তৃতীয় ভাগ।

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

 ১৩৪৬ মূল্য—দুই টাকা মাত্র
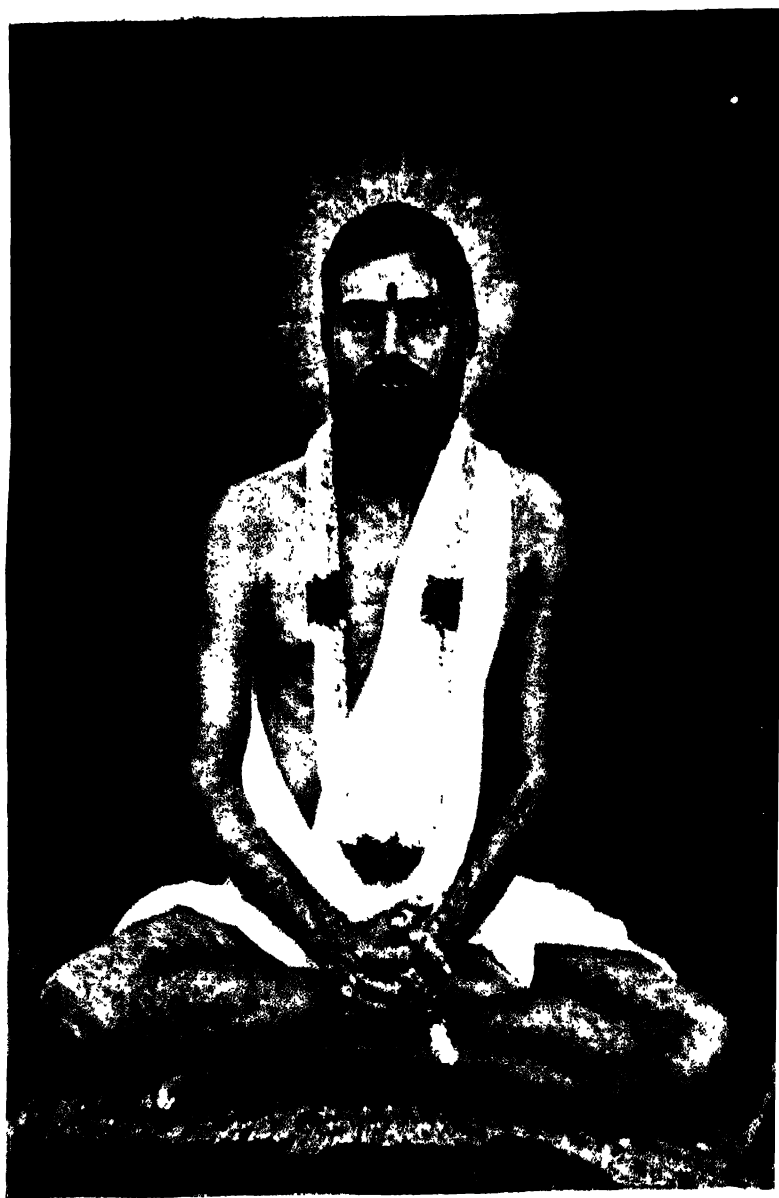
ঠাকুর শ্রীশ্রী জিতেন্দ্র নাথ

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ গুরুদেব

শ্রীশ্রীঠাকুর জিতেন্দ্রনাথের

শুভ অষ্টপঞ্চাশৎ জন্মতিথিতে

শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে

উৎসর্গ করা হইল।

লভিতে চির আশ্রয় প্রভু জীবনে মরণে
সুশীতল আপনার ঐ যুগল শ্রীচরণে
কি দিয়া করিব পূজা, দেব! কি আছে আমার
পাদ্য অর্ঘ্যাদি ভবে সকলই ত আপনার
তাই পূজিতে আজি ঐ রাঙ্গা চরণ দুখানি
এনেছি যতনে শ্রীমুখেরই **অমৃতবাণী**।

২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ সাল।
৯ই ডিসেম্বর ১৯৩৯।

ভূমিকা

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তাঁহার অমৃতবাণী তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। অমৃতবাণী প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ প্রায় বার বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ও শিষ্য মণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহার উপদেশ বাণী প্রচার করিতেছে। আমার ভাগ্যে তখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভ ঘটে নাই। প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রথম আসি প্রত্যহ কথোপকথনে তাঁর উপদেশ বাণী শুনিতে ভাল লাগিত বলিয়া ভবিষ্যতে আমার নিজের পাঠের সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে যেগুলি খুব ভাল লাগিত সেইগুলি তখনই অবিকল তাঁহার বাণী খুব তাড়াতাড়ি কোন রূপে নকল করিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিয়া পরিষ্কার করিয়া খাতায় লিখিয়া রাখিতাম। প্রথমে কেহই এ ব্যাপার জানিতে পারে নাই কিন্তু কিছু দিন পরে পূজনীয় ডাক্তারসাহেব দাদা জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিয়া দেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই শুনিয়া বলিলেন 'তা বেশ ত, তবে লিখছই যখন সবটাই লিখে যাও, বেশী হ'লে পরে ছাপান যেতে পারে।' তখনও পর্য্যন্ত আমার ধারণাই ছিল না যে শ্রীশ্রীঠাকুর যে ভাবে তাড়াতাড়ি অনর্গল উপদেশ দিয়া যান অত তাড়াতাড়ি আমি তাঁর সমস্ত বাণী সঙ্গে সঙ্গে অবিকল নকল করিয়া লইতে পারিব কি না। তাই আমি বলিলাম 'অত তাড়াতাড়ি সমস্ত কথা লিখিয়া উঠিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না তবে আপনি যখন আদেশ করিতেছেন, চেষ্টা করিব।' শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া একটু হাসিয়া হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন সবে কয়েক দিন মাত্র আমি নিয়মিত তাঁর সঙ্গ করিতে আসিতেছি, আমার কোনই অভিজ্ঞতা নাই তথাপি ঐ মৃদু হাসি ও আশীর্ব্বাদের ভাব ভঙ্গী আমার কাছে কেমন যেন অপরূপ বলিয়া মনে হইয়াছিল।

পর দিন হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ মত আমি প্রত্যহ তাঁহার উপদেশ-বাণী অবিকল যেমনটী বলিতেন সমস্ত নকল করিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া যাইতে লাগিলাম। কয়েক মাসের মধ্যেই প্রায় সাত শত পৃষ্ঠার উপর খাতায় লেখা হইয়া গেল, কেমন করিয়া যে হইল তাহা আমি নিজেই বলতে পারি না, কারণ এখন আমার নিজের খাতা দেখিলে

' আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না কেমন করিয়া কোন কোন দিন ষাট সত্তর পৃষ্ঠার উপরও লিখিয়া লইয়াছিলাম। কাজেই এ ভাবে লেখায় আমার নিজের বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা বা কৃতিত্ব নাই। এই অমৃতবাণীর গ্রন্থকার বা লেখক স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর তবে তিনি যে আমার প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার শক্তি দিয়া আমাকে কেবল মাত্র উপলক্ষ্য রাখিয়া তিনি নিজেই আমার দ্বারা তাঁহার বাণী গুলি লিপিবদ্ধ করাইয়া লইয়াছেন ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। তাঁহারই ইচ্ছায় আমি তাঁহার এই অমূল্য উপদেশ বাণীর গ্রামোফোন রেকর্ডের মত নকলদার বা লিপিকারক মাত্র।

এতদিন এইগুলি আমার কাছে লিপিবদ্ধ পড়িয়া ছিল এখন আবার তাঁহার ইচ্ছায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ছাপার কার্য্য চলিতেছে এমন সময় হঠাৎ একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর আমায় বলিলেন 'তা, তুমি এই বই নিয়েই প'ড়ে আছ এ ভাল.' আমি তাঁহার উপদেশ মত সঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেছি বটে কিন্তু এ পথে গতি করার মত আমার কোন ক্ষমতাই নাই; না আছে সাধন ভজনের একলক্ষ্য একাগ্রতা, না আছে সর্ব্বদা স্মরণ মননের বা সঙ্গলাভের সে একনিষ্ঠ প্রেম ভালবাসা; মন ত সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত, জোর ক'রে একটাতে লাগাবারও শক্তি নাই, তাই বুঝি দয়াল প্রভু আমার অবস্থা বুঝিয়া এই ভাবে আমাকে কৃপা করিবেন বলিয়া এই পুস্তক প্রকাশের ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যও দয়া করিয়া আমার দ্বারা করাইয়া লইয়া আমায় ধন্য করিলেন!

. আবার বই ছাপা প্রায় শেষ হইয়া আসিলে যখন প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয় সূচী এবং গান ও গল্পের সূচী লিখিতেছি এমন সময় হঠাৎ আমার মনে ইচ্ছা হইল যে ইংরাজী ভাষার পুস্তকের মত বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র একটী করিলে ভাল হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভাবিলাম যে ইংরাজী পুস্তকের প্রথা অনুযায়ী এক একটী কথা যেমন এখানে 'সঙ্গ', 'ভালবাসা' ইত্যাদি কোন্ কোন্ পাতায় আছে এ ভাবে না দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশবাণী গুলি কোন্‌টী কোন্ পাতায় আছে তার বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র দিলে সূচী হিসাবে যত লাভ হউক বা না হউক তাঁর অমূল্য উপদেশবাণী গুলি একত্রে এক জায়গায় পর পর সাজান থাকিলে পূজা আহ্নিকের সময় গীতা বা শাস্ত্র পাঠের মত এই উপদেশ গুলি প্রত্যহ নিয়মিত পাঠ করিলে আমাদের অশেষ কল্যাণ ও মঙ্গল হইতে পারে। ইহাও

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা নচেৎ বই শেষ হইয়া যাইবার পর হঠাৎ এ ভাবে বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র করিবার আমার খেয়াল হইল কেন? অর্থাৎ বইখানি আগাগোড়াই তাঁহারই ইচ্ছায় ও তাঁহার ভাবেই হইয়াছে, উপলক্ষ্য মাত্র আমি! আমার প্রতি তাঁর বিশেষ করুণা তাই আমাকে দিয়া এবার তিনি তাঁর এই কাজ করাইয়া লইলেন।

অমৃতবাণী প্রথম ভাগ বা দ্বিতীয় ভাগের কোন অংশই তৃতীয় ভাগে পুনরাবৃত্তি করা হয় নাই। তবে প্রসঙ্গ হিসাবে হয়ত এক ভাবের কথা থাকিলেও সেই বিষয়গুলি আরও বিশদ ভাবে এখানে বোঝান হইয়াছে। তা ভিন্ন কথা ত একই, তবে নানা ভাবে বিভিন্ন উপায়ে বার বার সেগুলি আমাদের শোনাইলে যদি কখনও কোনও ক্ষণে একটীর ভাবও অন্তঃত আমাদের মনে লাগিয়া গেলে আমারা সেই অনুযায়ী চলিতে পারি। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখেরই বাণী 'অমৃতবাণী জগতের কল্যাণ করিবে!' তাই তাঁহারই ইচ্ছায় আবার এতদিন পরে তাঁহার শ্রীমুখের এই আশীর্ব্বাদ বাণী জন সাধারণের কল্যাণের জন্য জগতে প্রচার হইল। আমার কাছে এখনও তাঁহার বাণী যাহা লিপিবদ্ধ রহিল তাহাতে চতুর্থ ভাগ অনায়াসে প্রকাশ হইতে পারে, তবে তাঁহার যখন আবার ইচ্ছা হইবে জন সমাজের হিতার্থে সেটীও ছাপান হইবে।

এই পুস্তক মুদ্রণে আমার পূজনীয় গুরুভাই দুইজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র (ডাঃ সাহেব) ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মল্লিক যত্ন সহকারে প্রুফ সংশোধন করিয়া যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন এবং আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ধর ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ধর তাঁহাদের ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ প্রেসে ভক্তিভাবে, যত্ন সহকারে ও অতি অল্প ব্যয়ে নিজেরাই ব্লক তৈরী করিয়া ছবি ও বই ছাপাইয়া দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য ও আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। তা ছাড়া এই কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ছাপাখানার সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি ভক্তি সহকারে ও আগ্রহের সহিত বরাবর আমাদের কার্য্যে সকল রকমে সাহায্য করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিতেন্দ্রনাথ মঠ।

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬।

শুদ্ধিপত্র

পাতা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৮	কহিতে	করিতে
১০	৬	বিশ্বাশ	বিশ্বাস
২৪	৭	কার্য্যে	কার্য্যে
২৪	১৭	সুখেব	সুখের
২৭	১৬	কাটাচ্ছি	কাটাচ্ছি
২৮	৪	মুর্ত্তি	মূর্ত্তি
২৮	২২	উত্তর	উত্তর
৩১	১৬	বাসনাও আকাঙ্খা,	বাসনা ও আকাঙ্খা
৮৪	১২	২৪শে	২৫শে
১১৯	৪	অর্জ্জুন	অর্জ্জুন
১২২	৬	থাকেন	থাকের
১২৫	২২	চাইবো	চাইবে
১২৮	১১	মুহূর্ত্তে	মূহুর্ত্তে
১৪৫	১৩	সভাসদকের	সভাসদদের
১৪৫	১৮	দুই জন	দু' চার জন
১৬২	১১	ষেমন	যেমন
১৬৪	১৭	বাঁকায়	বাঁকায় বাঁকায়
১৭৯	৫	নিষ্কৃতি	নিষ্কৃতি
১৮৬	১৭	রৈজয়ন্তি	বৈজয়ন্তি
১৯১	২৪	করলেও	করলে ও
৩১৪	২৭	তুমি তো হবে? দর	হবে? তুমি তাদের
৩৯১	১৮	পাব	পার

সূচীপত্র

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

গানের সূচীপত্র

* চিহ্নিত গানগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের রচিত।

* চিহ্নিত গানগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের রচিত।

উপদেশপূর্ণ গল্পের সূচীপত্র

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথের

অমৃতবাণী

তৃতীয় ভাগ—প্রথম অধ্যায়

কলিকাতা, সোমবার ১১ই বৈশাখ ১৩৪০ সাল;
ইং ২৪শে এপ্রিল ১৯৩৩।

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ৺কাশীধাম হইতে কলিকাতা পৌঁছিলেন। হাওড়া ষ্টেশনে অনেক ভক্ত গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া খিদিরপুরে কালুর বাড়ী গেলেন। সেখানে গঙ্গাস্নান করিয়া কালীবাড়ী গেলেন। আজ অমাবস্যা বলিয়া ওখান থেকে কালীঘাটে মা কালী দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে খিদিরপুরে পঞ্চানন্দ ঠাকুরের মন্দিরে গেলেন। তাহার পর কালুর বাড়ী আহার করিয়া বৈকালে মঠে ফিরিলেন।

সন্ধ্যার পর আলো জ্বালা হইলে আহ্নিক শেষ হইবার পর কথা হইতেছে।

শিরিশ। সকল সময় মনে ইচ্ছা থাকলেও কাজে ক'রে ওঠা যায় না।

ঠাকুর। তেমন জোর ইচ্ছা নয় তাই কাজ হয় না। মনের শক্তি তিন রকমের। যে জিনিষ পাবার ইচ্ছা হ'ল, তা পাওয়া যায় ভাল, না হ'লেও ক্ষতি নেই, মনের এরূপ অবস্থায় সেটা ফলতে পারে বা নাও ফলতে পারে। আর এক অবস্থা আছে, মনে জোর বাসনা হ'ল বটে কিন্তু সেটাই একমাত্র নয়, মনে আরও অনেক জিনিষ ধরা আছে,

অক্ষেত্রে আকাঙ্খা জোর হ'লেও একাগ্রতার অভাবে ও প্রাক্তন অনুযায়ী সকল সময় ইচ্ছামত ফল লাভ হয় না। কিন্তু মনের অবস্থা যখন এরূপ হয় যে আকাঙ্খার বস্তু যেমন ক'রে হোক পেতেই হবে তখন সেই বস্তু ছাড়া আর কোন দিকে লক্ষ্য থাকে না, এমন কি দেহের ওপর যতদূর কষ্ট হোক সেদিকেও গ্রাহ্য থাকে না। এখানে বস্তু লাভ হবেই। তাই বারবার বলেছে সঙ্গই প্রধান। সঙ্গে মনের শক্তি বাড়ে। অন্ততঃ কিছু সময় রোজ নিয়ম ক'রে সাধুসঙ্গ করবে।

শিরিশ। মনটা যেন দুর্ব্বল মনে হয়। কেমন একটা অবসাদ আসে। মনে হয় আমার কিছু হ'ল না। শরীরটাও খারাপ, অম্বলের অসুখে (dyspepsia) ভুগছি।

ঠাকুর। ও অসুখ নেই কার? বোধ হয় এখানে যত লোক ব'সে আছে তার প্রায় সকলেরই এ অসুখ আছে। তা ছাড়া বয়স হ'লে জরা আসবে ও সঙ্গে সঙ্গে রক্তের জোর কমবে। এ কালের ধর্ম্ম। কেউ রোধ করতে পারবে না। তবে মনের জোর রাখবে। মনকে শক্ত করবে। দুর্ব্বলতার কারণ খোঁজ ক'রে তা সরাবার চেষ্টা করবে। এই বয়সে শরীর ক্রমশঃ অপটু হয় ব'লে শীঘ্র ফল উপলব্ধি করার মত কোন কাজ করা চলে না। শরীরে যেমন সহ্য হবে সেই টুকু করা উচিত। এই জন্য সঙ্গই প্রধান। সঙ্গে মনের শক্তি বাড়বে। আর কি জান, মনকে সর্ব্বদা ত্যাগের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে তবে কিছু শান্তি পাবে। ভোগের দিকে নজর করলে কখনই শান্তি পাবে না, কারণ বাসনার ইতি নেই। আজ একজনের অবস্থা দেখে তোমার বাসনা হ'ল, কাল আবার তার চেয়ে বড় একজনকে দেখে আরও বাসনা উঠবে। এর আর শেষ নেই। তোমার আসল অভাব— ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্ন অর্থাৎ কেবল শাক অন্ন, লজ্জা নিবারণের জন্য একটু বস্ত্র ও মাথা গোঁজবার একটা স্থান। এ ক'টির ব্যবস্থা থাকলে তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে তিনি তোমার কোন অভাব রাখেন নি। অনেকের এ তিনটেও

তিনি দেন নি। এ ছাড়া আর বাকী সব ধার করা অভাব। এ ক'টার অভাব না থাকলে মন স্থির ও শান্তিতে থাকা উচিত।

জনৈক ভদ্রলোক। আমার ছেলের বড় অসুখ, কিছুতেই কিছু করতে পারছি না তাই আপনার কাছে এলুম।

ঠাকুর। আমি ত বাপু কোন ঔষধ জানি না। আমি যদি ঔষধ দিতে পারতুম তাহলে দেখতে ঘর লোকে ভরে যেত, শুধু এই ক'টি লোক থাকত না।

জঃ ভঃ। না, আমি সেভাবে আসিনি, তবে যখন কিছু হচ্ছে না তখন হঠাৎ মনে হ'ল আপনার কাছে গিয়ে জানাই যদি কিছু হয়।

ঠাকুর। দেখ, রোগ কর্ম্ম জনিত। যতক্ষণ না সেই কর্ম্মের শেষ হয় ততক্ষণ বড় কিছু হওয়া শক্ত। চেষ্টা ক'রে দেখ, আর, একটু চরণামৃত নিয়ে গিয়ে রোজ খাওয়াতে পার, তাতে যদি কিছু হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর দ্বিজেনকে গান করিতে বলিলেন।
দ্বিজেন গাহিল—

(১)

দীন ভক্তে দেখা দাও হে আসি ভকত বিলাসী।
আমি ধন চাইনা, মুক্তি চাইনা হে, শুধু ঐ (রাতুল) পদ অভিলাষী॥
প্রভু, তুমি যে আমার সর্ব্বমূলাধার, ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম।
(তুমি আমার বড়ই আপন, এমন আপন আর দেখি নাই)
তুমি মম প্রিয়, পরম আত্মীয়, তাই গেয়ে বেড়াই তোমার নাম।
(আমি দেশে দেশে নাম গেয়ে বেড়াই
দয়াল ঠাকুর এসেছেন ব'লে, আমি দেশে দেশে নাম গেয়ে বেড়াই
জীব তরাতে এ ধরাতে এসেছেন ব'লে, আমি দেশে দেশে নাম
গেয়ে বেড়াই)
প্রভু হে, প্রিয় হে, দয়াল হে, সর্ব্বগুণধাম (রামকৃষ্ণগুণধাম)॥
(বড় আপন জেনে তোমায় জানি
বড় ভালবাসার ধন জেনে হে তোমায় ভালবাসি)
এস অনাথ শরণ, ত্রিতাপ হরণ, জনম মরণ নাশী।

(তুমি অনাথের নাথ পতিত পাবন, এস অনাথ শরণ
তুমি অনাথ জনে রক্ষা কর, এস অনাথ শরণ)
এস যুগ প্রবর্ত্তক, ধর্ম্ম সংস্থাপক, ভকত হৃদয় বাসী।
(তুমি যুগে যুগে এসে থাক,
ধর্ম্ম সংস্থাপনের হেতু তুমি যুগে যুগে এসে থাক,
সাধুজনের রক্ষা হেতু তুমি যুগে যুগে এসে থাক,
দুষ্কৃত দমনের তরে তুমি যুগে যুগে এসে থাক।
তুমি ভক্ত হৃদে বাস কর,
তুমি ভক্তের লাগি দেহ ধর, ভক্ত হৃদে বাস কর,
তুমি ভক্ত বৎসল নামটী ধর, ভক্ত হৃদে বাস কর,
তুমি ভক্ত ছাড়া রইতে নার, ভক্ত হৃদে বাস কর)
প্রভু হে, প্রিয় হে, দেখা দাও হে আসি ॥
(এস ভক্ত সখা সঙ্গে ল'য়ে,
তুমি ভক্তের লাগি দেহ ধর, এস ভক্ত সখা সঙ্গে ল'য়ে)
এস সর্ব্বত্যাগী যোগী বেশে, এস প্রেমের ঠাকুর প্রেমিক বেশে।
(আজ সর্ব্বত্যাগ শেখাবে ব'লে, এস সর্ব্বত্যাগী যোগী বেশে।
আজ শাস্ত্র মর্ম্ম বোঝাবে ব'লে, এস সর্ব্বত্যাগী যোগী বেশে
এস প্রেমের ঠাকুর প্রেমিক বেশে
আজ প্রেমে আপন করবে ব'লে, এস প্রেমের ঠাকুর প্রেমিক বেশে
আজ প্রেমের বন্যায় ভাসাবে ব'লে, এস প্রেমের ঠাকুর প্রেমিক বেশে)
এস সন্ন্যাসীবর সঙ্গে নিয়ে হে, আমায় সাজাতে সন্ন্যাসী ॥

(২)

তুমি এত কাছে কাছে (আমার) হৃদয়েরই মাঝে লুকায়ে রয়েছ হরি।
কিন্তু আমি ভাবি মনে কত দূরে তুমি রয়েছ আমায় পাশরি ॥
যেমন ছায়া বাজীকরে, কত খেলা করে আড়ালে লুকায়ে থেকে।
তেমনি আমাদের ল'য়ে লীলায় মত্ত হ'য়ে রেখেছ আপনা ঢেকে ॥
যেমন আলোক সাগরে অন্ধ স্নান করে আলো কি যে বুঝতে নারে।
(অন্ধ জানে না জানে না,
আলো কি যে অন্ধ জানে না জানে না)
তেমনি তোমাতে ডুবিয়ে, তোমাতে মজিয়ে মোরা চিনতে নারি হে তোমারে ॥

যেমন কি ফুল ফুটেছে কোন্ বন মাঝে, না জেনেও অলি ধায়।

(অলি জানে না জানে না,

কোথা হ'তে গন্ধ আসে অলি জানে না জানে না)

তেমনি তোমাময় গন্ধে আমোদিত হ'য়ে, প্রাণ ছুটে যেতে চায়॥

(ব'লে কোথায় তুমি,

ব'লে কোথায় হরি, কোথায় হরি, প্রাণ ছুটে যেতে চায়)

যেমন নিজ নাভি গন্ধে অন্ধ হ'য়ে মৃগ ছোটে গন্ধ অন্বেষণে।

তেমনি তোমায় বুকে ধ'রে আকুল তোমার তরে মোরা ঘুরে মরি ভব বনে॥

(ব'লে কোথায় হরি কোথায় হরি

দেখা দাও দেখা দাও ব'লে ঘুরে মরি ভব বনে)

ধরা যদি নাহি দিবে, কেন মন মজাইলে, কেন দিলে এই প্রাণ মন।

দেখা যদি নাহি দিলে, কেন দুটী আঁখি দিলে, কেন প্রাণে এই আকর্ষণ॥

(দেখা দাও, দেখা দাও

বিনোদিয়া বেশে দেখা দাও দেখা দাও

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে দেখা দাও দেখা দাও

ভুবন ভরা কাল রূপে দেখা দাও দেখা দাও

শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে দেখা দাও দেখা দাও

আমি অতি মূঢ় মতি না জানি ভকতি স্তুতি

তোমার সাধন জানিনা ভজন জানিনা, কৃপা কর হে

এস হে কিশোর হরি, অধরে মুরলী ধরি, কিশোরী শোভিতা বামে

একবার দেখে যাই দেখে যাই,

আলো করা কাল রূপ একবার দেখে যাই দেখে যাই)

খুলে দাও আঁখির ডোর, ঘুচাও এ মোহ ঘোর, দূর কর যত অবিশ্বাস।

এই তুমি এই আমি এই ত জীবন স্বামী

(হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল)

(হরি বোল ব'লেরে, হরি বোল ব'লেরে)

হরি বোল ব'লেরে, হরি বোল ব'লেরে)

এই তুমি এই আমি, এই ত হৃদয় স্বামী, দেখা দিয়ে মিটাও হে পিয়াস॥

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর রচিত গান গাহিলেন—

তোমারি মতন এমন আপন এ ভুবন মাঝারে নাই আমার।
জীবন বল্লভ! ও নাথ, তুমি আমার আমিও তোমার॥
(ওহে জীবন বল্লভ, এই জগত মাঝে তুমি আমার আমিও তোমার)
(ওহে) দিবানিশি নাথ আছ আশে পাশে, প্রাণে প্রাণে আছ কত ভালবেসে।
আমায় ছাড়িয়ে (ভুলিয়ে) থাকনা, তবু ভালবাসা বুঝিনা তোমার॥
(ওহে প্রাণবল্লভ, তবু ভালবাসা বুঝিনা তোমার)
দিতেছ শকতি কহিতে বলিতে, খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে।
আমায় দেখিতে শুনিতে, তোমা বিনা কোন বল নাহিক আমার॥
(ওহে) দীনবন্ধু হরি, দীন জন ত্রাতা, তুমি বিনে কে আর বুঝবে মম ব্যথা।
আমায় যা করাও আমি তাই ক'রি, আমায় যা বলাও আমি তাই ব'লি।
তুমি হরি সর্ব্বসারাৎসার, ওহে তুমি হরি সর্ব্বমূলাধার॥

তৃতীয় ভাগ—দ্বিতীয় অধ্যায়

—০—

কলিকাতা, মঙ্গলবার ১২ই বৈশাখ ১৩৪০ সাল;

ইং ২৫শে এপ্রিল ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর আলো জ্বালা হইলে আহ্নিক শেষ হইবার পর দ্বিজেন সরকারের ভায়ের সঙ্গে দীক্ষা সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

দ্বিজেনের ভাই। অনেক আগে একজন সাধুকে দেখে ভাল লাগায় তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছি। এখন কুলগুরু এসে আবার দীক্ষা দেবার জন্য জেদ করছেন।

ঠাকুর। দীক্ষা ত দু'বার হয় না। দীক্ষা কেবল মাত্র একবার হয়, তবে দীক্ষার পর শিক্ষা নেওয়া চলে। সংসারী অর্থাৎ ভোগী গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেত্তয়ার পর সন্ন্যাসী অর্থাৎ ত্যাগী গুরুর কাছে শিক্ষা নেওয়া চলে। কিন্তু ত্যাগী বা সন্ন্যাসী গুরুর নিকট দীক্ষা হ'লে আর ভোগী বা সংসারী গুরুর নিকট শিক্ষা চলে না, কারণ তার কোন প্রয়োজন হয় না। ভোগ থেকে ত্যাগে যেতে হয় তাই ভোগ থেকে ত্যাগের শিক্ষা নিতে পার কিন্তু ত্যাগ থেকে আর ভোগে আসতে পারে না। এ, বি, সি, ডি (a, b, c, d) পড়ার পর ক্রমে এম্ এ (M. A.) ক্লাসে শিক্ষা লওয়া চলে কিন্তু উচ্চ শিক্ষা নিয়ে কেউ কি আবার নীচের ক্লাসে পড়তে আসে ?

দ্বিঃ ভাঃ। তাঁর নিকট দীক্ষা নেবার পর আমি অন্যান্য সাধুর কাছে গেছি কিন্তু আমার মনে কোন ভেদ বা বিদ্বেষ ভাব আসে না। এই আপনার কাছে এসেছি কোন ভেদ মনে হচ্ছে না। কেবল মাত্র আমার গুরুর ওপরই একনিষ্ঠ আস্থা রাখতে ভাল লাগে।

ঠাকুর। সে ত খুব ভাল। নিজের গুরুর ওপর এ রকম নিষ্ঠা রাখাই ত দরকার। আর গুরু ত সব এক। কারণ গুরু ত আর খোলটা নয়। গুরু সেই ভগবান, যখন যাঁর ভেতর দিয়ে যে ভাবে কাজ করেন।

দ্বিঃ ভাঃ। কুলগুরু এখন বলছেন যে কুলগুরু থাকতে তাঁকে ত্যাগ ক'রে অন্যত্র দীক্ষা নিলে পতিত হ'তে হয়।

ঠাকুর। আত্মার উন্নতি কল্প ছাড়া দীক্ষাই হয় না, এ ছাড়া দীক্ষার কোন মানে হয় না কাজেই দীক্ষা নিলে পতিত হয় না। তা ছাড়া, কুল গুরু ত ত্যাগ করছ না। তাঁর প্রাপ্য দিয়ে দেবে। বার্ষিকও সাধ্য-মত ঠিক ব্যবস্থা রাখবে আর এই কথা ব'লে তাঁকে বুঝিয়ে দেবে যে 'আমার ভাল লাগায় যদিও আমি অন্যত্র দীক্ষা নিয়েছি তথাপি সাধ্য-মত আপনার প্রাপ্য ঠিক বজায় রাখতে চেষ্টা করব।'

দ্বিঃ ভাঃ। তা হ'লে কি আমরা বুঝব যে আজকালকার কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিলে ঠিক কাজ হবে না ?

ঠাকুর। দেখ, মনের অবস্থা অনুযায়ী ও পূর্ব্বজন্মের যোগাযোগের দ্বারা সদ্‌গুরু লাভ হয়। সংসারী গুরুর কাছে দীক্ষা নিলে যে কাজ হবে না তার মানে নেই, কিন্তু এ অবস্থায় ঠিক ঠিক গতি করতে হ'লে শিষ্যের খুব শক্তি সম্পন্ন এবং জোর বিশ্বাসী হওয়া চাই। তা ভিন্ন কিছু হবার যো নেই। কথায় আছে—

"যদিও আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥"

এর একটা মানে হচ্ছে, গুরু শুঁড়ী বাড়ী যান আর যাই করুন তবুও তিনি আমার সেই নিত্যানন্দ রায়। আর অন্য মানে হচ্ছে, নিত্যানন্দ রায় শুঁড়ী বাড়ী গিয়ে তার (শুঁড়ীর) ভাবে প'ড়ে যে নীচ হ'য়ে যাবেন এ ভাব মনে উঠবে না। তিনি যখন শুঁড়ী বাড়ী গেছেন তখন নিশ্চয়ই তিনি তাদের উদ্ধার করতে গেছেন। তা দেখ, গুরু যাই করুন শিষ্য ঠিক সেই গুরু ভাবেই দেখবে, এ রকম জোর বিশ্বাসী শিষ্য

পাওয়া অত্যন্ত বিরল। সংসারে যদি কারুর নিজের অভাব থাকে ত সে কখনও অপরের অভাব মোচন করতে পারে না। কুলগুরু মানে যাঁর কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়েছে। তাঁরা সিদ্ধ ছিলেন, কাজেই তাঁদের দ্বারা সহজে কাজ হ'ত। কিন্তু তাঁদের বংশপরম্পরায় যাঁরা এসেছেন, তাঁরা যদি সাধন ভজন হীন হন, তা হ'লে তাঁদের দ্বারা কি সেই পরিমাণ কাজ হ'তে পারে? দেখ, একজন এম-এ পাশ করা মাষ্টারের কাছে প'ড়ে তুমি এম-এ পাশ করলে, এখন সেই মাষ্টারের ছেলে যদি লেখা পড়া না শেখে, তা হ'লে তোমার ছেলেকে এম-এ পাশ করাতে হ'লে তার কাছে কি পড়াবে? তবে, তাঁরা তোমাদের গুরু-বংশীয় ব'লে তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। গুরুর কার্য্য বড় কঠিন। এ শুধু সন্দেশ খাওয়া, টাকা নেওয়া নয়। যিনি সদ্‌গুরু তাঁর কোন অভাব থাকে না। শিষ্যের জন্ম জন্মান্তরীন কর্ম্ম গ্রহণ ক'রে ক্ষয় করতে হয়, শিষ্যের শক্তি বুঝে সেই পরিমাণ কার্য্যের বোঝা দিতে হয় এবং প্রকৃতির ধাক্কার ভেতর থেকে রক্ষা ক'রে গতি করাতে হয়। শক্তি সম্পন্ন গুরু না হ'লে এসব কার্য্য হয় না। যীশাস বলতেন 'স্থির সমুদ্রে নৌকা নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তরঙ্গায়িত সমুদ্রে ভাল মাঝি না হ'লে নৌকা নিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন।' তা, এ সংসার সমুদ্রে ঝড় তুফান তরঙ্গ লেগেই আছে, কাজেই এখানে শক্তি-সম্পন্ন গুরু ছাড়া গতি করা বড়ই শক্ত। তবে, যদি তোমার তাঁর 'ওপর' খুব বিশ্বাস ও ভক্তি আসে, তা হ'লে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। সেইজন্য জোর বিশ্বাস, ভক্তি ও খুব মনের টান না হ'লে কারুর কাছ থেকেই দীক্ষা নিতে নেই। তবে, যদি কেউ শুধু ভোগ রাঁধবার জন্যে সংস্কার বশতঃ নিতে চায়, সে আলাদা কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর রচিত গান গাহিলেন—

ও ভাই গুরুই কর্ণধার।
এই মায়ানদী পার হইতে গুরুই কর্ণধার॥
বেদ বেদান্ত দর্শন প'ড়ে পায়না কিছু তার।
এ পারেতে যারই বাড়ী ও পারেতেও তার॥
গুরুবাক্যে বিশ্বাশ ক'রি তুই ভাসিয়ে দে তোর দেহ তরি।
যাবি এক নূতন দেশে হেসে হেসে, জয় গুরু ব'লে পাড়ি মার॥
কাজ কি রে ভাই অপর কাজে, তুই গুরুর রূপে থাক্‌না মজে।
যাবে তোর সকল অভাব, হবে স্বভাব, অভাব নেই তোর কোন কালে॥
ছেড়ে ভাই সকল আশা মায়ার বাসা গুরুর চরণ কর সার॥
(দীন বলে) পূর্ণ বিশ্বাস এলে ভাই।
দেখবি গুরু বিনা এ জগতে আর ত কিছুই নাই॥
পারাপার থাকবে না আর ঘুচবে বিকার।
দেখবি রে সব একই পারে,
তখন কালী, কৃষ্ণ, শিব যে গুরু, গুরুময় এ সংসার॥

তৃতীয় ভাগ—তৃতীয় অধ্যায়

কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৪ই বৈশাখ ১৩৪০ সাল ;

ইং ২৭শে এপ্রিল ১৯৩৩।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলিতেছেন—

বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে। সঙ্গই প্রধান, সঙ্গেই উদ্দীপনা হয়। যেমন সঙ্গ করবে তেমনি সব বৃত্তি লাগবে। ভোগীর সঙ্গ করলে ভোগ বাসনা বেড়ে যাবে, আর ত্যাগীর সঙ্গ করলে ক্রমশঃ ত্যাগের দিকে নিয়ে যাবে। ভোগ বাসনার কি শেষ আছে? পর পর যত দেখবে ততই পর পর আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যাবে। তাতে ক্রমশঃই অশান্তি বাড়তে থাকে। যদি ঠিক ঠিক শান্তি পেতে চাও, তাহ'লে মনের শক্তি বাড়াতে ও ত্যাগের পথে যেতে চেষ্টা কর। সুখ, দুঃখ, শান্তি, অশান্তি ত আর কিছুই নয়, সবই তোমার মনের ওপর। মনের বাসনা পূরণ হ'লেই সুখ, আর না হ'লেই দুঃখ। মন যা চায় সেটা না পেলেই ত মনে অশান্তির সৃষ্টি হয়, কাজেই যে যত পরিমাণ বাসনাকে জয় বা অধীন করতে পারবে, তার সেই পরিমাণ মনে শান্তি থাকবে। সেই জন্যই ত আছে, যার যত বেশী বাসনা সে তত দরিদ্র, যার যত বাসনা কম সে তত ধনী। তোমার চেয়ে অবস্থাপন্ন লোকদের নকল করতে গেলে দুঃখ বাড়বে। তাদের নকল ক'রো না। তাদের দিকে মেলা দৃষ্টি রেখো না। কারণ প্রালব্ধে না থাকলে সে অবস্থা হবে না, অশান্তি আসবে। তাই রূপ, ঐশ্বর্য্য, মিষ্ট কথা অর্থাৎ চাটুবাক্য থেকে দূরে থাকতে বলেছে। এর একটা গল্প আছে।

একজনের একটা পা খোঁড়া। সে খুঁড়িয়ে চলে। অপর লোককে সুস্থ ভাবে চলতে দেখে মনে মনে ভগবানের নিন্দা করে যে তাঁর কি অন্যায়, ওরা কেমন হাঁটছে, আর আমায় তিনি এমন করলেন যে ভাল ভাবে হাঁটতে পারছি না। এরূপ পক্ষপাতিত্ব তাঁর অন্যায়। এমন অবস্থায় একদিন পথে যেতে যেতে দেখে যে রাস্তার ধারে একজন গলিত কুষ্ঠ রোগী ব'সে ব'সে তার ঘায়ের ওপর থেকে যে পোকা গুলি মাটীতে প'ড়ে যাচ্ছে সেইগুলো আবার ঘায়ের ওপর তুলে দিচ্ছে। তার দুটো পাই ঘায়ে পচে গেছে, একেবারে উত্থানশক্তি রহিত। তাকে ওরকম করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বললে যে 'আমার এই দেহ ত একদিন শেষ হয়ে যাবে, তখন একে পুড়িয়ে ছাই করা হবে। এর দ্বারা ত আর কারুর কোন উপকার হ'ল না কিন্তু ভগবানের এত দয়া যে এই দেহ দ্বারা তিনি এত গুলি জীবের জীবন ধারণের ব্যবস্থা ক'রে আমাকে ধন্য করেছেন। তাই আমি পোকা গুলো তুলে তুলে দিচ্ছি।' তখন সেই খোঁড়া লোকটি অবাক হয়ে ভাবলে যে এই ব্যক্তি গলিত কুষ্ঠে অকর্ম্মন্য হ'য়ে এত যন্ত্রণা ভোগ করছে তবু ভগবানকে দোষ দেওয়া ত দূরে থাক, তার এই অবস্থাতেও ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। আর আমি কোন রকম কষ্ট পাচ্ছি না কেবল চলবার একটু অসুবিধা ভোগ করছি ব'লে তাঁকে এত দোষ দিচ্ছি! এই ভেবে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে যে সে না বুঝে এই রকম তাঁকে অযথা দোষ দিয়েছে, আর কখনও এরূপ করবে না।

সঙ্গ করতে করতে ক্রমশঃ ভালবাসা লাগে এবং ভালবাসা লাগলেই কাজ হ'তে থাকে। এই ভালবাসা লাগারও আবার তারতম্য আছে, বালক অবস্থায়, তারা বিবাহ করে নি ব'লে, দেব স্থানে বা সাধুস্থানে যে ভালবাসা দেয়, সেটা প্রায়ই নিঃস্বার্থ হয়, কারণ তখনও তারা সংসার জ্বালায় জর্জ্জরিত হয় নি। ভেতরে সংসারের কোন স্বার্থ প্রবল ভাবে না থাকায় তারা নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবেসে সাধুর কাছে আসে; কিন্তু এ ভালবাসা অপর সঙ্গে মিশে ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা

আছে, তাই বেড় দিয়ে রাখা উচিত। যৌবনে, বিবাহের পর সংসারীরা সাধারণতঃ সংসার সুখের আশায় সাধু সঙ্গ করে এবং সে আশা না পূরলে অনেক জায়গায় ভালবাসা দাঁড়ায় না। বার্দ্ধক্যে, যারা সাধু সঙ্গ করে তারা সচরাচর ভয়ে আসে।' কারণ তখন মনে ভাবে যে 'দিন ত চলে গেছে, সংসারে কেবল স্ত্রী পুত্রকে সুখী করবার চেষ্টা ক'রে দিন কাটিয়ে দিয়িছি, নিজের পাথেয় ত কিছুই সঞ্চয় করিনি, এইবার সময় হয়েছে যেতে হবে' এই ভয়ে সাধু সঙ্গ করে। তখন আর তারা সংসার প্রলোভনে তত ভোলে না বটে, কেননা সংসারটা আগেই ভোগ ক'রে দেখেছে, কিন্তু শরীর অপটু হয় ব'লে ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় সে দিকে গতি করা তাদের পক্ষে শক্ত হ'য়ে পড়ে। অবশ্য, এই যে তিন অবস্থার ভালবাসার কথা বলা হ'ল, এ সাধারণ। কারুর হয়ত এমন মনের শক্তি থাকতে পারে যে বেশী বয়সেও সে ঠিক গতি করতে পারে। আর যে বিশ্বাসী, তার কথা আলাদা, সে সব অবস্থাতেই ঠিক গতি করবে। ভালবাসায় যেমন কাজ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। সাধুরা পরকে আপন ক'রে ভালবেসে তাদের কাজ করিয়ে নেন। তাই, পরমহংসদেব সকলকে আপন ক'রে নিয়ে ভালবেসে কাজ করাতেন, আর তারাও সেই ভালবাসায় আপনের মত ছুটে আসত। তিনি বলতেন, 'ওরে! লোকে সাধুর কাছে আসে হাত দেখাতে আর ওষুধ নিতে বা বড় জোর দু একটা মুক্তি মোক্ষের কথা বলতে, কিন্তু তোরা যে আমার কাছে ছুটে আসিস আর ছাড়িস না কেন জানিস, ? তোদের সঙ্গে পূর্ব্ব জন্মের সম্বন্ধ আছে, তাই তোরা এত আপন হয়ে গেছিস, না এসে থাকতে পারিস নি।' পরমহংসদেব তাদের এত ভালবাসতেন যে তারা না এলে তিনি অনেক সময় কেঁদে ফেলতেন ও বলতেন, 'ওরে, যারা সব ছেড়ে আমার জন্য ছুটে আসে, তারা যে সব আপন, তারা না এলে কাদের নিয়ে থাকব?' হাজরা মশাই একটু বেদান্ত পড়েছিলেন, তিনি এই কান্না দেখে একদিন বলেছিলেন "তুমি তাদের জন্য কাঁদ, না এলে গঙ্গার ধারে গিয়ে চেয়ে

থাক, তাদের অসুখ হ'লে আবার পূজা মানত কর। তোমার দেখছি মায়া হয়েছে, তুমি প'ড়ে গেছ, কিছু সাধন কর, তবে এই মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।" প্রায়ই এই কথা শুনে শুনে তিনি একদিন বললেন 'ওরে শালা! (শালা, শালা, তাঁর কথার মাত্রা ছিল) তুই দুপাতা বেদান্ত প'ড়ে কি বুঝবি? মন যখন সমাধিতে থাকে তখন আলাদা, তা ছাড়া মন নেমে এসে কাদের নিয়ে থাকবে? যারা সংসারের এত প্রলোভন ও আকর্ষণ ছেড়ে আমার কাছে ছুটে আসছে, ওরে তারাও যে আমি রে! আমি কি অপর চিন্তা করি? আমি যে আমারই চিন্তা করি কারণ তাদের মধ্যে আমার চিন্তা ছাড়া আর অন্য চিন্তাই যে নেই।'

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর রচিত গান গাহিলেন—

তোরা যে আমার বড় আপনার তাই থাকিনে তোদের ছাড়িয়ে।
আপন হারাই, সব ভুলে যাই, তোদের পানেতে চাহিয়ে॥
দিবা নিশি শুধু তোদের নাম নিয়ে আনন্দ সাগরে যাইরে ভাসিয়ে।
তোরা বিনে আর কে আছে আমার দেখ্ দেখিরে ভাবিয়ে॥
আপন হইতে হোস্ আপনার, জীবনে মরণে তোরা যে আমার।
জনমে জনমে এ প্রেম বন্ধনে রেখেছিস তোরা বাঁধিয়ে॥
করি অশীর্ব্বাদ শান্তি সুখে থাক, বিশ্বাস ভকতি হৃদে সদা রাখ।
তোরা মোর জীবন হৃদয়ের ধন থাক আনন্দে মগন হইয়ে॥

তৃতীয় ভাগ—চতুর্থ অধ্যায়

—০—

কলিকাতা, শনিবার ১৬ই বৈশাখ ১৩৪০ সাল;
ইং ২৯শে এপ্রিল ১৯৩৩।

ললিত। শাস্ত্রে যে আছে পঞ্চাশ উর্দ্ধে বনং ব্রজেত, এটা কি ঠিক?

ঠাকুর। হ্যাঁ, এ ধনীদের জন্যে। পূর্ব্বে খুব ধনী আর খুব দরিদ্র এই দুই রকম লোকই ছিল। মাঝামাঝি গেরস্ত কম ছিল। যারা গরীব, অভাবের ঠেলায় তাদের মন ত প্রায় বন হয়েই আছে। আর, বনের প্রয়োজনই বা কি? আসল কথা, কামনা বাসনাকে জয় ক'রে মনের অধীন করতে পারলেই শান্তি পাওয়া যায়। বাসনার অধীন হলেই লোকালয় আর বাসনাকে অধীন করতে পারলেই বন। তা ভিন্ন বনে গিয়েও কোন ফল নেই। ভরত রাজার বনে গিয়েও হরিণ শিশুর পাল্লায় প'ড়ে হরিণ জন্ম হ'ল, আবার জনক রাজা রাজত্ব চালিয়েও রাজর্ষি। এইখানে ঠাকুর জনক রাজা ও শুকদেবের গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ১ম ভাগ, ৭৪ পৃষ্ঠা)। সেই জন্য সংসারই মনকে তৈরী করবার ঠিক জায়গা, কারণ এখানে সর্ব্বদা কামনা বাসনার মধ্যে থেকে সহজেই বুঝতে পারবে মনের শক্তি কতদূর বাড়্‌ল কিন্তু বনে গিয়ে কামনা বাসনার লোভে না পড়ার দরুন অনেক সময় মনে হতে পারে যে কামনা বাসনা জয় হয়েছে কিন্তু হয়ত কামনা বাসনার সংস্পর্শে এলেই মন সহজেই সেই দিকে দৌড় মারবে। তবে কামনা বাসনার হাত থেকে একেবারে রক্ষা পেতে গেলে সংসারে থেকে মনের শক্তি বাড়িয়ে নির্জ্জনে সাধনা করা দরকার। তার পর সিদ্ধিলাভ হ'য়ে গেলে আবার সংসারে থাকতে পারা যায়।

তা ছাড়া, পঞ্চাশ বৎসর বয়স হলেই সাধারণতঃ ছেলে মানুষ করা, মেয়ের বিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজ শেষ হয় তখন উপযুক্ত ছেলের হাতে সংসার ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজ করতে হয়। তুমিত এত দিন

সংসার করলে, ছেলে মেয়ের প্রতি কর্ত্তব্য করলে, এখন তারা যে যার সংসার করুক ও তাদের কর্ত্তব্য করুক। আবার, তোমার প্রতিও তাদের কর্ত্তব্য আছে। সেই ছেলে ঠিক কর্ত্তব্য পালন করে, যে বাপ মাকে সংসার থেকে আলাদা ক'রে ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হবার জন্যে সুবিধা ও ব্যবস্থা ক'রে দেয়। ছেলে রোজগার ক'রে টাকা এনে দিলে বা খুব বাধ্য হ'য়ে সম্মান করলেই, তোমাদের সংসারীদের চোখে সে খুব ভাল ছেলে হ'ল, আমি কিন্তু তাকে সে ভাবে ভাল বলব না। অনেক দিন খেটে দিয়েছ বলে গবর্ণমেণ্টও তাদের কর্ম্মচারীদের পেন্সন দেয়, ও যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন খাবার পরবার ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু তুমি (আমি সাধারণ ভাবে বলছি) এমনি মায়ায় বদ্ধ যে পেন্সন নিয়ে সংসারত ছাড়লেই না, বরং আরও বেশী সময় সংসারে দিচ্ছ। এখন ছেলের সংসার নিজে ঘাড় পেতে নিয়ে, তাদের অসুখ করলে ঔষধ, পথ্যের ব্যবস্থা করছ, নাতির লেখাপড়ার ভার নিচ্ছ, এবং নাতনির বিয়ের ভাবনা ভাবছ। ছেলে না হয় মাস গেলে কিছু টাকা এনে তোমার হাতে দেয়। অর্থাৎ ছেলে দেখলে পয়সা দিয়ে বাইরের অপর চাকর রেখে সংসারের কাজ করানর চেয়ে, বাপের মত এত দরদী লোক যখন কিছু টাকা দিলেই পাওয়া যায় তখন সেইটাইত বেশ! সে মজা ক'রে তার নিজের ভার বাপের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমোদে দিন কাটাতে লাগল। ফলে কি হল? তুমি অকর্ত্তব্য নিয়ে জড়িয়ে নিজের আসল কাজ কিছুই করলে না, আবার ছেলেকেও তার কর্ত্তব্য বুঝতে বা করতে দিলে না। তোমার কর্ত্তব্য তুমি ছেলে মানুষ ক'রে দিয়েছ। সে যদি তার রোগের ঔষধ, পথ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা না করতে পারে বা নিজের ছেলে না মানুষ করতে পারে বা রোজগারের টাকা ঠিক হিসাব মত না রাখতে পারে ও নষ্ট করে, তার জন্যে সে ভুগবে। তার কর্ত্তব্য সে ঠিক মত না করতে পারে, সে দুঃখ পাবে। তুমি তার জন্যে নিজের ক্ষতি কর কেন? নিজের খাবার সংস্থানের মত কিছু রেখে, সব ভার বুঝিয়ে দিয়ে নিজের কাজে

শ্রীশ্রীঠাকুর জিতেন্দ্রনাথ

লেগে যাও। তুমি এখন যা করছ এরই নাম বদ্ধ মায়া; এ ছেলে মেয়ে ব'লে নেই। নিজের ছেলে মেয়ে না থাকলেও অপরকে নিয়ে বা পুষ্যি নিয়ে এই ভাবে বদ্ধ জীবের সংসার চলছে, অথচ সে মনে মনে ভাবে সে খুব কর্ত্তা সেজেছে এবং খুব কর্ত্তব্য করছে। এই ত সংসার। এই মায়ার রাজ্যে ব'সে থেকে, মনটা সাধুর কাছে ফেলে রেখে স্মরণ মনন ২৪ ঘণ্টা করা, বলাটা যত সোজা কাজে কিন্তু কিছুই হয় না। তা ছাড়া, সংসারীদের মন দেহাত্মবোধ নিয়েই আছে, সেটা ছাড়া মন বড় থাকতে পারে না; কাজেই দেহটা যেখানে, মনটাও সেই খানে প'ড়ে থাকে। তবে তোমার মন যখন দেহাত্ম বুদ্ধি ছাড়িয়ে উঠবে, তখন তুমি এক জায়গায় ব'সে স্মরণ মনন ক'রে সব করতে পারবে। তখন আর তুমি নিজের ছেলে মেয়ের জন্যও তাদের কাছে ছুটবে না। কিন্তু যখন সংসারীয় কাজের বেলা বহুদূরে থাকলেও ছুটছ, আর সাধু সঙ্গের বেলাই কেবল এখানে না এসে ঘরে ব'সে স্মরণ মনন করতে চাচ্ছ, তখনই বুঝতে হবে তুমি তোমার মনকে ঠিক ধরতে পার নি এবং তোমার ধারণা নেই যে বাস্তবিক মনটা জোর কোথায় প'ড়ে আছে।

ঠাকুর গাহিলেন—

মনের নাগাল পেলাম নারে ভাই।
তারে ধরব ধরব মনে করি, ধরতে তারে পারি নাই॥
মন যদি ভাই আমার হ'ত, সে আমার প্রেমে ম'জে রইত।
(আমায়) দিয়ে ফাঁকি ক'রে চালাকি পালিয়ে যায় সে অপর ঠাঁই॥
(এই) মনের লাগি সব খোয়ালাম, তবু তারই দেখা নাহি পেলাম।
খেলে মনরে পাজি ভোজের বাজী, এখন আমি ম'লে বেঁচে যাই॥
(দীন বলে) শোনরে মন বলি তোরে, আর ছুটোছুটি করিস না রে।
আয় সকল ছেড়ে স্বরূপ ধ'রে আপন ঘরে ফিরে যাই॥

মতি (ডাক্তার)। নেংটা সাধুদের মধ্যেও ত গোলমাল দেখা যায়। সেবার কুম্ভ মেলায় রীতিমত মারামারি হ'য়ে গেল।

ঠাকুর। নেংটা হ'লেই যে প্রকৃত সাধু হ'ল তা ত নয়। ঠিকঠিক

যদি দেখা দাও সে তোমার দয়া, আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু এই বাদশা আজ সমস্ত ছেড়ে এক কাপড়ে খালি পায়ে তোমার কাছে এসেছে, একে যদি দেখা না দাও ত তোমার নামে কলঙ্ক হবে'। এই বলতেই সেই মন্দির মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় রূপে বিটবা মূর্ত্তি দর্শন হল।' সেই অবধি পুটলিনাথ শিবের আর একটী নাম বিটবা হ'ল।

তৃতীয় ভাগ—ষষ্ঠ অধ্যায়

———o———

কলিকাতা সোমবার ১৮ই বৈশাখ ১৩৪০ সাল;

ইং ১লা মে ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর আলো জ্বালা হইলে আহ্নিক শেষ হওয়ার পর ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেখ, মনের কি অবস্থা! এক অল্প বয়সী বিধবা ভক্তের একটী ছেলে ও একটী মেয়ে ছাড়া এ সংসারে আর কেউ নেই। তত্রাচ সেই ছেলেটি আজ ২০ দিন টায়ফয়েড রোগে ভুগে এখন অজ্ঞান অবস্থায় প্রায় মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকা সত্বেও সেই ছেলেকে সে অবস্থায় ফেলে চলে আসা কতটা মনের শক্তির দরকার বল দেখি! তা এসে আমাকে একবারও ছেলের অসুখ কিসে ভাল হবে সে কথা না বলে বরং বললে 'ঠাকুর এইভাবে কি আমায় আটকে আপনার কাছ থেকে দূরে রাখছেন?' সে বললে এক ঘণ্টার জন্যে ছুটি নিয়ে একজনকে বসিয়ে আমায় দেখতে এসেছে কিন্তু এক ঘণ্টার জায়গায় সমস্ত দিন কেটে গেল দেখে আমি বললুম 'তুমি এক ঘণ্টার জন্যে ছুটি নিয়ে এসে সমস্ত দিন রইলে সেটা কি ঠিক হ'ল?' সে উত্তর দিলে 'আমি কি আর করব? আমি কি বাঁচাতে পারব? তার পরমায়ু থাকে ত বাঁচবে।' তখন তাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে পাঠাতে হ'ল যে 'যতক্ষণ সংসারে আছ ততক্ষণ কর্ত্তব্য ঠিক ক'রে যাবে। ছেলের এমন অবস্থায়

তোমার কর্ত্তব্য ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে তার কাছে থেকে ঠিক নিয়ম ক'রে ঔষধ পথ্য খাওয়ান ও সেবা করা।' এই হ'ল ঠিক মনের অবস্থা। এর আর আলাদা নেই। যার যখন এরকম অবস্থা হবে তখন তার ঠিক এই সব লক্ষণ দেখা যাবে। এ হ'ল অনুরাগের পূর্ব্ব লক্ষণ। সাধারণ ভাবে মনের এ সব অবস্থা বোঝা যায় না। যার এ অবস্থা হয়েছে কেবল সেই বুঝতে পারে, অপরে কিছুই ধরতে পারবে না। যার হয় সেই বোঝে, আর যার হয় না সেই বোঝায়।

এ ভাব যে জেনেছে সে মরেছে সে ত কভু জ্যান্ত নয়।
সে যে মরার মর্ম্ম মরায় বোঝে জ্যান্তে কি তার খবর হয়?

সাধারণ ভাব নিয়ে এর বিচার করতে পারবে না, আর বিচার করতে যাওয়াও উচিত নয়।

জনৈক ভদ্র লোক। ৯ বৎসর বয়সে পৈতার পরই দীক্ষা হয়। তদবধি সেই নীতি পালন ক'রে আসছি এবং এখনও ঠিক সেই মত পালন করছি কিন্তু কিছু উন্নতি হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। কয়েক মাস পূর্ব্বে আপনার অমৃতবাণী পাঠ ক'রে সেই পুস্তকে আপনার ফটো দেখে আপনাকে দর্শন করবার জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হয়েছিল। পরশু রাত্রে আবার আপনাকে স্বপ্নে দেখা পর্য্যন্ত মন কেমন করতে লাগল ব'লে আপনার চরণ দর্শন করতে এলুম। দীক্ষা অনুযায়ী নীতি পালন করছি বটে কিন্তু ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা বুঝতে পারছি না। অনুগ্রহ ক'রে যদি পথ ব'লে দেন ত সেই অনুযায়ী চলি।

ঠাকুর। লোকে দুভাবে ভগবানকে ডাকে। কেউ ভগবানকে পাবার জন্যে, আবার কেউ বা সংসার সুখের জন্যে অথবা দুঃখের নিবৃত্তির জন্যে। ভগবান দর্শন করতে গেলে সম্পূর্ণ ত্যাগ দরকার। বাসনা কামনা বা আসক্তি কিছুমাত্র থাকতে তাঁকে পাওয়া যায় না। আর, সংসারের মধ্যে থেকে ডাকা অনেক সুবিধা। তিনি অনেক সুবিধা ক'রে দেন। সাধারণ সংসারীর পক্ষে তাঁর করুণা লাভের জন্যও তাঁকে ডাকা খুব ভাল। তাতে জন্ম জন্মান্তরীন অনেক কর্ম্ম ক্ষয় হ'য়ে কিছু

শান্তি লাভ হয় ও ঠিক পথে গতি করা যায়। তোমারা সংসারী, সব দিক বজায় রেখে তার ভেতর থেকে তাঁকে ডেকে যাও তা হ'লে অনেক কাজ হবে। সংসারই জ্ঞান ভূমি। ভোগ বা ত্যাগ ত মনে। যদি মনে বাসনা কামনা থাকে, তা হ'লে বনে গেলেও সেখানে ঐ সব চিন্তা মনে উঠবে এবং সংসারে থাকার মতন ভোগের কাজ হতে লাগল। আবার সংসারে থেকে যদি মনকে ক্রমশঃ আসক্তি শূন্য করতে পার, কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে যখন যতটুকু প্রয়োজন কেবল সেইটুকু সংসারে দিয়ে বাকী সময় অপর কোন চিন্তা না রেখে, তাঁকে দাও তা হ'লে মনকে ক্রমান্বয়ে ত্যাগের পথে আনতে পারবে এবং তখন সংসারে থেকেও বনে যাবার কাজ হবে। কথায় আছে না, কেল্লার ভেতর থেকে যুদ্ধ করা অনেক সোজা কারণ খালি মাঠে অনবরত গোলা গুলির সামনে পড়তে হয়; সেই রকম সংসারের ভেতর থেকে মন তৈরী করা ঢের সোজা। বাইরে যেতে গেলেই দেহটাকে একেবারে মাটী ক'রে ফেলতে হবে। দেহটার মায়া একেবারে না ছাড়তে পারলে ও দেহের ওপর যত কষ্টই আসুক তাতে মন স্থির রাখতে না পারলে এক পাও চলতে পারবে না। কাজেই হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় বড় একটা কিছু করতে যাওয়া ঠিক নয়। শাস্ত্রেই আছে 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম'। তা ছাড়া, সংসারে তোমার ওপর নির্ভর করবার লোক যদি অনেকগুলি থাকে, তা হ'লে তাদের ত দেখা তোমার দরকার।

জঃ ভঃ। হ্যাঁ, আমার ওপর নির্ভর করার অনেক গুলি আছে বটে কিন্তু আমার যে ভাল লাগছে না, মন চাচ্ছে না। আর, তাদের ব্যবস্থা তিনি করবেন।

ঠাকুর। তা ঠিক। তোমার হয়ত সে বিশ্বাস থাকতে পারে কিন্তু তাদের ত এখনও সে বিশ্বাস আসে নি। কাজেই তুমি একটা হঠাৎ কিছু করলে তারা দুঃখ পাবে। সেটা ত ঠিক নয়। এখন যে ভাবে আছ ঐ ভাবেই মনকে তৈরী কর। মনে সর্ব্বদা ত্যাগের ভাব রাখবে। ভোগের পথে শান্তি পাবে না। সংসারীদের যখন ভোগের

দিকে মন থাকে, তখন তারা তাদের চেয়ে ভাল অবস্থাপন্ন লোকদের দিকে নজর করে এবং বাসনা বাড়িয়ে অভাব জনিত দুঃখ ভোগ করে। আবার যখন ত্যাগের ভাবে আসে, তখন তাঁরা তাদের চেয়ে হীন অবস্থার লোকদের দিকে দেখে এবং নিজের অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকে। যার প্রচুর অর্থ আছে তার আকাঙ্খা বাড়ালে প্রথমে ততটা অশান্তি না আসতে পারে, তবে ভোগেরও ইতি নেই, বাসনারও ইতি নেই, এই হিসাবে একদিন না একদিন দুঃখ আসবেই। কিন্তু যার এমনই অভাব রয়েছে তার যত আকাঙ্খা বাড়বে ততই দুঃখ ও অশান্তি আরও বেশী ভোগ হবে। মানুষের প্রকৃত অভাব তিনটী—ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্ন অর্থাৎ শাক অন্ন, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, আর মাথা গোঁজবার একটী স্থান। যার এ গুলো ঠিক আছে তার তা'তে সন্তুষ্ট থেকে ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে তাঁর অসীম দয়া, তিনি তার কোন অভাব রাখেন নি। এ ছাড়া অপর জিনিষে মন রাখতে নেই। আসে ভাল, ভোগ কর, কিন্তু না এলে দুঃখ পাবে না, এই ভাবে মনকে তৈরী করবে। যতই মাথা খোঁড় তোমার ভাগ্যে যা আছে তার বেশী ত কিছুতেই পাবে না। কাজেই, মনের বাসনাও আকাঙ্খা, অবস্থার অতিরিক্ত বাড়ালেই দুঃখ অনিবার্য্য। এই ভাবে মনকে ক্রমশঃ ত্যাগের পথে তৈরী কর। তার পর মনের যখন সে অবস্থা আসবে তখন আপনি কাজ হবে।

জঃ ভঃ। আমাকে যদি অনুগ্রহ ক'রে পথ দেখিয়ে দেন।

ঠাকুর। তোমার গুরু জীবিত আছেন?

জঃ ভঃ। আজ্ঞে না।

ঠাকুর। আচ্ছা, রবিবার দিন সকালে ৮টার মধ্যে গঙ্গা স্নান ক'রে এখানে এস। কি ভাবে চলতে হবে ব'লে দোব। তোমার চাকরী আছে ত, তা রবিবার ছুটী থাকবে। তোমার জন্মদিন কবে?

জঃ ভঃ। বৃহস্পতিবার।

ঠাকুর। আচ্ছা, রবিবার এস।

শ্রীশ্রীঠাকুর দ্বিজেনকে গান করিতে বলিলেন।

দ্বিজেন গাহিল

কি আর কব হে, ওহে জীবন বল্লভ।
তুমি সাধন দুর্লভ, কিন্তু সাধক সুলভ॥
মম মরমের কথা অন্তরের ব্যথা তুমি ত সব জান হে।
মম জীবন মন চরণে সঁপিনু বুঝিয়া লহ সব॥
এই সংসার পথে কণ্টক অতি সঙ্কটময় হে।
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে ল'য়ে প্রেম মুরতি তব॥
(আমি পথের কাঁটা মানিব না হে, আমি নীরবে যাব
আমি হৃদয় ব্যথায় ভুলিব না হে, আমি নীরবে যাব
তব প্রদর্শিত পথ লক্ষ্য ক'রে হে আমি নীরবে যাব)
সুখ দুঃখ সব তুচ্ছ করিনু, প্রিয় অপ্রিয় হে।
(আমি তোমারই লাগি সব তেয়াগিণু প্রিয় অপ্রিয় হে)
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে, তাহা মাথায় তুলিয়া লব হে॥
আহা, অপরাধ আমি করেছি কত, (তব শ্রীপদে হে) না কর যদি ক্ষমা
ওহে পরাণ প্রিয় (দয়াময়) দিও হে দিও বেদনা নব নব॥

তৃতীয় ভাগ—সপ্তম অধ্যায়

——o——

কলিকাতা, বৃহস্পতিবার ২১শে বৈশাখ ১৩৪০ সাল ;
ইং ৪ঠা মে ১৯৩৩।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে। স্থান, জায়গায় উদ্দীপনা হয়। সঙ্গই প্রধান ; তাই সঙ্গ করতে বলেছে, যেমন সঙ্গ করবে তেমনি ভাব লাগবে। ভোগীর সঙ্গ করলে ভোগের দিকে মন যাবে, আর ত্যাগীর সঙ্গ করলে ত্যাগ আসবে। ভোগ দুই প্রকার—এক জীবন্মুক্ত হয়ে ভোগ ; সে অবস্থায় সকল প্রকার ভোগ করলেও মনে কোনও ছাপ লাগে না ; ইচ্ছা করলেই ভোগের জিনিষ সব তখনই ছেড়ে দেওয়া যায়। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলছেন 'তোমায় ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছি আবার তোমার পৌরহিত্য করছি ব'লে মনে কোরোনা যে আমি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ থেকে আলাদা হয়েছি বা নেমে গেছি। বায়ু হিল্লোল যেমন গাছের পল্লবকেই শুধু কাঁপাতে পারে কিন্তু মূল কাণ্ডকে নড়াতে পারে না সেই রকম তোমাদের সঙ্গে এই সব কার্য্য করলেও মন সর্ব্বদাই তাঁতে লেগে আছে।' আর সংসারীদের ভোগ ; এ আলাদা। এরা ভোগে বদ্ধ হয়ে থাকে, ইচ্ছা করলে ছাড়তে ত পারেই না, অনেক চেষ্টা করলেও ভোগের জিনিষ মন থেকে সরাতে পারে না। সামান্য একটু এদিক ওদিক হলেই মনে দুঃখ ভোগ করে। ত্যাগও দুই প্রকার—এক হচ্ছে শুষ্ক বা কঠোর ত্যাগ, আর রসস্থ বা প্রেমের ত্যাগ। জ্ঞানীদের বা যোগীদের যে ত্যাগ তা শুষ্ক বা কঠোর। সংসারটা অনিত্য এবং দুঃখময় এই মনে ক'রে তারা বহু কঠোরতা স্বীকার ক'রে সংসার ত্যাগ করে। মন খুব শক্তি সম্পন্ন না হলে এরকম কঠোরতার ওপর দাঁড়ান

বড় শক্ত, বিশেষতঃ কলির জীবের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। অতি কম আছে, যারা এই কঠোরতা নিয়ে ধৈর্য্য ধ'রে গতি করতে পারে। তাই গীতায় ভগবান বলেছেন—

সাধক অব্যক্ত ব্রহ্মে বহু ক্লেশে পায়।
বহু কষ্টে সেই নিষ্ঠা লাভ করা যায়॥

বেশীর ভাগ লোকই কিছুদিন এই ভাবে কঠোরতা ক'রে কিছু লাভ না পেলে 'দূর ছাই' ব'লে ছেড়ে দেয়। তখন মনে হয় 'কই এতদিন ত কঠোর করলুম, মুনফা পেলুম কই?' তাদের ধারণা নেই যে **মুনফা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ওপর নির্ভর করে।** যেমন কারুর তহবিলে ৯০০৲ টাকা থাকলে আর ১০০৲ টাকা দিলেই তার ১০০০৲ টাকা পুরো হয়, কিন্তু যার তহবিলে মোটে ১০০৲ টাকা আছে তা'তে আরও ৯০০৲ টাকা দিতে হবে তবে ১০০০৲ টাকা হবে; তেমনি পূর্ব্ব সুকৃতি অনুযায়ী মুনফার কম বেশী দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই খুব ধৈর্য্য রক্ষা ক'রে চলতে হবে। তা ছাড়া, কঠোর ত্যাগ নিয়ে গতি করা বড় কঠিন, কারণ অনেক ঝড় ঝাপটা তুফান কাটিয়ে গতি করতে হয়। স্থির সমুদ্র হলে সহজে পার হওয়া যায় কিন্তু ঝড় তুফান উঠলে ভাল মাঝির দরকার। **এই সংসার সমুদ্রে ঝড় তুফান লেগে আছেই, ভাল মাঝি অর্থাৎ সদ্‌গুরু ছাড়া এ সব কাটিয়ে যাওয়া যায় না। সদ্‌গুরুর ওপর বিশ্বাস রেখে ঠিক চলতে হবে তবে উদ্দেশ্য সফল হবে।** আর, রসস্থ বা প্রেমের ত্যাগে আপনা আপনিই সব হয়ে যায়, জোর ক'রে বা চেষ্টা ক'রে কিছু করতে হয় না। সৎ এর ওপর ভালবাসা পড়ায় আপনি গতি করে। ঠিক ভালবাসা মানেই আত্মযোগ। যাকে ভালবাসা যায় তার ভাব স্বতঃই আসে। তখন সে আর কিছু চায় না; যাকে ভালবাসে তাকে ছেড়ে থাকতে

পারে না। তার জন্যে দেহ সুখ, যশ, মান, অর্থ, সব ছোট হয়ে যায়। মনটা তাঁর ওপর খুব জোর লাগায় এ সব গুলি তাকে জোর ক'রে ত্যাগ করতে হয় না। ত্যাগ আপনিই হয়ে যায় এবং তার জন্যে যে কঠোরতা করে, সে গুলো কঠোরতা ব'লেই তার জ্ঞান থাকে না। এটা সরস কঠোরতা, কারণ মন দুটো ধরে না এবং আপনা আপনি সম্পূর্ণ ত্যাগ হয়ে আসে। সে সাধন ভজন করুক আর নাই করুক তার আপনিই কাজ হয়ে যায়।

দেহ সুখ প্রভৃতি যখন কমতে থাকে, অনেক কঠোরতা যখন আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে পারে, তখনই বোঝা যায় কিছু ভাব ঠিক ঠিক লেগেছে। তখন সে গতি করবেই এবং তা'তে তার সংশয় ও অবিশ্বাস ক'মে আসবে। এই জন্যেই বার বার বলেছে সঙ্গ। সঙ্গ ছাড়া কিছু কাজ হতে পারে না। এই সঙ্গও আবার দুই প্রকার। এক হচ্ছে, মন প্রাণ সব দিয়ে সঙ্গ। তা'তে নিজের বিচার বুদ্ধি বা আমিত্ব থাকে না। আর এক, নিজের আমিত্ব ও বিচার বুদ্ধি রেখে সঙ্গ। তা'তে যাঁর সঙ্গ করছে তাঁর ওপর কিছু ভালবাসা আছে, তাঁকে সেবাও করছে কিন্তু নিজের আমিত্ব টুকু বজায় রেখে তাঁর কাজের ভাল মন্দ বিচার ক'রে চলেছে। তাই **বিচার বুদ্ধি নিয়ে সঙ্গ করলে তত কাজ হয় না।** আমিত্ব থাকায় নিজের বিচার বশতঃ সংশয় আসতে পারে, কারণ জীব বুদ্ধির বিচার প্রায়ই ঠিক হয় না, তা'তে মন অনেক নেমে যায়, বিশ্বাস নষ্ট করে ও অশান্তি আসে। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।' আবার বলেছেন 'অজ্ঞানের ফল এই মনের সংশয়।' **অবিশ্বাস এলেও সঙ্গ ছাড়তে নেই।** তবে এ অবস্থায় মেলা সঙ্গ করতে নেই, তাঁর আদেশ অনুযায়ী—যেরূপ ব'লে দেন—ঠিক সেই নিয়ম মত সঙ্গ করতে হয়। সেইজন্যে প্রেমে সঙ্গ করলে তাঁর ভালবাসা বেশী কাজ করে। অনেকে আবার সাধারণ ভাবে হিংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে 'একজনকে বেশী, এবং একজনকে কম

ভালবাসেন' মনে ক'রে দোষ দেয়। কিন্তু তখন বিচার ক'রে দেখেনা যে কেন একজন বেশী ভালবাসা পায়। কারুর হয়ত এক জালা জলের তৃষ্ণা আর কারুর হয়ত এক ঘটি জলের তৃষ্ণা ; একে এক জালা জল দিয়ে লাভ কি ? তার এক ঘটির বেশী ত জল ধরবে না, বাকীটা উপচে প'ড়ে শুধু শুধু নষ্ট হবে। তেমনি কোন ভক্ত হয়ত বহু লোকসান স্বীকার ক'রে তাঁর কাছে আসছে, তাঁকে ছেড়ে যেতে চায় না, আর কেউ বা সংসারে ষোল আনা বজায় রেখে, কোন লোকসান স্বীকার না ক'রে কিছু সময়ের জন্য তাঁর কাছে আসছে। এই দুই কি এক হবে ? তার ওপর হিংসা না ক'রে যদি ঠিক বিচার ক'রে দেখে, কি কি কারণের জন্য তাকে বেশী ভালবাসেন এবং সেই সব কারণ অনুসন্ধান ক'রে যদি তার মত চলতে চেষ্টা করে, তাহলে অনেক মঙ্গল হয়। এইখানে ঠাকুর শিখগুরু নানক, তাঁর দুই পুত্র ও ভক্তের গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ১ম ভাগ ১৪৫ পৃষ্ঠা)। সঙ্গের প্রভাব এত দিয়েছে যে সঙ্গে অনেক সময় জোর ক'রে কাজ করিয়ে নেয়। সদ্‌গুরুর কাজ কি ? তিনি ভালবেসে আপন ক'রে জোর ক'রে কাজ করিয়ে নেন। তাঁরা দেহ সুখকে বড় করেন না। তাঁরা দেখেন, সে কতটা প্রাণের আবেগ দিয়ে সেবা করছে, কতটা ভালবেসে ছুটে আসছে, তাঁর জন্যে কতটা ত্যাগ স্বীকার করছে, আর মন থেকে কতখানি সংসারের আসক্তি তার ক'মে আসছে। **অবিচারে গুরুবাক্য পালন করার নামই গুরুসেবা।** আবার সব ছেড়ে গুরুর সঙ্গ করলেও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম অনুযায়ী ভাবের তারতম্য হয়। এর এক গল্প শোনা আছে।

এক গুরুর তিন শিষ্য, লালাবাবু, চরণদাস ও ভগবানদাস। তিন জনেই সব ছেড়ে এসে গুরুর কাছে থাকে ও সর্ব্বদা গুরুর সঙ্গ করে। তত্রাচ তিন জনের মনের অবস্থার অনেক পার্থক্য। তিন জনেই 'দেহ, মন প্রাণ সব আপনাকে দিয়েছি' এই এক কথাই গুরুকে বলে। গুরু রোজ এ কথা শোনেন। একদিন গুরু লালাবাবুকে

ডেকে বল্লেন 'লালাবাবু! তুমি আমায় সব দিয়েছ?' লালাবাবু বললে 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সব ছেড়ে আপনার কাছে সর্ব্বদা রয়েছি, আর সব দিইনি?' গুরু বললেন 'ঠিক বলছ লালাবাবু? তুমি আমায় সব দিয়েছ?' লালাবাবু আবার বললে 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সব দিয়েছি; দেহ মন প্রাণ সব দিয়েছি।' গুরু তখন বললেন 'দেখ, আমার অঙ্গ বড় কামড়াচ্ছে, যদি পা দিয়ে টিপে দাও ত আমার বড় আরাম হবে, হাত দিয়ে নয়। কিন্তু আমার অঙ্গে পা দেওয়ার জন্য তোমার কুষ্ঠ হবে।' লালাবাবু বললে 'এটী পারব না প্রভু! আর যা আদেশ করুন এখনই করছি কিন্তু আপনার অঙ্গে পা দিতে পারব না।' গুরু বললেন 'কেন লালাবাবু, তুমি যে এই বললে আমায় সব দিয়েছ।' লালাবাবু বললে 'আর সব পারব কিন্তু অঙ্গে পা দিতে পারব না।' গুরু আবার জিজ্ঞাসা করলেন 'কি লালাবাবু পারবে না ত?' লালাবাবু বললে 'আজ্ঞে না, ও অঙ্গে পা দিতে পারব না।' তিনি তখন চরণদাসকে ডেকে বললেন 'চরণদাস! তুমি আমায় সব দিয়েছ?' চরণদাস বললে 'আজ্ঞে হ্যাঁ, দেহ মন প্রাণ সব দিয়েছি।' গুরু বললেন 'ঠিক বলছ চরণদাস?' চরণদাস বললে 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' তখন তিনি বললেন 'দেখ চরণদাস, আমার অঙ্গ বড় কামড়াচ্ছে, যদি পা দিয়ে টিপে দাও ত আমার বড় আরাম হবে, হাত দিয়ে নয়, কিন্তু আমার অঙ্গে পা দেওয়ায় তোমার কুষ্ঠ হবে।' চরণদাস বললে 'কুষ্ঠ হোক তাতে কোন ক্ষতি নেই কিন্তু আপনার শ্রী অঙ্গে পা দিতে পারব না।' গুরু বললেন 'কেন চরণ-দাস? এই যে তুমি বললে আমায় দেহ মন প্রাণ সব দিয়েছ।' চরণ-দাস বললে 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সব দিয়েছি, কিন্তু ওটী ছাড়া আপনি যা আদেশ করবেন করতে প্রস্তুত আছি।' গুরু আবার জিজ্ঞাসা করলেন 'চরণদাস পারবে না ত?' চরণদাস বললে 'ওটী মাপ করুন প্রভু, আপনার শ্রী অঙ্গে পা দিতে পারব না।' তিনি তখন ভগবানদাসকে ডেকে বললেন 'ভগবানদাস! তুমি আমায় সব দিয়েছ?'

সে বললে 'আজ্ঞে হ্যাঁ, দেহ, মন, প্রাণ সব দিয়েছি; সর্ব্বদাই ত আপনার কাছে রয়েছি, আর ত অপর কোন চিন্তাই আমার নেই।' গুরু বললেন, 'ঠিক বলছ ভগবানদাস?' ভগবানদাস বললে 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সব দিয়েছি; আমি ত আপনাকে ছাড়া আর জানি না।' গুরু তখন বললেন 'দেখ, আমার অঙ্গ বড় কামড়াচ্ছে, যদি পা দিয়ে টিপে দাও ত আমার খুব আরাম হবে, হাত দিয়ে নয়। কিন্তু আমার অঙ্গে পা দেওয়ায় তোমার কুষ্ঠ হবে।' ভগবানদাস বললে 'কি বললেন! আপনার আরাম হবে! তা এ দেহ ত আমার নয়, আমি আপনাকে ত সব দিয়েছি। আপনার জিনিষ দিয়ে আপনার সেবা করব তাতে আর কি?' এই ব'লে ভগবানদাস পা দিয়ে গুরুর অঙ্গ টিপে দিলে। তার কুষ্ঠ হয়েছিল। সে অনেকদিন কালনায় ছিল। শেষে গুরু কৃপায় তার কুষ্ঠ আরাম হয়ে গিয়েছিল।

এইভাবে গুরু সেবা করতে করতে তবে মনের শক্তি এলে প্রকৃতির ধাক্কা থেকে কতকটা রক্ষা পেতে পারবে। তাই বুদ্ধ বলেছেন রোগে, শোকে ও অন্নকষ্টে যে আনন্দ রক্ষা করতে পারে, সেই মহাত্মা। নিজের ওপর দাঁড়িয়ে এই শক্তি আনা বড় কঠিন, তাই সদ্‌গুরুর কাজ হচ্ছে ভালবেসে, আপন ক'রে নিয়ে কাজ করা। এই ভালবাসায় তারাও আপন হয়ে সেই দিকে ছুটতে থাকে, এবং আপনিই কাজ হতে থাকে। দ্বিজেন গাহিল—

ওমা জাগাও যদি তবে জাগি, আমার মন বসেনা যোগে যাগে।
জপ, তপ, সাধন, সাধ্য কষ্ট সাধ্য সবাই লাগে।
সহজ কিছু উপায় কর মা আমার কুল কুণ্ডলিনী যাতে জাগে॥
ইড়া, পিঙ্গলা নাড়ি, লাগাও বেড়ি তাদের আগে।
আমার সুষুম্না রহিল পড়ি জাগাও তাকে যোগে যাগে।
অকর্ম্ম ক'রেনা কর্ম্ম অলস মন খাটিতে ভাগে॥
(এখন) যা করবার আপনি কর মা আমার কুলকুণ্ডলিনী যাতে জাগে।
এই বেলা হচ্ছে যে মন দেখা দেমা দিনের আগে।
আমার চট্ করে দে চট্‌কা ভেঙ্গে থাকতে মনের অনুরাগে॥

তৃতীয় ভাগ—অষ্টম অধ্যায়

কলিকাতা, রবিবার, ২৪শে বৈশাখ ১৩৪০ সাল ;
ইং ৭ই মে ১৯৩৩।

জিতেন। বিশ্বাসের কি স্তর আছে ?

ঠাকুর। বিশ্বাসের স্তর নেই। বিশ্বাস বলতে পূর্ণ বিশ্বাস। মরার আর কি রকম আছে ? মরা বলতে মরাই বোঝায়। বিশ্বাস বললেই বুঝতে হবে যার দ্বারা আমিত্ব নষ্ট হয়েছে। তবে খণ্ড বিশ্বাস থাকতে পারে। কারুর কোন বিষয়ে হয়ত বিশ্বাস আছে আবার কোন বিষয়ে হয়ত বিশ্বাস নেই। যার যে পরিমাণ বিশ্বাস তার সেই পরিমাণ মন স্থির হয় ও শান্তি আসে।

জিতেন। বিশ্বাসের কি তা হলে পরিমাণ আছে ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, পরিমাণ আছে বৈ কি। বেশ বিশ্বাস ক'রে চলেছ, কেননা তখনও হয়ত কোন সংশয়ের কারণ হয়নি, কিন্তু সংশয়ের কারণ ধরিয়ে দিলেই সংশয় আসতে পারে; এ হ'ল সাধারণ মধ্যম বিশ্বাস। উত্তম বিশ্বাসে কিছুতেই সংশয় আসতে পারে না। তা ছাড়া, সঙ্গেতে ক্রমশঃ বিশ্বাস বাড়তে থাকে। পূর্ণ বিশ্বাসের কথা আলাদা, তাতে বিচার নষ্ট ক'রে মনকে স্থির করে।

জিতেন। ভগবান আছেন এই বিশ্বাস হলে সবই হয়ে গেল, আর কিছু বাকী থাকে কি ?

ঠাকুর। তা কেমন ক'রে হবে ? তোমাকে একজন বললে ভীম নাগের সন্দেশ আছে, তুমিও বিশ্বাস করলে, তা হ'লে তোমার কি ভীম নাগের সন্দেশ খাওয়া হ'ল ? সন্দেশ খেতে হলে তোমার প্রয়োজন আসা চাই ; তারপর তোমাকে সেখানে যেতে হবে

এবং কিনে খেলে তবে তোমার সন্দেশ খাওয়া হবে। তেমনি ভগবানকে পাবার তোমার প্রয়োজন হ'লে বিশ্বাসের দ্বারা গতি করবে। বিশ্বাস না থাকলে গতি ভঙ্গ হবার সম্ভাবনা। তাই বলেছে— **সরলতা ও বিশ্বাস ভগবানের বড় বড় দান।** তোমার **বিশ্বাস হয়েছে মানেই তাঁর দয়া।** তাই শাস্ত্রে আছে 'ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথম-লক্ষণম্; সিদ্ধির প্রথম লক্ষণ, তার মানেই যে হয়ে গেল তা নয়।

গোপেন আসিল।

ঠাকুর। কি গোপেন এত দিন কোথায় ছিলে? আমি ২০০ ক্রোশ দূর থেকে তোমাদের দেখতে এলুম আর তোমরা এখান থেকে আসতে পার না?

গোপেন। আপনি না টানলে কেমন ক'রে আসব?

ঠাকুর। টানব কি? তোমরা কি জড় পদার্থ যে টেনে আনব? আর দেখ, আমার টেনে আনা এক, আর তোমাদের নিজের টানে আসা আলাদা। আমি টেনে যদি জোর ক'রে বসিয়ে রাখি, তাতে বেশীক্ষণ থাকতে ভাল লাগবে না, কেবল ঘড়ির দিকে দেখবে কখন পালাবে ব'লে। আর নিজের টানে এলে তোমাদেরও আনন্দ হবে, আমিও আনন্দ পাব। আর তাতে কাজও বেশী হয়। তখন যেতে বললেও যেতে চাইবে না।

সুবোধ ডাক্তার আসিল।

ঠাকুর। সুবোধ কেমন আছ?

সুবোধ। আজ্ঞে ভাল আছি।

ঠাকুর। চারু কোথায়? কেমন আছে?

সুবোধ। সে ভাল আছে। তার স্ত্রীর অসুখ করেছিল। অনেক দিন ভুগলে। ছেলেরাও একে একে সব ভুগলে। একটা না একটা ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে।

ঠাকুর। সংসার মানেই এই। সংসারে থাকতে হলে এ সব ত আছেই।

সুবোধ। এ সব কর্ম্মফল জনিত ত?

ঠাকুর। হ্যাঁ, কর্ম্মফল জনিত বল, বা সংসারের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বল। **সংসারে এমন লোক নেই, যাকে রোগ, শোক, তাপ, ব্যাধি ও অভাবের হাতে পড়তে হয় না।** এই গুলি সংসারের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; তবে, কর্ম্ম জনিত কম বেশী হয়।

সুবোধ। এখানে আসাও ত কর্ম্মজনিত?

ঠাকুর। হ্যাঁ, কর্ম্মের জন্যই এই জগতে এসেছ। সুকর্ম্ম জনিত সুখ ভোগ হচ্ছে, আর কুকর্ম্ম জনিত দুঃখ ভোগ হচ্ছে। সংসারে এই রকম সুখ দুঃখ ভোগ অনবরত হচ্ছে। মনের শক্তি বাড়লে দুঃখটা মনকে বেশী স্পর্শ করতে পারে না।

সুবোধ। মনের শক্তি বাড়ে কি ক'রে?

ঠাকুর। সঙ্গের দ্বারা। সৎসঙ্গে মনের শক্তি বাড়ে। যেমন সঙ্গ করবে তেমনি বৃত্তি উঠবে। ভোগীর সঙ্গ করলে ভোগের দিকে মন যায়। তখন তোমার চেয়ে যারা ধনী তাদের উপর নজর পড়ে, আর মনে হয় ওর মত অর্থ, যশ হলে বুঝি সুখী হবে। কিন্তু দেখা যায় যে ধনীদেরও শান্তি নেই। রাজা দশরথের ত অর্থ, সম্পদ, যশ, মানের কিছু কমতি ছিল না। পুত্র ছিল না ব'লে মনে করলে পুত্র না হলে এ সব ভোগ করবে কে? তাই পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ করলে। রামচন্দ্রের মত পুত্র হল, আর সেই পুত্রই হ'ল মৃত্যুর কারণ! 'হা রাম, হা রাম' ক'রে সাধারণ লোকের মত ধুলোয় লুটিয়ে মরে গেল। তাহলেই দেখ, অর্থ, যশ, মান, থাকতেও সুখী হ'ল না। রামচন্দ্রেরও দেখ সীতাহরণ, বনে বনে ভ্রমণ ইত্যাদি দুঃখের ইতি নেই। জনক রাজা রামচন্দ্রের মত সুপাত্র দেখে সীতাকে দান করলে, সেই সীতার কাঁদতে

কাঁদতে জন্ম গেল। তা দেখছ রাজা রাজড়াদেরও শান্তি নেই। শান্তি পেতে গেলে ত্যাগ চাই। সৎসঙ্গ অর্থাৎ ত্যাগীর সঙ্গ করলে আপনি ত্যাগ আসবে। তখন তোমার চেয়ে হীন অবস্থা লোকেদের ওপর দৃষ্টি পড়বে, এবং তার চেয়ে নিজের অবস্থা ঢের ভাল দেখে মনে শান্তি পাবে। ঠাকুর এখানে গলিত কুষ্ঠ রোগী ও খোঁড়ার গল্প বলিলেন (৩য় ভাগ ১২ পৃষ্ঠা)। যতক্ষণ ভোগ বাসনা থাকবে ততক্ষণ অবশ্য এদিকে নজর আসবে না ; আর যখনই এরূপ দৃষ্টি আসে তখনই বুঝতে হবে ভোগ বাসনার অবসান হয়ে এসেছে এবং কর্ম্মক্ষয় আরম্ভ হয়েছে। তখন সুকর্ম্মের আলাদা সুখ ভোগ না হয়ে, কুকর্ম্ম ক্ষয় হতে থাকে ; এবং মন যত ত্যাগের দিকে আসবে তত তাড়াতাড়ি কর্ম্ম ক্ষয় হয়ে যাবে। আবার সংসারে মজা দেখবে যে যদি তোমার মনের শক্তি বাড়ে এবং তুমি আত্মীয়ের মৃত্যুতে সকলের মত অধীর না হও ত তোমাকে নিষ্ঠুর বলবে। সে শোকে অধীর হয়েও কিছু করতে পারলে না আর তুমি শোক না করেও কিছু করতে পারলে না, যার যাবার সে ঠিক চ'লে গেল, তবু তুমি ঠিক সাধারণের মত নও ব'লে তোমায় দোষ দিলে। সাধারণের দৃষ্টি ঐরকম। এই যে দুটো চোখ, এ সাজানো জিনিষ মাত্র। ভেতরে যত জ্ঞান বাড়ে, তত আলাদা দৃষ্টি হয় ও তখন সংসারটা ঠিক মত কিছু কিছু দেখতে শেখে এবং তখন এই সংসারের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ভগবানকে ডাকে। অবশ্য প্রয়োজন হিসাবে লোকের ভিন্ন দৃষ্টি হয় এবং সে ভিন্ন ভাবে ডাকে। কেহ বা সংসার সুখের জন্য তাঁকে ডাকে আবার কেহ বা সংসারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ডাকে। যারা সংসার সুখের জন্য তাঁকে ডাকে তারাও ভাল, কারণ ডাকতে ডাকতে তাদেরও একদিন ঠিক জ্ঞান আসবে এবং ত্যাগের দিকে নজর পড়বে।

সংসারে যার ক্ষুধা নিবৃত্তির শাক অন্ন, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র ও মাথা গোঁজবার

একটা স্থান আছে আর ব্যাধির যন্ত্রণা নেই, তার বোঝা উচিত যে তার ওপর ভগবানের অসীম করুণা; তিনি তার কোন অভাবই রাখেন নি'।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। সঙ্গই প্রধান। সঙ্গ ছাড়া কিছু হবার যো নেই। মায়ার এমনই প্রবল আকর্ষণ যে তুমি ইচ্ছা না করলেও জোর ক'রে তোমায় টেনে নিয়ে তার চক্রে ফেলবে। দেহ ধারণ করলেই একেবারে মায়ামুক্ত হবার যো নেই। দেখতে পাওয়া যায় যে সাধু ঋষিদেরও অনেক সময় মায়ার হাতে পড়তে হয়েছে। এইখানে ঠাকুর নারদের অহঙ্কার চূর্ণের গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ২য় ভাগ, ৩৬৩ পৃষ্ঠা)। বরাহরূপী অবতার হিরণ্যাক্ষকে বধ ক'রে শাবকদের মায়ায় এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে শিবকে ত্রিশূল দিয়ে তাঁর উদর বিদীর্ণ করতে হয়েছিল। তা দেখ, এঁদেরই যখন মায়ার প্রভাবে এই অবস্থা, তখন তোমরা কতটুকু শক্তি রাখ যে এই মায়ার হাত থেকে নিস্তার পাবে। এই জন্য বলেছে যে সাধু বা সদ্‌গুরুর সঙ্গ করতে করতে তাঁর ওপর মায়া পড়লে আপনি কাজ হ'তে থাকে। সেই মায়ার ভেতরই রইলে, তবে সৎ এর ওপর মায়া পড়ায় সৎ এর ভাব এসে লাগে এবং ত্যাগ শিক্ষা হতে থাকে। আবার ভোগীকে ভালবাসলে ভোগের দিকে নজর পড়ে। কাজেই সদ্‌গুরুর সঙ্গ ছাড়া এক পাও গতি করতে পারবে না, কারণ বিবেক বৈরাগ্য নিয়ে মনের শক্তি বাড়িয়ে মায়ামুক্ত হওয়া, সাধারণ জীবের পক্ষে অসম্ভব। শুকদেবের মত মহাপুরুষকে বিবেক বৈরাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও জনক রাজার কাছে শিক্ষা নিতে হয়েছিল। এখানে ঠাকুর শুকদেব ও জনক রাজার গল্প বলিলেন। (অমৃতবাণী ১ম ভাগ, ৭৪ পৃষ্ঠা) তা দেখ, এঁরাও যখন এত উচ্চ হয়েও সহজে নিস্তার পাননি, তখন তোমাদের বিবেক বৈরাগ্য নিয়ে গতি করা

ত কল্পনার অতীত। **তোমাদের ভালবাসা ছাড়া গতি করবার যো নেই।** তাই তোমরা সদ্‌গুরুকে ভালবাসতে চেষ্টা করবে, তা হ'লেই কাজ হবে। সঙ্গের দ্বারা এই ভালবাসা আসে। সেই জন্যে বার বার বলেছে সঙ্গ কর। সঙ্গেতে যত আপন হয় তত আর কিছুতে হয় না। সদ্‌গুরুর কাজই হচ্ছে সকলকে আপন ক'রে নিয়ে, যার যার ভাবে মিশে যাওয়া। আর সেই আপনত্বে তারাও জড়িয়ে পড়ে এবং তাঁকে ভালবাসতে শেখে। তখন আর তাঁকে ছাড়তে পারে না এবং এত যে প্রিয় পুত্র, পরিবার, সংসার, সব ভুলে তাঁর দিকে ছুটতে থাকে। তাই পরমহংসদেব সকলকে এত আপন ক'রে নিতেন এবং তারাও সেই আপনত্বের জোরে তাঁর কাছে ছুটত।

ঠাকুর গাহিলেন—

আমার যা কিছু ভরসা তুমি মা।
ওমা তুমি আছ তাই আছি, নইলে কেমনে বাঁচি।
তুমি যে ভুবনেশ্বরী অচিন্ত্যরূপিণী শ্যামা॥
তোমারি চরণ ধ'রে ভ্রমিতেছি এ সংসারে।
কাল পূর্ণ হ'লে জানি, তুমি কোলে নেবে মা॥
দীন হীন বলে জননী, আছি নিশ্চিন্ত দিবস রজনী।
জানি, তুমি ভাল বই মন্দ ত জান না॥

তৃতীয় ভাগ—নবম অধ্যায়

———o———

কলিকাতা, বৃহস্পতিবার ২৮শে বৈশাখ ১৩৪০ সাল ;
ইং ১১ই মে ১৯৩৩।

শিবপুরের পণ্ডিত মহাশয়ের কথা উঠিতে ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। একদিন পণ্ডিত ম'শাই বললেন পুরুষ ও স্ত্রীতে প্রেম হয় না। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। প্রেম মানে নিঃস্বার্থ ভালবাসা। যতক্ষণ পুরুষ ও স্ত্রী বলছ ততক্ষণ কিছু স্বার্থ নিহিত আছেই, কাজেই সেখানে ঠিক প্রেম হয় না; কিন্তু তাই ব'লে পুরুষ, স্ত্রী বোধ না রেখে যে নিঃস্বার্থ ভালবাসা হয় না, তা নয়। পুরুষ, স্ত্রী বোধ চ'লে গিয়ে দু'জনের মধ্যে যে ভালবাসা, তাকে প্রেম বলে। তা যদি না হবে, তা হ'লে বৃন্দাবনের সমস্ত লীলাটাই মিথ্যা হয়ে যায়। ভালবাসা যদি ত্যাগীর সঙ্গে হয়, তখন সেই ভালবাসা বাড়তে বাড়তে স্বার্থ সম্পুর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং তখন পুরুষ, স্ত্রী ব'লে কোন ভেদ থাকে না। সনাতন যখন বৃন্দাবনে মীরাবাই এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে খবর পাঠিয়েছিলেন যে 'তিনি পুরুষ মানুষ, তিনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন?' তখন মীরাবাই বলেছিলেন 'তিনি আবার পুরুষ মানুষ হলেন কি ক'রে? বৃন্দাবনে ত কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ।' প্রেমের এই স্বভাব; প্রেমে কোন ভেদ থাকে না। আবার প্রেম ত পুরুষে পুরুষেও হয় এবং স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকেও হয়। প্রেমেতে শরীরের কোন সম্বন্ধ থাকে না, শুধু মনের সঙ্গে সম্বন্ধ, আত্ম-যোগ। তাই বলেছে আত্মসমর্পণ। দেহ, মন, প্রাণ সব সমর্পণ ক'রে দেয়, নিজের বলতে কিছুই রাখে না, তার পক্ষে স্ত্রী, পুরুষ আলাদা বোধ কেমন ক'রে থাকবে?

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলিতেছেন—

. ঠাকুর। সঙ্গই প্রধান। অন্ততঃ কিছু সময় সাধু সঙ্গ করবে। সঙ্গে মন তৈরী হয়, মনের শক্তি বাড়ে। এ সংসারে সুখ, দুঃখ ছাড়া কেউ নেই। দেহ ধারণ ক'রে সংসারের মধ্যে থেকে যখন অবতারেরাও সুখ দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পান না, তখন সাধারণ জীবের ত কথাই নেই। তবে সঙ্গ করলে মনের শক্তি বাড়ে এবং তখন এই দুঃখের ধাক্কা এত জোর লাগে না। বড় গাছ, যার শেকড় অনেক দূর পর্য্যন্ত মাটীর ভেতর নেমে গেছে, ঝড়ের সময় তার ডাল পালা দুললেও, ঠিক দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু যে গাছের শেকড় মাটীর ভেতর বেশী দূর যায়নি, যেমন পেঁপে, সে গাছ একটু ঝড় উঠলেই প'ড়ে যায়। মাঠে, ময়দানে থাকতে গেলেই, যত বড় শক্ত গাছ হোক না কেন ঝড় খেতে হবেই, সেই রকম যতক্ষণ সংসারে আছ ততক্ষণ সুখ দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই, এটা সংসারের স্বভাব। তবে, যার মনের শক্তি আছে সে তার ধাক্কা সহজে সামলাতে পারে, আর যার তা নেই, সে সামান্য ধাক্কা পেলেই কোথায় তলিয়ে যায়, তার ঠিক নেই। তাই বারবার বলেছে সঙ্গ। তবে **কিছু বিশ্বাস অন্ততঃ চাই। কিছু বিশ্বাস রেখে সঙ্গ করতে করতে ঠিক গতি করতে থাকে, কিন্তু বিশ্বাস শূন্য সঙ্গ যেমন লবণ হীন ব্যঞ্জন।** যত ভাল ক'রেই রান্না করনা কেন, তাতে নুন না দিলে যেমন কোন স্বাদ হয় না, তেমনি বিশ্বাস হীন সঙ্গে বিশেষ কাজ হয় না। যেমন সঙ্গ করবে তেমনি সব বৃত্তি আসবে। সৎ এর সঙ্গ করলে স্বতঃই সৎ এর ভাব আসে এবং সত্ত্বগুণ বাড়ে। তাতে মনকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায় এবং তখনই কিছু শান্তি আসতে পারে। বাসনা থাকতে দুঃখ থাকবেই, কাজেই যত বাসনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে তত দুঃখের ধাক্কায় ঠিক দাঁড়াতে পারবে। এই বাসনাকে অধীন করতে গেলে সঙ্গ চাই, কারণ তোমরা ত আর সাধন ভজন করতে পারবে না। **সাধন ভজন করতে গেলে**

দেহ সুখ একেবারে ছাড়তে হবে, অনেক কঠোরতা করতে হবে, অগ্নি তরবারির ভেতর দিয়ে গতি করতে হবে, তবে কিছু হবে। দশ মিনিটের জন্যে ভগবানের নাম করেছ ব'লে মনে কর, তাঁর মাথা কিনে ফেলেছ, আর দুঃখ গেল না ব'লে তাঁকে দোষ দিচ্ছ, কিন্তু সংসারে যে সর্ব্বদাই দাসত্ব করছ, রোগ, শোক, তাপে জর্জ্জরিত হচ্ছ, অথচ তার জন্যে সংসারটাকে দোষ দিতে কই কাউকেও ত দেখছি না। সংসারে ছেলের অসুখ করলে ডাক্তার দেখাচ্ছ এবং হয়ত ভগবানকেও জানাচ্ছ, কিন্তু ছেলেটা ম'রে গেলে ভগবানকে দোষ দিয়ে ফেললে যে 'কই তাঁকে এত ডাকলুম তিনি কি করলেন ?' এমন কি হয়ত বলেই বসলে যে ভগবান টগবান নেই; কিন্তু কই ডাক্তারের ত কোন দোষ দিলে না! আবাব আর এক ছেলের অসুখ হলে সেই ডাক্তারকেই ডেকে পাঠালে। তাই, সংসারীদের সদ্‌গুরুর সঙ্গ করতে বলেছে, তাদের পক্ষে সাধন ভজন ক'রে ওঠা এক প্রকার অসম্ভব। তারা দেহ সুখে ভরা, কঠোরতা করা তাদের স্বপ্নের অতীত। সঙ্গে ভালবাসা প'ড়ে তাতে আপনা আপনি কাজ হতে থাকে। **যে ঠিক ঠিক বিশ্বাস রেখে সঙ্গ করে তার আর কিছু করবার দরকার হয় না। সে সাধন ভজন করুক আর নাই করুক তার কাজ আপনিই হতে থাকে।** কিন্তু সাধারণের ত ঠিক বিশ্বাস থাকে না, তাদের অন্ততঃ কিছু সময় নিয়মিত সঙ্গ করতে হয়; তাতে ক্রমে ভালবাসা ও বিশ্বাস আসতে থাকে, তখন কার্য্য হয়। খুব ধৈর্য্য নিয়ে চলতে হয়, এবং অবিশ্বাস এলেও সঙ্গ ছাড়তে নেই। সঙ্গের এত প্রভাব দিয়েছে যে সঙ্গে ভালবাসা পড়লে সব ছাড়তে পারে। এতদিন যে সব জিনিষ অতি প্রিয় ছিল, হঠাৎ সে সব ছেড়ে দিয়ে, যত কষ্ট হোক সব অম্লান বদনে সহ্য করতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না। এইখানে

ঠাকুর সুবোধ রাজা ও সুশীলের মৃগয়ার গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ২য় ভাগ ৬২ পৃষ্ঠা)। তা দেখ, ভালবাসার কি স্বভাব! সাধুকে দেখা মাত্র সুশীল রাজ্যসুখ, ঐশ্বর্য্য সব ভুলে গিয়ে সাধুর কাছে সকল রকম কঠোরতা স্বীকার ক'রে আনন্দ চিত্তে তাঁর সেবায় দিন কাটাতে লাগল। সংসারী লোকেরা তাকে খুব বোকা বলবে, যেন নিজেরা কতই বুদ্ধিমান! সংসারী যত বড় বুদ্ধিমানই হোক বা বোকাই হোক কালের কাছে দুয়েরই এক দর। সকলকেই একদিন কালের হাতে পড়তে হবে, দুজনকেই এক ভাবে যেতে হবে। তাই পরমহংস দেব বলতেন 'সা চাতুরী চাতুরী' অর্থাৎ **সেই কিছু চতুর যে সংসারে থেকে তাঁকে ডেকে নেয়; আর সকলেই বোকা; তা তিনি যত বড়ই ঐশ্বর্য্যবান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান হোন না কেন।** তাই, তিনি সংসারীদের জন্যেই বেশী ভাবতেন ও সকলকে কাছে ডাকতেন এবং আপন ক'রে নিতেন। আর তারাও তাঁকে না দেখে থাকতে পারত না, সব ছুটে আসত

ঠাকুর গাহিলেন—

হরি তোমাতে আমাতে শুধু মুখের কথাতে হবে কি গো পরিচয়।
আমার ষোল আনা মন সংসারেতে টান
শুধু লোক দেখান ডাকি, কোথা তুমি দয়াময়॥
ধন, ধান্য, রমনী, কাঞ্চন, যশ, মান, প্রাণ সদাই চায়।
আমি হেলায় বলি হরি, কাজে অন্য করি, যাতে লোকে আমায় সাধু কয়।
স্বার্থে ভরা মন, ভিন্ন পর আপন, জানি এ জীবন যাবার নয়॥
আমি ডাকতে হয় ডাকি, আবার বিষয় নিয়ে থাকি।
ফাঁকি দিলে কি হরি তোমায় পাওয়া যায়?
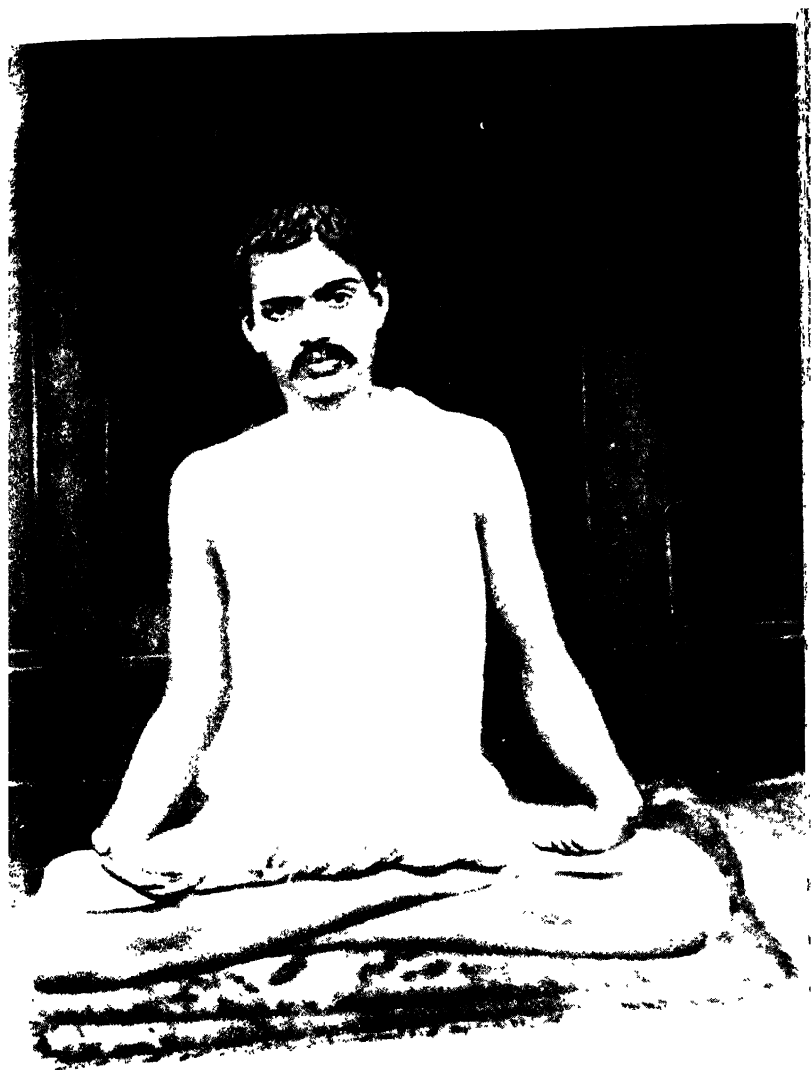
তৃতীয় ভাগ—দশম অধ্যায়

কলিকাতা, রবিবার ৩১শে বৈশাখ ১৩৪০ সাল ;

ইং ১৪ই মে ১৯৩৩।

মঠে থাকা সম্বন্ধে কথা উঠিতে ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। দুই রকম লোক মঠে থাকবার উপযুক্ত। যে বিবেক বৈরাগ্য নিয়ে সংসার ছেড়ে এসেছে বা যে প্রেমে সব ছেড়ে এসেছে। এরা ছাড়া অন্য কেউ ২৪ ঘণ্টা মঠে থাকবার উপযুক্ত নয়। এই দুই শ্রেণীর লোকই ত্যাগী। যাদের এ রকম ত্যাগ আসেনি তারা হঠাৎ কোন কারণ বশতঃ হয়ত বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু বৃত্তি গুলো সব মনে ঠিক পোরা আছে। তারা মঠে এসে দেখলে যে বেশ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে, সে জন্যে কোনও চিন্তা করতে হয় না। সংসারে থাকতে এর জন্যে টাকা রোজগার প্রভৃতিতে অনেক সময় তবু কাটত, কিন্তু এখন সমস্ত ক্ষণই তার বিশেষ কোন কাজ না থাকায়, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তি গুলো আরও ভাল ক'রে কাজ করতে থাকে ও তারা মঠে অশান্তির সৃষ্টি করে। এই জন্যে মঠ চালান বড় শক্ত ; ঠিক ঠিক ত্যাগী বা প্রেমিক লোক ছাড়া অপর লোক মঠে থাকলেই এই গোলমাল ও অশান্তির সৃষ্টি করবে।

কালু। কিন্তু মঠে ত কেবল ত্যাগী লোকই আসে না, অপর লোকও ত মাঝে মাঝে থাকে।

ঠাকুর। দেখ, সে থাকা আলাদা ; তারা কিছু শ্রদ্ধান্বিত হয়ে আমাকে ভালবেসে মাঝে মাঝে এসে থাকে। যারা আমাকে ভালবেসে আসবে, তাদের যতই দোষ থাক, আমি তাদের কোলে নেব। দোষ ত মানুষ মাত্রেরই আছে, তবে তারা যখন ভালবেসে আমার কাছে

ছুটে আসে তখন সে গুলো দেখবার তোমার প্রয়োজন নেই। আমার কাজ ত বর্জ্জন নয়, আমার কাজ সংশোধন। একটু ভালবাসা বা শ্রদ্ধা থাকলেই, সে আমার কাছে আসতে বা মাঝে মাঝে থাকতে পারে; তবে আমার দেখা দরকার যে তাদের মধ্যে কারুর দ্বারা মঠের অপরের কোনও ক্ষতি না হয়। তারা ত আর সব ত্যাগ ক'রে আত্মার উন্নতির জন্যে এসে থাকছে না। যারা ত্যাগ নিয়ে আসে তাদের থাক আলাদা। তাদের মধ্যে কেউ কপট ত্যাগ নিয়ে এলেই মনের স্বাভাবিক বৃত্তির ঠেলায় অশান্তি বাধায়।

কালু। তা, এই সব সংসারী লোকের সঙ্গ ক'রে ত্যাগী থাকের লোকদের ত ভাব নষ্ট হতে পারে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, যারা জোর ক'রে বিবেক বৈরাগ্য এবং ত্যাগ নিয়ে এসেছে তাদের ভোগীর সঙ্গে ও সংস্পর্শে কিছু ভাব নষ্ট হ'তে পারে; কারণ বাসনা কামনা ত পুরো মন থেকে চ'লে যায়নি, জোর ক'রে ছাড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু যারা প্রেমে বা আমাকে ভালবেসে ত্যাগ ক'রে এসেছে তাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না; কারণ তাদের মন একলক্ষ্য থাকায় অন্য বিষয় ধরবার সুযোগ বা সাবকাশ পায় না। সেইজন্যে বাইরের অপর বস্তুর দ্বারা তাদের নষ্ট করা কঠিন। তা হলেও এই সবের জন্যে তাদের একটু আলাদা রাখতে হয় বই কি। যারা ত্যাগ পথে যাবার জন্যে এসেছে, তাদের যাতে অপর ভাবের সঙ্গে মিশে ভাবটা নষ্ট না হয় সে দিকে ত লক্ষ্য রাখতে হয়ই।

কালু। ভোগী বা সংসারী ভক্তদের যে আলাদা থাক করলেন, তাদের ভেতরও ত অসচ্চরিত্র লোক থাকতে পারে; আর তাদের সংস্পর্শে সচ্চরিত্র লোকদেরও ত ক্ষতি হতে পারে? এই মনে করুন একজন মাতালের সঙ্গে প'ড়ে ভাল লোকও মদ খেতে শিখতে পারে।

ঠাকুর। দেখ, অতটা ঠিক হয় না? অসচ্চরিত্র লোক মঠে আসছে কেন? সে তার ইয়ারবর্গ এবং আড্ডা ছেড়ে এই ধর্ম্মের জায়গায় যখনই আসছে তখনই বুঝতে হবে যে তার কিছু অনুতাপ

এসেছে। সে বুঝেছে যে এটা তার ছাড়া দরকার কিন্তু বৃত্তির ঠেলায় নিজেকে সামলাতে পারছে না। তাই এসেছে, যদি এখানে এসে তার উপকার হয়। কাজেই সে তখন অন্য ভাবে এসেছে এবং অন্তঃত যতক্ষণ মঠে আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার বৃত্তি কাজ করছে না। এ অবস্থায় সে অপর লোককে খারাপ করতে পারে না। আর, অপর লোকই বা খারাপ হবে কিসে? সকলেই একটা সৎ হবার ইচ্ছা নিয়ে আসছে। তা ছাড়া এমনিই নেশা বা ভোগের কথা ত তার জানতে বা শুনতে কমতি নেই। তবে হ্যাঁ, সামনে যদি ভোগের জিনিষ বা নেশার জিনিষ পায় তাহলে হয়ত অনেক সময় সামলাতে পারবে না। তা, সে রকম অন্যায় ভোগের জিনিস ত আর মঠের ভেতর সামনে দেখতে পাচ্ছে না, যে তখনই তাতে ম'জে পড়বে। আরও, যাঁর কাছে এসেছে তাঁর নজর থাকায় মঠের ভেতর চট্‌ ক'রে কোন অন্যায় কাজ করতে তার সাহসও হবে না।

তা ছাড়া, মঠে যারা থাকে তাদের মঠের কড়া নীতি মেনে চলতে হয় কাজেই কোন মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে বা কোন স্বার্থ নিয়ে এখানে এলে তারা ক'দিন ঠিক এই কড়া নীতি পালন ক'রে চলতে পারবে? দুদিন পরেই দৌড় মারবে। আবার, যাঁর কাছে রয়েছে তাঁর ভেতর ত আর কোন মন্দ নেই। যদিও বা কারুর কারুর ভেতর খারাপ কামের বাসনাই থাকে ত তাঁর সঙ্গে তাদের সে বৃত্তি কোন কাজ করতে না পেরে আপনি ম'রে যাবে, কারণ তিনি কামজয়ী। তা না হলে কি তিনি দাঁড়াতে পারেন? না ইচ্ছামত দরকার হলেই সব ছেড়ে চলে যেতে পারেন? সাধারণ দেখনা, একটা স্ত্রীর টানে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং একটার জায়গায় দুটো বিয়ে করলে ত তাদের ঝগড়া, অশান্তির জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ে। আর এতগুলো স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবাধ ব্যবহার রেখে তাদের একভাবে কড়া নীতি রাখিয়ে চালান কি সোজা কথা? এ আলাদা শক্তির দরকার। তাই আছে, সাধারণ

গুরু বড় জোর দু'চার জন অর্থাৎ অল্প কয়েক জনকে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি সব ছেড়ে কৌপীন এঁটে বসে থাকতে পারেন আর সেই ভাবের দু'চার জন ত্যাগী তাঁর কাছে আসতে পারে ও গতি করতে পারে। কিন্তু সদ্‌গুরু বা আচার্য্যদের ত সে ভাব চলতে পারে না। তাঁদের বহু লোককে নিয়ে বহু প্রকৃতির সঙ্গে, যার যেমন ভাব সেই ভাবে তার সঙ্গে মিশে তার মন ঘুরিয়ে দিয়ে গতি করাতে হবে। তাঁদের বহু লোকের সঙ্গে ব্যবহার রাখতে হয় কাজেই তাঁদের একভাবে বা কৌপীন এঁটে বসে থাকলে বা শুধু একই কড়া ত্যাগ নীতি উপদেশ দিলে চলবে না। সেই জন্য আচার্য্য বলতে একই বোঝায় তার আর গুরুর মত উত্তম, মধ্যম বা অধম এ রকম আলাদা আলাদা থাক করা যায় না।

কালু। তা বলছেন বটে, কিন্তু এ ত অনবরতই দেখা যাচ্ছে যে যখন স্কুলে পড়তে যায়, তখন সকলেই লেখা পড়া শিখব এই ভাল উদ্দেশ্যেই যায়, কিন্তু সঙ্গে প'ড়ে ওখান থেকেই খারাপ হয়ে যায়।

ঠাকুর। এটা যে একেবারে আলাদা কথা হ'ল। স্কুল আর মঠ কি সমান হ'ল? স্কুলে পড়তে যাচ্ছ বটে, কিন্তু বাসনা নিবৃত্তি করবার উদ্দেশ্যে ত যাচ্ছনা, বরং ভোগের জিনিষের জন্যই যাচ্ছ। লেখা পড়া কর কি জন্য? এটা ত অর্থকরী বিদ্যা; পাশ করবে, টাকা আনবে, ভোগ বাসনা পোরাবে, এই হ'ল মূল উদ্দেশ্য। কাজেই এখানে সৎ বা অসৎ বেছে নেওয়াটা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি, মনের শক্তি এবং সঙ্গের ওপর পূর্ণ নির্ভর করছে। কিন্তু মঠে যারাই আসছে, তাদের ভেতরের ভাব আলাদা। তারা সকলেই সৎ হবার জন্যে বা সংসারের দুঃখের হা'ত থেকে যাতে কিছু নিষ্কৃতি পাওয়া যায় সেই জন্যে আসছে, তাই এখানে অসৎ ভোগ বাসনাটা বড় কাজ করতে পারে না।

ললিত। আর আজকাল ছেলেরা বাপ মা কাউকেই তত মানতে চায় না, সেই জন্যে আরও বেশী খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

ঠাকুর। সে দোষ কার? বাপ, মার। তোমরা কি ছেলেকে কখনও এমন উপদেশ দাও, যাতে তারা বাপ, মাকে মানতে শিখবে? তোমরা লেখা পড়া শেখাচ্ছ কি জন্যে? যাতে তারা পরে টাকা রোজগার করতে পারে এবং বেশ খেয়ে দেয়ে ভাল ক'রে ভোগ বাসনা মেটাতে পারে। **তোমরা কি চাও তোমাদের একটা ছেলেও অন্ততঃ ত্যাগ শিক্ষা ক'রে সৎ পথে চলুক?** তোমরা নিজেরা প্রায় সকলেই ভোগে অন্ধ আর ছেলেদেরও ঠিক তাই তৈরী করছ।

ললিত। বাপ, মা চেষ্টা করলেই কি সব সময় ছেলেরা ভাল হয়?

ঠাকুর। তা ঠিক না হতে পারে, কারণ পূর্ব্ব সংস্কার কাজ করে। তবে বাপ, মা'র সৎ ভাব ও সৎ বৃত্তি দেখলে ছেলেদের মনে স্বতঃই ভাল সংস্কারটা গোড়া থেকে লেগে যেতে পারে, এবং বাপ, মা'র চেষ্টায় সেটা অনেক বেড়ে যেতে পারে। তাতে ভবিষ্যতে অনেক উপকার হবে। পূর্ব্ব সংস্কার কাজ করলেও, সৎ সংস্কার ছোটবেলা থেকে লেগে যাওয়ায় ততটা ক্ষতি করতে পারে না।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। দেখ, এই যে কীর্ত্তনটা হ'ল এটা ত সব নিত্য ঘটনা গুলো কেবল একটু সুর ক'রে বলা, যাতে সহজে মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এ গুলো শুধু সুর ক'রে গাইলে আর কি হ'ল? তবে সমস্বরে ভগবানের নাম করলে অনেক কর্ম্মক্ষয় হয়। কীর্ত্তনটা হচ্ছে ধড়; হাত, পা, চোখ, মুখ সব আছে কিন্তু প্রাণ নেই। কীর্ত্তনের পরের উপদেশটাই হচ্ছে প্রাণ। এইটাতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, কি ক'রে হাত, পা প্রভৃতির কাজ করতে হয়। রোজই প্রায়, এই একই উপদেশ শুনে যদি মনে কিছু ছাপ লাগতে লাগতে বৃত্তিগুলো ঘুরে গিয়ে কার্য্য হয়। সংসারে সাধারণ বদ্ধ জীব হওয়া ছাড়া দুরকম সৎ সংসারী আছে। এক হচ্ছে, সংসারটাই তাদের প্রিয়, সেটাকেই বড় ক'রে রেখেছে। সংসারের সব দিক বজায়

রেখে, যদি কিছু সময় বার করতে পারে ত সেই সময়টুকু সাধুসঙ্গ করে। সাধুসঙ্গের জন্য একটুও লোকসান স্বীকার করতে তারা রাজী নয়। আর এক আছে, সৎসঙ্গকেই বড় এবং প্রিয় করেছে আর সংসারটাকে ছোট করেছে। মায়া কিছু আছে ব'লে সংসারের যেটুকু নইলে নয়, যেমন উদরান্নের জন্য চাকরী এবং স্ত্রী, পুত্রকে যতটুকু দেখা যথার্থ প্রয়োজন কেবল মাত্র সেইটুকু বজায় রেখে বাকী সব সময় সাধুসঙ্গ করে বা তাঁর চিন্তায় থাকে। এমন কি, সংসারের অনেক লোকসান স্বীকার ক'রেও তারা সাধুর কাছে আসে। এরাই সাধুকে যথার্থ ভালবাসে এবং সময় হ'লেই এদের সমস্ত ত্যাগ হয়ে যাবে। তারপর,অর্থাৎ সমস্ত ত্যাগ হয়ে যাবার পর, যদি কেউ সংসারে আসে তখন সে জীবন্মুক্ত ভাবে সংসার করে। জীবন্মুক্তরা মায়ামুক্ত ; সুখ, দুঃখে তারা স্থির থাকে ও কোন জিনিষই তাদের মনকে টলাতে পারে না। সংসারে চলতে গেলে সুখ, দুঃখ পর পর আসবেই, কেননা এ হচ্ছে সংসারের নিয়ম। আজ যে ধনী দুদিন পরে হয়ত সে গরীব হয়ে যেতে পারে, কিন্তু জীবন্মুক্তদের এ সব কিছু স্পর্শ করে না। ধন, ঐশ্বর্য্য, রইল ভাল, আবার গেল সেও ভাল ; থাকলেও খুব আনন্দ নেই, গেলেও কোন দুঃখ নেই। তারা সর্ব্বদাই জানে যে সমস্তই তাঁর। তাঁর জিনিষ থাকলে তাঁর রইল, আবার গেলে তাঁরই গেল, তাতে তাদের কি আসে যায়? যেমন অপরের বিষয়ের ম্যানেজার মনিবের সব কাজ নিজের মত করে বটে কিন্তু সকল সময়েই ভাবে যে এ সব ত তার কিছুই নয় ; মনিব যেদিন জবাব দেবে, সেদিন সব ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। অথবা যেমন পাড়ার লোক কর্ম্ম বাড়ীর ভাঁড়ারী হয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে ও ব্রাহ্মণভোজনাদি সকল কাজই নিজের বাড়ীর মত ক'রে শেষ পর্য্যন্ত থাকে কিন্তু যাবার সময় যাদের জিনিষ তাদের বুঝিয়ে দিয়ে চ'লে যায়, সে বিষয়ে আর কোন চিন্তা রাখে না। জীবন্মুক্তরা এই ভাবে সংসারের সব ভোগের মধ্যে থেকেও মন সর্ব্বদা তাঁতে রেখে দেয়।

আর, যারা বুঝতে পারছে যে সংসারে রোগ, শোক, তাপ, অভাব প্রভৃতির হাত থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই অথচ মায়ার এমনই প্রভাব যে রোগ, শোকাদিতে জর্জ্জরিত হয়েও ছাড়তে পারছে না তাদের পক্ষে সাধুসঙ্গ ছাড়া আর কোন গতি নেই ; কারণ এরা ত আর সাধন ভজন ক'রে গতি করতে পারবে না। তাই বার বার বলেছে সঙ্গ। সঙ্গে মনের শক্তি বাড়লে, প্রকৃতির ধাক্কা সহ্য ক'রে দাঁড়াতে পারবে। সেই জন্যই গুরুতে বিশ্বাস রেখে সংসারে চলতে বলেছে। গুরু হচ্ছেন খোঁটা। যেমন খোঁটা ধ'রে ঘুরলে আছাড় খাবার ভয় থাকে না, তেমনি **গুরুতে ঠিক বিশ্বাস রেখে কাজ করলে গুরু সব ঝড়, ঝাপটা, আপদ, বিপদ কাটিয়ে দেন। ধর্ম্ম যদি ঠিক থাকে ত সংসারে সব বজায় থাকবে ও দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।** এইখানে ঠাকুর 'শিবিরাজা ও ধর্ম্মের' গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ১ম ভাগ ১৯৭ পৃষ্ঠা)। তা দেখ, **গুরুই হচ্ছেন ধর্ম্ম।** অবশ্য **গুরুতে যার স্থির বিশ্বাস আছে তার আর কিছু দরকার হয় না, সে সাধন ভজন করুক আর নাই করুক, সে নিশ্চিন্ত। গুরুই তার সমস্ত ভার নিয়ে নেন, তার আর কোন চিন্তা, ভাবনার প্রয়োজন থাকে না।** তবে, সব আধারে ত এ বিশ্বাস দাঁড়ায় না ; এ অতি বিরল। তাই আছে, **সরলতা ও বিশ্বাস ভগবানের বড় বড় দান।** তবে সাধারণের জন্য হচ্ছে, কিছু শ্রদ্ধা ও কিছু পরিমাণ বিশ্বাস নিয়ে গুরুর উপদেশ মত চলতে পারলেও অনেক শান্তি পাওয়া যায়। **যার গুরুতে ঠিক বিশ্বাস আছে তার কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না। এমন কি গ্রহাদি পর্য্যন্ত**

প্রথমে বিমুখ হয়ে কিছু অনিষ্ট করলেও, শেষে তারা পরাস্ত হয়ে যায় এবং তখন তারাই আবার বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়। মূলে কোন ক্ষতিই করতে পারেনা। সঙ্গ করতে করতে এই বিশ্বাস পাকা হতে থাকে এবং গুরুর ওপর ভালবাসা পড়তে থাকে। **গুরুর ওপর ভালবাসা পড়লেই কাজ হতে লাগল, তার জন্যে আর বড় ভাবনা হয় না, সে স্বতঃই গতি করতে থাকে।** এই ভালবাসা লাগিয়ে দেওয়াই হচ্ছে সঙ্গের কাজ। ভালবাসা এলে আপনত্ব আসবে, আর আপনত্ব এলে যত কাজ হয় তত আর কিছুতে হয় না। তাই পরমহংসদেব সব ভালবেসে আপন ক'রে ডাকতেন।

ঠাকুর গাহিলেন—

তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে।
মানুষ শুধু সাক্ষী গোপাল মিছে আমার আমার করে॥
ছায়াবাজীর পুতুল যেমন, জীবের জীবন তেমন।
মানুষ দেবতা হ'তে পারে, যদি তোমার পথে চলে॥
দেহ যন্ত্রে তুমি যন্ত্রী আত্মারথে তুমি রথী।
জীব কেবল পাপের ভাগী, নিজ স্বাধীনতার ফলে॥
সর্ব্বমূলাধার তুমি, প্রাণের প্রাণ হৃদয় স্বামী।
অসাধুকে সাধু কর তুমি নিজ কৃপা বলে॥

তৃতীয় ভাগ—একাদশ অধ্যায়

কলিকাতা, বৃহস্পতিবার ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সাল;

ইং ১৮ই মে ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর কথা হইতেছে—

ঠাকুর। কি কেষ্ট কেমন আছ?

কেষ্ট। মনটা বড় খারাপ।

ঠাকুর। শরীরটা ভাল ত? মন খারাপের একটা কারণ আছে নিশ্চয়।

কেষ্ট। হ্যাঁ, শরীরটা ভাল বটে, কিন্তু মন খারাপের বিশেষ কারণ কিছু নেই।

ঠাকুর। তা কি হতে পারে, কিছু কারণ একটা থাকবেই।

কেষ্ট। না, সাংসারিক বা বৈষয়িক কিছু নয়।

ঠাকুর। তা না হতে পারে, তবে যে কোন কারণ হোক একটা আছেই।

কেষ্ট। এখন এখানে এসে মনটা ক্রমশঃ প্রফুল্লিত হচ্ছে। তা দেখছি যার যত মন খারাপই হোক, আনন্দময়ের কাছে এলেই আনন্দ হয়। তা ঠাকুর, আমাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা দুঃখ আছেই, কিন্তু আপনি সদা আনন্দময়, আপনার কোনও দুঃখ নেই বা কোনও দুঃখ আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না।

ঠাকুর। আমায় আর কিসে দুঃখ দেবে বল। আমার আছেই বা কি? টাকা কড়ি নেই যে তার জন্যে চিন্তা থাকবে বা বিষয় সম্পত্তিও নেই যে তার জন্যে অশান্তি ভোগ করব। থাকবার মধ্যে ত আছে এই পেটটা, তা তোমরা এত সব রয়েছ, কাজেই সে ভাবনা

রাখিনা। আর তোমরা যদি না থাকতে তা হ'লে তিনি ক্ষুধাও হয় ত তুলে নিতেন, যেমন পূর্ব্বে করেছিলেন। তবে দুঃখ যে একেবারে আসেনা তা নয়। তোমাদের দুঃখে মনে ক্ষণিকের জন্য দুঃখ আসে বৈ কি, কারণ তোমাদের ভালবাসি। এই দেখনা, অশোকের বড় ছেলেটী মারা যাবার পরদিনই সকাল বেলা সেখানে গিয়েছিলুম ; গিয়ে দেখি, তারা কেউ আর ওঠেনি, সব প'ড়ে আছে। তাদের আবার ওঠাই, জল টল্ খেতে বলি, তারপর তারা খেলে মঠে ফিরে আসি। তা, ও'দের জন্যে প্রাণে একটু দুঃখ লেগেছিল বই কি! ছেলে ম'রে গেছে ব'লে যে দুঃখ হয়েছিল তা নয়, কারণ এটা ত নিশ্চিত জিনিষ, সংসারে অমর হ'য়ে কেউ আসে নি ; একদিন না একদিন প্রত্যেকেই চ'লে যাবে। তা ছাড়া কলিকালে মানুষ স্বল্পায়ু, কে যে কখন যাবে তার কোনও স্থিরতা নেই। কাজেই এই অনিত্য জিনিষের জন্য ত দুঃখ হয় নি, তবে তাদের দুঃখ কান্না দেখে ক্ষণিকের জন্য একটু দুঃখ হয়েছিল। তাই তাদের বললুম যে 'দেখ, এ ত জানা জিনিষ ; সংসারে যখন রয়েছ, তখন শোক ত অনিবার্য্য ; জাগতিক নিয়মই এই। আমার কাছে এসেই যে তোমাদের সব ছেলে মেয়ে অমর হয়ে থাকবে বা তোমরা কোন রকম দুঃখ কষ্ট পাবে না তা ত হতে পারে না, সাধারণ নিয়ম কেমন ক'রে উলটে যাবে? তবে এই সব প্রকৃতির ধাক্কা গুলি যাতে সহজে সামলাতে পার তারই এত চেষ্টা।' তাই তোমাদের বলি যে রকম ক'রেই হোক মনের কিছু শক্তি বাড়াও, তা হলে এ সব ধাক্কা তত দুঃখ দিতে পারবে না। আর দেখ, দুঃখ পাও কেন? সেটা মায়ার জন্য বইত নয়। অপরের ছেলে ম'রে গেলে কি তোমাদের তত দুঃখ হয়? তোমার ছেলের ওপর মায়া আছে এবং আশা রয়েছে ব'লে দুঃখ পাও। মনের শক্তি বাড়লে ক্রমশঃ এই মায়ার হাত থেকে কিছু নিস্তার পাবে ও সেই পরিমাণ শান্তি পাবে। বড় শান্তি পেতে হ'লে ত্যাগ চাই। **ত্যাগ ভিন্ন কোন অবস্থায় শান্তি আসতে**

পারে না। আর দুঃখ দেয় কে? **বাসনাই দুঃখের মূল।** সংসারে বাসনার ত ইতি নেই কাজেই দুঃখেরও শেষ নেই। যার যত বাসনা তার তত দুঃখ। তাই সুখের বাসনা করলেই জানবে যে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের বায়না করছ। সুখটা কি নিজের মন গড়া? তুমি ভাবছ যে ওর মত হ'লে বুঝি সুখী হবে, কিন্তু সে তাতে বাস্তবিক সুখী আছে কি না খোঁজ করলেই দেখবে যে, সে যখন তাতে মোটে সুখী নয় তখন তুমিই যে ওর অবস্থা পেলে সুখী হবে তা কেমন ক'রে বলতে বা ভাবতে পার?

ঠাকুর গাহিলেন—

অহং নামধারী পত্রপুষ্পধারী পাদপে পরশ ক'রো না।
মুক্তিপথ রোধি বিরাজে কায়া, তাহার তলায় যেও না॥
গৃহ ক্ষেত্র দুটী শাখা শোভে তার, পুত্রাদি মমত্ব পল্লব বিলায়।
ধন ধান্য রূপে পত্রে শোভা পায়, সকলকে ভুলায় ভাবিয়ে দেখ না॥
বাসনা জনিত সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম প্রতিক্ষণে ফোটে কুসুম কুসম।
সুখ দুঃখ ফল ঝোলে তার ডালে সে ফল তুলিতে যেও না।
বিষধর সম সেই তরুবর, আলিঙ্গনে তোমায় দংশিবে সত্বর।
দীন হীন বলে সেই তরুবরে সমুলে নির্ম্মূল কর না॥

কেষ্ট। সুখের বাসনা মানেই কি দুঃখকে ডাকা? বাবা! তা হ'লে ত মুস্কিল। আচ্ছা ধরুন, যদি সৎ সুখের বাসনা হয়।

ঠাকুর। আসল সুখ যে কিসে হয় তাই ত জান না। না জেনে সুখের আশায় যে সব জিনিষে দুঃখ অনিবার্য্য তার পেছন পেছন ছোট; কাজেই দুঃখের হাতে পড়বে তার আর আশ্চর্য্য কি? দেহ জনিত দুঃখ রয়েছেই, তা ছাড়া আবার অপর দুঃখকে ইচ্ছে ক'রে ডাকছ কেন? হাতে বিছে কামড়ে জ্বালা করছে আবার সেই হাত আগুনে দিতে যাও কেন? তাই বলি, ভোগের পথ ছেড়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছে ক'রে ডেকে আনা দুঃখটা অন্তঃত কমাতে চেষ্টা কর। আর, এই ভাবে থাকলে দেখবে অপর দুঃখ তোমাকে অত কষ্ট দিতে

পারবে না, কারণ ত্যাগের পথে গতি করলে আপনি মনের শক্তি বাড়বে। আর দুঃখ কি? যেটা চাওনা সেটা হলেই দুঃখ পাও। দুঃখ ব'লে ত আর আলাদা কোন জিনিষ নেই। এই ধর, সুস্বাদু খাবার খাওয়াটা ত খুব সুখের, কিন্তু তোমার যদি পেট ভরা থাকে, আর তোমায় যদি জোর ক'রে সেগুলো খাওয়ান হয় তা হ'লে তোমার পক্ষে তখন সেইটাই ভয়ানক দুঃখের কারণ, কেননা তুমি তখন সে গুলি খেতে চাচ্ছ না। তাই বলেছে, যেটা সহজে আসবে সেইটার ওপরই ঠিক আনন্দ রাখতে শেখ, তা হলে দুঃখ অনেকটা কম বোধ হবে।

আর, যথার্থই যদি সৎ বা নিত্য সুখের বাসনা কর, তাহলে সমস্ত বাসনা ত্যাগ কর। সৎ সুখ মানেই শান্তি এবং বাসনা ত্যাগ ব্যতিরেকে শান্তি আসতে পারেনা। তা ছাড়া তুমি যা সৎসুখ বলছ, তাতেও দুঃখ আসবে। এমন কি ভগবান দর্শনের সুখ ইচ্ছা করলেও ভগবান দর্শন না পেলে দুঃখ আসবে। তবে, এটা হচ্ছে 'অকাম বিষ্ণুকাম বা' অর্থাৎ বিষ্ণুকামনাকে কামনা বলে না। সাধারণ ভোগসুখের বাসনার মত সৎ বাসনার সঙ্গে দুঃখ জড়িত থাকলেও সৎ বাসনায় ক্রমশঃ তোমার মনের শক্তি বাড়িয়ে ধীরে ধীরে ত্যাগের দিকে নিয়ে যাবে। যেমন, রোগীকে কুপথ্য খাওয়াও রোগের বৃদ্ধি হবে, আবার ঔষধ খাওয়াও ধীরে ধীরে রোগ কমতে থাকবে। দুইই খাওয়া, তবে একটাতে রোগ বাড়ে, আর একটাতে রোগ কমে। তাই, সুখ দুঃখ দুয়েরই হাত থেকে যখন নিষ্কৃতি পাবে তখন যথার্থ সেই নিত্য বা সত্য সুখ অর্থাৎ শান্তি পাবে। সুখ দুঃখ ভোগ হয় মনে। যে দিন ছেলে ম'রে যায় বা অপর কোন শোকের দিন সুখ ভাল লাগে কি? মন যতক্ষণ রিপুর অধীন, বাসনা কামনার অধীন হয়ে আছে, ততক্ষণ সুখ দুঃখ ভোগ হবেই। রিপুগণ যখন সম্পূর্ণ মনের অধীন হবে তখনই শান্তি পাবে।

কেষ্ট। মন কোন্ স্তরে থাকলে এ সব উপলব্ধি করা যায়?

ঠাকুর। বল্‌লেই বা তুমি বুঝবে কি ক'রে? মন সে স্তরে না উঠলে কি বুঝতে পার? 'ক, খ' শিখতে শিখতে কি এম্ এ'র পড়া বুঝতে পার?

কেষ্ট। তবু যদি জেনে রাখা যায় যে ঐ স্তরে মন থাকলে এ সব উপলব্ধি হয়।

ঠাকুর। এটা ত শুধু ভাষা জানা হ'ল। ধর, যদি বলি মন দ্বিদলে উঠলে এ অবস্থা হয়, কিছু বুঝলে কি? দ্বিদলই বা কি, আর দ্বিদলে মন পৌঁছুলে তার কি অবস্থা হয়, এ সব উপলব্ধি না হলে কি কিছু বোঝা যায়? শুধু ছুটো ভাষা শুনে রাখলে বই ত নয়।

কেষ্ট। যদি সৎ বাসনাও দুঃখের কারণ, তা হলে আমরা চলব কি ভাবে?

ঠাকুর। সৎ বাসনা ত দুঃখের কারণ বলিনি। সৎ বাসনার দ্বারা অসৎ বাসনা খণ্ডন হয়, তারপর সৎ অসৎ দুই থাকে না; তখনই ঠিক ঠিক শান্তি আসে। কাজেই সৎ বাসনার সঙ্গে প্রথমে দুঃখ জড়িত থাকলেও শেষে সেটা ত্যাগের পথে নিয়ে যাবে ও শান্তি আনবে। কিন্তু সাধারণ ভোগ বাসনায় ভোগের ইচ্ছাই ক্রমশঃ বাড়িয়ে দিয়ে দুঃখের পরিমাণ বাড়াতে থাকবে, তাই সেটাকে দুঃখের কারণ বলেছে। গীতায় ভগবান বলেছেন 'বিষয়েতে সুখ যাহা, দুঃখের কারণ তাহা'। দেখ বাসনা ওঠে কেন? প্রয়োজন হলেই বাসনা ওঠে। যত প্রয়োজন কমাবে তত বাসনা কমবে। তাই বলেছে ত্যাগ শিক্ষা করবে। মনকে ক্রমশঃ ত্যাগের দিকে নিয়ে গেলে, প্রয়োজন আপনি ক'মে আসবে। ত্যাগ ভিন্ন শান্তি পাবে না।

কেষ্ট। আপনি যে এত ত্যাগের কথা বললেন, তা ধরুন যদি আপনার সব ভক্ত একদিন সব ত্যাগ ক'রে কৌপীন এঁটে এসে হাজির হয় তা হলে কি হবে?

ঠাকুর। দেখ, যদি সত্যি সত্যি মন থেকে সব ছেড়ে আসে,

তা হলে আনন্দের স্রোত বয়ে যাবে। কিন্তু ভেতরে সবগুলি পুরে নিয়ে বাইরে কৌপীন এঁটে এলে দুঃখের স্রোত বইবে। কপটতা অত্যন্ত দোষের, এতে কখনও শান্তি বা আনন্দ আসতে পারে না। এ অবস্থায় এখানে এলেও হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি কাজ করবে এবং আমাকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলবে। শুধু বাইরে ত্যাগ হলে চলবে না, ভেতর সমস্ত পরিষ্কার হওয়া চাই।

কেষ্ট। বাইরের ত্যাগও ত দরকার। এই যে ন্যাংটা সন্ন্যাসীর সম্প্রদায় আছে, এরাও ত ত্যাগী।

ঠাকুর। দেখ, এটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ত্যাগ। যারাই ন্যাংটা তারাই যদি ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'ত তা হলে কি আর ভাবনা থাকত। জিনিষটা এত সোজা নয়, যে ঠিক ঠিক ত্যাগী দলে দলে পাবে। এমন অনেক হিন্দুস্থানী সংসারী পাবে, যারা শুধু একটা কৌপীন এঁটে থাকে; ওটা দরিদ্রতা বা সংস্কারের জন্য। এ রকম বাইরে ত্যাগ ঢের দেখতে পাবে, কিন্তু তা ব'লে তারা কি ভেতরে সব ছেড়েছে? ভেতরে সব ঠিক পোরা আছে।

কেষ্ট। আচ্ছা ধরুন, সবাই ঠিক সমস্ত ছেড়ে এসে মঠে জুটল, তখন অত লোকের খাওয়া প্রভৃতির ভাবনায় আপনাকে অস্থির ক'রে তুলবে ত?

ঠাকুর। যারা ঠিক ত্যাগী তাদের জন্যে কাউকে ভাবতে হয় কখন দেখেছ? আমাকে অস্থির করবে কেন? যারা ঠিক ত্যাগী তাদের খাওয়া, শোয়া, পরা প্রভৃতির দিকে নজর থাকে কি? তারা উপোস করতে পারে, ঘুম ছাড়তে পারে, বা যেখানে সেখানে প'ড়ে থেকে ঘুমিয়ে নিতে পারে; তারা সকল রকম কষ্ট সহ্য করতে পারে। তাদের জন্যে আর আমার ভাববার দরকার কি? আর দেখ, যারা এ রকম সব ছেড়ে আসবে তাদের কি আর কখন কিছুর অভাব হয়? 'বহাম্যহম', তিনিই তাদের ভার বহন করেন। **কৌপীন এঁটে ভেতরে কামনা বাসনা পোরা থাকলে**

সে মহাভোগী। আবার কাপড় জামা প'রে ভেতরে ত্যাগ থাকলে সে মহাত্যাগী। ভেতর ত্যাগই আসল ত্যাগ, কিন্তু খুব শক্ত। ভেতরে ঠিক ঠিক ত্যাগ হলে বাইরে ত্যাগ করতে আর কষ্ট হয় না।

কেষ্ট। ভেতর ঠিক ত্যাগ হ'ল কিনা ধরা যাবে কিসে ?

ঠাকুর। সে খুব সোজা। দুটো একটা কড়া কথা বললেই দেখবে সে তোমায় লাঠি নিয়ে তাড়া করবে। ভেতরে হিংসা দ্বেষ পোরা থাকলে, একটু টোকা মারলেই আসল প্রকৃতিটা বেরিয়ে পড়বে ; সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। তবে হ্যাঁ, বাইরের ত্যাগে দেহ সুখটা অনেক ক'মে আসে এবং ঠিক পথে গতি করবার অনেকটা সাহায্য করে। তাই তোমাদের বলি প্রয়োজন কমাবার খুব চেষ্টা কর। ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্ন (শাক অন্ন), লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, আর মাথা গোঁজবার জন্য যেমন হয় একটা জায়গা এই তিনটেই হচ্ছে সংসারীদের প্রয়োজন ; শুধু এই তিনটের ওপর মন রাখবে। এ ছাড়া অপর সমস্ত জিনিষ থেকে মন আস্তে আস্তে তুলে নেবার চেষ্টা করবে। তা হলেই দেখবে ক্রমশঃ শান্তি আসবে। এমনি, সংসারের মায়া ও প্রলোভনে থেকে এ অভ্যাস করা বড় কঠিন, তাই তাদের ব'লেছে সঙ্গ করতে। সদ্‌গুরু সঙ্গে প্রয়োজন আপনি কমে আসবে ও ত্যাগ শিক্ষা হবে।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। বেশ কিছু সময় তাঁকে দেবে। স্থান, জায়গায় উদ্দীপনা হয়। যেমন সঙ্গ করবে তেমনি সব বৃত্তি উঠবে। সংসারীর সঙ্গ করলে ভোগ বাসনা বৃদ্ধি পাবে আর সাধুর অর্থাৎ ত্যাগীর সঙ্গ করলে ত্যাগ শিক্ষা হবে। তাই, বারবার বলেছে সঙ্গ। চার প্রকার সাধনা দিয়েছে। প্রথম, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন অর্থাৎ শাস্ত্র কথা শুনবে, শুনে মনে মনে বেশ ক'রে চিন্তা করবে, তারপর ধ্যান, ধারণা, অভ্যাস দ্বারা মনকে স্থির করবে। দ্বিতীয়, অনাত্মাবাদ অর্থাৎ তুমি ত সেই

আত্মা অথচ কি কি দোষের জন্য এ রকম বদ্ধ হ'য়ে দাসত্ব করছ? সেই সেই দোষগুলি অনুসন্ধান ক'রে বাদ দাও। দোষ নষ্ট হলেই কেবল গুণ থেকে যাবে। তারপর গুণও চলে যাবে তখন তুমি গুণাতীত হবে। তৃতীয়, ভগবানের শরণাগত হওয়া। নিজের শক্তিতে যখন হচ্ছে না তখন শক্তিমানের আশ্রয় নাও; যেমন দুর্ব্বল রোগী ডাক্তারের শরণাগত হয়। তাও যদি না পার, তবে চতুর্থ, সাধু সঙ্গ অর্থাৎ নিয়মিত ভাবে সাধুর কাছে আসা ও তাঁর উপদেশ অনুযায়ী চলা। আমাদের হিন্দু সমাজে শাস্ত্র কথা বা ভাল কথা ত বহু শোনা আছে বা বইতে লেখা আছে, কিন্তু কই একটাও মেনে চলতে পার কি? একটাও যদি ঠিক ঠিক মেনে চলতে পারতে ত অনেক বড় হ'য়ে যেতে। কিন্তু পার না কেন? তোমাদের মন সংসারের নানা জিনিষে ছড়িয়ে থাকায় মনের অনেক বাজে খরচ হ'য়ে যায়। তখন মনের সে শক্তি কই যে শাস্ত্র কথা মেনে চল বা কোন রকম কঠোরতা ক'রে দাঁড়াতে পার? যেমন, সংসারে যখন টাকা রোজগার কর, অনেক টাকা রোজগার ক'রে আনলেও মাসকাবারে দেখবে কিছুই থাকে না, কারণ অনেকের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেছ ব'লে তাদের জন্যই সব খরচ হয়ে যায় এবং শেষে দেখ নিজের জন্যে আর কিছুই নেই; তেমনি, সংসারে থেকে যত ধর্ম্ম কর না কেন, সংসার মায়ায় প'ড়ে সব বাজে খরচ হয়ে যায় কিছুই থাকে না। যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে সেই সরষেটাই যে ভূতে পাওয়া কাজেই তা দিয়ে আর কি কাজ হবে? তা ছাড়া, কলির জীব অন্নগত প্রাণ, প্রায়ই ব্যাধিগ্রস্ত; সাধ্য কি তারা কঠোরতা নিয়ে গতি করতে পারে? তাই বলেছে, যখন নিজে দুর্ব্বল তখন বীরের আশ্রয় নাও, তাঁর শরণাগত হও। কিন্তু শরণাগত হওয়াও বড় সোজা নয়। সংসারে যখন দেহ সুখ, যশ, মান, বাসনা, কামনা, অর্থ, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার প্রভৃতির শরণাগত হ'য়ে রয়েছ তখন কোন্ মন দিয়ে তাঁর শরণাগত হবে? বাসনা কামনা অধীন না করতে পারলে ঠিক শরণাগত হওয়া যায় না। তাই সাধু সঙ্গই
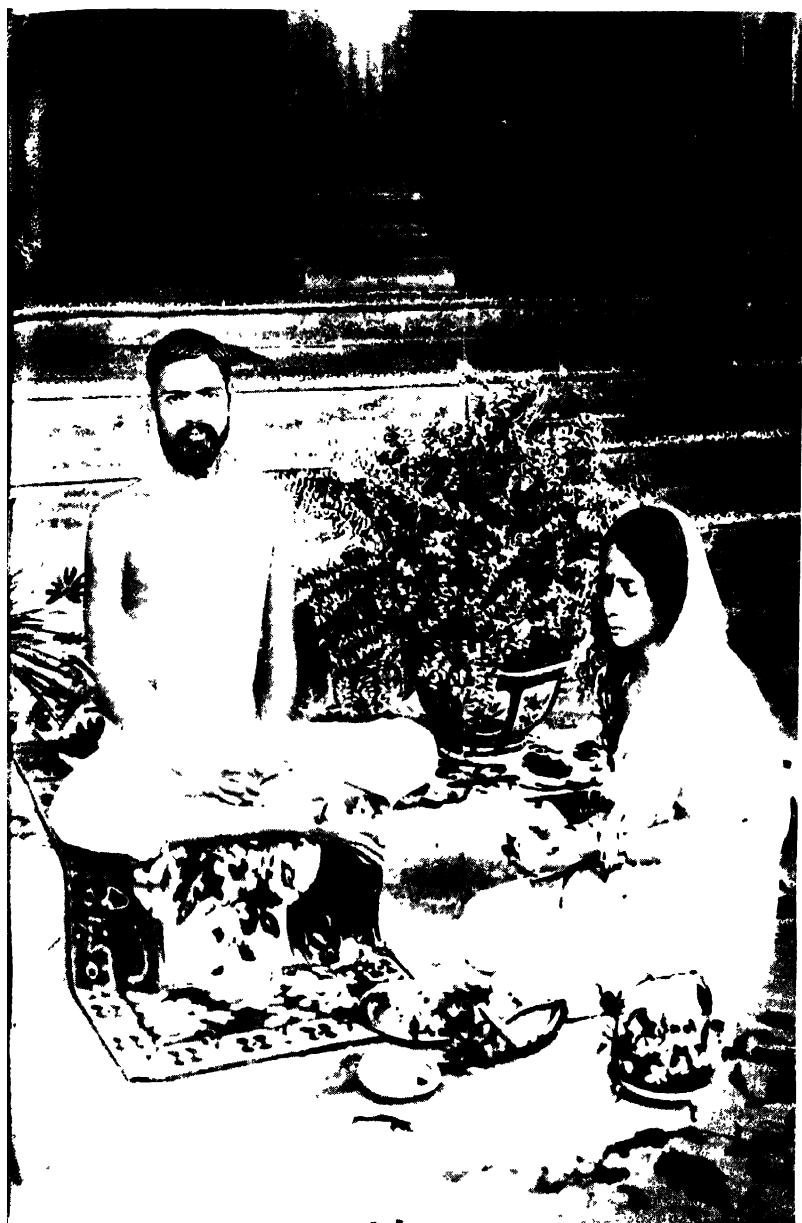
শ্রীশ্রীঠাকুর জিতেন্দ্রনাথ　　　　মাতাঠাকুরাণী

প্রধান। নিয়মিত ভাবে কিছু সময় সাধু সঙ্গ করলে অনেক কর্ম্মক্ষয় হয়ে যায়, মনের শক্তি বাড়ে এবং ক্রমশঃ সাধুতে ভালবাসা পড়তে থাকে, তখন আপনা আপনি কাজ হয়। **সাধুকে ভালবাসলে বা সাধুতে মন পড়লে আপনিই সাধুর ভাব আসবে, আপনিই বাসনা ক'মে আসবে ও ত্যাগ শিক্ষা করবে।** ভালবাসা হচ্ছে আত্মযোগ, ভালবাসা পড়লেই যোগ হয়ে গেল, এবং তখন সাধুর ভাব আপনি প্রবেশ করতে থাকে। **সাধু সঙ্গটাও কম সাধনা নয়।** নিয়মিত ভাবে সাধুর কাছে আসা, এবং ভালবেসে তাঁর সঙ্গ করা কি কম সাধনা? যারা সাধুকে ঠিক ঠিক ভালবেসে সঙ্গ করে তাদের ত আর কিছু ভাববার প্রয়োজন নেই। যদি বল, শুধু সঙ্গ করলেই কি সব হবে, আর কোন সাধনার প্রয়োজন হবে না? তা, তোমার ভাববার কি আছে? তুমি যখন ভালবেসে সাধুর কাছে আসছ তখন তিনি বুঝবেন তোমার এ ছাড়া অন্য কোন সাধনার দরকার হবে কিনা। তিনি যদি দরকার মনে করেন তোমায় দিয়ে সেই ভাবে সাধনা করিয়ে নেবেন।

আবার দেখ, এই সঙ্গও সকলে এক উদ্দেশ্য নিয়ে করে না। প্রয়োজনের ওপর সব নির্ভর করে। কেউ বা অর্থ, যশ, মান, প্রভৃতি সাংসারিক সুখের জন্য লালায়িত। যখন যে যেটার জন্য লালায়িত তখন সেইটাই তার কাছে সব চেয়ে প্রধান। আবার যখন সে সেটা ছেড়ে অপর একটার প্রয়োজন বোধ করে তখন সে ওটাকে ছেড়ে আবার এইটের জন্যে কত ছুটোছুটি করে এবং তার জন্যে যত বড়ই কষ্ট হোক আনন্দের সঙ্গে সহ্য করে। তা না হলে কি সংসারে অনবরত এত দুঃখ কষ্ট পেয়েও সেটা ধ'রে থাকতে পারে? দেখ, অর্থটাকে বড় ক'রে, সমস্ত দিন তার জন্যে দাসত্ব ক'রে, কত কষ্ট সহ্য ক'রে টাকা রোজগার করলে; আবার যখন বাড়ী তৈরী কর তখন সেই টাকা ঘর থেকে বের ক'রে দিয়ে ইঁট মাটি কিনছ।

কারণ তখন টাকার চেয়ে মাটির প্রয়োজন বেশী হয়ে পড়েছে। এই হচ্ছে মনের স্বভাব। প্রয়োজন হিসাবে ছোট বড় করছ। সেই রকম যে ভাবে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে সঙ্গ করবে সেই রকম ফল পাবে; 'যে ভাবে যে জন করয়ে ভজন, সেইরূপে তার মানসে রয়।' কোন সংসার বাসনা নিয়ে সঙ্গ করলে হয়ত সেটা কিছু ফলৃল ব'লে খানিকটা সুখ পেলে, কিন্তু তাতে ত আর দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে না। তা ছাড়া, তুমিত তা চাচ্ছও না। যদি দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইতে ত সমস্ত কামনা বাসনা ছেড়ে ত্যাগের পথে সাধনা করতে। তখন আর অপর কোন স্বার্থ নিয়ে সাধুকে ভালবাসতে না বা তাঁর সঙ্গ করতে না; কেবল তাঁকেই চাইতে, আর কোন দিকে লক্ষ্য রাখতে না। তখনই ঠিক সাধুসঙ্গ হয়। এইখানে ঠাকুর 'সনাতন ও পরশমণির' গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ২য়ভাগ ১৭২ পৃঃ)

ঠাকুর গাহিলেন—

মন চল নিজ নিকেতনে।
এ সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে কেন ভ্রম অকারণে॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সবই রে তোর পর কেউ নয়রে আপন।
পর প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন, ভুলিলি আপন জনে॥
সত্য পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ।
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যবল গোপনে অতি যতনে॥
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ পথিকের করে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন।
অতি সযতনে রাখরে প্রহরী, শম দম দুই জনে॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হ'লে তথা লভিও বিশ্রাম।
পথ ভ্রান্ত হ'লে সুধাইও পথ সে পান্থ নিবাসী জনে॥
যদি দেখ পথে ভয়েরই আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার।
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যার শাসনে॥

তৃতীয় ভাগ—দ্বাদশ অধ্যায়

কলিকাতা, রবিবার ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সাল ;
ইং ২১শে মে ১৯৩৩।

গোপেন। যুধিষ্ঠির ত সারাজীবন সত্য কথা ব'লে এল, কিন্তু সমস্ত জীবনটাই ত যতদূর কষ্ট ভোগ করবার করলে, শেষে একটু রাজত্ব ভোগ হ'ল। এতেই বোঝা যাচ্ছে সত্যের জয় নেই।

ঠাকুর। এই যে দুঃখ প্রভৃতির কথা বললে, এ ত জগতের নিয়ম। দেহ ধারণ করলে সুখ দুঃখ ভোগ করতেই হবে। ভোগের জন্যই দেহ ধারণ করা। এর সঙ্গে সত্যের কি সম্বন্ধ আছে? যুধিষ্ঠির সত্যের সাধনা করেছিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়, রাজত্ব প্রভৃতির ওপরও তাঁর মায়া ছিল। সত্যের উপলব্ধির জন্য সাধনা মানেই তখনও পূর্ণ উপলব্ধি হয় নি। উপলব্ধি হ'লে সুখ দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত। তা যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ সুখ দুঃখের ভেতর পড়তেই হবে।

গোপেন। সংসারে সত্য ও মিথ্যা দুইই আছে, কখনও সত্যের জয় হচ্ছে, কখনও বা মিথ্যার জয় হচ্ছে। তা এই ভাবে ত কাটাকাটি হ'য়ে যেতে পারে।

ঠাকুর। কাটাকাটি কি রকম ক'রে হবে? সত্য হচ্ছে নিত্য, তার ধ্বংস নেই। মিথ্যাটা আবরণ মাত্র, এই আবরণটাকে মিথ্যা বলেছে। আবরণ সরলেই সত্যের প্রকাশ ও উপলব্ধি হবে। কিন্তু এও গুণের ভেতর। মন যখন ত্রিগুণের পারে যায় তখন কিছুই থাকে না, কারণ তখন মনের লয় হয়ে যায়। সে যে কি অবস্থা তা বর্ণনা করা যায় না। তাই তাকে তুরীয়, অনির্ব্বচনীয় বলেছে, 'অবাঙ্‌মানস গোচরম্'।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে। সঙ্গই প্রধান। সদ্‌গুরুর সঙ্গে জন্ম জন্মান্তরের অনেক কর্ম্ম ক্ষয় হয় এবং মনের শক্তি বাড়ে ও ত্যাগ আসে। দুই প্রকারে মানুষ ত্যাগ করতে পারে, হয় বিবেক বৈরাগ্য সম্পন্ন হয়ে নয় অনুরাগে বা প্রেমে। বিবেক মানে হিতাহিত জ্ঞান আর বৈরাগ্য হচ্ছে সংসার বস্তুতে অশ্রদ্ধা। বিবেকের দ্বারা বিচার ক'রে দেখলে যে সংসারে শান্তি নেই, তখন সংসারের ওপর অশ্রদ্ধা আসে এবং ত্যাগ ক'রে চলতে থাকে। এখানে বিচারের ওপর গতি করে। প্রথমেই বিবেকটা ওঠা চাই, সেই বিবেক নিয়ে গিয়ে বৈরাগ্যের হাতে ফেলে দেবে এবং বৈরাগ্যই ত্যাগের দিকে অগ্রসর করিয়ে দেবে। কিন্তু অনুরাগে বিচার নেই, ভালবাসা পড়ায় আপনি সব ত্যাগ হয়ে যায়। **অনুরাগ বা প্রেমের লক্ষণই হচ্ছে ত্যাগ।** মন ত দুটো ধরে না। যখন সাধুর ওপর জোর ভালবাসা পড়ে তখন অপর দিক সব ছেড়ে আসে। সংসারের ভালবাসা প্রায়ই মায়াজনিত, কিন্তু এতেও দেখ, কিছু ত্যাগ রয়েছে। ছেলেকে ভালবাস ব'লে তার অসুখে এত কষ্টের টাকা অবাধে খরচ ক'রে ফেলতে কুণ্ঠিত হও না, এবং আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে কত রাত্রি তার কাছে ব'সে কাটাও। এই যে ত্যাগটা কর তার কারণ হচ্ছে তার ওপর কিছু ভালবাসা রেখেছ। তাই দিয়েছে, সাধুসঙ্গ। সাধুর ওপর ভালবাসা প'ড়ে, আপনত্ব হয় এবং সেই আপনত্বে তারাও এত আপন হয়ে যায় যে, সকল রকম কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার ক'রেও ছুটতে থাকে। ছোটে কেন? সাধুর কাছে ভালবাসা পায় ব'লেই ত ছোটে? সাধুর যদি এত লোককে দোবার মত ভালবাসা না থাকত তা হলে কি এত লোক তাঁর কাছে ছুটত না দাঁড়াতে পারত? কলসীতে একটুখানি জল থাকলে কি বহু তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলের আশায় সেখানে ছুটতে পারে? **সাধুর ভালবাসা অফুরন্ত ও নিঃস্বার্থ।** তাঁরা সমস্ত জগতকে ভালবেসে

আপন ক'রে নিতে পারেন, **কারণ তাঁদের মধ্যে স্বার্থ আর হিংসা নেই। সংসারীদের মন স্বার্থ ও হিংসায় ভরা। তারা ততক্ষণই ভালবাসতে পারে যতক্ষণ তাদের স্বার্থে ঘা না পড়ে, স্বার্থে একটু আঘাত লাগলেই সব চেয়ে আপনার লোকও পর হয়ে যায়।** আবার এই সংসারীই স্বার্থ ও হিংসা যত কমিয়ে আনে তত তার মনের উন্নতি হয় ও সেই পরিমাণ সে অপরকে ভালবাসতে পারে এবং শেষে স্বার্থ ও হিংসা শূন্য হয়ে গেলে তার সব ছেড়ে যায়। তখন তার ঠিক ঠিক ভালবাসা আসে।

মনের স্বভাব হচ্ছে, যখন যেটাকে জোর ক'রে ধরে তখন সেটার জন্য নানাপ্রকার কষ্ট স্বীকার করতে পারে। তোমরা সংসারী, এটা বেশ বোঝ, সংসারে রোগ, শোক, তাপ, ব্যাধির যন্ত্রণায় সর্ব্বদাই অস্থির হচ্ছ, তবু কি সেটা ছাড়তে পার; না, তার জন্যে বারমাস প্রত্যহ সমস্ত দিন খেটে টাকা রোজগার করতে কষ্ট বোধ কর? সমস্ত দিন কেন, আবার ওভার টাইমে বেশী পয়সা পাবে ব'লে সমস্ত দিনের খাটুনীর পর রাত্রেও বেশ হাসিমুখে খাটতে পার। কিন্তু খানিকক্ষণ ব'সে ধর্ম্ম চর্চ্চা করতে কষ্ট বোধ কর, আর এক ঘণ্টার জায়গায় দুঘণ্টা হলেই ত ছটফট্ করতে থাক। তাই বলেছে, সংসারের রোগ, শোক, তাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাও ত মনের শক্তি বাড়াও। সংসারটা কণ্টকময়; তা ব'লে তুমি যে সমস্ত জগতটাকে চামড়া দিয়ে ঘিরবে যাতে তোমার পায়ে কাঁটা না ফোটে এ ত চলে না; বরং তুমি নিজের পা চামড়া দিয়ে মোড়, আর কাঁটা বিঁধবে না। সংসারে তোমার ছেলে মেয়ে পরিবার সব অমর হয়ে থাকবে, সংসার থেকে রোগ, শোক, তাপ, ব্যাধি সব উঠে যাবে, এ ত জগতের নিয়ম নয়। জগতে সবই থাকবে, তোমার মন এমন তৈরী কর যাতে প্রকৃতির এই সব ধাক্কায় তোমাকে না টলাতে পারে।

ঝড় আসবেই, কিন্তু যে গাছের শেকড় খুব মাটীর ভেতর প্রবেশ করেছে, তার কিছুই করতে পারবে না। **এই শেকড় হচ্ছে গুরুতে ভালবাসা ও বিশ্বাস।** তোমরা সংসারী, তোমরা ত সাধন ভজন ক'রে মনের শক্তি বাড়াতে পারবে না। তাই, তোমাদের একমাত্র উপায় সদ্‌গুরুর সঙ্গ। আর এইটেই খুব সহজ উপায়। **ত্যাগ ভিন্ন কিছুতেই শান্তি আসবে না, আর সাধুসঙ্গে আপনা আপনি এই ত্যাগ আনিয়ে দেয়। সংসারীর সঙ্গে ব্যবহার মানেই আপন আপন ঠাট বজায় রাখা; কেউ কাউকেও যথার্থ ভালবাসে না, প্রত্যেকেই আপন আপন স্বার্থ খুঁজছে এবং তার একটু এদিক ওদিক হলেই গোলযোগের সৃষ্টি।** তখন সবাই বলবে যে সে ঠিক করছে, কিন্তু কে যে ঠিক করছে তার বিচারের জন্য আবার অপর লোক চাই। তবে, এ স্থলে দেখা দরকার যে তোমার ব্যবহারে অপরের প্রকৃত ক্ষতি হচ্ছে কি না, বা তুমি তার আত্মাকে কোন কষ্ট দিচ্ছ কি না। বাসনার বিরুদ্ধ হলেই অবশ্য কষ্ট পাবে, কিন্তু দেখ সেটা প্রকৃত আত্মার কষ্ট কি না। এই ধর, তুমি একজনকে ভালবাস, সে যদি চায় যে তাকে ছাড়া আর কাউকেও তুমি ভালবাসতে পাবে না; এখানে তুমি অপরকে ভালবাসলে সে যে কষ্ট পাবে সেটা হিংসা জনিত কষ্ট, বাস্তবিক এতে তার আত্মার কোন কষ্ট হচ্ছে না বা তার নিজের কোন ক্ষতি হচ্ছে না, কেননা তুমি অপরকে ভালবাসছ ব'লে ত তার ওপর ভালবাসা কমিয়ে দাওনি। যদি ভোগবাসনার কোন জিনিষ তার মেটাতে না পার, তার জন্যে যে কষ্ট হ'ল সেটা ত প্রকৃত তার ক্ষতিজনক নয়। শুধু অজ্ঞানবশতঃ সে দুঃখ পাচ্ছে। তার আবার যখন জ্ঞান হবে সে আপনিই বুঝবে যে তার আব্দারটা অন্যায় হয়েছিল। **তুমি**

যখনই ত্যাগের পথে যাবে তখন কোন ভোগের জিনিষ ছাড়লেই তোমার আত্মীয়রা দুঃখ পাবে। তাদের দুঃখে পাওয়া ঠিক নয়, আবার তোমার ছাড়াটাও অন্যায় নয় কারণ তুমি নিত্য জিনিষের দিকে মন দিয়ে অনিত্যকে ছাড়বার চেষ্টা করছ। সংসারে মনের শক্তি কিছু না হ'লে, এই সব ঠিক বজায় রেখে চলা বড় শক্ত। যশ, মান, অর্থ, সম্পদ মানুষকে এত অন্ধ ক'রে ফেলে যে খুব মনের শক্তি নিয়ে কাজ না করলে, সংসারে গুরু, লঘু সব ঠিক বিচার রাখা প্রায় অসম্ভব। সংসারে থেকে যারা তাঁকে ডাকে, তারা বেশীর ভাগই আর্ত্ত হয়ে ডাকে; এই আর্ত্ত দুইপ্রকার, এক হচ্ছে খণ্ড আর্ত্ত, হঠাৎ কোন বিপদে পড়েছে সেটা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে তাঁকে ডাকে, কিন্তু যেই বিপদ কেটে যায় অমনি ভুলে যায়, তখন আর তাঁকে ডাকে না। এখানে ঠাকুর "ছেলের অসুখে কালীঘাটে ধন্না দেওয়ার ও জোড়া মোষের বদলে ফড়িং ধ'রে খাওয়ার" গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ২য় ভাগ ২৫৫ পৃষ্ঠা)। আর এক হচ্ছে, সংসারের দুঃখ কষ্টে ঠিক বুঝতে পারে যে তিনি ছাড়া কেউ শান্তি দিতে পারে না, এবং সেই জন্যে তাঁকে ডাকে। তখন সে বুঝতে পারে যে জগতে কারুর কোন ক্ষমতা নেই, তিনিই একমাত্র শান্তি দাতা, এবং তিনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন।

এর একটী গল্প আছে—

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উপস্থিত। তার নিজের এমন অবস্থা নয় যে সে কন্যাটী পাত্রস্থ করে এবং তার আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব সকলের কাছেই চেষ্টা করলে কিন্তু কেহই বিশেষ কিছু করলে

না। এমন কি ধনী আত্মীয় স্বজন কাহারও দ্বারা কোন রকম সাহায্য ত পেলে না, আবার উল্টে তারাই মেয়ের বিয়ে দিতে পাচ্ছে না ব'লে কত গঞ্জনা দিতে লাগল। আগেকার দিনে মেয়ের বিয়ে একটা মস্ত সমস্যা ছিল, এবং মেয়ের বয়স ৯।১০ বছর হয়ে গেলেই মেয়ের বাপকে বিয়ের জন্য কত ছুটোছুটি করতে হ'ত। তখন সমাজেরও এত পীড়ন ছিল যে অনেক সময় নিরুপায় হয়ে সমাজ শাসনের ভয়ে বাপ যাকে তাকে ধ'রে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তখনকার মত যেন মস্ত দায় থেকে উদ্ধার পেত; কিন্তু পরিণামে অনেক স্থলে হয়ত মেয়েটীর ভবিষ্যতে এত দুর্দ্দশা হ'ত যে বাপকেই আবার আজীবন সেই মেয়ের ভার বইতে হ'ত। এখন সমাজ অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছে এবং মেয়েদের বয়স হলে বিয়ে হচ্ছে। তা ছাড়া, কোন কোন জায়গায় মেয়েরা পর্য্যন্ত ছেলেদের মত বিয়ে কর্ত্তে রাজী হচ্ছেনা, কারণ তাদের বয়েস হয়েছে, তারা চারদিকের অবস্থা দেখে বুঝছে যে, দিনকাল যে রকম পড়েছে তাতে যদিও বা কোন রকমে স্বামী স্ত্রী দুটো পেট চালাতে পারা যায়, কিন্তু ছেলে মেয়ে হ'লে তাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করার খরচ জোগাড় করা খুব শক্ত। এমন অনেক দেখতে পাওয়া যায় যে ছোট ছেলে মেয়েদের দুধ খেতে দিতে পারেনা ব'লে শুধু পাতলা জল সাবু খাইয়ে যেন কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখে মানুষ করে। তাই এই দুর্দ্দিনে পিতা মাতারও উচিত হচ্ছে, ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মনীতি ও সংযম শিক্ষা দেওয়া এবং পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থা বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে যত দিন না তারা স্বেচ্ছায় বিবাহ ক'রে সংসারে ঢুকতে চাইবে ততদিন যেন, জোর ক'রে বিবাহ না দেওয়া। বরং যে সব ছেলে মেয়েরা ত্যাগনীতি নিয়ে চলবার কিছুমাত্র ইচ্ছা ও চেষ্টা দেখায় তাদের সেই দিকে সাহায্য ক'রে সেই ভাবের অনুকুল সৎসঙ্গ বা সদগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতির যোগাযোগ ক'রে দেওয়া উচিত, যাতে তাদের মন আরও জোর ক'রে সেই দিকে লেগে ত্যাগের ভাবটা বাড়াতে পারে। এ হলে পিতা মাতা যথার্থই পিতামাতার কাজ করলে, তা নইলে মায়ায় অন্ধ

হয়ে ঠিক কর্ত্তব্য কি বুঝতে না পেরে অনেক সময় ঘোর দুঃখ ও অশান্তিতে পড়ে। তবে যাদের ভোগের দিকে যাবার ইচ্ছে তাদের পক্ষে আলাদা, কারণ বিবাহ না দিয়ে তাদের সংসারে রক্ষা করা বড়ই কঠিন।

সেই ব্রাহ্মণ যখন কিছুতেই কিছু করতে পারলে না তখন আত্মীয় কুটুম্বের গঞ্জনা আর সহ্য করতে না পেরে ঠিক করলে যে, শেষ চেষ্টা বিশ্বনাথের কাছে হত্যা দেবে, কারণ সে শুনেছে সংসারে নিরুপায় হয়ে ভগবানকে কাতর ভাবে ডাকলে অনেক সময় তিনি দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেন। সেই আশায় ঐ ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথের কাছে হত্যা দিলে। দুদিন অনাহারে প'ড়ে থাকার পর এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী এসে জিজ্ঞাসা ক'রলে 'হ্যাঁ বাছা, তুমি এখানে এমন ভাবে প'ড়ে রয়েছ কেন?' তখন সেই ব্রাহ্মণ বললে, 'আর মা! আমি মেয়ের বিয়ের টাকা কিছুতেই জোগাড় করতে না পারায় শেষ বিশ্বনাথের কাছে ধন্না দিয়িছি; যদি তিনি কিছু ব্যবস্থা ক'রে দেন ভাল, নয়ত এ দেহ আর রাখব না, গঙ্গায় ডুবে মরব, কারণ আর লোকের গঞ্জনা সহ্য করা যায় না।' বৃদ্ধা বললে, 'এই! তা এর জন্য এত কষ্ট করছ কেন? যাও, হালিসহরে আমার এক ছেলে আছে নাম রামপ্রসাদ, তার কাছে গিয়ে বললেই সে তোমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে দেবে।' এই কথা শুনে ব্রাহ্মণের মনে আশা হ'ল। তখন রেল হয়নি, কোথায় কাশী কোথায় হালিসহর এই পথ হেঁটে রাস্তায় কত কষ্ট সহ্য করে সে হালিসহরে এসে উপস্থিত হল। কারণ এটা মনের স্বভাব, মন যখন যেটাকে জোর ক'রে ধরে তার জন্যে যত রকম দুঃখ কষ্ট হোক অনায়াসে সহ্য করতে পারে। হালিসহরে এসে লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে রামপ্রসাদের বাড়ী বের করলে। বাড়ীর অবস্থা অতি শোচনীয়, বহুদিন মেরামত অভাবে চাল খ'সে পড়ছে। বাড়ীর অবস্থা দেখে ত ব্রাহ্মণ মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়ল এবং বললে 'বৃদ্ধা, আমি ত তোমার কোন অপকার করিনি, আমার সঙ্গে তোমার এরূপ শত্রুতা

করার কি প্রয়োজন ছিল। যার এমন অবস্থা, যে নিজের থাকবার বাড়ী মেরামত করতে পারে না, সে আমায় কি সাহায্য করবে? আমি কি না কষ্ট ক'রে এতদূর এসেছি, আবার ফিরে যাই কি ক'রে?' এখন মন ভেঙ্গে পড়ায় এই পথ ফিরে যাওয়ার কষ্ট ভয়ানক বোধ হচ্ছে। আবার ভাবলে, এতদূর যখন এসেছি একবার জিজ্ঞাসা করেই যাই। এই ব'লে সেই বাড়ীর দরজায় গিয়ে রামপ্রসাদকেই জিজ্ঞাসা করলে রামপ্রসাদ কার নাম। তখন রামপ্রসাদ বললেন আমারই নাম রামপ্রসাদ, কি দরকার?' ব্রাহ্মণ বললে 'আমি আমার মেয়ের বিয়ের টাকা জোগাড় করতে না পেরে বিশ্বনাথের কাছে হত্যা দিয়াছিলাম, এক বৃদ্ধা এসে আমায় বললে হালিসহরে আমার এক ছেলে আছে নাম রামপ্রসাদ, তার কাছে গেলেই সে ব্যবস্থা ক'রে দেবে। তা আমি অনেক কষ্ট ক'রে এতদূর এসেছি।' শুনে রামপ্রসাদ ভাবলেন, তিনি কি আমার অবস্থা জানেন না তত্রাচ আমার কাছে পাঠালেন! পরক্ষণেই আবার মনে হ'ল, তিনি যখন এতদূর থেকে আমার নাম জেনে একে পাঠিয়েছেন তখন তিনিই সব ঠিক ক'রে রেখেছেন আমি ভাবি কেন? অমনি বলছেন 'ব্রাহ্মণ ব'সো, ভেবোনা যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' ব্রাহ্মণ শুনে একটু আশ্বস্ত হয়ে বসল। রামপ্রসাদ তখন গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছিলেন, তিনি নাইতে যাবার পথে গান বাঁধতেন। সে দিন জলে নেবে চান করতে করতে এই গানটী গাইছেন

সকলই তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার ইচ্ছায় সকলই হয় মা লোকে ভাবে করি আমি॥

এমন সময় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভাউলে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। গানটী শুনে রাজার এত ভাল লাগল যে তিনি নৌকা ফিরিয়ে এনে বললেন আপনার গানটী আমার বড় ভাল লেগেছে, অনুগ্রহ ক'রে যদি আর একবার গান। রামপ্রসাদ আবার গাইলেন।

সকলই তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার ইচ্ছায় সকলই হয় মা লোকে ভাবে করি আমি॥

গানটী শুনে রাজা বললেন 'দেখুন আপনার এ গান অমূল্য, এর জন্যে আর কি দোব। তবে আমার মনে বড় ইচ্ছে হচ্ছে, আপনাকে কিছু দিই।' এই ব'লে এক তোড়া মোহর তুলে রামপ্রসাদকে বললেন, 'এটা আপনাকে দয়া ক'রে নিতেই হবে।' তখন রামপ্রসাদ বললেন 'আচ্ছা, আজ আমারও প্রয়োজন আছে।' সেই মোহরের তোড়াটী নিয়ে ফিরে এসে ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন, 'এই নাও ব্রাহ্মণ, তোমার মেয়ের বিয়ের টাকা।' ব্রাহ্মণ টাকা পেয়ে আনন্দে ফিরে গেল। পথে যেতে যেতে ভাবছে যারা আমার আত্মীয়, যাদের টাকা যথেষ্ট আছে, যাদের দেওয়া সম্ভব তাদের কারুর কাছ থেকে ত কিছু হ'ল না, আর এই লোক, এর ঘর ভেঙ্গে পড়ছে, এর মারফৎ তিনি আমায় দিলেন! আর এও ত টাকার ওপর কিছুমাত্র লোভ না দেখিয়ে অনায়াসে সব টাকা গুলো দিয়ে দিলে! তখন তার কিছু চৈতন্য এসেছে, সে ভাবলে তাহলে মানুষের ওপর আশা রেখে কোন লাভ নেই; তাঁকে ধরলে আর কোন অভাব থাকে না; তিনি ইচ্ছে করলে সবই করতে পারেন। আর, এই রামপ্রসাদ টাকার চেয়ে এমন কি বড় জিনিষ নিয়ে আছে যে নিজের বাড়ী ভেঙ্গে পড়ছে, টাকা অভাবে মেরামত হচ্ছে না, তত্রাচ সে দিকে নজর না দিয়ে যা পেলে সমস্তটাই আনন্দের সহিত আমায় দিয়ে দিলে, একবার চিন্তাও করলে না! ব্রাহ্মণের মন তখন ঘুরে গেছে, সে ভাবলে বাড়ী গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে আর সংসারের ভেতর থাকবে না কেননা সংসারটা সে বেশ ভাল ক'রে বুঝে নিয়েছে। তাই, মেয়ের বিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। তা দেখ, ঠিক আর্ত্ত হয়ে একবার তাঁকে ডাকলে আগেকার মত সে আবার সংসারে বদ্ধ হতে পারে না। তখন তিনি তাকে ধ'রে নেন এবং সে ক্রমশঃ তাঁর দিকে গতি করে।

আর, রোগ, শোক, তাপ প্রভৃতি সংসারে ত দুঃখ দেয়ই কিন্তু সংসারীরা এত দুর্ব্বল যে অনেক সময় অপরে কি বলবে

শুধু তারই ওপরে দাঁড়িয়ে কাজ করে। আত্মীয়, স্বজন যার যা ভাব একটা না একটা কিছু বলবেই, আর সেই কথায় জোর দিয়ে অনেক সময় লোকে যা তা ক'রে বসে আর দুঃখ ভোগ করে। এই মেয়ের বিয়ের ব্যাপারেই দেখলে ত টাকা না দিলে মেয়ের বিয়ে হবে না; সমাজ তার কোন ব্যবস্থা করবে না অথচ বাপ মাকে কথা শোনাতে ছাড়বে না। আর মানুষ এত দুর্ব্বল যে লোকের গঞ্জনার ভয়ে নিজের মেয়েটাকেই অনেক সময় জেনে শুনে দুঃখের সাগরে ফেলে দেয়। তাই বলেছে, মনের শক্তি বাড়াও, যাতে এই সামান্য ঝড় ঝাপ্টাতে না ভেঙ্গে পড়। সাধুসঙ্গে আপনা আপনি এই মনের শক্তি বাড়ে। সদ্গুরু ভালবেসে আপন ক'রে নেন। তাঁর কাছে ধনী, নির্ধনী, রাজা, প্রজা নেই; তিনি সকলকেই ভালবাসেন, কেউ তাঁর পর নেই; ভালবেসে এলেই যার যার নিজের ভাবের ভেতর দিয়ে তাদের গতি করান। তাই পরমহংসদেব সকলকে আপন ক'রে নিয়ে ডাকতেন, আর তারাও সেই আপনত্বে ছুটে আসত।

ঠাকুর গাহিলেন—

(ওগো) আমি তোমারে করেছি সার।
যত বাধা আসুক বাদ সাধিতে, আমি কভু না ভুলিব আর ॥
আমি কভু না ছাড়িব আর ॥

সুখ দুঃখ সব তুচ্ছ করেছি, মান অভিমান মুছিয়া ফেলেছি।
ঘৃণা লজ্জা ভয় দূরেতে রেখেছি, আমি যে হয়েছি তার ॥
প্রেমের বাঁধনে বেঁধেছি তোমারে, তুমি যে আমার জেনেছি এবারে।
ভাল মন্দ সব দিয়াছি তোমারে, তোমায় করেছি গলার হার ॥
সুদূর প্রান্তরে নিকটে বা থাকি, প্রাণের ভিতরে তোমাকে ত রাখি।
ও রূপ সুন্দর সতত নিরখি, বিচ্ছেদ নাহিক যার ॥
ওগো বিচ্ছেদ হবে না আর ॥
শয়নে স্বপনে থাকি তব ধ্যানে, অপার আনন্দ তোমার স্মরণে।
থেক কাছে কাছে জীবনে মরণে, আমি তাই বলি বারেবার ॥
সব ছেড়ে গেছে ভুলনিক তুমি, তাই মন প্রাণ সঁপিয়াছি আমি।
তোমারি প্রেমের সতত বাথানি, নারিব শুধিতে ধার ॥

তৃতীয় ভাগ—ত্রয়োদশ অধ্যায়

কলিকাতা, মঙ্গলবার ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সাল।

ইং ২৩শে মে ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর কথা হইতেছে।

জনৈক ভদ্রলোক। সঙ্গ করলেই কি সব হয়ে গেল? তার আর সাধন ভজন প্রয়োজন হয় না?

ঠাকুর। হ্যাঁ, **ঠিক সঙ্গ করলে, অর্থাৎ মন প্রাণ দিয়ে সঙ্গ করলে তার আর সাধন ভজন দরকার হয় না;** শুধু দেহটা সঙ্গ করলে তত কাজ হয় না। তুমি এখানে ব'সে আছ, কিন্তু মনে অপর চিন্তা করছ, তখন তোমার দেহটাই কেবল সঙ্গ করছে, মন কিন্তু অপর সঙ্গ করছে। তবে, দেহ দিয়ে যে সঙ্গটা কর, সেও মন্দের ভাল, কারণ এখানে ব'সে থাকলে মাঝে মাঝে মন পড়বেই ও সেই সময়টুকু কিছু সঙ্গ হবে। এই ভাবে চেষ্টা করতে করতে ক্রমশঃ মন এই দিকে এসে পড়ে। তাই বলেছে **সাধুসঙ্গ একপ্রকার সাধনা; আর সংসারীদের পক্ষে এইটাই সহজ এবং একমাত্র সাধনা।** এই সঙ্গ করতে করতে ভালবাসা লেগে যায়, তখন আর সে ছেড়ে যেতে পারে না। **যার পূর্ণ ভালবাসা এসে গেছে তার কথা আলাদা; তার মন সর্ব্বদাই এইখানে প'ড়ে আছে এবং সর্ব্বদাই সঙ্গ করছে।** সে আহার, নিদ্রা, দেহসুখ সব ছেড়ে ছুটছে, তখন তার আপনি কাজ হতে থাকে, তার আর কোন রকম সাধন ভজন দরকার হয় না। সাধুর ভাব আপনি তার ভেতর আসে ও ক্রমশঃ মিশে এক হয়ে যায়। যেমন আরশুলা গুলো কাঁচ

পোকার চিন্তা করতে করতে কাঁচ পোকা হয়ে যায়। মারীচ সর্ব্বদা রাম চিন্তা করতে করতে রামে মিশে গেল। এরা যে সাধন ভজন করে সেটা প্রেমে; এই নাম করতে তাদের আনন্দ হয়। যেমন মায়ের কোলে শুয়ে ছোট ছেলে 'মা' 'মা' ব'লে হাত, পা ছুঁড়ে খেলা করে। তবে এ, সব আধারে হয় না। সাধারণ মন অন্যদিকে ছড়িয়ে আছে এবং বহু অসার জিনিষ ধ'রে আছে, তা থেকে জোর ক'রে ফিরিয়ে এনে সঙ্গ করাতে হয়। এদের গুরু উপদেশ অনুযায়ী কিছু সাধন ভজন করতে হয় এবং নিয়মিত সঙ্গও করতে হয়।

জঃ ভঃ। তা হলে গুরু লাভ হলেই হয়ে গেল ত?

ঠাকুর। হ্যাঁ, ঠিক লাভ হ'লে হয়ে গেল। গুরুত আছেই কিন্তু তোমার সে বোধ কই? **তুমি যদি ঠিক বুঝতে পার যে গুরুর আশ্রয় পেয়েছ তবে ত হয়ে গেল।** গুরু ত নিত্য; তাই বলেছে গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেব মহেশ্বর। তিনি ত সকল সময় সকলেরই গুরু, তবু কি তোমরা ঠিক বুঝতে পার? মার কোলে যখন ঘুমোও তখন কি জ্ঞান থাকে যে মার কোলে শুয়ে আছ? বরং সময়ে সময়ে 'মা' ব'লে চিৎকার ক'রে কেঁদে ওঠ। তেমনি **তিনি ত জগদ্‌গুরু কাজেই তোমারও গুরু।** এ কথা শুনেও কি তোমার ঠিক বোধ আসছে? **যখন সেটা ঠিক বোধ আসবে তখন ত হয়ে গেল। এই বোধ আনার জন্যেই না সাধনা।** আবার দেখ, দীক্ষা হলেই যে হয়ে গেল, তা নয়। কলেজে নাম লিখিয়েছ বলেই কি তোমার এম্ এ পাশ করা হ'য়ে গেল? হয়ত একই মাষ্টার আই, এ, বি, এ এবং এম্, এ ক্লাসে পড়াচ্ছেন; তাই ব'লে তুমি সেই মাষ্টারের কাছে আই, এ, পড়ছ ব'লে কি এম্ এ পাশ ক'রে ফেল্‌লে? ঐ সব ক্লাসে পর পর প'ড়ে পাশ ক'রে বেরুতে হবে তবে ত হবে। তা ছাড়া, একই ক্লাসে

একই মাষ্টারের কাছে অনেক ছেলে পড়ছে তার মধ্যে কেউ ফার্ষ্ট হচ্ছে, কেউ সেকেণ্ড হচ্ছে, কেউ সাধারণ পাশ করছে আর কেউ বা ফেল হচ্ছে। সেই রকম, যার যেমন আধার সেই মত কাজ হবে। নদীর ধারে গেলেই কি সকলে সমান জল তুলে আনতে পার? যার যেমন শক্তি এবং পাত্র (আধার) সে সেই পরিমাণ জল নিতে পারে। কারুর ঘট, কারুর বা কলসী, আবার কারুর হয়ত জালা। নদীর কিন্তু জল দিতে কোন আপত্তি নেই। তাই হচ্ছে, **যার মনের ভেতর যত ফাঁক অর্থাৎ যত সংসার বাসনা কম সে তত পরিমাণ বেশী গ্রহণ করতে পারবে।** এই জন্যই সদ্‌গুরুসঙ্গকে এত বড় করেছে। **পরমহংসদেব বলতেন 'ওরে সাধুর কাছে যতক্ষণ থাকবি ততক্ষণ বর বরযাত্রীর মত থাকবি, খুব আনন্দ করবি, কোন চিন্তা রাখবি নি'। সদ্‌গুরুর কাছে থাকলে কিছু করবার দরকার হয় না; তবে দূরে থাকলে তাঁর উপদেশ অনুযায়ী নীতি খুব জোর ভাবে ধ'রে থেকে সে গুলি পালন করবার চেষ্টা করবে। যার প্রেম লেগে গেছে তার কথা আলাদা, তার আর নীতি থাকে না; সে দূরে থাকলেও সর্ব্বদা গুরু চিন্তা নিয়ে থাকে এবং তাইতেই তার সব কাজ হয়ে যায়; কিন্তু যতক্ষণ না প্রেমটা লাগছে ততক্ষণ নীতি পালন করা খুব দরকার।**

কেষ্ট আসিল।

ঠাকুর। কেষ্ট কেমন আছ?

কেষ্ট। আজ্ঞে, ঠাকুর, ভাল আছি। তবে কিনা বড় রাত্তির হচ্ছে সেই জন্যে বড় কষ্ট হয়।

ঠাকুর। তাইত কেষ্ট! এদিকটায় বড় কষ্ট হচ্ছে। সংসারটায় কেষ্টর বেশ মন লেগেছে কিন্তু এদিকটায় এখনও তত মন লাগেনি।

কেষ্ট। কেন ঠাকুর! আর, সংসারটায় মন কি কখনও ছিল না?

ঠাকুর। এখন বেশ পাকা হয়ে গেছে। ন্যায়, অন্যায় কিছুতেই আর মনে ধাক্কা লাগে না।

কেষ্ট। ঠাকুর, এদিকে জোর টান আসে কি ক'রে? চেষ্টা ত এত করছি, কিন্তু কই, পারছি না যে?

ঠাকুর। সেই জন্যই ত সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গের কাজই হচ্ছে, জন্ম জন্মান্তরের অনেক কর্ম্ম ক্ষয় ক'রে মনটাকে এই দিকে নিয়ে আসে। তাও ত এখানে বসতে চাও না। 'রাত্রি হয় ব'লে কষ্ট হচ্ছে' প্রভৃতি নানা আপত্তি ক'রে সকাল সকাল চ'লে যাবার চেষ্টা কর। এখানে, যেটা তোমরা অনিয়ম বল সেটাও নিয়ম। নিয়ম মানে সময়টাকে ভাগ ক'রে ফেলে কাজ করা। তা যে কেবল বেলা ৯টা, ১০ টায় খেলেই নিয়ম হ'ল, নইলে নয়, সেটা হতে পারে না। প্রতিদিন বেলা ১০টায় খাওয়া আর প্রতিদিন বেলা ১টায় খাওয়া একই হ'ল না কি? দুয়েরই ত সেই ২৪ ঘণ্টার তফাৎ। বরং সংসারে কোন দিন গল্পে বা খেলায় জ'মে গেলে বা ছুটীর দিনে দেরী হয়ে যায়। আর দেখ, মঠে থাকলে মনটা স্বতঃই প্রফুল্ল থাকে, কারণ সংসারের ঝঞ্ঝাট ত আর এখানে পৌঁছায় না, আর মন প্রফুল্ল থাকলে শরীর আপনিই ভাল থাকবে। তা ছাড়া, মঠে থাকায় অনেক কর্ম্ম ক্ষয় হয় ব'লে, কর্ম্মজনিত যে শরীর খারাপ হয় সেটা হতে পারে না। যেবার কাশীতে একলা গিয়ে কেউ মঠে থেকেছে সেবার সে বেশ ভালই থেকেছে, আবার সেই যখন কাশীতে পরিবার নিয়ে গিয়ে বাসা ভাড়া ক'রে নিয়ম ক'রে থেকেছে সেবার অসুখ নিয়ে এসেছে। তোমাদের যে একটা

সুরূপা

ধারণা, মঠে থাকলে অনিয়মে শরীর খারাপ হবে, সেটা ভুল; কেননা, মঠে একটা শক্তির খেলা থাকে, তার দ্বারা সব ঠিক রেখে দেয়।

ললিত। জোর টান হ'লেই যে বেশী ক্ষণ এখানে থাকতে হবে তা কেন? ঘরে ব'সে স্মরণ মনন করলেও ত হতে পারে। রোজ ঠিক এখানে আসবার সময় হলেই খুব একটা জোর ইচ্ছা হয়, আবার যদি কোন দিন কোনও বিশেষ কাজে আটকে না আসতে পারি ত মনটা খুব জোর ছট্‌ফট্ করে। তা ছাড়া, সমস্ত ক্ষণই ত আপনার স্মরণ মনন করছি।

ঠাকুর। খুব ভাল, তুমি যে আমায় ভালবাস না তা ত বলছি নি। ভালবাস, চিন্তা কর সবই ঠিক; কিন্তু জোর টানের কথা বলছ কিনা? জোর টান কাকে বলে? টান মানেই মন সংসারের দিকে যেতে চাচ্ছে না, তবু জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে—বলাদিব নিয়োজিত। আর সেই টান যখন খুব জোর হয়, তখন মন ত প্রায় সব সময়ই এইখানে প'ড়ে থাকে, অপর জিনিষে খুব কম থাকে, অর্থাৎ যেটুকু নইলে নয়। এখন এই অবস্থা বুঝব কি ক'রে? দু'জনে পাশাপাশি ব'সে আছ, একজন সাধারণ ভালবেসে এসেছ, আর একজন খুব জোর টানে এসেছ। দু'জনেই অল্পক্ষণ পরে চ'লে যাবে, তবে যার জোর টান, সে না হয় বাড়ী গিয়েও সেই জোর টানে স্মরণ মনন করবে। এ দু'জনের মধ্যে কার জোর টান কি ক'রে বুঝব? কি লক্ষণ? বাড়ী ব'সে স্মরণ মননের লক্ষণ ত আর এখানে দেখতে পেলুম না। তা হয় না। যার জোর টান লেগেছে সে এই দিকটাই বড় করেছে। সে এদিক ছেড়ে যেটা কম ভালবাসে সে দিকে যাবে কেন? মনের স্বভাব হচ্ছে যেটা জোর ক'রে ধরে, সেই দিকেই বেশী প'ড়ে থাকে, অপর দিক তার ছোট হয়ে যায়। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে মনটা কোথায় বেশী প'ড়ে আছে। যতদিন ছেলে মানুষ করতে থাকে বা মেয়ের বিয়ে দিতে বাকী থাকে, ততদিন ত খাটতে হবেই,

নইলে টাকা না আনলে এ সবগুলো করবে কি ক'রে? তখন বাহ্যিক কিছু মায়ার বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কর্ত্তব্যও রয়েছে। ইচ্ছা করলেও সব সময় ছাড়তে পারে না। কিন্তু যেই ছেলে উপযুক্ত হ'ল, ও মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল, কর্ত্তব্য অনেকটা ক'মে গেল, তখন কেবল দু'বেলার দু'মুঠোর ব্যবস্থা ক'রে নিজের পাথেয় সঞ্চয় করা উচিত নয় কি? তাই শাস্ত্রে বলেছে 'পঞ্চাশ ঊর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ'।

জঃ ভঃ। আচ্ছা, কাশীখণ্ডে যে লেখা আছে—কাশীতে ম'লে মুক্তি হয়ে যায়—এটা কি ঠিক?

ঠাকুর। হ্যাঁ, কাশীতে ম'লে এই অবস্থা থেকে উর্দ্ধগতি হয়। তার মানে, স্থানের প্রভাবে কিছু উচ্চতা (promotion) আপনিই হয়ে যায়। একেবারে যে জন্ম হবে না তা নয়। তবে ঠিক সে অবস্থা পেতে গেলে একেবারে বাসনা শূন্য হওয়া চাই। তাই বলেছে—

মনে একান্ত বাসনা, ত্যজে বিষয় কামনা
পুণ্য বারাণসী ধামে চরমে বিশ্রাম করি।
সিদ্ধিদাতা মহেশ্বরে সর্ব্ব সমর্পণ ক'রে
নিশ্চিন্ত, নিঃসঙ্গ হয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করি॥

নিশ্চিন্ত, নিঃসঙ্গ হওয়া চাই, অর্থাৎ বাসনা, কামনা শূন্য হওয়া চাই, তবে ঠিক মুক্তি হবে। বাসনার লেশ থাকলে আবার জন্ম হবে। তবে স্থানের প্রভাবে কিছু কর্ম্মক্ষয় হয়ে যায় এবং বাসনা কিছু কমিয়ে দেয়। যেমন, কোন ধনীর বাড়ীতে লোক খাওয়ান হচ্ছে, যাদের নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছে, তাদের বাড়ীর মালিক ওপরে নিয়ে গিয়ে যত্ন ক'রে খাওয়ালে, কিন্তু নীচে অনেক গুলি কাঙ্গালী খেতে এসেছে, দরোয়ান অনেক তাড়া দেওয়াতেও যখন তারা সকলে চ'লে গেল না, কেউ কেউ ধন্না দিয়ে প'ড়ে রইল, তখন মালিক হয়ত ব'লে দিলেন 'আচ্ছা, ওদেরও খাইয়ে বিদেয় ক'রে দাও'। তেমনি কাশীখণ্ডে আছে কাশীতে ম'লে রুদ্রপিশাচের কাছে

শান্তি নিয়ে কর্ম্মক্ষয় হলে মুক্তি পাবে। তবে বিশ্বাস আলাদা জিনিষ। যার স্থির বিশ্বাস আছে যে কাশীতে ম'লেই মুক্ত হয়ে যাবে, তার কথা আলাদা। সে সেই বিশ্বাসের জোরেই মুক্তি পাবে। তাই আছে 'কাশীতে ম'লে মুক্তি, এ বটে শিব উক্তি, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী'। এ রকম সকল ধর্ম্মেই কিছু কিছু আছে, সেটা সংস্কার হিসাবে, সেই সেই ধর্ম্মের লোকেরা পালন ক'রে গতি করে।

জঃ ভঃ। বিশ্বাস হলেই কি হয়? ধরুন একটা পাত্রে বিষ আছে, আমি জানি না, আমি জল ব'লে স্থির বিশ্বাস ক'রে খেলুম, কিন্তু বিষের কাজ ত হবে?

ঠাকুর। এটা ত বিশ্বাস হ'ল না, এটা অজ্ঞানতা। বিশ্বাস বলতে যেমন প্রহ্লাদের ছিল; সে জানত যে সেটা বিষ, কিন্তু তার স্থির বিশ্বাস, যে, যখন সে হরির নাম নিয়েছে, তখন সেই নামের জোরে বিষ অমৃত হয়ে যাবে। স্থির বিশ্বাস মানে নিশ্চিন্ত! বিশ্বাসটা কিন্তু পরীক্ষা নয়। পরীক্ষা করতে গেলে হবে না।
এর একটা গল্প আছে।

এক বেঙ সাপকে বলছে 'দেখ, মানুষ বিশ্বাসের জোরেই মরে বা বাঁচে। তুমি যদি কাউকে জলের ভেতর কামড়াও আর আমি যদি সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে ভেসে উঠি, তার ঠিক বিশ্বাস হবে যে আমিই তাকে কামড়েছি এবং দেখবে সেই বিশ্বাসের জোরেই সে বেঁচে যাবে, তোমার বিষ কিছুই করতে পারবে না।'

এরপর যখন একজন পুকুরে স্নান করছে সাপ তার পায়ে কামড়ে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেঙ তার সামনে ভেসে উঠ্‌ল। বেঙকে দেখে সে ভাবলে, ও! বেঙটা আমার পায়ে কামড়ে দিলে! এই বিশ্বাস হওয়ায় সে কিছুই করলে না এবং স্নান হয়ে গেলে চ'লে গেল, মনে কোন চিন্তাই রাখলে না। তার ফলে সেই লোকটীর কিছুই হ'ল না, সে বেঁচে রইল।

আর একদিন বেঙটা একজনের পায়ে কামড়ে দিলে এবং সাপটা তখনই তার সামনে দিয়ে ভেসে গেল। সাপ দেখেই লোকটী ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠ্‌ল 'আমায় সাপে কামড়েছে!' এবং প'ড়ে গেল। পাশের অপর সকলে তৎক্ষণাৎ তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল, ঔষধাদি দিলে এবং সাপ কামড়ালে যা যা করা দরকার সমস্তই করলে; কোন ত্রুটি করেনি। তত্রাচ 'সাপে কামড়েছে' এই বিশ্বাসের ফলে সে কিছুতেই রক্ষা পেলে না, ম'রে গেল।

তা দেখ, স্থির বিশ্বাসের জোরে সাপের বিষ কিছুই করতে পারে না আবার বেঙের কামড়ে ম'রে যায়।

তৃতীয় ভাগ—চতুর্দ্দশ অধ্যায়

—০:*:০—

কলিকাতা; বৃহস্পতিবার ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সাল;
ইং ২৪শে মে ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর কথা হচ্ছে

অমূল্য। অনেক দিন আসব আসব মনে করি, কিন্তু আমরা অধম, কি ক'রে আপনার কাছে আসব তাই ভাবি।

ঠাকুর। প্রকৃতির মধ্যে উত্তম, অধম, ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, আলো, অন্ধকার এই দুই দুই থাকবেই। সাধারণ সকলেই উত্তম, অধম মিশিয়ে, তবে কম বেশী! একেবারে শুধু অধম, বা শুধু পাপী প্রকৃতির ভেতর থাকতে পারে না। ভাল, মন্দ মিশান থাকবেই। আর উত্তম হবে কখন? যখন প্রকৃতির বাইরে, অর্থাৎ প্রকৃতিকে বশ করেছ, প্রকৃতি আর তোমাকে

অধীন ক'রে চালাতে পারবে না। তখন প্রকৃতির সব ভাবের সঙ্গে মিশে চলতে পার কিন্তু প্রকৃতি তোমাকে বাঁধতে পারবে না। যেমন বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়ত ড্রেন বা পায়খানাও দেখে বেড়াতে পারে, তা ব'লে মেথরের কাজ দেখছে ব'লে সে মেথর হয়ে যায় না। সৎ-সঙ্গ কাদের জন্য? শুকদেব প্রভৃতি সৎলোক ত আপনিই গতি করবে, তাদের জন্য ত কিছু দরকার হয় না; কিন্তু অসৎ লোক নিজেরা গতি করতে পারে না ব'লে তাদের জন্যই সাধুসঙ্গ। যীশাশ বলেছেন 'আমি পাপীদের জন্যেই এসেছি, পুণ্যাত্মাদের জন্যে নয় কারণ তারা ত আপনি গতি করতে পারে।' অসৎ লোকই সৎ হবার জন্যে সৎসঙ্গ করবে। অসৎ লোক কারা? যারা কাম, ক্রোধ, লোভের অত্যন্ত বশীভূত ও হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, যারা নিজেরা অসৎ কার্য্য অর্থাৎ আত্মার অবনতি জনক কার্য্য করে এবং সৎ লোকের নিন্দা করে। আর সৎ লোক হচ্ছে যারা নিজেরা সৎ কাজ করে, সকলকে ভালবাসে ও আত্মার উন্নতিজনক কার্য্য করে।

অমূল্য। ইঞ্জিনিয়ার হবার উপায়টা ব'লে দিন। আমরা ত এ বিষয়ে একেবারে নিরক্ষর।

ঠাকুর। ইঞ্জিনিয়ার বল, ডাক্তার বল এ গুলো ত কিছু নয়। বেশী টাকা রোজগার করবার জন্যেই এইগুলো দরকার। দেখলে বিলেত গেলে বেশী টাকা রোজগার হওয়া সম্ভাবনা, অমনি বিলাত গেলে। মূলে হচ্ছে কিসে বেশী টাকা রোজগার হবে। যদি বলা যায় যে ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হলে আর পয়সা রোজগার হবে না, তখন দেখবে, কেউ আর ওদিক মাড়াবে না। তোমরা সংসারী, তোমাদের মন অর্থ, সম্পদ, যশ, মান প্রভৃতিতেই ম'জে আছে। কিসে এসব বৃদ্ধি পায় তারই সাধনা ২৪ ঘণ্টা করছ। যে ইঞ্জিনিয়ারের কথা বলছ, তা হবার চেষ্টা কই? সে প্রয়োজন বোধ করছ কোথায়? সংসারে থেকে ইঞ্জিনিয়ার হ'তে হ'লে সদ্‌গুরু সঙ্গ করতে ও তাঁর উপদেশ মত চলতে হবে। যে বস্তুর জন্য

প্রয়োজন বোধ কর সেই মত সাধনা কর, তার কিছু ফলও পাও। তেমনি এর জন্যে প্রয়োজন বোধ কর যদি, তাহলে সেই ভাবে চল, সেই ভাবে সঙ্গ কর এবং সাধনা কর। জ্ঞান অনুযায়ী প্রয়োজন আসবে। আবার যেমন জ্ঞান বদলাবে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনও বদলাবে। ছেলেবেলায় চুষুম কাঠি, ঝুমঝুমিরই প্রয়োজন থাকে; তার জন্যে হয় ত কেঁদে অস্থির হ'লে। আবার বয়েস হলেই যেমন জ্ঞান বাড়ল, অমনি প্রয়োজন ব'দলে গেল। তখন সেই অর্থ, যশ, মানকে বড় করলে। তারপর জ্ঞান যখন আরও বাড়ে, তাঁর দিকে গতি করবার জন্যে মন ছোটে, তখন প্রয়োজন ব'দলে যাওয়ায় এত প্রিয় অর্থ, সম্পদ সব ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়ে। মনের স্বভাবই এই—যখন যেটা প্রিয় ব'লে ধরে, তখন তার জন্যে যত বড়ই কষ্ট হোক সব আনন্দের সহিত সহ্য করতে পারে। এই জন্য কথায় আছে চোরের কাছে বস্তুলাভের জন্য গতি করবার সাধনা শিখতে হয়; আর কৃপণের কাছে বস্তু রক্ষার সাধনা শিখতে হয়। যেমন, চোর চুরি করবার জন্যে রাত্রে অন্ধকারে গা, হাত, পা কেটে যাওয়া, এমন কি ওপর থেকে প'ড়ে প্রাণ হারাণ, পুলিশের সাজা, গৃহস্থের মার প্রভৃতি সবগুলিকে অগ্রাহ্য ক'রে গতি করতে থাকে; আবার কৃপণও টাকা রক্ষার জন্যে সকল প্রকার দেহসুখ, মান, অপমান, কিছুরই প্রতি নজর রাখে না, ঐ এক সাধনায় বিভোর হয়ে থাকে। আবার মনের আগ্রহের ওপর বস্তুলাভ হয়; মনের আগ্রহ হ'ল না বস্তুলাভ হ'ল এটা অসাধারণ ভাগ্যের কথা, এ প্রায়ই হয় না। মনে আগ্রহ হ'ল কিন্তু বস্তুলাভ হ'ল ভাল, না হ'লেও ততটা ক্ষতি নেই, এ অবস্থায় সফল হতেও পারে আবার নাও হতে পারে; কিন্তু যে রকমেই হোক বস্তুলাভ করতেই হবে এরূপ জোর আগ্রহ হলে বস্তুলাভ হতেই হবে। তা যদি ঠিক সৎ হতে চাও ত সেই ভাবে সাধনা কর। এই জন্যেই তোমাদের পক্ষে বলা হয় যে সাধুসঙ্গ কর। সৎ সঙ্গে মনের শক্তি বাড়বে

ও প্রয়োজন আস্তে আস্তে ব'দলে যাবে। সংসারীদের পক্ষে 'সৎ-সঙ্গই হচ্ছে প্রধান সাধনা। আগ্রহের সহিত সৎসঙ্গ করলে ফললাভ হবেই। যদি বল 'সৎ' জানব কি ক'রে? তা' তুমি সৎ হবার জন্যে যদি কোথাও সঙ্গ করতে যাও, তাতে ত আর তোমার লোকসান হচ্ছে না; কিছু ভাল কথাও শুনে এলে, তারপর সে জায়গায় যদি তোমার মন না বসে, তখন যাওয়া বন্ধ ক'রে দিতে পার। আর দেখ, ঠিক ঠিক সৎ হবার বাসনা মনে উঠলে তিনি সৎগুরু মিলিয়ে দেন। সৎ সঙ্গের এমনি প্রভাব দিয়েছে যে এক মূহূর্ত্তে সব ব'দলে দিতে পারে। এইখানে ঠাকুর রূপ সনাতনের গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ২য় ভাগ ১৭২ পৃষ্ঠা)। তাই বলেছে, রোজ কিছু সময় অন্তঃত নিয়মিত সাধুসঙ্গ করবে। সঙ্গই হচ্ছে প্রধান। সংসারে অনবরত দেখছ ত, চাকরি, অর্থ, যশ, মান: সবই চ'লে যায়, কিছুই থাকে না, তবুও ২৪ ঘণ্টা তাতেই ডুবে আছ। এমনি মায়ার প্রভাব যে অনিত্য জেনেও কেবল তারই সাধনা করছ। এতে কখনও শান্তি কাহারও হয় নি, হতে পারে না। সংসারের মধ্যে রাজাই ত সব চেয়ে প্রধান, এর চেয়ে ত আর বড় নেই। বাপ মার আশীর্ব্বাদের চরম হচ্ছে রাজা হও। তা রাজাদের সব অবস্থা দেখলে বুঝতে পারবে, কেউ শান্তি পায় না; তারাও সংসারের রোগ, শোক, তাপ প্রভৃতির হাত থেকে নিস্তার পায় নি। সৎসঙ্গে মনের শক্তি বাড়বে, তখন এ সবের ধাক্কা তত জোর লাগবে না, আর তখনই কিছু শান্তি পাবে।

রাণাঘাট থেকে একজন ভদ্রলোক দীক্ষা নেবার আশায় আজ প্রথম ঠাকুরের কাছে আসেন। দীক্ষা নেবার কথা বলতে ঠাকুর বলছেন।

ঠাকুর। দেখ, এখানে আসতে হয়। আসতে আসতে মন পড়লে তবে ত ঠিক কাজ হবে। যার কাছ থেকে দীক্ষা নেবে আগে দেখ তাকে তোমার ভাল লাগে কিনা, তার প্রতি তোমার মন বসে

কিনা, নইলে হঠাৎ একটা খেয়াল বশতঃ নিলে আবার ছেড়ে দিলে তাতে ত আর কিছু কাজ হবে না। আর দীক্ষা কি? যদি তোমার এখানে আসতে ভাল লাগে এবং আমার ওপর ভালবাসা প'ড়ে যায় আর তুমি ঠিক মত এখানে আসতে আরম্ভ কর তখন আপনি কাজ হতে থাকবে। তখন যেটা ব'লে দোব সেইটাই মন্ত্র। এর এক গল্প আমার শোনা আছে।

এক ব্রাহ্মণ সনাতনের কাছে দীক্ষা নিতে গেছেন। সনাতন ব'ললেন, 'আগে গুরুতে ভক্তি, বিশ্বাস আসুক, ভালবাসা পড়ুক, গুরুর উপদেশ মত চ'লতে শেখ, তবে ত দীক্ষা নিয়ে ঠিক কাজ হবে, নইলে, শুধু সংস্কার হিসাবে দীক্ষা নিয়ে লাভ কি? তা দেখ, আমি তোমায় বেশী কিছু এখন বলব না, কেবল একটী কথা ব'লে দিচ্ছি 'একাদশীতে অন্ন খেওনা'। আগে দেখি, আমার এই একটী কথা ঠিক পালন করতে পার কিনা।' ব্রাহ্মণ সেই অবধি আর একাদশীতে ভাত খান না। প্রায় দুই বৎসর খুব যত্ন সহকারে এই নীতি পালন ক'রে যাচ্ছেন, কিছুতেই এর ব্যতিক্রম হয় না। এমন সময়, একদিন একাদশীতে রাধা নিজে হাতে নানা রকম ব্যঞ্জন ও অন্ন নিয়ে এসে ব্রাহ্মণকে বললেন, 'আমি তোমার ভক্তি, শ্রদ্ধায় ও এতদিন অকপটে গুরু আজ্ঞা পালন করায় বড় প্রীত হয়ে তোমার জন্যে এই অন্ন ব্যঞ্জন এনেছি, তৃপ্তি ক'রে খাও।' ব্রাহ্মণ ভাবলেন রাধা যখন নিজে এনেছেন, তখন 'না' বলি কি ক'রে, আর, স্বয়ং রাধার হাতের অন্ন পাওয়া, সেত বহু ভাগ্যের কথা। এই ভেবে তিনি রাধার কাছ থেকে অন্ন ব্যঞ্জন খেলেন। কিন্তু মনটা খারাপ হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণ পরদিন গুরুর কাছে গিয়ে জানালেন, 'গত একাদশীর দিন রাধা এসে বললেন যে, তিনি আমার ভক্তি, শ্রদ্ধায় ও গুরু আজ্ঞা পালন করায় প্রীত হয়ে আমার জন্যে অন্ন ব্যঞ্জন এনেছেন'। এই কথা শুনেই গুরু বললেন, 'তুমি কি বললে, অন্ন খাওনি ত?' ব্রাহ্মণ তখন বললেন, 'আজ্ঞে, রাধা নিজে হাতে এনেছিলেন, কাজেই 'না' বলি কি ক'রে? তাই খেয়েছি'।

সনাতন বললেন, 'সে কি? আমি যে তোমায় বারণ করেছিলুম, তুমি খেলে কেন?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'রাধা নিজে এনেছিলেন বলে, 'না' বলতে পারিনি!' সনাতন বললেন 'তুমি রাধাকে বলেছিলে কি, যে একাদশীতে অন্ন খাওয়া আমার গুরুর নিষেধ আছে?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'না, তা ত বলিনি'। সনাতন বললেন, 'কেন বলনি? একথা বললে রাধা আর তোমায় খেতে বলতেন না। এতদিন তুমি ছিলে, রাধাও ছিলেন, তা কই এত দিন ত তিনি অন্ন নিয়ে আসেন নি? তুমি এতদিন গুরু আজ্ঞা পালন করেছিলে ব'লেই রাধার দেখা পেয়েছিলে। তিনি তোমার মনের শক্তি কতটা হয়েছে, দেখবার জন্যে একাদশীর দিন অন্ন নিয়ে এসেছিলেন। এখন গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছ, আর রাধাও তোমার কাছে আসবেন না। তোমার কাছে তোমার গুরুর আজ্ঞাই সবচেয়ে বড়। অবিচারে গুরু আজ্ঞা পালন করার নামই গুরু সেবা। যে, গুরুর প্রত্যেক কথা অবিচারে ঠিক ঠিক পালন করতে পারে, তারই যথার্থ গুরু সেবা হয় এবং সে সাধন ভজন করুক আর নাই করুক, সে আপনিই গতি করবে।'

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন।

ঠাকুর। বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে। সঙ্গই প্রধান; যেমন সঙ্গ করবে তেমনি সব বৃত্তি আসবে, সত্ত্বগুণীর সঙ্গ করলে সত্ত্বগুণ বাড়বে। সত্ত্বগুণ এলে তবে বাসনা ত্যাগ করার কথা মনে ওঠে। রজ, তম গুণ থাকলে বাসনা কামনাতেই মন থাকে আর তখন ঐ দিকেই কেবল নজর পড়ে। সৎসঙ্গে মনকে এই দিক থেকে ফিরিয়ে সত্ত্বগুণে নিয়ে যায়। তখন জীব মনোময় কোষ ছাড়িয়ে যেতে থাকে। মনোময় কোষের পর বিজ্ঞানময় কোষ। এখানে সব সমভাব প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ মাটী রইল, কিন্তু কোন গড়ন নেই। মনোময় কোষ পর্য্যন্ত সুখ, দুঃখ বোধ আছে, তারপর আর সুখ দুঃখ বোধ থাকে না, কারণ সুখ দুঃখ বোধ মনে, মন ছাড়ালে আর কিছুই থাকে না। আনন্দময় কোষে পৌঁছুলে আর নিরানন্দ নেই, সর্ব্বদাই পূর্ণ আনন্দ। এই

আনন্দের ছায়া মনোময় কোষে এসে পড়লেই মানুষের ঐ দিকে গতি করবার ইচ্ছা হয়। তাই বলেছে সৎগুরুসঙ্গ। সৎগুরু সদা আনন্দময়; তাঁর সঙ্গ করলেই সাধারণ মানুষ মনোময় কোষে থেকেও সেই আনন্দময় কোষের ছায়া অনুভব করে, অর্থাৎ আনন্দময় কোষের কিছু আনন্দের ছায়া মনে এসে লাগে। মনে সব কোষের ছায়া পড়ে; মনের সব ভাবের ছায়া নেবার ক্ষমতা আছে, সেই জন্য মনকে বড় করেছে, রাজা করেছে। মনে আনন্দময়ের ছায়া না পড়লে বৈরাগ্য আসে না, আর বিজ্ঞানময়ের ছায়া পড়লে বিবেক ওঠে। যেমন, খুব এঁদো পড়া, স্যাঁতসেঁতে ঘরেও প্রখর সূর্য্যের তাপ এসে লাগলে ঘর গরম হয়ে ওঠে। সদ্‌গুরু কে? যিনি আনন্দময় কোষ থেকে, ইচ্ছা ক'রে মনকে নামিয়ে এনে সমস্ত অবস্থা উপভোগ করেন। সৃষ্টির মধ্যে থেকে সমস্ত আনন্দ উপভোগ করা, অথচ কিছুতে লিপ্ত না হওয়াকে 'অমৃত-সমাধি' বলে। যাঁরা আনন্দময় কোষে থেকে অপরকে সেখানে নিয়ে যাবার ক্ষমতা এবং আদেশ প্রাপ্ত হন, কেবল তাঁদের দ্বারাই লোকশিক্ষা হয় এবং তাঁদের অবতার বা আচার্য্য পুরুষ বলা হয়। তাই বলেছে, সদ্‌গুরু অগ্নির তাপের মত; ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অগ্নির কাছে গেলেই যেমন ভিজে কাপড় আপনি শুকুতে থাকে, তেমনি সদ্‌গুরুর সঙ্গ করলেই আপনি কর্ম্মক্ষয় হতে থাকে। পরমহংসদেব এর এক গল্প বলতেন—চার বন্ধু বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় এসে শুনলে, এই পাঁচিল ঘেরা পাশের বাগানে চির আনন্দের ফোয়ারা চলছে, তাই শুনে একজন পাঁচিলে উঠে বাগানের ভেতরকার সব দেখে খুব আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাফিয়ে পড়ল আর এলো না। তারপর দ্বিতীয় বন্ধু উঠল, সেও দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাফিয়ে পড়ল আর ফিরলে না। তৃতীয় বন্ধুও ঠিক ঐ রকম করলে। তখন চতুর্থ বন্ধু উঠে ভেতরের সব দেখে নিজে ত আনন্দ উপভোগ করতে লাগল আবার অপরকে

ডেকে নিয়ে দেখাতে লাগল বাগানে কি রকম আনন্দ হচ্ছে। তা, এ রকম নিজে উপভোগ ক'রে আবার অপরকেও নিয়ে যাবার ক্ষমতা কদাচ হয়। এঁরাই আচার্য্য বা অবতারপুরুষ রূপে লোকশিক্ষার ভার পান।

যা যায় তার নামই জগত। কাজেই জগতও মিথ্যা; তথাপি কিছু সত্য আছেই। যেমন স্বপ্নটা মিথ্যা, অথচ স্বপ্ন ব'লে একটা জিনিষ আছে সেইটা সত্য। আর মিথ্যা কি জন্য? সত্যকে প্রমাণ করার জন্য। তবে সত্য বড় কেন? কারণ মিথ্যা ছাড়া সত্য একলাই দাঁড়াতে পারে, কিন্তু সত্য ছাড়া মিথ্যা দাঁড়াতে পারে না। এই মিথ্যাই মায়া; সত্যকে আবরণ ক'রে রেখেছে, আর সমস্ত জীব এই মিথ্যার সাধনায় ছুটোছুটী করছে। এই দেহটাও মিথ্যা, কারণ এটা নষ্ট হয়ে যায়, থাকে না। অপর বাসনা কামনা ছাড়লেই যে হোল তা নয়, এই দেহটার ওপরও যতক্ষণ মন রইল, বা মায়া রইল, ততক্ষণও দুঃখ পাবে, এমন কি সৃষ্টির যে জিনিষটার ওপর কিছু আসক্তি থাকবে সেইটাই দুঃখ দেবে। মন যখন দেহাত্ম বুদ্ধি ছাড়িয়ে যায়, তখনই শান্তি আসে। জ্ঞানপন্থীরা তাই বিচার ক'রে এই দেহাত্ম বুদ্ধি ছাড়তে থাকে। যতরকম দুঃখ কষ্টই আসুক না কেন, তারা বিচার করে যে সে গুলো ত এই মিথ্যা দেহ, মন ভোগ করছে, আমি ত ভোগ করছি না, কাজেই সে দিকে লক্ষ্য না ক'রে গতি করতে থাকে। তাই সাধককে তিতিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তিতিক্ষা ছাড়া সাধক এক পাও গতি করতে পারে না। কিছুমাত্র দেহসুখ থাকলেই তাঁকে কম সময়ের জন্যও অন্তঃত ভুল করিয়ে দেবে এবং তার এক লক্ষ্য গতির ব্যাঘাত ঘটাবে। এর গল্প আছে।

বৈশাখ মাস, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা যাবেন ব'লে কুন্তীর কাছে বিদায় নিতে গেছেন। কুন্তী তখন বললে, 'কৃষ্ণ! তুমি আমার এত আপন, তোমার চেয়ে ভালবাসার পাত্র আর আমার নেই,

তবু কেন তোমায় মাঝে মাঝে ভুলে যাই বলতে পার?' কৃষ্ণ বললে 'পিসিমা, দেহসুখ থাকায় আমায় ভুলে যাও।' কুন্তী বললে 'তাও কি হয়? তোমার চেয়ে আমার দেহসুখ বড়, এ আমি বিশ্বাস করলুম না।' কৃষ্ণ বললে 'আমার ত তাই মনে হয়, পিসিমা।'

কিছুদিন পরে একদিন সকালে কৃষ্ণ এসে বললে, পিসিমা চল একটু বেড়িয়ে আসি। দুজনে বেড়াতে বেড়াতে বহুদূর গিয়ে পড়েছে, এদিকে বেলা দুপ্রহর হয়ে গেছে, রৌদ্রের তাপে ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় এতক্ষণ কোন কষ্ট বোধ করেনি কারণ মনের স্বভাব হচ্ছে, যাকে ভালবাসা যায় তার ওপর মনটা পড়ায় সব ভুল হয়ে যায়। কিন্তু যেই মনে হয়েছে অমনি কুন্তী অস্থির হয়ে এই রৌদ্রের তাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য চার দিকে একটা আশ্রয় খুঁজতে লাগল। কিছুদূরে একটী বৃক্ষ দেখতে পাবামাত্র কুন্তী দ্রুত পদবিক্ষেপে সেই গাছ তলায় গিয়ে ছায়ায় দাঁড়িয়েছে, তখন আর কৃষ্ণকে মনে নেই, তাকে ছেড়েই একলা চ'লে এসেছে এবং তৃষ্ণার জ্বালায় দেখছে গাছে কোন ফল আছে কিনা? এমন সময় দেখলে উঁচুতে একটী ফল ঝুলছে কিন্তু কিছুতেই হাত পাবার উপায় নেই। নিকটে কোন জিনিষও নেই যার সাহায্যে ফলটী পাড়া যায়। অগত্যা মাঠের উপর যে সকল শব দেহ পড়েছিল সে গুলো টেনে একটার পর একটা রেখে তার ওপর উঠে ফলটী পাড়লে। ঠিক সেই সময়ে কৃষ্ণও সেখানে এসে হাজির হয়ে বললে 'এই দেখলে ত পিসিমা! সকাল থেকে দু'জনেই একসঙ্গে বেড়াচ্ছি, দু'জনেই রৌদ্র তাপে ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় সমান কাতর হয়েছি কিন্তু যেই তোমার কষ্ট বোধ হয়েছে অমনি তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের দেহটা রক্ষা করবার জন্যে এই গাছতলায় ছুটে এসেছ আর যে সব আত্মীয়ের মৃত্যুতে একদিন কত কেঁদেছিলে আজ তাদেরই শব দেহের ওপর উঠে ফলটী পাড়লে। তা, এই দেহসুখ থাকায় আমার কথাও আর মনে পড়েনি।'

এদিকে অনেক বেলা হয়েছে ব'লে ভীম খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে উপস্থিত। কৃষ্ণের কথা শুনে কুন্তী বললে 'সত্যিই ত! আমি সুখ

খুঁজেছি দুঃখ চাইনি, তাই আজ সুখের অনুসন্ধান করতে গিয়ে তোমায় ভুলে গেছি। তা দেখছি, সুখই তোমায় ভুলিয়ে দেয়; অতএব এই বর দাও যেন আমি বরাবর দুঃখই চাই, আর সুখ খুঁজিনি, কারণ, তা হলে আর তোমায় ভুলব না'। ভীম তখন বলছে 'হ্যাঁ মা! এত দুঃখ পেয়েও তোমার আশ মিটল না যে আজ সবে রাজা হতে যাচ্ছি, এই সুখের সময় আসবার আগেই আবার দুঃখ চেয়ে নিলে! কুন্তী বললে, ওরে অবোধ বালক! আমাদের কাছে কৃষ্ণই বড়, সুখ বড় নয়; যতদিন দুঃখে দুঃখে দিন কেটেছে, ততদিন কৃষ্ণও সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে আছে, আর যেই সুখের সময় আসছে অমনি কৃষ্ণ বিদায় নিচ্ছে! তাই বলছি, দুঃখই বড়, তা হলে আর কৃষ্ণ আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে না।

এই ভালবাসার স্বভাব, চাই তোমাকে, তা সুখ পেলে তোমায় পাই ত সুখ বড়, আর দুঃখ পেলে তোমায় পাওয়া যায় ত দুঃখই বড়। তা দেখ, যতক্ষণ দেহের অধীন থাকবে ততক্ষণ ভয় যাবে না, সেই জন্যই ছোটবেলা থেকে তিতিক্ষা অভ্যাস করতে বলেছে, কারণ সাধারণতঃ বয়স হয়ে গেলে, বিশেষতঃ পঞ্চাশের ওপর আর তিতিক্ষা নিয়ে গতি করা বড়ই কঠিন।

প্রেমের বা অনুরাগের গতিও তাই, তবে জ্ঞানপথে যেমন বিচার ক'রে ছাড়তে হয়, প্রেমে বিচার শূন্য। প্রেমে আপনিই সব ছেড়ে যায়। ভক্ত মন, প্রাণ সব তাঁকে দিয়ে ভালবাসে, তখন আর তার দেহসুখ বোধ থাকে না। সে জানে দেহটা ত আমার নয় তাঁরই, সব তাঁকে দিয়ে ফেলেছে; দেহ যেতে হয় যাক থাকতে হয় থাক সে তিনি বুঝবেন। তা হলেই দেহাত্ম বুদ্ধি চলে গেল। আর যোগপন্থীরা যোগের কৌশল দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করে, তখন যে যে বৃত্তি চিত্তকে অস্থির করে. সেই গুলো আপনিই স্থির হ'য়ে যায়। ব্যাপার সবই এক, ত্যাগ। লাল গাই, কাল গাই আর সাদা গাই দুধ কিন্তু সব এক, সাদা।

তাই বলেছে, বাসনাই দুঃখের উৎপত্তি করে, এবং এই বাসনার

ঠেলাতেই সমস্তক্ষণ সংসারে ছুটোছুটী করছ। আর, এই যে পরিশ্রম করছ সবই অনিত্য জিনিষের জন্য, তার কোন মুনফা থাকবে না, সবটাই ব্যর্থ। কিন্তু তাঁর জন্যে যতটুকু করা যায় তার কিছুই ব্যর্থ হয় না। সেই জন্যেই সঙ্গকে এত বড় করেছে; অন্ততঃ কিছু সময় তাঁকে সৎভাবে দিলে তিনি তার অনেক ভার নেন এমন কি কোন বাসনা নিয়ে তাঁকে ডাকলেও তিনি সংসারীর অনেক দুঃখ কষ্ট কমিয়ে দেন।

দ্বিজেন গাহিল—

কত অপরাধ করিয়াছি আমি চরণে তোমার মাগো।
তবু কোল ছাড়া তুমি করনি ত, মোরে ফেলে চ'লে গেলে না গো॥
যবে চলিয়া এসেছি আমি আসি ব'লে, তুমি বিদায় দিয়েছ আঁখি জলে।
কত আশীষ করেছ, বলেছ, বাছারে যেন সাবধানে থেকো।
আর পড়িলে বিপদে যেন প্রাণ ভ'রে 'মা' 'মা' ব'লে ডেকো॥
মলিন হৃদয় তপ্ত, লয়ে ফিরিয়াছি অভিশপ্ত।
তখন বলিয়াছি মা করিয়াছি দোষ, ক্ষমা ক'রে পায়ে রেখো॥
যবে পড়িয়া পাতক শয়নে চাহি চারি দিক দীনশরণে
তখন প্রলাপের ভরে কত কটু বলি (মাগো) তবু তুমি নাহি রাগো।
আমি দেখি বা না দেখি, বুঝি বা না বুঝি, সতত শিয়রে জাগো॥

তৃতীয় ভাগ—পঞ্চদশ অধ্যায়

—০ঃ*ঃ০—

কলিকাতা, রবিবার ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সাল ;
ইং ২৮শে মে ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর কথা হচ্ছে।

ঠাকুর। যতক্ষণ মনোময় কোষের মধ্যে আছ, ততক্ষণ সত্য, মিথ্যা বোধ থাকবে। মনোময় কোষে মিথ্যাটাও সত্য ব'লে মনে হয়, কারণ সে গুলোত সব সামনে পরিষ্কার দেখছ, মিথ্যা বল কি ক'রে? মনোময় কোষ পার হলে তবে মিথ্যা বোধ হয়। সত্য ত নিত্য, সকল সময়েই আছে, কিন্তু যখনই সত্য বলছ তখনই মনোময় কোষের মধ্যে, কারণ মনোময় কোষ পার হলেই কোন রকম বাসনা আর থাকেনা, কেননা আসক্তি থেকে বাসনার উৎপত্তি এবং আসক্তির স্থান মনে। মনোময় কোষ পার হয়ে বিজ্ঞানময় কোষে ও পরে আনন্দময় কোষে গেলে নিজেই মহা আনন্দের নেশায় মজগুল হয়ে যাও, তখন সত্য, মিথ্যা আর কে খবর দেবে? তাই অনির্ব্বচনীয় বলেছে। তা হলে মনোময় কোষ পার হলেই সব হয়ে গেল, বাকীটা আপনিই গতি করবে, কারণ তখন কোন কামনা থাকে না; কামনাই গতি করার প্রতিকুল।

নগেন। চণ্ডীদাসের 'মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন' এই গানটীর ভাব বেশ।

ঠাকুর। হ্যাঁ, রাধা হচ্ছেন হ্লাদিনী শক্তি, একেবারে আহ্লাদিনী, আনন্দময়ী। তিনি কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর, কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না। মান, অপমান, দেহসুখের দিকে লক্ষ্য নেই। মনের এরূপ অবস্থায় বিচ্ছেদ হ'লে যে কি কষ্ট হয় সেটা বোঝাবার জন্য তিনি কৃষ্ণকে বলছেন 'ভক্ত না হ'লে ভক্তের কষ্ট উপলব্ধি করতে পারবে না

ত, তাই এই বার আমি কৃষ্ণ হব, আর তোমাকে রাধা হ'তে, হবে তখনই ভক্তের বেদনা তুমি উপলব্ধি করতে পারবে।' প্রেমের স্বভাব হচ্ছে এই, প্রেমে ত আর পর বোধ থাকেনা সব এক হয়ে যায় ও তার ভাব ধারণ করে। তাই গীতগোবিন্দে জয়দেব যখন 'দেহি পদ-পল্লবমুদারম' লিখতে পারলে না তখন তিনি নিজে এসে লিখে দিয়ে গেলেন।

জয়দেব গীতগোবিন্দ লিখতে লিখতে 'স্মরগরলখণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্' পর্য্যন্ত লিখে আর 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' কিছুতেই লিখতে পারলে না, কারণ তার মনে হল কৃষ্ণ রাধাকে কি ক'রে একথা বলেন। যখন কিছুতেই ওকথা লিখতে পারলে না তখন পদ্মাকে (স্ত্রী) ডেকে বললে 'পদ্মা বই তুলে রাখ আমার বোধ হয় গীতগোবিন্দ লেখা হ'ল না।' এই ব'লে স্নান করতে চ'লে গেল। স্নান ক'রে আসতে রোজ বিলম্ব হ'ত, কিন্তু সে দিন একটু পরেই ফিরে এসে বললে পদ্মা বইটা দাও ত আমার মনে পড়েছে। পদ্মা বই দিতেই লিখলে 'দেহি পদপল্লবমুদারম'। তারপর বই রাখতে দিয়ে বললে পদ্মা খাবার দাও। পদ্মা প্রতিদিনের মত স্বামীকে খাবার দিলে এবং স্বামীর খাওয়া শেষ হলে তাঁকে শুইয়ে তাঁর পদসেবা ক'রে এসে প্রসাদ পেয়ে উঠতেই, জয়দেব যেমন রোজ করে, ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললে পদ্মা খাবার দাও। পদ্মা তাকে দেখে একটু অবাক হয়ে বললে 'সে কি! এই যে খানিক আগে তুমি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসে গীতগোবিন্দের পদ মনে পড়েছে ব'লে আমার কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে লিখলে 'দেহি পদপল্লবমুদারম'। তারপর খাবার চাইলে, আমি তোমায় খাবার দিলুম এবং খাওয়া শেষ হতে ঘরে শুইয়ে পদসেবা ক'রে এসে এই ত প্রসাদ পেয়ে উঠছি!' এই কথা শুনেই জয়দেব বললে 'দেখি দেখি! পদ্মা বইখানা দেখি তিনি নিজে এসে লিখে গেলেন না কি?' বই খুলতেই 'দেহি পদপল্লবমুদারম' লেখা দেখে জয়দেব বললে আজ আমার গীতগোবিন্দ লেখা সার্থক হ'ল, তিনি
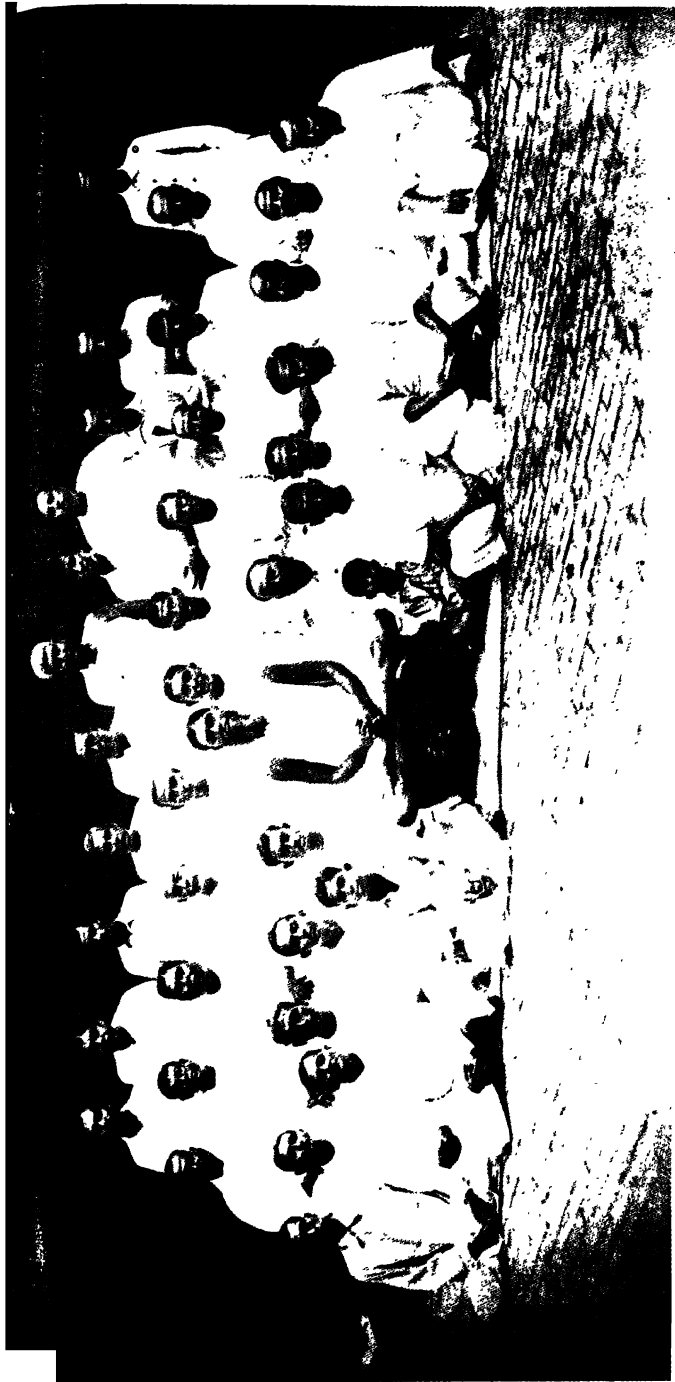
সুরথ ঠাকুরদাস (পচু) নিরঞ্জন দেবচণ্ডী কালীপদ কিরণ (মামা) তারা. যাদব হরিদাস কিরণ মৃত্যুণ
প্রফুল্লদত্ত মাণিক সুবোধ •মতি জ্ঞান শ্রীশ্রীঠাকুর বিজয় গোপাল যোগেশ (কালু) ললিত কালীমোহন কিরণঘোষ
সুধাময় মনোমোহন ব্রজ পঞ্চানন প্রভাত জনার্দ্দন বিভূতি গৌর দ্বিজেন প্রফুল্ল রাখাল অভয় হং প্রসন্ন সাধন মনতোষ (ভোলা)

স্বয়ং এসে লিখে দিয়ে গেছেন! তারপর ঘরে যেতেই সেই সব মকরন্দ গন্ধ পেয়ে ও পদচিহ্ন দেখে আনন্দে বিভোর হয়ে বলছে 'পদ্মা তুমি আজ ধন্যা! তুমি ঘরে বসেই তাঁর দেখা পেয়েছ, নিজে হাতে রেঁধে তাঁকে খাইয়েছ ও তাঁর পদসেবা করার অধিকারী হয়েছ; এ সুযোগ কিন্তু আমার ঘটল না! পদ্মা সেই প্রসাদ আমাকে একটু দাও! পদ্মা বললে, আমি যে খেয়েছি সে কি ক'রে দোব! জয়দের বললে, 'ওকথা ব'ল না পদ্মা! এ যে তাঁর প্রসাদ! যে প্রসাদ খেয়ে তুমি ধন্য হয়েছ, আমিও আজ তাই খেয়ে ধন্য হব।' কৃষ্ণ স্বয়ং 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' লিখলেন কারণ সমর্পিত জিনিষে ভেদ থাকে না, তখন এক হয়ে যায়, সেখানে আর ছোট বড় নেই। কাজেই রাধা আমায় যখন সব সমর্পণ করেছে তখন রাধা আর আমি কি আলাদা? এ যে আমিই আমাকে বলছি 'দেহি পদপল্লবমুদারম'। সেই জন্যই ত আছে যেখানে গীত-গোবিন্দ পাঠ হয় সেখানে আমি বিরাজ করি।

দ্বিজেন। জপ করতে করতে এক এক সময় যেন নেশার ঘোরের মত মনে হয়। এ রকম কি সত্যি হয়?

ঠাকুর। হ্যাঁ তা হয়; জপ করতে করতে মন হয়ত কখনও দ্বিদলে ওঠে, তখন ঐ রকম একটা ভাব হয়।

নগেন সপ্তলোক, স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধে কথা বলায় ঠাকুর বলছেন

ঠাকুর। স্বর্গলোক চন্দ্রলোকের অন্তর্গত, যেখান থেকে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসতে হয়; 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।' কারণ ভোগমার্গে চন্দ্রলোকে যায় এবং সুখ ভোগ করে, যতক্ষণ সঞ্চিত পুণ্য থাকে। পুণ্য ক্ষয় হলে আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু সূর্য্যলোক থেকে আর ফিরে আসতে হয় না, আরও ঊর্দ্ধগতি হয়। লোক মানেই কিছু ভোগ, মোক্ষ নয়। যতক্ষণ লোক আছে ততক্ষণ মুক্ত নয় এমন কি সত্য লোকেও মুক্ত নয়।

দেখ বৈকুণ্ঠলোক থেকেও জয়, বিজয় দ্বারীদের জন্ম হ'ল। সাধারণ জীব ভূ-লোকে থেকে অপর লোক দেখতে পায় না কিন্তু অপর লোকে থেকে তার নিজের লোক ও ভূ-লোক দেখতে পায়। তবে এই ভূ-লোকে ব'সে মন ঠিক করতে পারলে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ ক'রে যোগী হ'লে সব লোকেই যেতে পারে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ হ'লে বায়ু সূক্ষ্ম হয় এবং তখন স্থূল শরীরটা ছেড়ে সূক্ষ্ম শরীরে যেখানে ইচ্ছা গতি করতে পারে এবং আবার ফিরে এসে সেই স্থূল শরীরে থাকতে পারে।

কেষ্ট। বিবেকটা কি ? ব্রহ্ম বলতে কি বোঝায় ?

ঠাকুর। বিবেক হচ্ছে হিতাহিত জ্ঞান; সত্য ত নিত্য রয়েছে ও থাকবে, কিন্তু মিথ্যা থাকবে না। বিবেক এইটার ঠিক বোধ আনিয়ে দেয়। ব্রহ্ম কি জানা যায় না, ব্রহ্ম হতে হয়। যখনই জানার কথা হ'ল, তখন যে জানছে এবং যাকে জানছে, এই দুটো রইল। কাজেই জানতে বা বলতে গেলেই দুটো এসে গেল। তাই বলেছে ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নি, কারণ সে সম্বন্ধে মুখে কিছু বলা যায় না। সেই জন্য সগুণ ব্রহ্ম বলেছে। সাধারণ ভাবে এই ব্রহ্মের কথা বলা হয়, কারণ সগুণ হ'লেই গুণের মধ্যে এল তখন জানা বা বলা যেতে পারে। প্রকৃতির মধ্যে 'আমি' 'তুমি' রয়ে গেল, প্রকৃতি ছাড়িয়ে গেলে তবে নির্গুণ ব্রহ্ম। বাল্মীকি ঋষি তাঁর শিষ্য ভরদ্বাজকে নির্গুণ ব্রহ্ম বোঝাতে চেষ্টা করায়, তিনি যখন বুঝতে পারলেন না, তখন ঋষি বললেন 'তোমার এখনও পাপ, পুণ্য, ভাল, মন্দ বোধ রয়েছে, তোমার চিত্ত শুদ্ধ হয় নি; তুমি এখন সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কর তাতে সত্ত্ব গুণ বাড়বে, তখন তুমি নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা করতে পারবে।'

কেষ্ট। সবই যদি তাঁর সৃষ্টি তখন পাপ ও ত তিনি সৃষ্টি করেছেন ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, সবই যখন তাঁর সৃষ্টি, তখন পাপ আর কে

করবে? পাপ, পুণ্যটা কি? মনের বিকৃতির ওপরই পাপ আর পুণ্য। মনের বিকৃতির ওপর ব্যবহারের তারতম্য হয়। একই জিনিষের, জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে ব্যবহারের তারতম্য হয়। যেমন বিষ খেলে মানুষ সাধারণতঃ ম'রে যায়, আবার সেই বিষ কবিরাজরা রোগীকে খাইয়ে বাঁচাচ্ছে, সেই রকম মন বিকৃত অবস্থায় এক রকম ব্যবহার করলে পাপ আবার আর একভাবে ব্যবহার করলে পুণ্য হয়। পাপে দুঃখ আসে আর পুণ্যে সুখ আসে। পাপ পুণ্য ছাড়িয়ে যেতে পারলে তবে শান্তি।

কেষ্ট। তা হ'লে আমরা ত আর অপরাধী নই।

ঠাকুর। কে বলছে তোমরা অপরাধী। তুমি নিজেই ত নিজেকে অপরাধী ভাবছ। তা না ভাবলেই পার।

কেষ্ট। তবে আর কি, তাহলে আনন্দ।

ঠাকুর। বেশ ত! খুব আনন্দ করলেই ত পার। কিন্তু তা ত পার না। তুমি যে সংস্কারে রয়েছ, তার বিরুদ্ধাচরণ করলেই সুখ, দুঃখ নিতে হবে।

কেষ্ট। সেই সংস্কারেই বা ফেললে কে?

ঠাকুর। তুমি নিজেই পড়েছ। আর যদি বল তিনি ফেলেছেন, তবে আর ভাবছ কেন? তাঁর ওপর নির্ভর কর। তিনিই আবার তুলবেন। নিশ্চিন্ত থাক। তুমি অপরের কথায় মন খারাপ কর বা লাফাও কেন?

মতি ডাক্তার। সেই যে গান আছে 'নিবৃত্তি কে সঙ্গে নিবি' তাহলে এখানে ত কর্ত্তৃত্ব রয়েছে।

ঠাকুর। তাঁর ওপর নির্ভর করতে পারছনা বলেই ত? যতক্ষণ নিজে ঘাড়ে নিয়েছ ততক্ষণ নিজে ভাল, মন্দ বিচার করবে। যখন নিজের ওপর নেবে না তখন সব ছেড়ে দেবে। নিজের ওপর যতক্ষণ রেখেছ, ততক্ষণ বিবেক দরকার কিন্তু তাঁর ওপর নির্ভর করতে শিখলে বিবেকের প্রয়োজন নেই। তিনি তোমায় চালিয়ে নেবেন।

কেষ্ট। তবে কর্ত্তা কে ?

ঠাকুর। তোমার মত কি ? তোমার মতে কে কর্ত্তা বল ?

কেষ্ট। তিনি কর্ত্তা।

ঠাকুর। বেশ কথা। তিনি যখন কর্ত্তা, আর কর্ত্তার হুকুম ছাড়া নড়বার যো নেই, তখন আর ভাববার দরকার কি ? অফিসে যখন কাজ কর তখন কর্ত্তা যেটুকু বলেন সেটুকু কর, কেবল তার হুকুম মেনে চল, অফিসের লাভ লোকসানের কথা ভাব কি ?

নগেন। মরবার সময় একজন খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেল; তখন সূক্ষ্ম শরীর ভূবর লোকে গিয়ে আবার সুস্থ হ'য়ে ভূলোকে আসে, কারণ ভূলোকের বাসনা তখনও আছে ; এই নয় কি ?

ঠাকুর। সব লোকেই বাসনা আছে, তবে ভূ, ভূবর, স্বর এই তিন লোকে বাসনা খুব প্রবল থাকে। ভূ-লোকের এই রাজত্ব ছেড়ে যাবার সময় এখানকার বাসনা এত প্রবল থাকে যে ভূবর লোকে সে খুসী থাকে না এবং সেখানকার যতদিন মেয়াদ সেটা শেষ হলেই আবার ভূ-লোকে আসে। লোক মানেই ভোগ। কতক লোক আছে সেখান থেকে উর্দ্ধে গতি হতে পারে, আর কতক লোক আছে সেখানে ভোগের শেষ হলে আবার মর্ত্ত্য-লোকে ফিরে আসতে হয়। ভূ-লোকের আসক্তি নিয়ে দেহ রাখলে, চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত যে লোকেই থাক সেই সব লোক ভোগ ক'রে ভূলোকে ফিরে আসে। যেমন তোমার বাড়ী কল্‌কাতা, কাশী বেড়াতে গেলে ; কাশীর সব দেখা হলেই আবার কল্‌কাতা নিজের বাড়ী ফিরে এস।

মতি ডাক্তার। বাসনা নিয়ে ভূবর লোকে গেলে সে নিজেই ভূলোকে ফিরে আসে না সদ্‌গুরু, যিনি আমাদের ধরে আছেন তিনি পাঠিয়ে দেন ?

ঠাকুর। নিজের কর্ত্তৃত্বতে চলতে পার না। সব লোকের এক এক কর্ত্তা আছেন, সেই সেই কর্ত্তার হুকুমে চলতে হবে। আর

যা যা হবে তার সব ব্যবস্থা হয়ে থাকে। সাজা সব লোককেই নিতে হবে, নিস্তার নেই, তবে চেষ্টা ক'রে সাজার হাত থেকে নিষ্কৃতি নিতে হয়। তা ছাড়া খোঁটা ত সব জায়গাতেই চাই, তা নইলে ত চলতেই পারবে না। সংসারেই দেখছ না, অফিস, বাড়ী সব জায়গায় একজন খোঁটা নইলে কি কাজ করতে পার? যারা গুরুর ঠিক সঙ্গ চায় এবং অপর আর কোন চিন্তাই রাখে না, তারাই কেবল গুরুর সঙ্গে সঙ্গে সব লোকে যেতে পারে। তিনি ওপরে উঠলে উঠবে আবার নীচে নেমে এলে তাঁর সঙ্গে আসবে। ঠিক গুরুর সঙ্গ করলে সদ্‌গুরু তোমায় টেনে রাখবেন, তাহ'লে তিনি ওপরে গেলেও তাঁর সঙ্গে থাকতে পার। সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেলে বড় জোর তিন জন্মের পর মুক্ত হবেই।

কালু। গুরু বললেই ত হ'ত, আবার সদ্‌গুরু, এ ভাগ কেন?

ঠাকুর। গুরু বললেই সদ্‌গুরু বোঝায়। কিন্তু আজকাল গুরু একটা ব্যবসার মধ্যে দাঁড়িয়েছে, আর পূর্ব্বের মত সাধন ভজন নেই ব'লে একটা ভাগ করা হয়েছে। সদ্‌গুরু কে? সৎ মানে নিত্য। যাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, পূর্ণ ত্যাগ আছে, শক্তি আছে, যিনি ভূত ভবিষ্যত, বর্ত্তমান সব জানেন এবং যিনি সদা আনন্দময়। এই দেখ না, ব্রাহ্মণ বললেই সত্ত্বগুণ বোঝায়; সত্ত্বগুণ সম্পন্ন না হ'লে ব্রাহ্মণই হ'ল না। ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণই হ'ল ত্যাগ। যখনই বাসনা ত্যাগ বা অধীন হয় তখনই সে ঠিক ব্রাহ্মণ বাচ্য হয়, আর তখনই সে বেদের অধিকারী হয় এবং বেদের মর্ম্ম বুঝতে পারে। ত্যাগ ব্যতিরেকে বেদের মর্ম্ম বোঝা যায় না। তাই ব্রাহ্মণদের বেদ দেওয়া হয়েছিল, যে তারা ঐ নিয়েই থাকুক। যারা ব্রাহ্মণের ঠিক নীতি পালন করে ও যাদের ভেতর ত্যাগ আছে তারাই ঠিক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সৎ ব্রাহ্মণ। কিন্তু এখন বাপ ঠাকুরদাদা ব্রাহ্মণ অতএব ব্রাহ্মণের কার্য্য না ক'রেও ব্রাহ্মণ।

কালু। ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নি বললেন মানে কি? বর্ণনা

করতে পারে নি না জানতে পারে নি ? আচ্ছা বাল্মীকি যে ভরদ্বাজকে বোঝাতে যাচ্ছিলেন তা তাঁর নিজের কি অবস্থা ছিল ?

ঠাকুর। দেখ তাঁরা ঋষি, তাঁদের অবস্থার আলোচনা না করাই ভাল ; তোমার যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু মিটে গেলেই হ'ল। ব্রহ্ম জানা যায় না, ব্রহ্ম হ'তে হয়। জানলেই সগুণ ব্রহ্ম হয়ে গেল।

কালু। বিজ্ঞানে জ্ঞান বাড়ছে ব'লে দেখুন প্রকৃতির ব্যাপারটাও মানুষের গোচর হচ্ছে। হাওয়ার উত্তাপ ও অবস্থা (Barometer) ব্যারোমিটার নামক যন্ত্র দিয়ে নির্ণয় ক'রে, ঝড়, হাওয়া, বা বৃষ্টির কথা কত পূর্ব্বে বলে দিচ্ছে আর সে সব ঠিক মিলেও যাচ্ছে।

ঠাকুর। এ ত হ'ল জড় বিজ্ঞান। একে ঠিক বিজ্ঞান বলে না। এটা জড় জগতের সূক্ষ্মতা ; যেমন জালার কাছে ঘট। যার দুঃখের নিবৃত্তি হয়েছে, তারই ঠিক বিজ্ঞান অবস্থা হয়েছে ; আর যার দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হয় সেইটে হ'ল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান বদলায় না, যে জিনিষ বদলায় সেটা বিজ্ঞান নয়। সে হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান।

মতি ডাক্তার। যারা সদ্গুরুর আশ্রয়ে আছে, তারা নিজেরা কর্ম্মের দ্বারা গতি করবে, না সদ্গুরু তাদের উদ্ধার করবেন ?

ঠাকুর। যাদের গুরুতে ঠিক ঠিক বিশ্বাস আছে, গুরুশক্তি তাদের উদ্ধার করেন, নচেৎ নিজের কর্ম্মের দ্বারা গতি করতে হয়। **যে সব শিষ্য ঠিক ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে, মন দিয়ে গুরুর সঙ্গ করে তারা সেই জন্মেই উদ্ধার হয়ে যায়।** তা ভিন্ন অপর শিষ্যদের জন্য তাঁকে আবার আসতে হয়। তবে কাহারও তিন জন্মের বেশী লাগে না।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন।

সঙ্গই প্রধান ; সৎসঙ্গে সৎএর উদ্দীপনা হয়, নিত্য, সত্য ও চৈতন্যের উদয় হয়। বিনা সঙ্গে এ ভাব আসা কঠিন। ভাল কথা, শাস্ত্র কথা অনেক জানা থাকতে পারে, কিন্তু সঙ্গ ব্যতিরেকে

কাজ হবে না। যার গুরুতে ঠিক ঠিক মন পড়েছে, যার গুরুতে ঠিক বিশ্বাস আছে, তার আর কর্ম্ম থাকে না, তার আর জন্ম হয় না। যাদের সংসারে মন, তাদের আবার আসতে হয়, কারণ ভূবর ও স্বর লোকে গিয়েও নীচের দিকে মন থাকে। তখন পুত্র পিণ্ড দিলে তবে পুৎ নামক নরক থেকে উদ্ধার পাবে, এই সব চিন্তা রাখে ও শ্রাদ্ধ, পিণ্ড প্রভৃতির ওপর নজর রাখে। কিন্তু যাদের গুরুতে নিষ্ঠা থাকে তারা কেবল গুরুর দিকেই লক্ষ্য রাখে, তাতেই তাদের সব কাজ হয়ে যায়। তাই পরমহংসদেব বলতেন—'সদগুরু পেয়ে থাকত তাকিয়া পেয়েছ, ঠেস্ দিয়ে আরাম কর, কোন চিন্তা মাথায় রেখো না।' যার অন্তঃত কিছু বিশ্বাস এসেছে, তারই ঠিক গুরুলাভ হয়েছে। মানুষ এ জগতে কর্ম্মফল ভোগ করতে আসে। যতক্ষণ সংসারে আছ ততক্ষণ দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। সংসারীর দুঃখ থাকবেই ও কর্ম্মফল ভোগ করতে হবে। তাই সৎসঙ্গে যদি মনের শক্তি বাড়াতে পার ত কর্ম্মক্ষয় হবে ও দুঃখ তত লাগবে না। তবে বিশ্বাস এলে তার কাজ আপনি হয়ে যায়। রাবণের স্থির বিশ্বাস ছিল যে সে যত অন্যায়ই করুক, সে রামকে পাবেই। সে বলেছিল 'রাম আমার জন্যেই এসেছেন আমি তাঁকে পাবই।' গুরুতে যার বিশ্বাস আছে, তার কিছু অন্যায় হয়ে গেলেও শেষে সব ঠিক হয়ে যায়। তিনি আবার অনেক সময় অন্যায়ের ভেতর ফেলে তার ভেতরটা বুঝিয়ে দিয়ে তা থেকে উদ্ধার করেন। এইখানে ঠাকুর গুরুর আদেশ অমান্য ক'রে শিষ্যের যে দেশে সন্দেশ বাতাসা একদর সেখানে থাকা, পরে শূলের আদেশ ও তা থেকে গুরুর রক্ষা করার গল্প বলিলেন। (অমৃতবাণী—২য় ভাগ ৯১ পৃষ্ঠা)

সংসারে বড় বোকা ও বড় বুদ্ধিমান দুই একদরে বিক্রয় হয়। দুঃখের হাত থেকে কারুর নিস্তার নেই। তবে সেই ঠিক ঠিক বুদ্ধিমান যে দুঃখের হাত থেকে কিসে বাস্তবিক নিষ্কৃতি পাওয়া যায়,

এইটে অনুসন্ধান করে এবং তার চেষ্টা করে। যে ঠকে এবং যে ঠকায় দুজনেরই এক অবস্থা, দুজনেই দুঃখ ভোগ করে; দুজনেই, যা যায়, এমন যে জগৎ তাকে ধ'রে রাখবার বৃথা চেষ্টা ক'রছে। তবে যে সৎএ বিশ্বাস রেখে কাজ করেছে সেই কিছু পেয়েছে। মানুষ বার বার বাসনার কবলে প'ড়ে হাবুডুবু খায় তবু ছাড়তে পারে না। সঙ্গে এইগুলো বার বার মনে করিয়ে দেয়। সৎগুরু প্রত্যেকের সঙ্গে থাকেন ও বুঝিয়ে দেন। সৎগুরুর কোন অভাব থাকে না, তিনি কারুর মুখাপেক্ষী নন, কোন জিনিষের জন্য চিন্তাও রাখেন না, কারণ তাঁর সঙ্গে ওপরের রাজার যোগ রয়েছে। সৎগুরু এমন কিছু করে দেবেন না, যে তুমি আগুনে হাত দেবে অথচ জ্বলবে না, পুড়বে না। তবে সদ্‌গুরু, বার বার বুঝিয়ে দেবেন যে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে, হাত দিও না। সঙ্গের দ্বারা আপনা আপনি এ বোধও আসবে। মায়ার এমনি প্রভাব যে, এত দুঃখ কষ্ট পেয়েও ছাড়তে পার না অথচ ধর্ম্মের দিকে তোমার মন নেই। তাই বার বার বলেছে সঙ্গ। সঙ্গ ব্যতিরেকে সংসারীদের গতি করা বড়ই কঠিন। একটু ভালবাসা লাগলেও কাজ হয়, কিন্তু এই ভাবটুকু অতি সহজে বদলে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্ভব। যেমন একটা গাছ ফলে ফুলে সুশোভিত হ'লেও শেকড় মাটীর ভেতর বেশী দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ না করলে অল্প ঝড়েই প'ড়ে যেতে পারে। তাই বলেছে প্রথম অবস্থায় ভাব রক্ষা করবার জন্যে বেশ ক'রে বেড় দিতে হয়, মেলা মেশামিশি ভাল নয়, কারণ মন তখন বড় কাঁচা, অন্যভাবে প'ড়ে নিজের ভাবটুকু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মনের শক্তি হয়ে গেলে, তখন অন্য ভাবের সঙ্গে মিশলে তত ক্ষতি হয় না। সদ্‌গুরু সর্ব্বদাই শিষ্যকে ধরে থাকেন ও রক্ষা করেন। গুরু যে শুধু দর্শন, স্পর্শন ও চিন্তা দ্বারা কাজ করেন তাহা নহে, তিনি আরও তিন প্রকারে কাজ করেন; কেহ কেহ উপদেশ শুনেও যেমন পূর্ব্বে চলছিল সেইরকম চলতে লাগল।

কিন্তু গুরু সর্ব্বদাই ধ'রে থাকেন যাতে সে সৎভাবে চলতে পারে। কাহাকেও অবস্থা বিশেষে অন্যায়ের মধ্যে ফেলে সেটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেন এবং পরে ঠিক ভাবে নিয়ে যান; কেউ বা উপদেশ শুনেই এমন ফিরে গেল যে সে আর অন্য দিকে গেল না। গুরু রক্ষা করবার জন্যে সর্ব্বদাই কাছে কাছে থাকেন, কোন সময় দূরে থাকেন না। এইখানে ঠাকুর গুরুর আদেশ অমান্য ক'রে রাজপুত্রের বন্ধুর সহিত মিশে বাগানের আনন্দ দেখতে যাওয়ার গল্প বলিলেন। (অমৃতবাণী ১ম ভাগ ১৮৮ পৃঃ)।

তোমার ভেতর যে কুমতি আছে সে সর্ব্বদাই প্রলোভন দেখিয়ে বিপথে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে, আর সদ্‌গুরু তা থেকে কেবল ফেরাবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা রয়েছেন। কাহাকেও বা অনেক সময় বেশী ধাক্কা দিয়ে ফেরাতে হয় কারণ সে কিছুতেই শুনছে না। মায়ার আকর্ষণে পড়লে অশান্তি ভোগ করতেই হবে তার আর কোন সন্দেহ নেই। তবে গুরুতে ভালবাসা থাকলে তিনি সেগুলো সহজে কাটিয়ে নিয়ে যান। সৎ-গুরুতে যত ভালবাসা বাড়বে, তত কুমতি তোমার কিছু ক'রে উঠতে পারবে না, নইলে টেনে নিয়ে গিয়ে সৎভাবটুকু নষ্ট ক'রে ফেলবে। তাই বার বার বলেছে, সঙ্গে ও ভালবাসায় যত কাজ হয় তত আর কিছুতে হয় না।

দ্বিজেন গাহিল—

ভুলনা মন তাঁরে যদি যাবি পারে।
যাঁর করুণা তরণী এ ভব পারাবারে॥
শৈশব ত গত কভু জনক জননী ক্রোড়ে।
যৌবনে যুবতী লয়ে ছিলি রে ভুলে॥
এখন প্রৌঢ়ে সুতাসুত মায়ায় মজিলি সংসারে॥
নলিনী দলগত সলিল মত চপলমিহ জীবন।
কেহ নাহি রবে তোমাকেও যেতে হবে শমন ভবন॥
ধূলা খেলা, গঠন ভঙ্গ বালিকারই মত তারই রঙ্গ।
দিন ত গেল মন ভাব সারাৎসারে॥

তৃতীয় ভাগ—ষোড়শ অধ্যায়

কলিকাতা ; বৃহস্পতিবার ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সাল।

ইং ১লা জুন ১৯৩৩।

নগেন। বেদে পড়েছি হৃদয় থেকে মন, মন থেকে চন্দ্র, আর কান থেকে দিক—চোখ থেকে নয়। মন থেকে চন্দ্র কি রকম? এ সব জ্ঞানের কথায় অনেকে হয়ত মারতে উঠবে।

ঠাকুর। কোন কথাতেই মারতে যাওয়া ঠিক নয়। যখন জ্ঞান, ভক্তি, যোগ তিনটে মার্গ আছে তখন যার যেটা ভাল লাগবে সে সেইটাতেই যাবে, তবে অবশ্য অধিকারী বিশেষে। চন্দ্রনাড়ী ও সূর্য্যনাড়ী তুটোতে কাজ করছে, আর চন্দ্রও আলাদা নয় সূর্য্য থেকেই হয়েছে। মন যতক্ষণ অনুরাগ বা বিবেক, বৈরাগ্য সম্পন্ন না হয়ে ত্যাগের ভাব দেখায় ততক্ষণ সেটা ঠিক ত্যাগ নয়; তার মধ্যে ভোগের ইচ্ছা নিহিত আছে; যেমন ভোগের বস্তু পায় অমনি ধ'রে বসে। আর ভোগ বাসনা থাকে ব'লে মনকে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছে, কারণ চন্দ্রলোকে ভোগ আছে। সূর্য্যলোকে মন গেলে সেখান থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

ডাক্তার সাহেব। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে যে কোন পদার্থে তেজ থাকে তাহা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সূর্য্যও অনন্তকাল থেকে আলো ও উত্তাপ দিচ্ছে, অথচ তার ত কই কিছুই কমছে না। এটা আমাদের জড় বিজ্ঞানের বাইরে।

ঠাকুর। এটা হ'ল জড় জগতের বিজ্ঞান। জড় জগতের মধ্যে যেটাই থাকে তার ক্ষয় হয়, তবে জড় জগতের বাইরে একটা কিছু আছে সেটা যারা জানতে পেরেছে তারাই ঠিক ঠিক বিজ্ঞানী। গীতায় আছে 'প্রকৃতির পারে সূর্য্য সম জ্যোতির্ম্ময়,' সব ভাবই আছে যে যে ভাবে নেয়। যেমন আরসিতে মুখ দেখা, তার পারাটী

উঠে গেলে তাতে আর মুখ দেখা যায় না, অথচ তুমি ঠিকই রয়েছ। তেমনি যা যায় তাই জগৎ। জগৎ চ'লে গেলে আর সূর্য্যের বোধ থাকে না অথচ ব্রহ্ম সূর্য্য ঠিকই আছে। সেইটাই ঠিক বিজ্ঞান যাতে দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আমাদের ঋষিরা দেখেছিলেন যে ভোগে দুঃখ যায় না, যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছ তাই রইলে, দুঃখ গেল কই? শান্তিই বা পেলে কই? তাই বলেছে এই অন্ধকার তাড়াও, তবে আসল দুঃখ যাবে। তা দুই প্রকারে এই দুঃখ তাড়ান যায়। হয় আলো নিয়ে এস অন্ধকার চলে যাবে আর নয় অন্ধকার তাড়াও। প্রথমটা হচ্ছে ভক্তি পথ, দ্বিতীয়টা হচ্ছে জ্ঞান পথ। ভক্ত বলে যে আমি যখন আমার মনকে বশ করতে পারছি না তখন ভগবানের (আলোর) শরণাগত হই, দুঃখ (অন্ধকার) আপনি চ'লে যাবে। তাই ঋষিরা এই সাধনা করেছিলেন, তাঁরা ভোগের সাধনা করেন নি কারণ তাঁরা দেখেছেন যে ভোগে দুঃখ আর ত্যাগে আনন্দ। তাঁরা যে এখনকার মত ভোগের জিনিষ জানতেন না বা তৈরী করেন নি তা নয় তবে অধিকারী বুঝে ভোগ করতে দিতেন। সকলে চাচ্ছে দুঃখের নিবৃত্তি কিন্তু কিসে সে দুঃখের নিবৃত্তি হয় তা জানে না। এই যে বিজ্ঞানের দিন দিন উন্নতি করছ বলছ কিন্তু তাতে দুঃখ যাওয়া ত দূরের কথা আরও দুঃখ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। একটা লোকের মুখে প্রফুল্ল ভাব দেখতে পাওয়া যায় না। সব বিকৃত। বিকৃতির লক্ষণ কি? একাকী নির্জ্জনে ব'সে চিন্তায় ডুবে রয়েছ, মুখ শুকনো ও শরীর কদাকার করছ। ভোগের সাধনা ক'রে ত এই ফল! তাই বলেছে ত্যাগ শিক্ষা কর ত্যাগে শান্তি আসবে। যে সকল জিনিষ থাকবে না তার জন্যে এত খেটে মর কেন? ভোগের জিনিষ কিছুই ত থাকবে না। বিজ্ঞান চর্চ্চা ক'রে যতই আবিষ্কার কর কিছুই যখন থাকবে না তখন এর পেছনে এত খেটে তুমি ত কিছু মুনফা পেলে না; কাজেই মিছে খেটে মর কেন? হয় ত, কিছু যশ মান হ'ল বা

সংসারীর (thank you) ধন্যবাদ পেলে, তাতে কি হ'ল? ম'রে গেলে যশ মান কে ভোগ করবে? তাই এ সব জিনিষের মেলা সাধনা করতে বারণ করেছে। ত্যাগের দিকে মন দাও। সংসারে থাকতে গেলে যেটুকু নেহাত নইলে নয় ততটুকু ছাড়া আর জড়ের সাধনার দিকে নজর দিও না। নিত্য বস্তু চাও দেখবে শান্তি পাবে। আমি অত বুঝি না, যাতে দুঃখের নিবৃত্তি না হয় সেটাকে আমি বড় বলব না তা সে যত বড় বিজ্ঞান হোক। যদি তোমার তেঁতুল খেয়ে দুঃখ যায় আর সোনায় দুঃখ না যায় তা হলে তোমার পক্ষে তেঁতুলই বড়, সোনার দরকার কি?

সালকিয়ার জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছে।

জঃ ভঃ। আপনি যেটা বলেছিলেন, সেটা করতে পারিনি একটা বাধা পড়ল। সোমবার ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম সে এসে বলছে 'বড় জবর ধরেছিস্; আচ্ছা, তাকে জিজ্ঞাসা করিস দিকি আমি কে?'

ঠাকুর। তুমি তাকে স্বপ্নে দেখেছ মাত্র। তোমার সঙ্গে কথা চলত বা তোমায় খাড়া ক'রে সে কথা কইতে পারত, ত না হয় দেখা যেত, নইলে আবার তোমার সঙ্গে তার কবে স্বপ্নে দেখা হবে তার জন্যে জবাব দিয়ে আর কি হবে? তা ছাড়া দেখ তুমি এসে বললে 'যে কাল কাল দাগ সর্ব্বদাই তোমার চোখের সামনে রয়েছে, সেই কাল দাগ অনেকগুলি কাল চাকতির মত হয়ে জ্যোতির্ম্ময় হয়,' তাই আমি বললুম 'কাল দাগ ভাল নয় তাতে বাড়ীতে মৃত্যু হতে পারে।' তুমি বললে 'হ্যাঁ, মৃত্যু হয়েছে।' তুমি এই সব দুঃখ জানালে ব'লে মঙ্গলবার সকালে কালীঘাট থেকে মায়ের পায়ের একটা জবা ফুল ধারণ করতে বলেছিলুম। তুমি যদি বলতে যে না বেশ সুখে আছি, তাহলে কি কিছু বলতুম? সে শক্তির ওপর আমার কোন রাগ, দ্বেষ নেই বা সে আমার কোন ক্ষতি করে নি। সে যে আছে থাক

না, আমার তাতে দরকার কি? তুমি দুঃখ জানালে ব'লেই ত বলেছিলুম।

জঃ ভঃ। সুখ দুঃখ মেশান আছে, আর এ ত থাকবেই।

ঠাকুর। তা এখানে যত লোক ব'সে আছে সবাই ত সুখ দুঃখ বোধ করছে।

জঃ ভঃ। তা হলেও ত আমাদের মধ্যে 'মানুষ', 'মানহুঁস' দু'রকম আছে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, পরমহংসদেব বলতেন 'যে সব মানুষের হুঁস হয়েছে তারা মানহুঁস। তা তোমার যদি সে রকম হুঁস হয়ে থাকে ত সেই শক্তিটাকেই ধ'রে থাক, সেই ঠিক করবে।

জঃ ভঃ। তাকে ত ঠিক ধরতে পারছি নি, তাই পথ দেখিয়ে দেবেন ব'লে আপনার কাছে এসেছিলুম।

ঠাকুর। দেখ, পথ দুরকম। যদি ভগবান দেখবার পথ চাও ত সেই পথ ধর, আর যদি কোন শক্তি, যেমন তোমার সঙ্গে রয়েছে, ধরতে চাও ত সেই পথে চল। ভোগের দিকে যাবার ইচ্ছে থাকলে, ত্যাগ দেখলে ভয় আসবে; তখন কাল দাগ দেখে বাড়ীতে মৃত্যু হলে, বা রোজগার ক'মে গেলে কেঁদে ভাসাবে। আর ত্যাগের পথে যাও ত এ সবে আনন্দ হবে, কিছুতেই ভয় খাবে না, ভ্রুক্ষেপ করবে না; ভাববে, 'মা ষষ্ঠী রাগ করেন ত বড় জোর ছেলে কেড়ে নেবেন' এই রকম নির্ভীক হয়ে থাকবে। রাজা রামকৃষ্ণ সম্পত্তি লাটে উঠেছে শুনে আনন্দ ক'রে বললেন 'জয়কালীর পূজা দাও।' কারণ তিনি ভাবলেন একটা ঝঞ্ঝাট ঘাড় থেকে নেমে গেল। এখন যে ভাব তোমার ভাল লাগবে সেই ভাবে চলবে।

জঃ ভঃ। ঠিক বুঝতে পারি না, আমার মনে হয় এটা ভাল, না কোন ভূত প্রেত ভাল? অনেককেই জিজ্ঞাসা করেছি; কেউ বলে 'বাবা! বড় ভাল জিনিষ পেয়েছ কাউকে ব'ল না,' আবার কেউ বলে 'ও ভাল জিনিষ নয়।'

ঠাকুর। সেটা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। জ্যোতি সত্ত্বের জিনিষ, এতে ক্রমশঃ সত্ত্বগুণ বাড়বে, বাসনা কমিয়ে আনবে ও মনকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যাবে। কাল, তমের জিনিষ, এতে অমঙ্গল আনে। যে শক্তি তোমাকে ক্রমশঃ ত্যাগের দিকে নিয়ে যাবে ও ধর্ম্মভাব বাড়াবে সেইটে ভালশক্তি; আর যে শক্তি ভোগ বাসনা বাড়িয়ে দেয় ও মনকে কাম, ক্রোধ প্রভৃতির অধীন করে, সেইটে খারাপ শক্তি। এখন নিজে বুঝে দেখ, তোমার সেই শক্তি তোমাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তবে, এটা ঠিক যে ত্যাগ ভিন্ন শান্তি আসবে না; তা যে শক্তিই হোন ত্যাগ না আনিয়ে শান্তি দিতে পারেন না।

জঃ ভঃ। আবার এও ত আছে, ভোগ না হ'লে ত্যাগ হতে পারে না।

ঠাকুর। সে ত আলাদা কথা। সেটা ত্যাগ কি ক'রে হয়, তার একটা উত্তর। আমাদের কথা হচ্ছে 'শান্তি কিসে আসে?' তা ত্যাগ ভিন্ন শান্তি কিছুতেই আসতে পারে না। এখন তিনি ভোগ করিয়ে নিয়ে ত্যাগ শেখাবেন, বা বাসনা নিবৃত্তি করিয়ে নিয়ে ত্যাগ শেখাবেন, তা তিনি বুঝুন।

জঃ ভঃ। তা হলে আশাটাই দুঃখের মূল?

ঠাকুর। আশাই দুঃখের মূল বটে, তবে ভগবৎ আশা ভাল। সে পথে গেলে সংসারীয় আশা থেকে নিষ্কৃতি পাবে ও শান্তি আসবে।

জঃ ভঃ। মানুষ কি আপনি চলছে না তিনি চালাচ্ছেন?

ঠাকুর। সেটা তোমার বোধের ওপর, তিনিই তো সকলকে চালাচ্ছেন, কিন্তু তুমি সেটা বুঝতে পার কই? তোমার অহং বুদ্ধিটা তোমাকে ত সেটা বুঝতে দেয় না। মায়ায় প'ড়ে মনে কর যে তুমিই করছ। যেমন যে হীরে চেনে না তার কাছে হীরে আর কাঁচ একই এবং সে অনেক সময় কাঁচকেই হীরে ব'লে আদর করে কিন্তু যে জহুরী সে হীরেকে ঠিক চেনে ব'লে কাঁচ ফেলে দিয়ে হীরেকে যত্ন করে; তেমনি

তোমার যখন জ্ঞানের উদয় হবে তখন তুমি দেখবে যে, যেটা তুমি করছ ভেবেছিলে, সেটা বাস্তবিক তিনিই করাচ্ছেন।

জঃ ভঃ। ধরুন, যদি বিশ্বাস হয়, তাহলে 'তিনিই করাচ্ছেন' এটা ঠিক ত?

ঠাকুর। এই দেখ, যখনই 'ঠিক ত'? বললে তখনই অবিশ্বাসের কথা হ'ল।

জঃ ভঃ। যখন সবই তিনি করাচ্ছেন, তখন মন্দটাও ত তিনি করাচ্ছেন? তা হলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, যে এ সব কিছু না, স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

ঠাকুর। বেশ কথা; তবে আর ভাবছ কেন? ছুটোছুটি কর কেন? এটার ওপর ঠিক বিশ্বাস রেখে চল। দেখ, যে জিনিষটা তোমায় ঘোরাচ্ছে সেটা নিবৃত্তি না হ'লে তুমি ত স্থির হয়ে থাকতে পারবে না।

জঃ ভঃ। আপনার সঙ্গে অনেক তর্ক করলুম, ক্ষমা করবেন।

ঠাকুর। তর্ক ত ভাল; তর্ক দরকার। তর্ক মানে কি? সন্দেহ ভঞ্জন করা, এতে উপকার হয়; মানুষের মন ত সব এক রকম নয়; কত রকম সন্দেহ হয়, মনে অবিশ্বাস আসে, খোলাখুলি তর্ক ক'রে জিনিষটা যদি বুঝতে পার, তা হলে হয় ত তোমার সে সন্দেহটা চ'লে গেল বা বিশ্বাস এল। যার বিশ্বাস বা প্রেম লেগে গেছে, তার কথা আলাদা; নইলে সাধারণ মনই ত এই রকম; নানা সংশয়ে ভরা, আর তর্কের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, সেই সব সংশয় নিবৃত্তি করা। তা ছাড়া শুধু ঠকাবার জন্যে যে তর্ক করা সেটা কুতর্ক, তাতে বরং অপকার হয়। সেই গল্প আছে না? একজন বলছে তর্কে হারি ত সব দোব, বিষয় সম্পত্তি সব দোব, এমন কি স্ত্রী পর্য্যন্ত দোব। এই শুনে স্ত্রী বললে একি! সব দেবে দাও, আমায় দেবে একথা বললে কেন? তখন স্ত্রীকে বোঝাচ্ছে, আরে তুমি ভাবছ কেন? আমি কি তর্কে হারব ভাবছ? যতই বলুক আমি বুঝবও না আর কিছু দিতেও হবে না।

ভদ্রলোকটী চলিয়া গেল।

ঠাকুর মঠের একজন সন্ন্যাসিনী মেয়ে যোগমায়াকে ঘুম সম্বন্ধে বলছেন।

ঠাকুর। তোমার ওপর অনেক আশা রাখি, তোমাকে ত মেয়ে ব'লে ভাবি না ছেলের মতই দেখি। খুব কঠোরতা নেবে। শরীরকে যত আয়েস দেবে, সে ততই আয়েস চাইবে। তোমার অপর সব দিক তৈরী আছে, তোমার মধ্যে বাসনা কম ও ঠিক ঠিক ত্যাগের ভাব আছে; আর তোমার এই যে একাগ্র ভালবাসা, এ খুব ভাল জিনিষ। তার ওপর তোমার শরীর সুস্থ, বয়স কম, আর অসীম সাহস আছে। যাদের বয়স কম, তাদের খুব কঠোর অভ্যাস করা দরকার। আমাদের এ বয়সে কি আর কঠোরতা চলে? তবে এতদিন বহু কঠোরতা ক'রে এসেছি ব'লে শরীরে এখনও অনেক সয়। তা ছাড়া, আমার ত আর এখন প্রয়োজন নেই; তবে কঠোরতা করি কেন? তোমাদের জন্যে; যদি আমাকে দেখে, তোমরা কিছু কঠোর নীতি নিতে পার। অল্প বয়সে, যাদের আবার কোন খাটুনির কাজ নেই, তাদের ৬ ঘণ্টা ঘুম হলেই যথেষ্ট হ'ল, তার বেশী ঘুমান উচিত নয়। যারা বেশী ঘুমোয় তারা কখনও ভগবানকে ডাকতে পারে না, তারা অলসতারই সাধনা করে। এই অলসতাই তম গুণ আনে। কথায় আছে না—'কর্ম্মে কুড়ে ভোজনে দেড়ে আর বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে,' তাদের দ্বারা কোন কাজ হবার যো নেই। যারা ভগবানের দিকে যাবে তাদের রাত্রি ১২টার আগে শোওয়া উচিত নয়, আবার ভোর বেলা ওঠা দরকার, কারণ রাত্রি ১২টায় ও ভোরে সত্ত্বগুণের প্রভাব বেশী; প্রকৃতি এই সময় স্থির থাকে এবং মনটাও সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়। সেই সময় ধ্যান, জপের প্রশস্ত সময়।

নগেন। শরীর ক্লান্ত হলেই ত ঘুম আসবে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তবে শরীরকে ক্লান্ত হতে দেবে কেন?

নগেন। আচ্ছা, মেয়ে, পুরুষ, ভাব ত কেবল মনেই? মন ছাড়ালে ত আর কিছু থাকে না?

যোগমায়া

ঠাকুর। হ্যাঁ, মন ছাড়ালে পর মেয়ে, পুরুষ ভাব নেই; আর, জোর ভালবাসা পড়লে বা প্রেমে মেয়ে, পুরুষ ভাব থাকে না; তখন সব এক হয়ে যায়। মনটা নিয়েই না যত গণ্ডগোল; মনটা ঠিক হলেই ত হয়ে গেল।

নগেন। দেখুন, মানুষের আশাই যত দুঃখের কারণ।

ঠাকুর। হ্যাঁ, আশাটা কি? এ বাসনারই অপভ্রংশ।

নগেন। সত্য, অমর এবং চিরস্থায়ী, কিন্তু মিথ্যা থাকে না।

ঠাকুর। মিথ্যাটা সত্যের আবরণ মাত্র; আবরণ চিরস্থায়ী নয়।

নগেন। মনোময় কোষে, সত্য হচ্ছে কাঠামো, মিথ্যা ওপরের তৈরী পুতুল, এই পুতুল বিসর্জ্জন দিলেই কেবল কাঠামো রইল। জীব, জন্তু সবই মিথ্যা, কারণ এ সবই সৃষ্টি; মনোময় কোষ পার হলেই মিথ্যা গেল। আর প্রাণময় কোষ অর্থাৎ প্রাণ, এবং অন্নময় কোষ অর্থাৎ অন্ন, এ দুটোই জড় ও মনোময় কোষের মধ্যে।

ঠাকুর। তুমি আসক্তি শূন্য হয়ে যদি মিথ্যার মধ্য দিয়ে যাও, তা হলে মিথ্যা এবং সত্য উভয়ই এক বোধ হবে। আসক্তি না থাকায় মিথ্যাও তোমার কিছু করতে পারবে না আর সত্যও কিছু করতে পারবে না। তখন তুমি কাউকেও আর ভয় করবে না এবং সকলকেই আদর করতে পারবে। আদর কর না কেন? ভয় খাও পাছে কিছু দুঃখ পাও। তবে মনোময় কোষ কি প্রাণময় কোষ এসব ভাববার কিছু প্রয়োজন নেই। আসক্তি শূন্য হ'লেই সব অবস্থাতেই আনন্দ পাওয়া যায়। মন তখন সত্য মিথ্যার পারে যায়; তাই সৎ, চিৎ, আনন্দ।

নগেন। পাপ, পুণ্য দুইই ক্ষয় হওয়া চাই ত? নইলে শান্তি আসবে কোথা থেকে?

ঠাকুর। পাপ, পুণ্য বললেই দুটোই ভোগের কথা এল। পুণ্য বললেই বুঝতে হবে সুখ ভোগের ইচ্ছা আছে; তাই পুণ্য কর্ম্মের ফলে সুখ ভোগ হয় আর পাপের জন্যে দুঃখ ভোগ হয়। দুটোই

পাশাপাশি ভোগ হয়। সৎ কর্ম্ম দুই প্রকার, এক, সুখ ভোগের জন্য, এইটেই পুণ্যকর্ম্ম; আর, দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য, এর দ্বারা সুখ দুঃখ দুই যায়। পুণ্য কর্ম্মে বাইরের বস্তুর দিকে নজর থাকে, যেমন অর্থ, যশ, মান, দেহসুখ, রসনাতৃপ্তি ইত্যাদি। এই সব অস্থায়ী সুখ ভোগেই মানুষ ম'জে থাকে, এর পর যে দুঃখ আসবে সে চিন্তা তখন রাখে না। কিন্তু দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে যে সব কর্ম্ম করা যায়, তাতে মনের শক্তি বাড়ে। মন স্থির, শান্ত হ'লে ভেতরে অপার আনন্দ অনুভব করা যায়, তখন সেইটাই ভাল লাগে, বাইরের সুখের বস্তুর দিকে নজর থাকে না। আর, এ কর্ম্মও প্রথমে একেবারে নিষ্কাম হয় না, কারণ দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতির আশা রাখছে কিনা। তবে সুখ, দুঃখ বোধ দুই চ'লে গেলে, তখন নিঃস্বার্থ কর্ম্ম হবে। একই সুকর্ম্ম—উদ্দেশ্য অনুযায়ী পুণ্য ফল ভোগ করায়, অথবা পাপ, পুণ্য দুইই ক্ষয় করিয়ে শান্তির পথে নিয়ে যায়।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন—

ঠাকুর। বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে; সঙ্গই প্রধান। বেদ, বেদান্ত যতই পড় না কেন, বিনা সঙ্গে কিছুই উপলব্ধি হবার যো নেই। শাস্ত্র মুখস্থ করা, আর শাস্ত্রের উপদেশ অনুযায়ী চলা অনেক তফাৎ। শাস্ত্র মানে যার দ্বারা মনকে শাসন করা যায়; শাস্ত্র প'ড়ে নিজের চেষ্টায় সাধনা ক'রে এ অবস্থা লাভ করা বড়ই কঠিন। গীতায় ভগবান বলেছেন—

'সাধক অব্যক্ত ব্রহ্মে বহু ক্লেশে পায়।
বহু কষ্টে সেই নিষ্ঠা লাভ করা যায়॥'

আবার বলেছেন, 'অর্জ্জুন তুমি আমার শরণাগত হও আমি তোমায় সব পাপ থেকে মুক্ত করব।' হয় নিজে বীর হও, নয় বীরের শরণাগত হও। সাধুসঙ্গে আপনি কাজ হয়। তাই দিয়েছে, সাধনা চার প্রকার—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন; অনাত্মাবাদ,

শরণাগত আর সাধুসঙ্গ। শাস্ত্র শুনবে, শুনে মনে চিন্তা করবে ও ধ্যান ধারণা অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে স্থির করবে। কিন্তু শুনবে কার কাছে? সাধুর কাছে, যিনি শাস্ত্র অনুযায়ী চলেন এবং শাস্ত্রের মর্ম্ম ঠিক ঠিক উপলব্ধি করেন। যে নিজেই পুত্রশোকে কাঁদছে সে আর একজনকে পুত্রশোকে কাঁদতে নিষেধ করলে তার কি ফল হবে? পুত্রশোক নিবারণ করতে গেলে মনের কি কি অবস্থা হওয়া চাই, এবং শোক হলেই বা কি কি অবস্থা হয়, এ সব জানা থাকা চাই, তবে না, সে ঠিক কাজ করতে পারবে। শাস্ত্র পাঠ্য পুস্তক নয়, মুখস্থ করার জিনিষ নয়, শাস্ত্রের বাক্য অনুযায়ী চলা চাই, তবে ঠিক শাস্ত্র পড়ার কার্য্য হল। এইখানে ঠাকুর 'ভাগবতের পণ্ডিত ও রাজাকে ভাগবত শোনাবার' গল্প বললেন (অমৃতবাণী ১ম ভাগ ২৪৩ পৃষ্ঠা)। ভাগবত সাধন পুস্তক। এক একটী পুস্তক মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও স্তরের বর্ণনা ক'রে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছে। দেহের যেমন শৈশব, যৌবন, জরা, মৃত্যু চারিটী অবস্থা, সেইরকম মনের চারিটী অবস্থা—পুরাণ, ভাগবত, বেদ, বেদান্ত। পুরাণ অবস্থা—তখন সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়, শাস্ত্রীয় সৎ কাজ, সৎ সংস্কার ভাল লাগে অর্থাৎ ক্রিয়া, কলাপ প্রভৃতি এবং পাপ, পুণ্য এ দিকে দৃষ্টি থাকে। ভাগবত অবস্থা—প্রথমে স্বেদ, কম্পন, রোমাঞ্চ প্রভৃতি ভেতরে কয়েক ভাব হয়, তারপর জড়বৎ, পিশাচবৎ, উন্মাদবৎ, পৌগণ্ড্রবৎ অর্থাৎ খাদ্য খাদক বিচার হীন, বালকবৎ অর্থাৎ অজ্ঞানরহিত বাল্যভাব প্রভৃতি কয়েক ভাবে থাকে। এ অবস্থাতেও দুই দুই থাকে। বেদ অবস্থা-এ সঙ্কল্প রহিত অবস্থা, তখন সঙ্কল্প নষ্ট হয়ে মন স্থির হয়। এথেকে ক্রমশঃ মনের লয় হয়ে যায়। বেদান্ত অবস্থা—গুণাতীত অবস্থা, জীবন্মুক্ত অবস্থা। অর্থাৎ মন লয় হয়ে যাবার পর সে অবস্থা থেকে নেমে এসে দ্রষ্টা স্বরূপ থাকে, তখন প্রকৃতির ভেতর থাকলেও প্রকৃতি তাকে ধরতে পারে না। মন এক একটা স্তরে না উঠলে,

সেই সেই ভাবাপন্ন হয় না। যতই পড়না কেন, মনকে যতক্ষণ শাসন করতে না পারবে, ততক্ষণ তোমাতে আর অতি সাধারণ ব্যক্তিতে কোনও প্রভেদ নেই। তুমি না হয় বড়জোর দু'চারটে বুলি আওড়াতে পারলে, কিন্তু কাজে একই অবস্থা। এইখানে ঠাকুর 'হাওড়া ষ্টেশনে বেদের পণ্ডিতের ঠাকুরকে বেদ পড়বার উপদেশ দেবার' গল্প বললেন (অমৃতবাণী ২য় ভাগ ২৪৫ পৃষ্ঠা)। সাধনার দ্বারা বাসনা অধীন হয়, প্রয়োজন চ'লে যায় ও অভাব ক'মে আসে। তুলসীদাস বলেছেন

সত্যবচন, দীনভাব, পরধন উদাস।
ইস্‌মে নাহি হরি মিলে ত জামিন তুলসীদাস॥

সত্য কথা বলবে। দেখ, ছোট বেলায় পড়েছ, 'সদা সত্য কথা বলবে,' কিন্তু যিনি পড়ান তিনি কখনও সত্য কথা বলেন না আর যে পড়ে সেও কখন সত্য কথা বলে না। তার কারণ হচ্ছে, বাসনা, কামনা থাকতে অভাব যাবে না, অভাব থাকতে ভয় যাবেনা, আর ভয় থাকতে সত্য কথা বলতে পারবে না। তাই ধর্ম্মের লক্ষণ দিয়েছে, 'ভয়শূন্য ভাব আর চিত্ত প্রসন্নতা'। এ মনের একটী অবস্থা, মনে করলেই হবার যো নেই। তখন মনোময় কোষ ছেড়ে আনন্দ ময় কোষে যাবে, আর সেখানে সর্ব্বদাই তোমার আনন্দ থাকবে ও মন প্রফুল্ল থাকবে। দীন ভাব হচ্ছে, অহঙ্কার নষ্ট করা। আর পরধন উদাস মানে পরধর্ম্ম হচ্ছে রিপুরধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম হচ্ছে আত্মার ধর্ম্ম। পরধনে মনকে আকর্ষণ করায় কারা? রিপুরা। তাই তুলসীদাস বলেছেন রিপুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে হরিকে পাবে। যতই পড়না কেন, তোমার প্রকৃতি তোমায় বলে ধ'রে কার্য্য করাবে, 'বলাদিব নিয়োজিত'। বাসনা অধীন করতে না পারলে কিছুই হবেনা; যতক্ষণ বাসনার রাজ্যে রয়েছ, ততক্ষণ সুখ দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সব এক অবস্থা। বিনা ত্যাগে শান্তি আসবে না। সাধনা ব্যতিরেকে বাসনা অধীন করতে পারবে

না। এক, বিবেক, বৈরাগ্য নিয়ে সব ছেড়ে আর নয়ত অনুরাগে গতি করা। অনুরাগে সব দিক ছেড়ে আপনি একলক্ষ্য হয়ে আসে। তার আর অপর সাধনা দরকার হয় না কারণ সাধনার কাজ ত আপনা আপনিই হয়ে গেল। নিজে বীর হতে গেলে, প্রকৃতির সকল ধাক্কায় দাঁড়াতে হবে ও স্থির থাকতে হবে। বীর কে ? যে শত্রু দেখে ভয় খায় না, অর্থাৎ রোগ, শোক, তাপকে গ্রাহ্য করে না এবং কামিনী কাঞ্চনের আকর্ষণে পড়ে না। তাই বলেছে মহাত্মা কে ? যে রোগে, শোকে আর অন্নকষ্টে আনন্দ রক্ষা করতে পারে। ভক্তের কথা আলাদা, তার এসব কিছু প্রয়োজন হয় না ; তিনি ভক্তকে নিজে রক্ষা করেন, তার সব ভার নিজে গ্রহণ করেন। ভক্ত, ভগবান আর ভাগবত অর্থাৎ ভগবৎ বাক্য এক। ভক্ত দেহ, মন, প্রাণ সব অপর্ণ করে, সে তিনি ছাড়া কিছু জানে না বা বোঝে না। তাই, ভক্ত ভগবান অভেদ, কাজেই ভগবান নষ্ট না হলে আর ভক্ত নষ্ট হতে পারে না। ভক্তের জন্য তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা নিজেই ভাঙ্গলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় দুর্যোধন ভীষ্মকে সেনাপতিত্বে বরণ করেছিল। প্রথম যুদ্ধে ভীষ্ম তত মনোযোগ না দেওয়ায় যুদ্ধে হার হয়। তখন দুর্যোধন ভীষ্মকে ডেকে কটু বাক্যে যথেষ্ট তিরস্কার ক'রে বললে, তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, যদি নাই পারবে ত গিছলে কেন ? আমি ত এখন মরিনি, আমায় বললে না কেন ? আমি নিজেই যেতুম। ভীষ্ম বললে দুর্যোধন, আর কিছু ব'লো না, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কাল নিষ্পাণ্ডবা করব। এই ব'লে দুর্যোধনের কাছে যে পঞ্চবাণ ছিল, তা নিয়ে ভীষ্ম চ'লে গেল। কৃষ্ণ এসে তখন যুধিষ্ঠিরকে বললে, 'শুনেছ, ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছে, কাল সে পাণ্ডবশূন্য করবে, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ত নিস্ফল হবে না, আর পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করলে আমারও সাধ্য নেই যে রক্ষা করি।' যুধিষ্ঠির বললে 'তা আমায় বলছ কেন ? যেতে হয় যাব, থাকতে হয় থাকব, সে তুমি বোঝগে যাও।' এই হ'ল নির্ভরতা ; কৃষ্ণের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে

নিশ্চিন্ত, কাজেই কৃষ্ণকেই ঠেকাতে হবে। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ডেকে বললে, একবার দুর্য্যোধনের কাছে যাও, গিয়ে বলবে 'তুমি যে আমায় বর দিতে চেয়েছিলে সেই বর নিতে এসেছি।' বর দিতে চাইলে, তার রাজপরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ চেয়ে নেবে। এখানে দেখ, সাধারণ বুদ্ধিতে এত বড় যুদ্ধের সময় শত্রু শিবিরে একলা যাওয়া কতদূর বিপজ্জনক, কিন্তু কৃষ্ণ দুর্য্যোধনের প্রকৃতি জানত ব'লে অর্জ্জুনকে একলা পাঠিয়েছিল। অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের শিবিরের বাইরে দাঁড়িয়ে খবর পাঠাতেই, দুর্য্যোধন বেরিয়ে এসে বললে, একি ভাই! তুমি এখানে বাইরে দাঁড়িয়ে! এ ত তোমারই জায়গা, ভেতরে এস ব'লে, ডেকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'কি মনে ক'রে ভাই?' অর্জ্জুন বললে তুমি আমায় বর দিতে চেয়েছিলে তাই নিতে এসেছি। দুর্য্যোধন বললে 'হ্যাঁ, বল ভাই কি চাই? যখন দোব বলেছি, নিশ্চয়ই দোব, যা চাইবে তাই দোব।' অর্জ্জুন বললে তোমার রাজ পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ আমায় দাও। এই শুনে দুর্য্যোধন বললে 'হ্যাঁ ভাই! এ সামান্য জিনিষ কেন? রাজত্ব, রাজঐশ্বর্য্য যা চাইবে তাই দোব।' মনের উদারতা দেখ, বিনা যুদ্ধে স্বচ্যগ্র জমি দোবনা ব'লেই এত বড় যুদ্ধের আয়োজন, অথচ বর প্রার্থনা করলে সব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত; ভাব হচ্ছে, আমার কাছ থেকে চেয়ে নিক, হীনতা স্বীকার করুক সব দোব, তা ভিন্ন এক বিন্দু মাত্রও দোব না। তবে দুর্য্যোধন এটাও স্থির জানত, যে রাজঐশ্বর্য্য, রাজত্ব যাই নিক না, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কখনও নিষ্ফল হবে না, কাল সে নিষ্পাণ্ডবা করবেই। অর্জ্জুন বললে দেখ, মহতের লক্ষণ হচ্ছে 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করবে না, কারণ তা করলে আত্মা নীচগামী হয়', তাই আমার যে টুকু দরকার সেই টুকু তোমার কাছে চেয়েছি।' দুর্য্যোধনের রাজপরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ আনলে, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বললে 'এই প'রে ভীষ্মের শিবিরে গিয়ে শুধু এই বলবে যে পঞ্চবাণ আমায় এখন ফেরত দাও, আবার প্রয়োজন হলে দোব।' এদিকে প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে, ভীষ্ম বৃদ্ধ, চোখে কম দেখে,

আবার অর্জ্জুনের চেহারা দেখতে অনেকটা দুর্য্যোধনের মত, তার ওপর দুর্য্যোধনের রাজপরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ প'রে গেছে, কাজেই ভীষ্ম চিনতে পারেনি, সে মনে করেছে দুর্য্যোধন এয়েছে তাই পঞ্চবাণ চাইতেই ভীষ্ম সে গুলি অর্জ্জুনকে দিয়ে দিলে। অর্জ্জুন পঞ্চবাণ নিয়ে আসতে কৃষ্ণ বললে, এইবার আমি একবার ভীষ্মের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। তখন সবাই বল্লে সে কি! শত্রু শিবিরে যাবে? কৃষ্ণ বললে ভীষ্ম আমার শত্রু নয়, সে আমার পরম ভক্ত; যুদ্ধে নামবার আগে সে গোবিন্দ গোবিন্দ নাম উচ্চারণ ক'রে নামে আবার যুদ্ধ শেষ হলে গোবিন্দ গোবিন্দ নাম করতে করতে ফিরে আসে। কৃষ্ণ ভীষ্মের শিবিরে যেতেই ভীষ্ম বলছে এই অসময়ে এখানে কেন? কৃষ্ণ বললে এই মাত্র অর্জ্জুন এসেছিল, তাই আমি একবার এলুম। ভীষ্ম বললে অর্জ্জুন এসেছিল! কৃষ্ণ বললে, হ্যাঁ, এই একটু আগেই ত সে এসেছিল। তখন ভীষ্ম সব বুঝতে পেরে বলছে 'ও চক্রী! তোমার এই কাজ! তা আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে তোমার কি লাভ হ'ল! আমি কি জানতুম না, যে আমি পঞ্চপাণ্ডবকে মারলে তুমি তাদের বাঁচাতে পার। আচ্ছা, আমিও প্রতিজ্ঞা করছি কাল রণে আমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব এবং দেখে নোব তুমি কত বড় ভক্তবৎসল। পরদিন ভীষ্ম এত ভীষণ রণ আরম্ভ করেছে যে অর্জ্জুন আর দাঁড়াতে পারছে না, বলছে কৃষ্ণ আর পারছিনা গেলুম। কৃষ্ণ তখন নিজের দেহে শর গ্রহণ করতে লাগল, কিন্তু তাতেও ঠেকাতে পারছে না। অর্জ্জুন বললে আর আমি পারছিনা, গাণ্ডীব প'ড়ে গেল। তখন কৃষ্ণ বললেন, কি! এই ব'লেই সুদর্শন চক্র নিয়ে নিজে নেমে দাঁড়াতেই, ভীষ্ম ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ ক'রে বললে, 'এখন বুঝলুম, তুমি যথার্থই ভক্তবৎসল বটে, ভক্তের জন্য তুমি সব করতে পার, তাই তুমি নিজে যুদ্ধের আগে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে এই যুদ্ধে তুমি কোন পক্ষের হয়ে অস্ত্র ধারণ করবে না, আজ আমার জন্যে তুমি তোমার সে প্রতিজ্ঞাও ভাঙ্গলে।' সেই কারণে গীতায় কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছে তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আমার

ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, কেননা তুমি ভক্ত, তুমি প্রতিজ্ঞা করলে সেটা থাকবে, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করলে ভক্ত সেটা ভেঙ্গে দিতে পারে। তাই আছে

ভক্ত আমার পিতা মাতা, ভক্ত আমার গুরু।
ভক্তের তরেতে আমি বাঞ্ছা কল্পতরু॥

ভগবান ভক্তকে এত বড় ক'রে বাড়িয়ে গেছেন যে এমন কি তাঁকে গালাগাল দিয়েও যদি কেউ ভক্তকে ভালবাসে তাহলে তিনি তার ঘরে বাঁধা থাকেন। ভালবাসায় যত কাজ হয়, অত আর কিছুতে হয়না। দেখনা, সংসারে দিবা রাত্র রোগে, শোকে জর্জ্জরিত হচ্ছ, তবুও সেখানে একটু ভালবাসা লাগায় সেটা ছাড়তে পারনা। এই ভালবাসা সৎএ দিলে জন্ম জন্মান্তরীন অনেক কর্ম্ম ক্ষয় হয়। তখন সে আপনি গতি করতে থাকে। তা ছাড়া যত ভাল কথা বলনা কেন, সাঁকোর জলের মত এক দিক দিয়ে ঢুকবে, আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে; তোমার কিছুই তাতে হবে না। এই ভালবাসায় সৎ এ আপনত্ব হয়, আর সেই আপনত্বে তারাও ছুটতে থাকে। তাই পরমহংসদেব সকলকে এত আপন ক'রে নিজের কাছে ডাকতেন, আর তারাও সেই আপনত্বে বাড়ী, ঘর, আত্মীয়, স্বজন সব ছেড়ে তাঁর কাছে যেত। এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

'আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি, বড়ই আপন তোরা' ইত্যাদি।

তৃতীয় ভাগ—সপ্তদশ অধ্যায়

—০:*:০—

কলিকাতা ; রবিবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সাল ;
ইং ৪ঠা জুন ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, তপেন, দ্বিজেন, নগেন, মতি, বিভূতি, তারাপদ, কল্যাণ ও অভয় আছে।

নগেন সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে কথা তুলিলে ঠাকুর বলছেন—

ঠাকুর। মন যতক্ষণ মনোময় কোষে থাকে, ততক্ষণ মিথ্যাটাকে সত্য ব'লে ধ'রে নেয়। সত্য, মিথ্যা দুই এক শক্তিতে আসে। চণ্ডীতে আছে 'আমি বদ্ধ করি, আবার আমিই মুক্ত করি।' বিবেক এলে বিচার আসে, তখন যে গুলো মিথ্যা সেই গুলো ছাড়তে থাকে ; আর তখনই কিছু সত্যের জ্ঞান আসে, ও আসল সত্যের অনুসন্ধান করে। বিবেক নিয়ে গিয়ে বৈরাগ্যের হাতে ফেলে দেয়, আর অমনি সব ত্যাগ হতে থাকে। বৈরাগ্য না এলে শুধু বিবেক এলে বড় দুঃখ পায়, কারণ বিবেকের জন্যে বুঝতে পারছে, ছাড়া দরকার, কিন্তু বৈরাগ্য না আসায় ছাড়তে পারছে না। পূর্ণ বৈরাগ্য এলে মন প্রথমে বিজ্ঞানময় কোষে যায়। পরে ক্রমশঃ এই দেহ রেখেই বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে যাওয়া যায়। আনন্দময় কোষে অপার আনন্দ। এই আনন্দময় কোষে থাকলে কিছু বোধ থাকে না সেখানে সকলেই নেশার ঘোরে থাকে। সে স্তর থেকে নেমে না এলে আর অপরের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারা যায় না। তখন জীবন্মুক্ত অবস্থা হয়। যারা জীবন্মুক্ত, তারা নেমে এলেও কোন মায়ার আকর্ষণে পড়ে না। তারা পদ্মপত্রের ওপর জলের মত নির্লিপ্ত ভাবে থাকে অথবা পাঁকাল মাছের মত থাকে, পাঁকে থাকলেও গায়ে পাঁক লাগে না। সাধারণ সেই আনন্দে এত বিভোর হ'য়ে যায় যে তার আর কোন দিকে লক্ষ্য থাকে না। এই অবস্থায় সাধারণতঃ প্রায়ই ২১ দিনে দেহ চ'লে যায়।

যারা জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করে তারা আবার সে স্তর থেকে নেমে এসে শেষ পর্য্যন্ত সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে থাকতে পারে। তবে যাঁরা নিত্যসিদ্ধ বা ঈশ্বরকোটী তাঁরাই কেবল সেই আনন্দ ভোগ ক'রে, লোকশিক্ষার জন্যে সেখান থেকে নেমে আসেন এবং ইচ্ছামত মনকে আবার সেই স্তরে তুলে নিতে পারেন। এঁরাই শুধু, আচার্য্য বা অবতার থাকেন। যেখানে সত্য, মিথ্যা বোধ আছে, সেখানে আনন্দ, নিরানন্দ দুই আছে, যেমন আলোর পর অন্ধকার। যে আনন্দের কাছে নিরানন্দ নেই সেই সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ যেন বাড়ীর তেতলা, সেখানে পূর্ণ আনন্দ, নিরানন্দ নেই; দোতলায় নিরানন্দের সঙ্গে কিছু আনন্দ রয়েছে, আর এক তলায় শুধু নিরানন্দ। অবতার হচ্ছেন যেমন গৃহস্বামী, তিনি তেতলাতেই থাকেন, তবে ইচ্ছামত দোতলা বা একতলায় নেমে আসতে পারেন; তিনি জানেন যে 'আমারই একতলা, দোতলা, তেতলা, ইচ্ছে করলেই তেতলায় চলে যেতে পারি', তখন একতলার নিরানন্দ তাঁকে দুঃখ দিতে পারে না। তিনি মায়ার জগতে থাকলেও মায়া তাঁকে বাঁধতে পারে না; যেমন মাকড়সার জালে অপর কীট পতঙ্গ জড়িয়ে পড়ে, কিন্তু মাকড়সা নিজে তাতে জড়ায় না। বাইরের লোক একতলায় ঢুকে নিরানন্দ ভোগ করে, কারণ সে জানে যে এ বাড়ী তার নয়, গৃহস্বামীর হুকুম ছাড়া ওপরে উঠতে পারবে না। আবার সে যখন অনেক চেষ্টা ক'রে গৃহস্বামীর হুকুম নিয়ে ওপরে ওঠে, তখন সে সেখানকার আনন্দ পায়। তারপর সে যখন আরও ওপরে তেতলা পর্য্যন্ত ওঠে তখন সেই আনন্দে সে নিজে এত বিভোর হয়ে যায়, যে সেখান থেকে সে আর নেমে আসতে পারে না। এই অবস্থায় সাধারণতঃ দেহ থাকে না। সচ্চিদানন্দ জ্ঞান-মার্গের কথা; ভক্তি-মার্গে ভক্ত সচ্চিদানন্দ বোঝে না, সে তাঁকে ভালবাসে, তাঁকেই চায়। তবে সে স্তরে উঠলে ভক্তেরও সেই একরকমই আনন্দ উপভোগ হবে। যেমন লাল গাই সাদা গাই, দুধ একই সাদা।

নগেন। কর্ম্মযোগে ষড়চক্র ভেদ হয়। জ্ঞান ও ভক্তিতে কি তাই হয়?

ঠাকুর। হ্যাঁ, জ্ঞান ও ভক্তিতে আপনা আপনি চক্র ভেদ হয়ে যায়। চক্র ভেদ মানে অবস্থা লাভ। যে যে অবস্থায় মন উঠছে, সেই সেই অবস্থার বোধ ঠিক আসবে। দ্বিদলে মন গেলে বিজ্ঞানময় কোষ খুলবে, তখন সমস্ত জ্ঞান লাভ হয়। তারপর মন সহস্রারে উঠে বিভোর হয়ে যায় ও সমাধিস্থ হয়। সে অবস্থায় দেহ চ'লে যায়, অথবা সমাধি ভঙ্গ হয়ে জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকে। তুরীয় অবস্থায় মন গেলে জাগতিক বিষয়ের কোন অনুভূতি থাকে না, সে স্তরে কিছু করা যায় না। তাই আচার্য্য বা অবতাররা জগতের সঙ্গে ব্যবহার রাখবার জন্যে মনকে সহস্রার ও দ্বিদলের মধ্যে রক্ষা ক'রে বাঁচ খেলানর মত রাখেন। আনন্দময় কোষে মন গেলে, সঙ্কল্প, বিকল্প, বাসনা সব চ'লে যায়, শুধু সূক্ষ্ম মন থাকে। তারপর জীবন্মুক্ত অবস্থায় যে সঙ্কল্প থাকে তা তার ইচ্ছামত, সে সঙ্কল্পের জোর থাকে না। এটা চিন্তাশূন্য অবস্থা; এখানে সুখ, দুঃখ ও নিরানন্দ স্পর্শ করতে পারে না। একে অমৃত সমাধি বলে।

নগেন। ব্রহ্ম এক স্বীকার করলুম, কিন্তু ব্রহ্মের মায়া ত রয়েছে; কাজেই দুটো হ'ল ত?

ঠাকুর। এটা ঠিক দুটো নয়। ব্রহ্ম ও মায়া অভেদ, একটী বললেই অপরটী বোঝায়। যেমন দুধ আর দুধের ধবলত্ব, মনি আর জ্যোতি, সাপ আর তির্য্যক্ গতি ইত্যাদি সব অভেদ একটা বললেই অপরটা বোঝায়। যেমন একটী বাড়ীর ভেতর ঘর আছে, খাট, আলমারি, ঝাড়, লণ্ঠন ইত্যাদি আছে; এ সবগুলি বাড়ীরই ভেতর। যখনই বাড়ী বলছ, তখনই এই সবগুলি সমেত বুঝিয়ে গেল। চণ্ডীতে বলছেন 'আমাতেই উৎপন্ন, আমাতেই লয়।' মায়াতে আছে ব'লে পাঁচটা আলাদা আলাদা দেখছ, আবার মায়া গেলে সব এক দেখতে পাবে। যেমন রামপ্রসাদ বলেছে 'একেই পাঁচ, পাঁচেই এক, মন ক'রো না দ্বেষাদ্বেষি।'

কল্যাণের সঙ্গে দেব মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ সম্বন্ধে কথা হচ্ছে।

কল্যাণ। স্নান ক'রে পবিত্র হয়ে মন্দিরে গেলে ক্ষতি কি?

ঠাকুর। দেখ, দেবতার কোন ক্ষতি নেই; তাঁর কাছে পবিত্র, অপবিত্র ব'লে আছে কি? তাঁর কাছে সব সমান। তবে এই বেড় দেওয়া তোমাদের জন্যে। একে, তোমরা নিজেরা দুর্ব্বল, তোমাদের মনের সংযম কম, তার ওপর যাদের সংযম নেই বললেই হয় ও যারা আচারভ্রষ্ট, তাদের সঙ্গে অবাধে মিশলে তোমরাই ক্রমশঃ নীচগামী হয়ে যাবে। তোমরা মনে করছ তাদের তুলবে, তা আগে দেখ, তাদের তোলবার মত শক্তি তোমাদের আছে কি না? যদি তোমরা নিজেরা দুর্ব্বল হও ত তাদের তুলতে ত পারবেই না, লাভে প'ড়ে তোমরাও প'ড়ে যাবে। যাদের সে রকম শক্তি আছে, সেই সব সাধু বা মহাত্মারা তাদের তোলবার চেষ্টা করুন, তাতে কাজ হবে। মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করেছে কেন? এই ধর, তোমরা সব পবিত্র ভাব নিয়ে এখানে এস; আমি তোমাদের ভালবাসি, আবার যদি কেউ অপবিত্র ভাবে আসে তাকেও আমি ভালবাসি কিন্তু কেউ অপবিত্রভাবে বা নেশা ক'রে এলে এবং এটা সাধুস্থান বা দেবস্থান ব'লে মর্য্যাদা না রাখলে, আমার অবশ্য কিছু হোল না, কিন্তু তোমরা যে পবিত্র ভাব নিয়ে এসেছিলে সেটায় কিছু ধাক্কা লাগল এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে তোমাদের ক্ষতি হতে পারে; কারণ তোমাদের মন এখনও কাঁচা আছে, ঠিক তৈরী হয় নি। এইটে রক্ষা করবার জন্যেই মন্দিরে যাওয়ার এত কড়াকড় করা বা বেড় দেওয়া। আর দেখ, বিশেষ বিবেচনা না ক'রে হঠাৎ একটা ভাব নিয়ে বহু-পূর্ব্ব-প্রচলিত সংস্কারে ঘা দিয়ে একটা অশান্তি করা উচিত নয়।

নগেন। অনেক সময় এমন দেখা গেছে—সংক্রামক ব্যাধি ঘেঁটেও অসুখে পড়েনি। ওটা তার ভেতরের শক্তির ওপর নির্ভর করে ত?

ঠাকুর। ব্যাধি কর্ম্মজনিত। কর্ম্মের জন্য দেহের কোন কোন জায়গা

জন্ম থেকেই দুর্ব্বল হ'য়ে থাকে, তাই সময় এলে সামান্য কোন কারণ হলেই সেইখানে রোগ জন্মায়। কর্ম্ম নিয়েই মানুষ জন্মগ্রহণ করে; অপরের সংস্পর্শে তার কর্ম্মজনিত সেই ব্যাধি এসে পড়ে; আমরা কিন্তু শুধু দেখছি যে সংস্পর্শে ব্যাধিটা উৎপন্ন হ'ল। আবার আছে, অনেক সময় নিজের না হলেও অপরের কর্ম্মজনিত ব্যাধি সাধুদের ঘাড়ে এসে পড়ে কারণ সাধুরা যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবে ততক্ষণ ব্যাধি আসবেই। সহরে বাড়ী রাখলেই ট্যাক্স দিতে হবে।

কালু। ব্যাধি যদি শুধুই কর্ম্মজনিত, তা হলে ওষুধ না খেলেও ত সারবে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, ওষুধ খাও আর না খাও, সে বিশ্বাসের ওপর দাঁড়াতে পারলেই এক দিন সেরে যাবে। কর্ম্ম শেষ হলে রোগ আপনি সেরে যাবে।

কালু। কিন্তু আমরা ত দেখতে পাই অনেক জায়গায় ওষুধ খেলেই সেরে যায়।

ঠাকুর। আবার সারে না তাও ত দেখ? কর্ম্ম অনুযায়ী ঠিক ওষুধ খাবে আর সেরে যাবে। এইখানে ঠাকুর রাজা ও ঔষধকে কথা কওয়ানর গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ১ম ভাগ ৪৮ পৃষ্ঠা)।

কালু। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অগ্নি স্পর্শ করলে হাত পুড়বে ত?, তা হলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে থেকেও পাণ্ডবদের অত দুঃখ পেতে হ'ল কেন?

ঠাকুর। স্পর্শ করে কে? হাত না মন? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থেকেও সংসারকে যখন বড় করেছ, তখন বাসনা অনুযায়ী চাইবো আর তার ধর্ম্ম ঠিক ফলবে। সংসারের নিয়মই হচ্ছে সুখ, দুঃখ, কাজেই সংসারে থাকতে গেলে সুখ, দুঃখ আসবেই। সংসারে থেকে ভগবানকে ডাক কেন? শুনেছ, তাঁকে ডাকলে সংসারে ভাল হবে তাই ডাক। যদি জান যে তাঁকে ডাকলে কিছু হবে না, তাহলে আর ডাক কি? তাহলেই তাঁকে চাওনি, সংসারের সুখ চেয়েছিলে। দুঃখ ত

আর কেউ ইচ্ছে ক'রে ডেকে আনে না। সবাই যুবা থাকতে চায়, কেউ কি বার্দ্ধক্য চায়? তথাপি কালের স্বভাবে বার্দ্ধক্য আপনি এসে পড়ে। **সুখ, দুঃখ সংসারের স্বভাব, যতই সাবধান হও না কেন যেন তেন প্রকারে হোক সুখ দুঃখ আসবেই, কিছুতেই আট-কাতে পারবে না।** আর দেখ, দুঃখ ব'লে ত কোন জিনিষ নেই, বাসনা পূরণ হলেই সুখ আর পূরণ না হলেই দুঃখ। ভগবানকে মুখেই কেবল 'বড় বড়' বল, 'বড়' কিসে হয়, কি কি গুণ থাকলে তবে বড় হয়, আগে সেইটা বোঝ, তবে ত বড় যে কি তা জানবে। যে নিজে বড়, সেই কেবল বড় কোনটা তা বুঝতে পারে। তুমি ভগবানের কাছে কিছু টাকা চাইলে; হয়ত কিছু টাকা পেলে, অমনি তুমি ভগবানকে বড় বললে, আবার যদি না পাও, অমনি ভগবানকে ছোট ক'রে ফেললে। এর ওপর বড় বা ছোট নির্ভর করে না। বড় মানে হচ্ছে, তিনি দুঃখের হাত থেকে এমন নিষ্কৃতি দিতে পারেন কিনা, যাতে আর কখনও দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে এবং সর্ব্বদা আনন্দে থাকতে পার? তাই বলি তাঁকে ডেকে মনের শক্তি কর, যাতে সকল অবস্থাতেই মনের আনন্দ রক্ষা করতে পার, তাহলে কিছু শান্তি পাবে। সংসার করবার মত শক্তি কর তবে ত ঠিক সংসার করতে পারবে। ঠিক ঠিক ভোগ করাও ভয়ানক শক্ত। যে ব্যক্তি ভোগে সকল সময় আনন্দ রক্ষা করতে পারে সেই ঠিক ভোগ করতে পারে। তোমরা ভোগ করতে পার কোথায়? সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। যখনই ভবিষ্যতের জন্যে কোন ভয় থাকবে না, অর্থাৎ আজ যে সব জিনিষ নিয়ে ভোগ করছ, সে সব জিনিষ চ'লে গেলে কোন চিন্তা রাখবে না বা দুঃখ পাবে না, অর্থাৎ মায়ার বস্তু থাক বা যাক তার ওপর কোন লক্ষ্য রাখবে না, তখনই ঠিক ঠিক ভোগ করতে পারবে। নির্ভীক হওয়া চাই, তবে ত চিত্ত প্রসন্ন থাকবে। মায়াতে প'ড়ে,

যে যে বস্তু নিশ্চিত ধ্বংস হবে সেইগুলিকে রক্ষা করবার জন্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক ব'লে এত দুঃখ পাও। তুমি বরাবরই ধ'রে রাখতে চেয়েছ, কখনই ছাড়তে চাও নি; যখন ঠিক বুঝতে পারবে যে না, এ সব ত একদিন যাবেই, হাজার চেষ্টা ক'রে ধরে রাখলেও থাকবে না, তখন একে আর অত জোর ক'রে ধরবে না, এবং গেলেও তত দুঃখ পাবে না। সৎসঙ্গে এইগুলো ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দেয় ও চৈতন্য ক'রে দেয়, তখন গতি করা অনেকটা সোজা হয়। প্রারব্ধ যখন ভাল চলে তখন যেটা ধর সেইটাই হয়, আর তুমি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ঠাওরাও, আবার প্রারব্ধ যখন খারাপ হয় তখন যেটা ধর সেটাই হয় না, তখন লোকে তোমাকে বোকা বলে। এই বুদ্ধিমান বা বোকার কোন অর্থ নেই, দুয়েরই এক অবস্থা; সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান যে বুঝতে পারে যে এই জগতটা দুঃখময়, আর সেই দুঃখের হাত থেকে যথার্থ নিষ্কৃতি পেতে চেষ্টা করে। সৎসঙ্গের এত প্রভাব দিয়েছে যে সঙ্গ অনেক সময় বহু কর্ম্ম ভস্মীভূত ক'রে দেয়। কর্ম্মের দরুণ কিছু হয়ত ভোগ হতে পারে, কিন্তু নৌকাডুবি হয় না, ফিরিয়ে আনবেই। এইখানে ঠাকুর পিতৃশ্রাদ্ধকারী ধনী ও চিত্রগুপ্তের গল্প বলিলেন। (অমৃত-বাণী ২য় ভাগ ২১ পৃঃ) এখানে দেখ, সংসারীদের জন্যে দান, অতিথি সৎকার, সাধু সেবা ও সাধুসঙ্গ এইসব দিয়েছে। এর দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হয় ও ঠিক চৈতন্যের উদয় হয়, কারণ সংসারীরা ত সাধন ভজন ক'রে গতি করতে পারে না। মানুষ দুঃখ আদির দ্বারা তবু ভগবানকে কিছু ডাকে, কিন্তু অর্থ, সম্পদ নেশার মত একেবারে ভুলিয়ে রাখে, চৈতন্য আসতে দেয় না, মাথা বিকৃত ক'রে দেয় এবং ভগবানকে ডাকতে দেয় না। তবে যে, অর্থ, সম্পদের অধীন হয় না, এবং মায়া, মোহ, কামিনী, কাঞ্চনের মধ্যে থেকেও, যে ঠিক ভাব বজায় রাখতে পারে ও তাঁকে ডাকে সেই মহৎ, সেই মহামহিমশালী।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন।

ঠাকুর। অন্ততঃ কিছু সময় মন দিয়ে সৎসঙ্গ করবে; তা হলে তিনি অনেক ভার নেন ও দুঃখ কমিয়ে দেন। সৎসঙ্গ করলে সৎভাব লাগবে, তখন সংসার দুঃখময় এ বোধ আসবে এবং প্রয়োজন ঘুরে যাবে। এইখানে ঠাকুর 'সনাতন ও পরশমণির' গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ২য় ভাগ, ১৭২ পৃঃ)। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ, যে সংসারীর সঙ্গ ক'রে, সমস্তক্ষণ সংসারে খেটে কোন মুনফা নেই, সব একদিন চ'লে যাবে, কিছুই থাকবে না, এসব দেখেও তাতেই আবার ম'জে থাক। তার ওপর দেখ, একে নিজের দুঃখে অস্থির, আবার পরের দেখে নকল করতে গিয়ে বেশী দুঃখ পাও। সৎসঙ্গে এগুলো ঠিক বুঝতে পারা যায়। আবার সৎসঙ্গের এত প্রভাব যে বহু সাধনায় যা না হয়, সঙ্গে মুহূর্ত্তে তা হয়ে যায়। একই জিনিষ শক্তিসম্পন্নের কাছে অন্যরূপ ধারণ করে। এইখানে ঠাকুর 'রূপ সনাতনের' গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ২য় ভাগ ১৭২ পৃঃ)। সনাতন শক্তিসম্পন্ন ছিলেন ব'লে তাঁর মৃত্তিকা পাত্রে কয়লা দিয়ে লেখা প'ড়েই রূপ সব ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দ্বিজেন গাহিল—

(১)

কেন মন তারে চায় সেই শ্যাম রায়।
আমি ভুলি ভুলি মনে করি ভোলা নাহি যায়॥
শ্যাম মোরে ছেড়ে গেছে, ব্রজের কথা ভুলে গেছে।
এখন কুব্জা দাসী বামে আছে, ও সে রাজা মথুরায়॥
নিঠুর চোরেরই সনে, কেন মজিলাম জেনে শুনে।
এখন তাহার বিচ্ছেদ বাণে বুঝি প্রাণ যায়॥

দণ্ডায়মান—ত্রিমনাথ বরেন তারানাথ রসিক

(২)

আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল ক'রেছ গর্ব্ব করিতে চূর ॥
যশ, অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য সকলই করেছ দূর ॥
ঐ গুলো সব মায়াময় রূপে ফেলেছিল মোরে অহমিকা কূপে।
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল করিলে দীন আতুর।
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছ গর্ব্ব করিতে চূর॥
যায়নি এখনও দেহাত্মিকা মতি, এখনও কি মায়া দেহটার প্রতি।
এই দেহটা যে আমি এই ধারণায় হয়ে আছি ভরপূর।
জানিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ।
তাই বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিলে বেদনা দিলে প্রচুর।
আমায় কতনা যতনে শিক্ষা দিতেছ গর্ব্ব করিতে চূর ॥

শ্রীশ্রীঠাকুর গাহিলেন—

এলো একটা নেংটা মেয়ে অঙ্গে তার রুধির ধারা।
রূপে ভুবন আলো করে লোম কূপে রবি শশী তারা ॥
জগৎ খানা সৃষ্টি ক'রে নিজের ছেলে খায় গো ধ'রে।
আবার পতি তার পায়ে প'ড়ে, বামার পদ ভরে কাঁপে ধরা ॥
নরকর বেড়া কটি খড়্গ মুণ্ড ধরা মুঠি।
যে যা চায় পায়গো সেটি, মুখ খানি তার হাসি ভরা ॥
দেখলে নয়ন যায় গো ফুটে মনের আঁধার যায়গো ছুটে।
মায়ার বাঁধন যায়গো কেটে, আনন্দে তার প্রাণটী ভরা ॥
ভয় ভাবনা থাকেনা রে, আপন পর সে বোঝেনা রে।
সবাই আপন ভাবে তারে, হ'য়ে যায় সে সৃষ্টিছাড়া ॥

তৃতীয় ভাগ—অষ্টাদশ অধ্যায়

কলিকাতা; সোমবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সাল।
ইং ৫ই জুন ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে দ্বিজেন, ললিত, অতুল, জিতেন, কালীমোহন, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, মতি, দ্বিজেন সরকার, নগেন ও অভয় আছে।

জিতেন। কালীঘাটে লোকে যে নানারকম মানত করতে যায় তা কি ফলে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, ফলে বই কি। যদি ষোল আনা মন দিয়ে প্রার্থনা করে ত ফলবেই। তা ভিন্ন জোর মন দিয়ে প্রার্থনা না করলে অর্থাৎ এর সঙ্গে অপর দিকেও কিছু মন থাকলে কখনও ফলবে আবার কখনও ফলবে না।

জিতেন। ষোল আনা মন দেওয়া মানেই ত একলক্ষ্য হওয়া। একলক্ষ্য হলেই ত ভগবান লাভ হয়, তা হলে সে আবার অপর কামনা নিয়ে যাবে কেন?

ঠাকুর। তা কি হয়? ভগবানের প্রতি একলক্ষ্য হ'লে তবে ত তাঁকে লাভ হবে। ভগবান ছাড়া সাংসারিক বস্তুতেও এক একটায় ক্ষণিক একলক্ষ্য হওয়া যায়। সংসারীয় কোন বস্তুর বিশেষ প্রয়োজন হলে তখন মন সেই দিকে একলক্ষ্য হয়, অপর সব বস্তু মন থেকে ছেড়ে যায়। কিন্তু যতক্ষণ না সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ততক্ষণই মন কেবল তাতে থাকে, যেই আবশ্যক মিটে গেল অমনি মন অন্য বস্তু ধরে। যেটা যখন বেশী প্রিয় বোধ হয় সেইটার জন্যে তখন একলক্ষ্য হয় ও বহু কঠোরতা স্বীকার করতে পারে। ছেলের অসুখ হলে না খেয়ে তারকনাথে হত্যা দিয়ে পড়ে

থাকে। আবার কেউ বা টাকার জন্যে কত না কঠোর করে। এ রকম, সংসারের জন্য মানুষ খুব বেশী কঠোরতা করে। সংসার বস্তুতে একলক্ষ্য আর ভগবতে একলক্ষ্য হওয়ার তফাৎ এই, ভগবানে একলক্ষ্য হলে শুধু সেইটাই ধ'রে থাকে; সেটা ছেড়ে আর অপর একটা ধরে না, কারণ ভগবানে মন গেলে সংসারীয় বস্তু আর ভাল লাগে না ও মন ধরে না। সন্দেশের তার পেলে কেউ আর চিটে গুড়ে ভোলে না। যদি কেউ চিটে গুড়ে ভোলে, তা হলে জানবে সে সন্দেশের তার পায়নি।

জিতেন। এ রকম কোন জিনিষে মন জোর ক'রে পড়লে অনেক সময় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে যায় ত?

ঠাকুর। হ্যাঁ, মন ত দুটো ধরে না। একটা জোর ক'রে ধরলে, মন তাতেই বিভোর হয়ে যায়, তখন আর অপর দিকে লক্ষ্য থাকে না। মন জোর ক'রে পড়ার লক্ষণই হচ্ছে অপর বস্তুর জন্যে মনে কোন চিন্তা নেই; যত বড় লোকসানই হোক, সে দিকে নজর নেই। সেই আছে না—এক পণ্ডিত খুব তন্ময় হয়ে শাস্ত্র লিখছে; বাড়ীতে ছেলেকে সাপে কামড়েছে, স্ত্রী ছুটে ব'লে গেল, তা ভ্রূক্ষেপ নেই শাস্ত্রই লিখছে। যখন মারা গেল কান্না উঠল, তখন বললে কান্না কেন? সবাই বল্লে তোমার ছেলেকে সাপে কামড়েছে, সে ম'রে গেছে। শুনে 'তা বেশ, বেশ!' ব'লে আবার লিখতে লাগল। দেখ, শাস্ত্রে এত বিভোর যে কোন কথা তার উপলব্ধি হ'ল না; সে তখনও ঘটনাটা কি বোঝেনি, একটা ফাঁকা জবাব দিয়ে গেল। যখন এই রকম মনটা তাঁর দিকে পড়বে তখন অন্য কোন ঘটনাতে মন আর যাবে না। ভগবানে মন ডুবে গেলে সমাধি হয়, তখন একেবারে বাহ্যজ্ঞান থাকে না, দেহটা জড়ের ন্যায় হয়ে যায়। তোমরা সংসারী, তোমাদের মায়া আছেই, তাই সেই মায়া সৎএর ওপর কর ত সৎ হবে আর অসতের ওপর কর ত অসৎ হবে; মনটা পড়া নিয়ে কথা। ধর, রাস্তায় যেতে যেতে কোন একজন

লোকের সঙ্গে দেখা হলে, তুমি, দেরী হয়ে যাবে ব'লে দুটো কথা ব'লেই চলে যাও, কিন্তু একজন প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লে, যত বেলা হ'ক, যত কাজ ক্ষতি হ'ক, তার ওপর আসক্তি থাকায় তাকে তখনই ছেড়ে যেতে পার না। ভালবাসারও আবার তিনটী ভাব আছে, প্রথম রাগাত্মিকা বা সামর্থ্যা, অর্থাৎ পূর্ণ ভালবাসা, এতে নিজের লাভ লোকসান কিছুই দেখে না, ও অপর কোন দিকে লক্ষ্য রাখে না। যেমন শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম। সে কৃষ্ণকে ভালবাসে, তাকেই চায়, কৃষ্ণের সুখে সুখী, নিজের যা হয় হোক। তার অন্য চিন্তা নেই, দোষ গুণ বিচার নেই। তাই ললিতা বলেছিল 'তোর সামর্থ্যা প্রেম, তোর আবার মান কি? তুই নিজের সুখের জন্য মান, করলি! যেমন কাজ করেছিস, ফল ভোগ কর।' দ্বিতীয় সামঞ্জস্যা, অর্থাৎ দুই দিক বজায় রাখে। এ ক্ষেত্রে ভালবাসা খুব জোর আছে, নিজের কোন লাভের দিকে লক্ষ্য থাকে না বটে—কিন্তু নিজের কিছু লোকসান করতে চায় না। সবদিক ঠিক বজায় রেখে মানিয়ে চলতে চায়। তৃতীয় সাধারণী, এতে যে ভালবাসা আছে, সেটা শুধু নিজের স্বার্থের জন্যেই; সেই স্বার্থে ঘা পড়লে বা নিজের লোকসান হলে আর ভালবাসতে পারে না; স্বার্থ না পুরলে বা কিছু লোকসান হলেই ভালবাসা চলে যায়।

পুত্তু। ধরুন, রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খেটে এসে ইচ্ছা থাকলেও এখানে এসে অত রাত্র পর্য্যন্ত থাকলে শরীর খারাপ হতে পারে ত? শরীরের বিশ্রাম চাই ত?

ঠাকুর। এটা কি জান, মনের শক্তির ওপর। যখন যে জিনিষটা প্রিয় হয়, তখন তার জন্যে উদ্যম আসে, তখন সে জন্যে কঠোরতা বোধ থাকে না। এই মঠেই দেখেছি সুরূপা ব'লে একটি মেয়ে টানা ৬ মাস অসুস্থ শরীরে জ্বর নিয়ে রাত্রে মাত্র দু ঘণ্টা ঘুমিয়ে বাকী সময় খাড়া হয়ে আমার সামনে বসে আছে; তাও এই দু ঘণ্টা তাকে জোর ক'রে পাঠিয়েছি। তা হলেই দেখ, এ দু ঘণ্টাও সে প্রয়োজন

বোধ করেনি, আর এমনি ব্যাপার যে বাকী সময় সে একটুও ঢুলত না এবং তার মুখ দেখে মোটেই মনে হ'ত না যে সে এত কষ্ট করছে। বিশ্রাম দরকার কাদের? যারা বিশ্রাম চাচ্ছে। যারা থাকতে কষ্ট বোধ করছে অথচ জোর ক'রে রয়েছে, তাদেরই শরীর খারাপ হতে পারে। আর কি জান, ভগবানের দিকে গেলে শরীর খারাপ হ'তে পারে না। তাঁর আলাদা শক্তি থাকে তাতে শরীর খারাপ হয় না বা কঠোরতা বোধ হয় না; অমৃত সাগরে ডুব দিলে অমর হয়, মরে না। এই দেখনা, মঠে যারা রয়েছে, তাদের এত বেলায় ও এত রাত্রে খাওয়া ও এত কম ঘুম সত্ত্বেও শরীর ত খারাপ হয়ই না বরং ঢের ভাল হয়; অথচ বাড়ীতে সকাল সকাল নিয়ম ক'রে খেয়ে শুয়ে, এত তোয়াজে থেকেও অসুখে ভুগছে। মোট কথা অলসতাকে কিছুতেই আশ্রয় দিওনা শরীরকে যতটা পারবে কঠোর করাবে।

দ্বিজেন। ১২ বৎসর গুরু সঙ্গ করার পরও সাধারণ ভাব থাকতে পারে?

ঠাকুর। ঠিক সে ভাব থাকতে পারে না কিছু যাবেই, আর দেখ, ১২ বৎসর সঙ্গ কি দিয়ে করলে? দেহ সঙ্গ করেছে না মন সঙ্গ করেছে? যে, যে ভাবে আসবে তার সেই ভাবে কাজ হবে। যে ত্যাগের পথে আসতে চায়, তাকে ত্যাগ আনিয়ে দেয়, আবার যে অর্থ সম্পদাদি সাংসারিক ভোগের জন্য আসে, তার সে দিকে খানিকটা লাভ হয়। তবে শুধু দেহ সঙ্গ করার জন্য কিছু জল মরবেই, পূর্ব্বের বৃত্তি কিছু কমবেই। এই দেখনা, দেবস্থানের পাণ্ডা রোজ সমস্ত দিন পাশে ব'সে রয়েছে, তার কি সব বাসনা গেছে? সে পূজা করছে, সমস্তদিন স্পর্শ করছে, কতবার মাথায় হাত বুলুচ্ছে, কিন্তু সেই সামান্য মাইনেতে জীবনটা দুঃখে কাটাচ্ছে, আবার সাধারণের মত গালাগালও দিচ্ছে এবং নানা উপায়ে পয়সাও নিচ্ছে। তার ত বিশেষ কিছুই হয়নি, কারণ তার ত আর দেবতাকে স্পর্শ ক'রে ভাল হবার আগ্রহ নেই; তার মন পূজার জিনিষ, পয়সা ইত্যাদির ওপর রয়েছে, সেইগুলো সামলাতে গিয়ে

সমস্তদিন ছোঁয়া হচ্ছে, মাথায় হাত বুলুনো হচ্ছে। উদ্দেশ্য ভিন্ন, কাজেই সেই রকম লাভ হয় না।

নগেন। একজন বলছিল ১২ বৎসর সঙ্গ করার পর যে সব লক্ষণ শাস্ত্রে আছে তা যখন মিলছে না, তখন ঠিক সঙ্গ হচ্ছে না।

ঠাকুর। প্রথমেই কথা হচ্ছে, ১২ বৎসর আগে কার কি ছিল, এখনই বা কি হয়েছে, তা কেউ দেখতে পাচ্ছ কি? তারপর দেখ, কি জন্য সঙ্গ করছ, কি চাইছ, কি ভাবে সঙ্গ করছ? মন দিয়ে না দেহ দিয়ে? কতক্ষণ সঙ্গ করছ, আবার কতক্ষণই বা বিরুদ্ধ সঙ্গ করছ? এ সব বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ তবে ত ঠিক ধরবে। তার কি ছিল, কি হয়েছে, এ মাপ করছে কে? কি নিয়ে সে এসেছিল, সে ওজন করেছিলে কি? তা না হলে কি ক'রে মাপবে? তা ছাড়া কার ভেতর কি হয়েছে তা ধরবার ক্ষমতা আছে কার? কে কি ভাবে আসছে, কার কতক্ষণ বিরুদ্ধ সঙ্গ হচ্ছে, এ সবই ত আমার জানা আছে। আমি প্রমাণ ক'রে দিতে পারি সাধু সঙ্গের কত বড় জোর প্রভাব। না হলে, এত বিরুদ্ধ সঙ্গ সত্ত্বেও তোমরা এত শীঘ্র এত উন্নতি করতে পার না। জল পরিষ্কার করতে চাও যদি তাকে বেড় দেবে ত যাতে ময়লা জল না ঢোকে। আর এর বেলা ২৩ ঘণ্টা বিরুদ্ধ সঙ্গ করবে আবার বলবে কিছু হ'ল না। সকলের ত সমান হবে না। যার যেমন মূলধন সে সেই রকম লাভ পাবে, চার আনা মূলধনে আধপয়সা লাভ পাবে, আর বেশী মূলধনে বেশী লাভ পাবে এই সাধারণ। সকলেই যদি একদিনে শুকদেব হতে চাও, তাত আর হবে না। এই করতে করতে তবে ত বৃত্তিগুলো মরবে এবং তখন ঠিক কাজ হবে।

কালীমোহন। শঙ্করাচার্য্য বলেছেন 'ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা', তা ক্ষণ মাত্র মন দিয়ে সঙ্গ করলেই যখন হওয়া উচিত তখন আধ ঘণ্টা কম বলছেন কেন? আধ ঘণ্টারই বা দরকার কি?

ঠাকুর। এটা, সঙ্গের জোর প্রভাব দেখাবার জন্যে এরকম

বলেছেন। সঙ্গ মানে এক চিন্তা, মনে অপর চিন্তাই নেই। এই ভাবে ঠিক ঠিক মন দিয়ে সঙ্গ করলে তাই বটে। আছেই ত 'একনামে মুক্তি পায় নরে, এই বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে, গোষ্পদ সমান তার এ ভব সংসার' একবারের জায়গায় তিন বার রাম নাম শোনাবার জন্যে গুহককে চণ্ডাল হতে হল, একি সোজা কথা! এখানে ঠাকুর নারদ ও চাষার গল্প বলিলেন—একদিন নারদের সঙ্গে কথা হতে হতে ভগবান বললেন অমুক গ্রামের অমুক চাষার আমার ওপর খুব জোর বিশ্বাস। তাই শুনে নারদ ভাবলে সে ভক্তটীকে ত একবার দেখে আসতে হবে। নারদ একদিন তার কাছে এসে দেখে যে সে একবার সকালে আর একবার সন্ধ্যার সময় ভগবানের নাম করে এবং বাকী সময় সংসারের কাজ করে। নারদ দেখে ভাবলে 'এ দিনান্তে মাত্র দুবার নাম করে, আর এ হ'ল জোর বিশ্বাসী ভক্ত! যাই হোক যখন এসেছি, একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখিনা।' এই বলে চাষাকে ডেকে বললে ওহে বাপু তুমি সমস্ত দিনে মোটে দু'বার ভগবানের নাম কর কেন? এই শুনে সে ব'লে উঠল 'চুপ, চুপ, আমার এখনও তাঁর ওপর তত জোর বিশ্বাস আসে নি, তাই এখনও একবারের জায়গায় দু'বার নাম করছি, আর আমায় বেশী অবিশ্বাসের ভেতর ফেলো না' নারদ তার বিশ্বাসের জোর দেখে অবাক! ঠিক মন দিতে হলেই প্রেম আসা চাই। তখন তাকে উন্মাদ ক'রে দেবে, সব ছেড়ে যাবে।

ঠাকুর গাহিলেন—

মন মজল যার সনে।
আমি ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াই শুধু তারে দেখিনে॥
এমন মানুষ কি দেখেছিস তোরা,
সে যে দোষ করলে রোষ করে না, প্রেমে ডাকলে দেয় ধরা।
(ও সে) বড় ভালবেসে কাছে আসে রে (ও ভাই) আপন পর তার নাই মনে॥

তোরা ব'লে দেনা ভাই কোথা গেলে, কি করিলে মনের মানুষ পাই।
পেলে পরে ছাড়ব না আর তারে রাখব ধ'রে প্রাণপণে ॥
দীন বলে (এখন) বুঝেছিরে ভাই সকল ছেড়ে আপন ভুলে শুধু
তারই হওয়া চাই।
(দেখবি) আনন্দের স্রোত বইবে তখন তুই ভেসে যাবি সেইখানে ॥

এ ভাব ত মূহূর্ত্তের মধ্যে হতে পারে, আর এ ভাব এলে তার ত হয়েই গেল। এটা ত্যাগীদের জন্যে বলেছেন। যাদের বৈরাগ্য এসেছে এবং যারা ত্যাগের দিকে যেতে চাচ্ছে তাদের পক্ষে তখন হয় ত হঠাৎ একবার সাধুসঙ্গ হ'তেই তারা সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল; যেমন শুকনো কাঠ হ'লে একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়লেই ধ'রে ওঠে কিন্তু ভিজে কাঠে তা হয় কি? তা ছাড়া কথায় আছে সময় না হলে হয় না; এর মানে হচ্ছে, মানুষের জীবনে একটা ক্ষণ আছে ঠিক সেই ক্ষণে যদি সাধুসঙ্গ হয় ত তখনই হঠাৎ সব ছেড়ে চ'লে যায়। একটা প্রবাদ আছে, একটা আস্ত কাঁটাল খেলে সাপের বিষ নষ্ট হয়ে যায় তখন আর সাপে কামড়ালে সে মরে না; কিন্তু ঐ কাঁটালের মধ্যে একটী বিশেষ কোয়া আছে কেবলমাত্র সেইটী খেলেই সাপের বিষ নষ্ট হয়ে যায়। তা যেমন সেই কোয়াটী কোথায় আছে ঠিক জানা যায় না ব'লে সব কাঁটালটা খেতে হয়, তেমনি আমাদের জীবনে ঠিক সেই ক্ষণটী কখন জানা নেই ব'লে সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করা উচিত।

জিতেন। যারা সাধন ভজন ক'রে যাবে, তাদের আর সঙ্গ দরকার কি? তারা ত বিবেক বৈরাগ্য নিয়ে গতি করবে।

ঠাকুর। সঙ্গ ছাড়া কিছু হবার উপায় নেই। বিনা সঙ্গে এ পর্য্যন্ত কারুর ক্ষমতা হয়নি যে এক চুল এগুতে পারে। যিনি যেমনই হোন, যত বড়ই হোন, সঙ্গ ছাড়া এ পর্য্যন্ত কেউ কিছুই করতে পারেন নি, পারবেনও না। সংসার ছেড়ে বাইরে নিজের চেষ্টায় কত কঠোর ক'রে দু'বছরে যা না করতে পারবে, সঙ্গে এক

ঘণ্টায় তাই হবে। এমন কি অবতাররাও লোকশিক্ষার জন্য আগে এই সব পথ (পন্থা) দেখিয়ে গেছেন। অবতারদের ত আলাদা কথা, তাঁদের আগে ফল তারপর ফুল, যেমন লাউ' কুমড়ার। তা হলেও লোকশিক্ষার জন্যে তাঁরা সেই ফুল রেখে দেন ফেলে দেন না। আর সাধারণের আগে ফুল তারপর ফল। পরমহংসদেব পর্য্যন্ত লোকশিক্ষার জন্য তোতাপুরি প্রভৃতি কত সাধুদের সঙ্গে কত সাধনা করেছেন, কত কঠোর করেছেন এবং এমন কি সাধারণের মত, যেন আর ধৈর্য্য রক্ষা করতে না পেরে, জলে ডুবতে ও গলায় খাঁড়া বসাতে গেছলেন। আর তোমরা সাধারণ সংসারী—কানা, খোঁড়া, কালা বললেই হয়, তা তোমাদের বিবেক মানে কি? দু হাজার জিনিষ ধরেছিলে, তার মধ্যে না হয় ১০টা ছাড়লে। এতেই তোমরা একেবারে মস্ত হতে চাও? তাঁর জন্যে তোমরা কি কঠোর করেছ? কত বাসনা ত্যাগ করেছ? কত আহার, নিদ্রা, দেহসুখ তুচ্ছ করেছ? কত লোকসান স্বীকার করেছ? সংসারের মায়া কাটিয়ে তাঁকে কতটুকু মন দিয়েছ যে তোমরা মুনফা দেখতে চাও আর তাঁকে দোষ দাও? তোমরা সংসার চিন্তায় উন্মাদ হয়ে রয়েছ; দেহ সুখে ভরা, কঠোরতা ত দূরের কথা, সামান্য একটু ধাক্কা নেবার ক্ষমতা নেই; বেশ সময় মত ভাল ভাল খাচ্ছ, ঘুমুচ্ছ, আর ক্লাবে যাবার মত একবার এখানে এসে ব'সে দুটো গল্প করে, দুটো বুক্‌নি ঝেড়ে চ'লে যাচ্ছ। এতেই তোমরা মনে করছ কি না করছি? ঠিক ঠিক সঙ্গ করছ হয়ত বড় জোর ভেড়ার শৃঙ্গে সরষে থাকে যতটুকু সময় কেবল ততটুকু মাত্র, অথচ এসত্ত্বেও যে তোমাদের সংস্কার ঘুরে গিয়ে সৎ হবার বা সৎপথে গতি করবার ইচ্ছা হচ্ছে তাই কি কম হ'ল? যে টুকু দিচ্ছ তার তুলনায় এই যা পেয়েছ, এই যথেষ্ট লাভ মনে করা উচিত। আবার তোমাদেরই মধ্যে কারুর হয়ত হঠাৎ এমন ভাব আসতে পারে যে সে তখন বুঝতে পারবে, 'তাই ত এই সব বাজে কাজে ও সংসারের আত্মীয় স্বজনের মায়ায়

প'ড়ে সময় নষ্ট করছি কেন ?' সে তখন সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। বদ্ধই মুক্ত হয়। সাধু ত আর গাছ থেকে পড়ে না, সেও মার পেট থেকে বেরোয়। এরা বিচার ক'রে বৈরাগ্য নিয়ে বেরোয়, অর্থাৎ এরা জ্ঞান পথ অবলম্বন করে। আবার কেউ কেউ প্রেমে সব ছেড়ে বেরোয়। এ হ'ল ভক্তি পথ। প্রেম এলে মনটা একদিকে জোর পড়ায় অপর সব ছেড়ে যায় ; তখন দেহসুখ, আহার, নিদ্রা সব তুচ্ছ হয়ে যায়। এসব না গেলে কিছুই হবার উপায় নেই, তা যে ভাবেই যাক, বিচার করে বা ভালবেসে। ভক্তিতে জোর করে ছাড়তে হয় না। যেমন ঘুমুবার আগে 'চিন্তা করব না' মনে ক'রে ত ঘুমাও না, অথচ ঘুমুলেই সব চিন্তা ছেড়ে যায়। যেটা প্রিয় সেইটার ওপরই ত বাসনা হয়। এর আর তিনি ছাড়া অন্য প্রিয় নেই, কাজেই আপনা আপনি সব বাসনা যায়। তোমরা ত চোখ শূন্য, তোমাদের মাপ করার মত চোখ কই ? যাঁরা খুব ওপরে উঠেছেন, যাঁরা সকল প্রকৃতি নিয়ে খেলা করেন, তাঁরাই কেবল ধরতে বা বুঝতে পারেন। যদি কখনও কাহাকেও ঠিক ভালবেসে না থাক বা কেহ তোমাকে কখনও ঠিক ভালবেসে না থাকে ত তুমি ভালবাসা কি বুঝতেই পারবে না। যাকে ঠিক ভালবাসছ সে ছাড়া অপরে কি বুঝবে ? ভক্ত আবার গুরুকে দুইভাবে দেখে, একহচ্ছে গুরুই সব, তাঁকেই ভালবেসে সুখী হয় ; মন প্রাণ সব তাঁকে দিয়ে ফেলে, কিছুই রাখে না বা ভাবে না ; সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এরা ত নিশ্চিন্ত। এরা জাহাজের পেছনে নৌকা বেঁধে ব'সে আছে, জাহাজ টেনে নিয়ে যাবে, নৌকাকে বেয়ে যেতে হবে না। আর হচ্ছে, গুরুকে দালাল ভাবে। তিনি ভগবানকে পাইয়ে দেবেন ব'লে এই বিশ্বাসে তাঁর কথা মত কার্য্য করে। সৎসঙ্গের এমনই জোর প্রভাব যে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সঙ্গ করলেই কিছু ফল হবেই।

কালু। আচ্ছা এখানে ব'সে বাড়ীর চিন্তা করার চেয়ে বাড়ীতে ব'সে আপনার চিন্তা করা ভাল নয় কি ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, কিন্তু বাড়ীতে এত বিরুদ্ধ জিনিষ রয়েছে যে মন স্থির করতে দেয় না, টক্ করে ভেঙ্গে দেবে। সেই জন্যই এখানে আসা, যাতে এখানে যতক্ষণ থাক, অন্তঃত তত্তক্ষণ বাড়ীর বিরুদ্ধ জিনিষ গুলো মনকে না ধরতে পারে। দেখ, বাড়ীতে ব'সে এখানকার চিন্তা করতে পারত ভাল, কিন্তু যদি এখানে ব'সে সংসার ভুলতে পার ত সে আরও ভাল ও বড়।

কালু। অনেক সময় যে শরীরে কুলোয় না ; শরীর খারাপ হলে কি ক'রে আসব ?

ঠাকুর। শরীর খারাপ হলে বাড়ীতে রইলে ত, সেটা আর ছাড়লে না। এক ত ২৪ ঘণ্টার ভেতর বড় জোর ২ ঘণ্টা এখানে দিচ্ছ, বাকী ২২ ঘণ্টা সংসারে দিচ্ছ ; তা এই দু ঘণ্টাও যদি কোন অছিলায় কমাও বা কেবল ঘড়ির দিকে নজর রাখ, তাহলে আর কি হল ? আমি ত আর তোমাদের সংসার ছেড়ে আসতে বলিনি বা বেশী কঠোর করতে দিইনি। সাধারণ ভাবেই বলছি—এই, একটা নীতি নিয়েও যদি নিয়ম মত চলতে না পার ত কি করলে ? নীতি বল চাই। ঠিক নীতি রক্ষা করতে পারলেও অনেকটা হ'ল, তখন কিছু পারলেও পারতে পার। আমি ত আর কারুর অধীন নই, তবে যেখানে সেই ভাব পাই সেখানেই একটু বেশীক্ষণ থাকি। মেয়েরা একে তোমাদের অধীন, তার ওপর সংসার, ছেলে, মেয়ে নিয়ে বিব্রত, আবার তোমাদের মত স্বাধীনভাবে আসতেও পারে না। বেশী পয়সা খরচ ক'রে গাড়ী ক'রে ছাড়া আসবার যো নেই তত্রাচ দেখ, তারা এত বাধা সত্ত্বেও সকল রকম অসুবিধা, বাড়ীর বকাবকি সব উপেক্ষা ক'রেও ছুটছে এবং এখানে এসে সব ভুলে রয়েছে, যাবার সময়ের দিকে নজর নেই ; তাদের এ ভাব নোব না ? আর যতক্ষণ আমার কথা শুনবে বা আমার কাছে থাকবে, ততক্ষণ খাওয়া নাওয়া সব ভুলে ব'সেই আছে। কাজেই তাদের ভাবটা তোমাদের চেয়ে বড় বলতে হয়, তাই তাদের সঙ্গে একটু

থাকি। আমি ত তাদের কাছে থাকি না, তাদের ভাবের কাছে থাকি। নইলে ইচ্ছা করলেই কি ছেড়ে কাশী চ'লে যেতে পারতুম? আর দেখ, কষ্ট ভোগ করলে শরীর খারাপ হয়, আনন্দ করলে শরীর খারাপ হয় না; যদি আনন্দ ক'রে এখানে আসতে পার ত শরীর খারাপ হতে পারে না। তা ছাড়া ধর্ম্মভাবের ওপর থাকলে এমন কি যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও থাক, কিছুতেই শরীর খারাপ হবে না। তোমরা বল না, আমি সমস্ত দিন রাত এই সব কথা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কাটিয়ে দোব। এসব আমার এত ভাল লাগে যে আমার কোন কষ্টই হবে না। চালাই না কেন জান? তোমরাই টেকতে পারবে না, একদিন বা দু'দিন পরেই হয় ত শরীর খারাপ হবে, আর এদিকেও আসবে না। তবে যার প্রেম বা অনুরাগ এসেছে, তার কথা আলাদা; তার ত আর অপর কোন দিকে নজর থাকে না। সে বিভোর হয়ে থাকে। যখনই দেখব; কারুর এদিকে এত টান হয়েছে যে সে বাড়ী যেতে চায় না বা নেহাৎ যে সময় না গেলে নয়, সেই সময় যতটুকু কম পারে সেখানে থাকে, বাকী সব সময় এখানে, তখনই জানব যে তাঁর ওপর তার কিছু ভালবাসা লেগেছে ও সে গতি করতে পারবে।

পুত্তু। আবার সব ভাবের ভেতর দিয়ে না গেলে নাকি ঠিক হয় না?

ঠাকুর। মন যখন ভগবানের দিকে যায়, তখন অপর সব সাংসারিক ভাব মরতে থাকে। শেষে অপর সব ভাব নষ্ট হয়ে গেলে তবে একলক্ষ্য গতি করতে পারে। আর যদি বল যে ভগবৎ পথের সব ভাব দিয়ে গতি করতে হবে, তা সে আপনিই হয়ে যায়। তাঁকে প্রাপ্ত হলে আর কোন ভাব জানবার বাকী থাকে না।

দ্বিজেন। তা হলে পরমহংসদেব মুসলমান ধর্ম্মের ভাব নিয়ে সাধনা করেছিলেন কেন?

ঠাকুর। তাঁর কাছে সকল সম্প্রদায়ের লোক আসবে। তাঁকে সকলকেই নিয়ে যেতে হবে। তাই তিনি সব ধর্ম্মের সাধন পথ গুলো অভ্যাস ক'রে রেখেছিলেন। কারণ পথ সব জানা থাকলেও নিজের অভ্যাস না থাকলে, অপরকে শিক্ষা দিয়ে সেই পথে নিয়ে যাওয়া তত সুবিধা হয় না। তুমি মোটর গাড়ী চালাবার সব নিয়ম জান; কোন্‌টার পর কোন্‌টা দরকার এবং কিসে কি হয় সবই জানা আছে, কিন্তু যদি নিজে চালাবার অভ্যাস না রেখে থাক তা হলে কি অপর একজনকে চালান শেখাতে পার?

শ্রীশ্রীঠাকুর দ্বিজেনকে গান গাহিতে বলিলেন।

দ্বিজেন শ্রীশ্রীঠাকুরের রচিত গান গুলি গাহিলেন

(১)

ঐ শ্যামের বাঁশী বাজিছে।
কত সোহাগে, কত আদরে বাঁশী 'রাধা' 'রাধা' ব'লে ডাকিছে॥
চঞ্চল চিত ধৈরয মানে না, কারুর মানা সে ত শোনে না শোনে না।
গুরুজনার ভয় করে না করে না, মন সদা তারে চাহিছে॥
শ্যাম বিনে সখি যে যাতনা প্রাণে, আমি জানি আমার মন শুধু জানে।
কত লোকে কত বলে, সে কথা শুনে আঁখি বারি ঝরিছে॥
মরমের ব্যথা চাপা আছে বুকে, দেখা হ'লে সব বলিব গো তাকে।
ঐ শুনি বাঁশী বাজে দিবা নিশি, সেই ছবি হৃদে জাগিছে॥

(২)

আমার মন বেদনা কাহারে জানাব সই॥
আমি জানি, আমার মন জানে আর কেহ বোঝে কই॥
ভালবেসে এই হ'ল, কাঁদিয়ে জনম গেল।
(ও সে) ভালবাসার ছল করি আমারে মজালে ঐ॥
কত সাধ ছিল মনে পুরিল না এ জীবনে।
আমি বুঝেছি তা প্রাণে প্রাণে, তাই মরমে মরিয়ে রই॥

(৩)

শ্যাম বাঁশীতে আমারে ডেকেছে।
কি করি কি করি বুঝিতে না পারি, গুরুজনার ভয় হতেছে॥
কুলনাশা বাঁশী কুলেতে রাখে না, ঘৃণা, লজ্জা, ভয় কিছু ত থাকে না
শুধু মনে হয় কত সে আপনা, ও সে প্রাণের ভিতর রয়েছে॥
বিষমঁ সে বাঁশী ছিল কোনখানে, বল বল শ্যাম পাইল কেমনে।
ঘরে থাকিতে পারিনে, যেন ধরে টেনে আনে (ও সে) বাঁশীতে পাগল করেছে॥
তার ভালবাসার নাহিক তুলনা, মনে হ'লে পাই দারুণ যাতনা।
(তারে) কেমনে পাইব বল না বল না আমার সেই রূপে
(কাল রূপে) মন মজেছে॥

তৃতীয় ভাগ—উনবিংশ অধ্যায়

কলিকাতা; বৃহস্পতিবার ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সাল,
ইং ৮ই জুন ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, দ্বিজেন, ললিত, কালু, জিতেন, কালীমোহন, তপেন, গোপেন, দ্বিজেন সরকার, ভোলা, সুধাময়, পঞ্চানন, ইঞ্জিনিয়ার, মতি, পুতু, নগেন, কিরণ, আশু, তারাপদ, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, কৃষ্ণকিশোর ও অভয় আছে।

জিতেন। এক আছে প্রারব্ধ কর্ম্ম অনুযায়ী ভোগ হয়। আবার তিনিই সব করাচ্ছেন। তা হলে, প্রারব্ধ কর্ম্মও তিনিই করিয়েছেন। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা নেই অথচ ভোগ করার বেলা ঠিক আছে।

ঠাকুর। তুমি ভোগ কর বলছ কেন? বল তিনি ভোগ করছেন।

জিতেন। দেখছি, আমি ভোগ করছি, তিনি ভোগ করছেন বলি কি ক'রে?

ঠাকুর। তিনিই যদি সব করিয়ে থাকেন, তুমি যদি কিছু না ক'রে থাক, তবে তিনিই ভোগ করছেন। আর যতক্ষণ তুমি সব করছ এ বোধ রেখেছ ততক্ষণ তুমি ফলভোগ করবে। আগুনে হাত দিলেই পুড়ে যাবে, এ স্বভাবের ধর্ম্ম, তেমনি সংসারের ধর্ম্মই হচ্ছে সুখ দুঃখ ভোগ। এ হবেই। যেমন কর্ম্ম করবে সে রকম ফল ভোগ হবেই। আর প্রারব্ধ অনুযায়ী প্রকৃতির সঙ্গে এমনি যোগাযোগ হয়ে রয়েছে যে তুমি সেই রকম কাজ না ক'রে থাকতে পারবে না। গীতায় আছে 'অবশে প্রকৃতি বশে তুমিই করিবে শেষে, মোহ বশে ভাবিছ যা করিব না আমি।'

জিতেন। তা হলে আমাদের কোন শক্তিই নেই, কোন কর্ত্তৃত্ব নেই।

ঠাকুর। তোমাদের শক্তি কোথায়? এই দেহটা ধ'রে মান অপমান নিয়ে কত কাণ্ড করছ, কিন্তু একদিন সেই দেহ যাবেই। ম'রে গেলে যখন লাথি মারছে, টেনে নিয়ে গিয়ে পোড়াচ্ছে, তখন তুমি কিছু করতে পারছ কি? দেহটা কি ইচ্ছামত রাখতে পারলে? মানুষ সুখ ইচ্ছা করে, কেহ কখনও দুঃখ চায় না; তবুও দুঃখ আসবেই কিছুতেই আটকাতে পারবে না। তা হলে তোমার শক্তি কোথায়? অপর একটা বড় শক্তি পেছনে কাজ করছে। কর্ত্তৃত্বের কথা বলছ, কর্ত্তা কি? এক হচ্ছে, যে ইচ্ছামত সকল জিনিষ করতে পারে; আর এক আছে, জীবত্ব ধর্ম্ম, যেমন তুমি হাত তুলছ, পা ফেলছ ইত্যাদি। তাও দেখ, জীবত্ব ধর্ম্ম অনুসারে তুমি হাত পা না নেড়ে থাকতে পারবে না। আবার হয়ত এমন একদিন আসবে তুমি হাত তুলতে পাচ্ছ না। তোমার কোন কাজ করার ওপর কর্ত্তৃত্ব নেই, আবার না করার ওপরও কর্ত্তৃত্ব নেই। তা হলে তোমার কর্ত্তৃত্ব কোথায় স্বাধীন ইচ্ছা কই? তবে সেই দিয়েছে না, গরু, খোঁটা ও দড়ি, তার মধ্যে যতটা পার ইচ্ছা মত চল। স্বাধীন ইচ্ছা কখন? যখন তুমি প্রকৃতি ছাড়িয়ে যাবে। যতক্ষণ মনের রাজ্যে ততক্ষণ পরাধীন, কারণ তুমি

জড়ের মত মায়ায় ডুবে রয়েছ, আর রিপুগুলো তোমায় ঘোরাচ্ছে। জীবের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। শিবের স্বাধীন ইচ্ছা আছে।

কালু। আচ্ছা ধরুন, জগদীশ বসু গাছ সম্বন্ধে কত নতুন আবিষ্কার করেছেন, তিনি ত জানতেন না তাঁর মাথায় এ গুলো আছে; তিনি নিজে চেষ্টা ক'রে খেটে করলেন।

ঠাকুর। বেশ, যদি তাঁর নিজের চেষ্টাতেই হ'ল, তিনি আর একটা চেষ্টা ক'রে করুন তবে ত বুঝব যে তাঁরই চেষ্টায় হ'ল। আর এ রকম চেষ্টা ত অনেকেই করছে। সকলেই বা পারছে না কেন? অনেকেই ত পড়াশুনা ক'রে পাশ করবার চেষ্টা করছে, কেউ বা খুব খেটে একটাও পাশ করতে পারলে না আবার কেউ বা চট্ ক'রে এম্ এ পাশ ক'রে ফেলে। তোমাদের নিজের ইচ্ছা বা চেষ্টার ওপর হলে কি এ রকম হতে পারে?

জিতেন। পরমহংসদেবও যখন নরেন্দ্রকে বলেছিলেন 'ওরে আমার ত ইচ্ছা হয় কিন্তু মা যে দিতে চান না,' তখন অবতারদেরও কোন স্বাধীন ইচ্ছা নেই ত?

ঠাকুর। যখন সাধারণ ভাবে দেখছ তখন তিনি সাধারণের মত ব্যবহার করছেন ব'লে 'মা দিতে চান না' বললেন, আবার উচ্চ ভাবে দেখ, মা, অর্থাৎ আমিই দিতে চাই না। তা ছাড়া অবতার আসেন কতকগুলি প্রয়োজন নিয়ে। তাঁর বহুশক্তি, সেই শক্তি ছড়িয়ে অপরকে দিয়ে সেই সব প্রয়োজন সারেন। তিনি ত আর ঘরে ঘরে অবতার বা শুকদেব তৈরী করতে বা কতকগুলো অসাধারণ ক'রে তাঁর শক্তির পরিচয় দিতে আসেন না। ধর্ম্মের গ্লানি হ'লে ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য বহুশক্তি নিয়ে এসে কতকগুলো কাজ ক'রে শক্তি দিয়ে যান যাতে ঠিক ভাবে চলতে পারে।

জিতেন। তা হ'লে অবতারও সেই রামা শ্যামার মত কতকগুলো বাঁধি কাজ করে যান। এ জন্যে আর তাঁর আসার দরকার কি?

ঠাকুর। রামা শ্যামা নিজেরা দুঃখ পাচ্ছে এবং অপর সকলকেও

দুঃখের সাগরে ভাসাচ্ছে ; আর অবতার নিজে আনন্দ সাগরে ভাসছেন এবং অপরকে আনন্দ দিচ্ছেন, এই তফাৎ। তাঁরা জীবকে সাহস দিবার জন্য আসেন এই, 'আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শেখান।' দেখ, সাধুরা একটা ভাব নিয়ে সাধন করে। কেবল সেই ভাবটাই তার ভাল লাগে এবং সে সেই ভাবের প্রকৃতির সঙ্গে মিশতে পারবে, বিরুদ্ধ ভাব এলে আর দাঁড়াতে পারবে না, বহু প্রকৃতির ভাব সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু অবতারের নিয়ম নয় একভাবে চলা। তিনি বহুভাবে খেলবেন। বহু প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গতি করবেন। যার যতটুকু পাত্র তাতে তার চেয়ে বেশী জল ত ধরবে না। আধার অনুযায়ী শক্তি দিয়ে কাজ করান তার চেয়ে বেশী শক্তি সহ্য করবার ক্ষমতা কই ?

এর একটা গল্প আছে।

এক রাজা তাঁর বন্ধু, বান্ধব ও সভাসদকের কাছে প্রায়ই বলতেন 'ভগবান নিজে দেহ ধারণ ক'রে অবতার হ'য়ে আসেন এ আমি মানি না। তাঁর জগতে এত সাধু, মহাপুরুষ রয়েছেন, তিনি তাদের দিয়েই ত কাজ সারতে পারেন, এর জন্যে তাঁর নিজের আসার দরকার কি ? একদিন বৈকালে রাজা ও রাণী ছেলে মেয়েদের নিয়ে নৌকায় বেড়াতে বেরিয়েছেন সঙ্গে মন্ত্রী ও দুইজন বন্ধু ও সভাসদ. এবং অনেক দরোয়ান লোকজন আছে। যেতে যেতে যেখানে একটু জল কম এমন জায়গায় নৌকাটা একটু কাত হতেই রাজার ছোট ছেলেটী জলে প'ড়ে গেল। অমনি দরোয়ান লোকজন সব জলে লাফিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজাও জলে লাফিয়ে পড়লেন, বন্ধু বান্ধব কারুর বারণ শুনলেন না। লোক জন সবাই ছেলেটীকে তখনই তুলে ফেল্লে। তারপর রাজা স্থির হ'য়ে নৌকায় বসতে মন্ত্রী তাঁকে বললে 'দেখুন আপনার ছেলেটী জলে পড়তেই আপনার এত লোকজন সবাই লাফিয়ে পড়ে ছেলেটীকে তুললে ত কিন্তু তত্রাচ আপনাকে সবাই বারণ করা সত্ত্বেও আপনি জলে পড়লেন কেন ?

আপনার ত জলে পড়বার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আপনি যেমন নিজের ছেলে ব'লে নিজেও লাফিয়ে পড়লেন, তেমনি সাধু মহাপুরুষ থাকলেও তাঁর সন্তানদের দেখবার জন্যে মাঝে মাঝে তাঁকেও স্বয়ং আসতে হয়।'

নগেন। ইচ্ছা শক্তি কার? মনের না চৈতন্যের?

ঠাকুর। শাস্ত্রে বলছে, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, জড় প্রকৃতি, আর চৈতন্য পরা প্রকৃতি।

নগেন। সাধারণ মানুষের বিবেক নেই মনে হয়।

ঠাকুর। জীবত্ব ধর্ম্মের মত বিবেক আছে। মন তামসিক, রাজসিক ও সাত্তিক বৃত্তির ওপর। সত্ত্বগুণ জ্ঞান প্রকাশক; তাতে ঠিক হিতাহিত জ্ঞান ও শান্তি থাকে একেই ঠিক বিবেক বলে, বাকী সব জীবত্ব বুদ্ধি। রজঃ গুণে আমিত্ব বেশী থাকায় তার নিজের কথাটাই বড় ব'লে মনে করে। অজ্ঞানের কথাটাও তখন জ্ঞানের কথা ব'লে মনে হয় ও এই ভাবের বিরুদ্ধে গেলে ক্রোধ ও অশান্তি উৎপন্ন হয়। তমঃগুণে অজ্ঞানতা ভরা। মন যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তার ভাবের মত একটা বিচার ক'রে নেয়। সত্ত্বগুণের সঙ্গে না মিশলে জ্ঞান আসে না। চৈতন্য ঠিক আছে তবে যেমন গুণের ওপর পড়ছে তেমনি কাজ করছে। যেমন ইলেক্ট্রিসিটি (বৈদ্যুতিক শক্তি) এক ভাবেই আছে, যে রকম বাল্ব (বাতিডুম) দেবে সেই রকম কম বেশী আলো হবে। এই ধর প্রকৃতপক্ষে মনই শোনে, মনই দেখে; কিন্তু জড় জগতের কাজ করতে হলে শুধু মন দিয়ে হয় না, চোখ, কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি দরকার। বাহ্যিক রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির বোধ নিতে গেলে এগুলি চাই। ইন্দ্রিয়গুলি যন্ত্র এবং মন তাদের চালায়, কারণ সাধারণ প্রাকৃতির জগতে চোখে না দেখতে পেলে, মন থাকলেও দেখা যায় না। এখানে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। মন না হলে চোখ, কান প্রভৃতি কিছু কাজ করতে পারে না, আবার চোখ, কান না থাকলে মন দেখতে

বা শুনতে পায় না। মন সারথি, যেমন হুকুম করে এরা সেই রকম চলে। তা না হ'লে মনকে রাজা করেছে কেন? এ ত হ'ল মনের সাধারণ অবস্থা। তা ছাড়া মনের আর একটা অসাধারণ অবস্থা আছে যখন এ সব ইন্দ্রিয় ছাড়াও মন সমস্ত কাজই করতে পারে। কিন্তু মন ছাড়া এরা কখন কিছু করতে পারবে না। চোখ থাকতে চোখের শক্তি গেলে সে চোখ আর ভাল হয় না, আর তাতে দেখা যায় না; তবে চোখের শক্তি ঠিক থাকলে, চোখ গেলে ডাক্তার অনেক সময় ছানি প্রভৃতি চিকিৎসা ক'রে ভাল করতে পারে ও তখন আবার দেখা যায়। মন না হলে বুদ্ধিতে কিছু কাজ করতে পারে না। বুদ্ধি না থাকলে চোখ যে কি দেখছে তা বলতে পারে না। শোনা অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে বুদ্ধির কাজ। বুদ্ধি না থাকলে কানে শুনেও কোন কাজ করতে পারবে না।

কালু। রাশিয়াতে চেষ্টা হচ্ছে যাতে মানুষ ম'রে গেলে, তাকে বাঁচাতে পারে।

ঠাকুর। বাঁচা মানে কি? স্মৃতি, চৈতন্য ফিরে আসা। কোন রকম ক'রে হাত পা নাড়াতে বা নিঃশ্বাস ফেলাতে পারলেই যে বাঁচান হয় তা নয়। সে হয়ত ইলেক্ট্রিক (বৈদ্যুতিক) শক্তির সাহায্যে করতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ না পূর্ব্বের স্মৃতি সব ফিরে আসে এবং আগেকার মত বুদ্ধির কাজ করতে পারে ততক্ষণ ঠিক বাঁচল বলা যায় না।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন—

ঠাকুর। সঙ্গই প্রধান, যেমন সঙ্গ করবে তেমনিই বৃত্তি উঠবে। তমঃ গুণীর সঙ্গ করলে মনে তমঃ গুণ বৃদ্ধি হয়, রজঃ গুণীর সঙ্গ করলে রজঃ গুণ বৃদ্ধি হয়, আর সত্ত্ব গুণীর সঙ্গ করলে সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধি হয়। তখন জ্ঞানের উদয় হয় এবং ত্যাগ ও উপেক্ষা আসে। মনের স্বভাবই হচ্ছে স্বতঃ নেমে যায়, সেই জন্যে বার বার সত্ত্বগুণীর সঙ্গ করতে বলেছে, যাতে মনের শক্তি বাড়ে এবং মনকে সত্ত্বগুণের দিকে

নিয়ে যায়। সঙ্গে প্রেম আসে, তখন কাজ হয়ে যায়। তিন প্রকারে তাঁকে ডাকে—প্রেমে, লাভের জন্যে ও ভয়ে। যাদের বিবাহ বা সন্তানাদি হয় নি, তারা প্রেমে ডাকে কারণ তখন বাসনাদি জোর না থাকায় মনটা বেশী অপর দিকে ছড়িয়ে থাকে না এবং সেই সময় থেকে সৎসঙ্গ হতে থাকলে শীঘ্র কাজ হয়। তখন যেদিকে লাগে চট্ ক'রে ধ'রে নেয়, আর যৌবনটা ঠিক ঐ ভাবে রক্ষা ক'রে যেতে পারলে ভাবটা পাকা হয়ে আসে। সেই জন্যে প্রথম অবস্থায় খুব বেশী বেড় দিয়ে রাখতে হয় যাতে অপর জিনিষ দেখে বা অপর ভাবে পড়ে এই ভাবটা নষ্ট হয়ে না যায়। সংসারীরা যৌবনে, সংসার সুখ প্রভৃতি লাভের আশায় তাঁকে ডাকে। তখন মন মায়ায় এমন জড়িত থাকে যে ইচ্ছে করলেও ছাড়তে পারে না। সংসারে কত দুঃখ পাচ্ছে, কত লোহা পেটা হচ্ছে তবু আঁকড়ে ধ'রে থাকে; তখন ছাড়া বড় শক্ত। এ অবস্থায় তারা শুধু সংসার সুখের জন্যেই তাঁকে ডাকে। আর বার্দ্ধক্যে ভয় আসে, এই ত যাবার প্রায় সময় হ'ল, নিজের পাথেয় কই? এতদিন কি করলুম? তখন এই ভয়ে তাঁকে ডাকে। এই হ'ল সাধারণ কথা, তবে যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে যে কেউ প্রেমে ডাকে না তা নয়, এর সংখ্যা অতি কম। মায়ার প্রভাব যে কত বড় তা বোঝাবার জন্যে এইখানে ঠাকুর 'নারদের মায়া মুক্ত হওয়ার অহঙ্কারের গল্প বলিলেন। (অমৃতবাণী ২য় ভাগ ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

প্রেমে গতি করা বড় সুবিধা কারণ ভালবাসা পড়লে আপনি টেনে নিয়ে যায়, আর কোন ভাবনা থাকে না। শান্তি দুই ভাবে আসে, প্রেমে বা ত্যাগে। প্রেমে নিজের ব'লে কোন চিন্তা থাকে না, তার সুখেই নিজের সুখ। ত্যাগে নিজের কোন স্বার্থ ব'লে কিছু থাকে না, কাজেই স্বার্থের টানে এদিক ওদিক করে না, যেটুকু কর্ত্তব্য, ক'রে যায়। দু'য়েতেই মনে শান্তি আসে। আর কর্ত্তব্য কি? মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য হচ্ছে ভগবতে প্রেম ও জ্ঞান লাভ করা। সেই জ্ঞান এলে যে কার্য্য হয় সেইটাই ঠিক কর্ত্তব্য; তা ভিন্ন মায়াতে

অন্ধের ন্যায় কার্য্য করে ও কর্ত্তব্যের দোহাই দেয়। ভোগ নিয়ে বা স্বার্থ নিয়ে সংসারে চললে নিজের ও অপরের খালি অশান্তি। পূর্ণ ভালবাসা এলে মান অভিমান থাকে না, কারণ তখন লাভ লোকসান বোধ থাকে না। যতক্ষণ মান অভিমান থাকে ততক্ষণ লাভ লোকসান বোধ থাকবে।

এখানে ঠাকুর রিচিকের রামের প্রতি অভিমানের গল্প বলিলেন

রাম মারীচকে আগে নির্ব্বাণ দিয়ে রিচিকের কাছে আসতে রিচিক অভিমানে তাঁর সঙ্গে কথা কইলে না। তখন রাম বলছেন এ কি! রিচিক তোমার অভিমান! রিচিক বললে হবে না! আমি দিবারাত্র তোমার নাম করছি, আর তুমি আমায় নির্ব্বাণ না দিয়ে, মারীচ কিনা একটা রাক্ষস, তাকে আগে নির্ব্বাণ দিয়ে এলে, তা আমার অভিমান হবে না! রাম বললেন, আচ্ছা ঋষি তুমি সর্ব্বদাই আমার নাম করছ, বলছ ত? কিন্তু যখন তুমি বনে আহার অন্বেষণে যাও তখন কি আমার নাম কর? রিচিক বললে না তা ত করিনি, ঐ সময়টুকু বাদ যায়। তখন রাম বললেন তা হলে তুমি যখন আহার অন্বেষণ যাও সে সময়টুকু ছাড়া বাকী সব সময় আমার নাম কর, ঐ সময়টুকু ভুলে যাও, আর মারীচ আমার শরে বিদ্ধ হবার পর থেকে দিবারাত্র, খেতে, শুতে, নাইতে সর্ব্বদাই ভাবছে ঐ বুঝি রাম এল, ঐ বুঝি রাম এল, এক মূহুর্ত্তের জন্যেও ভুলে নেই; তা এখন তুমিই বল দেখি ঋষি কে আগে নির্ব্বাণ পাবার উপযুক্ত! রিচিক তখন বুঝতে পারলে যে তার অভিমান করাটা ঠিক হয় নি এবং রামের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে।

দেখ, তাঁকে পেতে গেলে অমুক জায়গায় অত খেটেছি, অমুক করেছি এ সব বললে চলবে না। তোমায় দেখাতে হবে তাঁর জন্যে কতটা মন দিয়েছ, কতটা মান অভিমান ছেড়েছ, দেহসুখ আদি উপেক্ষা ক'রে কতটা কষ্ট স্বীকার ক'রে তাঁর প্রতি ঠিক মন রাখতে পেরেছ? প্রেমে ভালবাসা পড়লে আপনত্ব আসে আর

তখন এ সব আপনিই হয়ে যায়, চেষ্টা ক'রে বা কঠোর ক'রে করতে হয় না। তাই পরমহংসদেব সকলকে ভালবাসতেন ও আপন ক'রে ডাকতেন।

দ্বিজেন্ গাহিল—

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবা নিশি আশা পথ নিরখিয়ে॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ।
কেমনে বসিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে॥
হৃদয় কুটীর দ্বার খুলে রাখি অনিবার।
কৃপা ক'রে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়া॥

তৃতীয় ভাগ—বিংশ অধ্যায়

কলিকাতা, রবিবার ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সাল ;
ইং ১১ই জুন, ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, গোপেন, কালু, ললিত, নগেন, জিতেন, ভোলা, মতি, ললিত ভট্টাচার্য্য, শ্যাম, তারাপদ, গোষ্ঠ, নন্দ, গতিকৃষ্ণ, কালীমোহন, দ্বিজেন সরকার, পুত্তু, কৃষ্ণকিশোর, দ্বিজেন, কৃষ্ণ দত্ত, ও অভয় আছে।

জিতেন। অমৃতবাণীতে বার বার লেখা আছে, 'তোমাদের সঙ্গই প্রধান' ; 'তা এইখানে বসে থাকা', এই সঙ্গের কথা বলছেন কি ? ত্যাগ না হলে কি ঠিক সাধু সঙ্গ হয় ? আর সাধন না ক'রে শুধু সঙ্গেই কি শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া যায় ?

ঠাকুর। শুধু বসে থাকলেও সঙ্গ হয়, তবে যেমন মন দিয়েছ সেই ওজনের জিনিষ পাবে। যাদের ত্যাগ হয়ে গেছে, তাদের ত সব হয়ে গেছে : সাধু সঙ্গ ত তাদের আপনি হয়। তাদের জন্যে ত বলিনি। সাধু সঙ্গই ত্যাগ করাচ্ছে। কেউ বা সংসারের উন্নতির জন্যে আসছে আবার কেউ আত্মার উন্নতি চাচ্ছে। ত্যাগ ক'রে সাধন করতে পারত ভাল, কিন্তু পার কই ? সংসার ত্যাগ কি সোজা কথা ? জোর ক'রে সংসার ছাড়া যায় না, এপর্য্যন্ত কেউ পারে নি। প্রাণে তীব্র বেগ না এলে সংসার ছাড়া যায় না, আর জোর ক'রে ছাড়লেও সে দাঁড়াতে পারে না। তবে জোর ক'রে ছাড়বার চেষ্টা বা অভ্যাস করতে পার মাত্র। তোমরা সংসারটা জবর ক'রে ধ'রে ব'সে আছ। যখন সামান্য একটু মাথা ধরলে কাবু হয়ে পড়, একটা ছেলের অসুখ হলে চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়, আহ্নিক করতে বসলে

সামান্য ব্যাপারেও আহ্নিক ছেড়ে উঠে পড়, তখনই বোঝা উচিত মনটা ঠিক কোন দিকে। তোমরা সংসারকে বড় ক'রে ধর্ম্ম করতে চাও, আবার এই অবস্থায় প'ড়ে থেকেও নিজেরা মায়ামুক্ত এইটে প্রমাণ করবার জন্যে নানা রকম যা, তা বল। যেমন তন্ত্রে আছে, এই দোহাই দিয়ে, তান্ত্রিক সাধকরা মদ খেয়ে কাটাচ্ছে। বাইরে বেরুলেই নিজেকে কত কঠোর করতে হবে, কত তিতিক্ষা নিতে হবে তবে এক পা এগুতে পারবে। তাই তোমাদের সংসার বজায় রেখে একটা সৎনীতি নিয়ে সৎসঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা মনের শক্তি বাড়াতে বলি। এর চেয়ে আর সোজা কি হবে? এতে কোন অসুবিধা নেই বরং সুবিধা, কারণ যেটা ভাল ক'রে ধ'রে আছ, সেটা বজায় রেখেই চলেছ, তাতে কোন রকম কঠোর করতে হ'ল না, নিজের ওপর জোর ক'রে তিতিক্ষা প্রভৃতি নিতে হ'ল না, অথচ আপনি যেন সব করিয়ে দিচ্ছে। তাই সাধু সঙ্গের এত প্রভাব দিয়েছে, যে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এখানে এসে ব'সে থাকলেই কিছু কাজ হবেই, যেমন অনিচ্ছায় আগুনের কাছে দাঁড়ালে অগ্নির তাপে আপনি ভিজে কাপড় শুকিয়ে যাবে। একটা নীতি বজায় রেখে নিয়মিত সঙ্গ করবে খুব বিশেষ বাধা না পেলে এ নীতি কিছুতেই ভাঙ্গবে না। **নীতি বল মস্ত বল।** শুধু নীতি রক্ষা মানেই কিছু মনের শক্তি হয়েছে। সঙ্গে বাসনা কমিয়ে আনে এবং মনকে ক্রমশঃ এদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে। মন এক মুখো হলে, তখন মন যে জিনিষ ধরবে তার জন্যে যত রকম কঠোর হোক করতে পারবে, তখন কঠোর ব'লে বোধই হবে না। মনের স্বভাব এই; যেমন ছেলের অসুখ হলে মা যে অত কষ্ট করে, তার কি কঠোর বোধ থাকে? তাই তুমি যদি ঠিক মত সঙ্গ ক'রে চল, সঙ্গই তোমায় সব করিয়ে নেবে; দরকার হয় সাধন বা কঠোরতা করিয়ে নেবে এবং তখন এসব কষ্ট বলেই বোধ হবে না, কেননা জোর ক'রে ত কিছু করছ না। তা ছাড়া সঙ্গে প্রেম এলে আপনিই গতি করে। প্রেমে মন একদিকে জোর পড়ায় অপর সব দিক ছেড়ে যায়। আসল কথা মনকে তৈরী

কর। মাটী ভাল ক'রে কাঁকর বেছে, পিটে ভাল পাট করা হ'লে, তাতে যে গড়নই গড়বে, শিবই গড় আর বাঁদরই গড়, সব ভাল হবে, কিন্তু মাটী খারাপ হ'লে কিছুই ভাল হবে না। **সঙ্গই মন তৈরী করবার একমাত্র উপায়।**

পুত্তু। একজন প্রথমে ইষ্টকে ডেকে যে আনন্দ পাচ্ছিল, পরে গুরুকে ডেকেও সেই আনন্দ পেলে, কিন্তু গোড়ায় গুরুকে ডেকে সে তা পায় নি। এ কি রকম?

ঠাকুর। সাধারণে সংস্কার বশতঃ গুরুর কাছে দীক্ষা নেয়, কিন্তু তখন গুরুর ওপর সে বিশ্বাস বা প্রেম আসে না, অথচ ইষ্ট যে গুরুর চেয়ে বড় গোড়া থেকে সংস্কার বশতঃ এ জ্ঞানটা থাকে ব'লে ইষ্টের প্রতি কিছু মন লাগাতে পারে ও কিছু আনন্দ পায়। পরে ক্রমশঃ গুরুর ওপর ভালবাসা পড়তে পড়তে তাতে মনটা লাগে এবং গুরুও বুঝিয়ে দেন দুই এক। তখন গুরুকে ডেকে আনন্দ পেতে থাকে। গুরু কে? তিনিইত গুরু; গুরু বল, ইষ্ট বল সবই ত এক। যাকেই ধর একটা ধ'রে চললেই হবে। গুরু চিন্তা করা মানে তাঁকেই চিন্তা করা। ইষ্ট বা ভগবান ত আর দেখতে পাচ্ছ না শুনে মেনে নিয়ে সংস্কার বশতঃ ক'রে যাচ্ছ। তবে স্থূল গুরুর প্রয়োজন কেন? সামনে নিজেরই মত একজনকে দেখলে তাঁকে সহজে ভালবাসতে পারবে; তোমাদের মন সর্ব্বদা রূপ, রস, গন্ধে ম'জে আছে, তাই একটা দেহ পেলে সহজে প্রেম লাগাতে পারে; তা ছাড়া দেহ ভিন্ন প্রেম আসা বড়ই কঠিন। এই গুরুতে ভালবাসা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে ভগবতে প্রেম আসবে। গুরু কি মানুষ? নিজের স্ত্রী, পুত্রকে বশে রাখা যায় না আর এই এত রকম বিভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গে অনবরত ব্যবহার রাখা ও এক জায়গায় টেনে এনে সকল সময় ধৈর্য্য রেখে যার যেমন ভাব তাকে তেমনি ভাবে নিয়ে যাওয়া কি মানুষের ক্ষমতা? তোমরা স্থূল ভালবাস ব'লে, যখন যার ভেতর দিয়ে সুবিধা তার ভেতর দিয়ে তিনিই কাজ করেন। তবে প্রহ্লাদ

প্রভৃতির কথা ছেড়ে দাও। প্রহ্লাদের গর্ভেই দীক্ষা; ওরা ঐ রকম সংস্কার নিয়েই জন্মায়। কতজন্ম থেকে গুরু কাজ করছেন। তবুও তিনি একজন গুরু পাঠিয়ে দেন।

জিতেন। দেবস্থানে যে শক্তি থাকে; সে কি খণ্ড দেবশক্তি না ভগবৎশক্তি? সেখানে গেলেই যদি সেই শক্তির সঙ্গ হয়, তবে পাণ্ডারা যে সেখানে রয়েছে তাদের কি হল?

ঠাকুর। তিন ভাবে মানুষ তাঁর কাছে যায়। প্রেমে, লাভের আশায় ও ভয়ে; কাজেই যদিও ওখানে গেলেই সঙ্গ এবং সঙ্গে কিছু কাজ হবেই, তথাপি যে যে ভাবে যায় তার সেই রকম লাভ হবে। দেবস্থানে খণ্ড শক্তি আছে আবার ভগবৎ শক্তিও আছে। তুমি যে ভাবে গেছ সেই ভাবে ফল পাও। যদি ছেলে চাও, টাকা চাও, তাহলে সেই সেই দেবশক্তির আরাধনা কর, আবার যদি মনের উন্নতি চাও, মায়ামুক্ত হ'তে চাও তখন ভগবৎ শক্তির আরাধনা কর। তিনি যখন সর্ব্বময়, তখন যে শক্তিরই আরাধনা কর তাঁরই আরাধনা করলে। তিনি তোমার ভাব অনুযায়ী দেবেন; যেমন একটী ঘরে হীরে, মোহর, টাকা, পয়সা রাখা আছে, আর সেই ঘরে যদি একজন জমিদার, বড় চাকুরে, কেরাণী ও পাখাটানা কুলিকে নিয়ে গিয়ে বলা যায় তোমাদের জন্যেই এসব রাখা হয়েছে তোমরা ইচ্ছামত নাও, তখন জমীদার হীরে নেবে, বড় চাকুরে মোহর নেবে, কেরাণী টাকা নেবে এবং পাখা টানা কুলি পয়সা নেবে। যে যে অবস্থায় সে ঠিক সেই মত বেচে নেবে। তোমার বাড়ী চুরি হ'লে পুলিশের কাছে না গিয়ে যদি রাজার কাছে যাও, তাহলে তিনিও আবার তোমায় পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। পাণ্ডারা যে এত অত্যাচার করছে, তার জন্যে তিনি তাদের অনেক ধাক্কাও দিচ্ছেন, তবে কি জান তারা তাঁর সেবায় আছে ব'লে, তিনি অনেক মাপ করেন, যেমন সাহেবের খানসামারা সাহেবের সেবা করে বলে অনেক দোষ করলেও সাহেব মাপ করে। তবে, এই কামনা নিয়ে ডাকাও ঢের ভাল, কারণ যে ভাবেই হক তাঁকেই ত

ডাকছে। যখনই সুখে তাঁকে ডাকে ও সুখ্যাতি করে এবং দুঃখ এলে নিন্দা করে ও ডাকতে চায়না, তখনই জানবে তাঁতে প্রেম আসেনি। প্রেম এলে দুঃখ পেলেও ছাড়বে না বা নিন্দা করবে না, কারণ তখন ত আর দুঃখ বোধ করে না। সংসারে থেকেও কিছু সময় যারা তাঁর জন্যে দেয় তারা সৎ সংসারী। সংসারে মন নানা জিনিষে ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে থেকে সেই সব জিনিষে মন না রেখে গুড়িয়ে এনে তাঁর দিকে দিতে পার না বলেই অন্তঃত কিছু সময় সাধু সঙ্গ করা দরকার তা ভিন্ন মুখে যতই বল কাজে কিছুই পারবে না।

বিবাহের পর বর ক'নে পাঠাবার সময় কান্নার কথা উঠতে ঠাকুর বলছেন।

ঠাকুর। তোমাদের সংসারীদের হাসি কান্নার দাম কি? যদি বোঝ বিয়ে দিয়ে মেয়ের ভাল করলে তবে কাঁদ কেন? বরং তার ভাল হবে ব'লে আরও আনন্দ কর। আর যদি বোঝ যে না খারাপ হবে তবে তুমি নিজেই চেষ্টা ক'রে এত খুঁজে বিয়ের জোগাড় কর কেন? এ কান্নার দাম কি?

নগেন। কর্ম্ম দুই প্রকার এক প্রকার কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হয় ও ত্যাগ আসে, আর এক প্রকার কর্ম্মের দ্বারা অজ্ঞানতা জনিত ভোগে বদ্ধ করে, এই ত?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তুমি যা বলছ তাই ঠিক। সুকর্ম্ম, কুকর্ম্ম দুই প্রকার কর্ম্ম আছে; সুকর্ম্মে মুক্ত করে ও কুকর্ম্মে বদ্ধ করে। ভোগের দ্বারা ভোগ নষ্ট হয়; সুখ ভোগে পুণ্য ক্ষয় হয় ও দুঃখ ভোগে পাপ ক্ষয় হয়। দুই কর্ম্ম ক্ষয়ের পর মুক্তি ইচ্ছা আসে। তখন সুখ দুঃখের ইচ্ছা নষ্ট হয়। যতক্ষণ সুখ দুঃখ বোধ থাকবে ততক্ষণ ভোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। যত প্রথম জন্ম তত ভোগ বাসনা বেশী; কিসে ভোগ হয় কেবল তারই চেষ্টা। এই ভোগের পারিপাট্যের জন্য মাথা খাটিয়ে কত নতুন জিনিষ বার কচ্ছ। যেমন ধর কেউ দুধ খেলে কেউ বা মাথা খাটিয়ে দুধ থেকে মাখম করলে, মাখম গলিয়ে ঘি করে

লুচি ভেজে খেলে আবার দুধ থেকে ছানা করে সন্দেশ প্রভৃতি খাবার তৈরী করে খেলে, তেমনি মাথা খাটিয়ে ভোগের সূক্ষ্ম দিকে উন্নতি করে যত বুদ্ধির পরিচয় দাও না কেন, এই স্থূল সূক্ষ্ম দুঃখেরই এক দাম। দুইই ধ্বংস হবে। মুক্তির ইচ্ছা হলে তখন আর এগুলো ভাল লাগে না। সুখ দুঃখের হাত থেকে, মায়ার হাত থেকে কিসে নিষ্কৃতি পাবে সেই চেষ্টা করে। তখন সুখ ভোগ ইচ্ছা যে দুঃখেরই বায়না করে এবং সুখ দুঃখ দুটোই বন্ধনের কারণ এই বোধ আসে। মায়া কি? ভোগের জিনিষে জড়িয়ে পড়ার নামই মায়া। মায়ার এতই জোর যে ব্রহ্মা নিজে সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি সৃষ্টি করে তারই মায়ায় পড়ে পেছনে পেছনে দৌড়ুচ্ছেন। শেষে সেই মেয়ে যখন দৌড়ে শিবের কাছে গেছে তখন শিব দেখলেন যে ব্রহ্মা নিজে সৃষ্টি করে এরই রূপে আকৃষ্ট হয়ে ছুটছে, তাই তিনি সেই রূপটা বদলে দিয়ে মৃগী রূপে তাকে হাতে ধরে নিলেন। যেই মূর্ত্তি সামনে থেকে চলে গেল অমনি ব্রহ্মার চৈতন্য হল, বললেন এঁ্যা! আমি নিজে তৈরী করে তারই মায়ায় ছুটছি। তখন ওপর থেকে আদেশ হ'ল 'তপঃ' অর্থাৎ তপস্যা কর তবে এই মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। ঋষিরা কি ভোগের জিনিষ জানতেন না? তখনও পুষ্পক রথ ছিল, রাবণের রাজ সভায় বৈদ্যুতিক আলোর চেয়ে ভাল আলো ছিল; তবে সে সব রাজা রাজড়ার জন্যেই ছিল। তাঁরা ভোগের জিনিষকে চাকর করে রাখতেন, তার অধীন হতেন না। আর তোমরা ভোগের অধীন হয়ে রয়েছ, যত সৃষ্টি করছ তাতেই আরও জড়িয়ে পড়ছ, আর ততই দুঃখ ভোগ বাড়ছে।

পুত্তু। দুঃখ বাড়েনি ঠাকুর; দুঃখ ঠিকই আছে, তবে তখন হয়ত সামান্য একটা জিনিষ নিয়ে অশান্তি ভোগ করত, আর এখন অন্য একটা বড় ভোগের জিনিষ নিয়ে সেই দুঃখ পাচ্ছে।

ঠাকুর। তা কি হয়? তখন অনেক কম জিনিষ ধরে ছিলে; আর অবস্থার অতিরিক্ত কোন জিনিষ ব্যবহার করার নিয়ম ছিল না। তার তুলনায় এখন ঢের বেশী জিনিষ সৃষ্টি করে তার অধীন হয়ে

রয়েছ। যে সব জিনিষ অনায়াসে পাওয়া যায়, ও অবস্থা অনুযায়ী সেই সব জিনিষ ব্যবহার করতে ব'লে দুঃখ কম হত, কিন্তু এখন অবস্থার অতিরিক্ত ও বহু দ্রব্য ব্যবহার কর ব'লে বেশী দুঃখ পাও। তখন চাষারা নিজের জমিতে যে যে জিনিষ তৈরী হ'ত তাতেই মন রাখত, তাই সেটার জন্যে খুব চিন্তা করতে হত না, আর দুঃখও বেশী আসত না কিন্তু এখন বড় লোকের দেখাদেখি নগদ টাকা না হলে যে সব জিনিষ পাওয়া যায় না এমন বাইরের বস্তুর ওপর মন দেওয়ায় পূর্ব্বের চেয়ে ঢের বেশী দুঃখ পাচ্ছে। গরীব মানুষ আনন্দ করে মাটীতে শুয়ে কাটায়, সে তাতেই খুসী কিন্তু তুমি খাট না হলে শুতে পার না বলে তোমার নিজের মাপ অনুযায়ী তাকে মহাদুঃখী ভাবছ অথচ বাস্তবিক তা নয়। মাটীতে শোয়ার জন্যে গরীব কোন চিন্তা রাখে না, কেননা তার জন্যে তাকে কিছু খরচ করতে হয় না, আর খাট জোগাড় করবার জন্যে তোমাকে টাকার চিন্তা রাখতে হয় এবং কোন কারণে টাকার অসুবিধা হলেই খাটের জন্যে অশান্তি ভোগ কর। তোমার বাড়ীর চাকর বামুনকে একটু বকলে সে অনায়াসে চাকরী ছেড়ে চলে যাবে কারণ সে জানে এই সামান্য টাকা যে রকমে হক সহজেই রোজগার হয়ে যাবে ; কিন্তু তুমি অফিসে গালাগাল খেয়েও চট্‌করে চাকরী ছাড়তে পার না, কেননা অত টাকা রোজগার করা বড় শক্ত। অর্থাৎ টাকার তখন প্রয়োজন বেশী হওয়ায় গালাগালি সহ্য করতেও কুণ্ঠিত হও না। আর এই বেশী রোজগারের উপযোগী ভোগের জিনিষ এমন বাড়িয়ে রেখেছ যে তার চেয়ে রোজগার কম হলে, তোমার খাওয়া পরার পক্ষে যথেষ্ট হলেও ভোগের জিনিষ সব জোগাতে পার না বলে দুঃখ পাও। সংসারে স্বামী স্ত্রী থাকলে যে খরচে চালাতে পার, সেই খরচে আর পাঁচটী ছেলে মেয়ে নিয়ে চালাতে হলে দুঃখ পাবে না ? আগের চেয়ে এখন ঢের বেশী ভোগের জিনিষ চোখের সামনে দেখছ, কানে শুনছ আর মনে বাসনা উঠছে। সে সব মেটাতে অনেক বেশী টাকার দরকার হয় বলে পারনা কাজেই দুঃখ ভোগ কর। রাজা হওয়ায়

বাসনা যে কারুর নেই তা নয় তবে এটা অসম্ভব, হবে না জেনে সে দিকে মন দেয় না। মনের সুক্ষ্ম স্বভাব কি জান? সুক্ষ্ম অতি সুক্ষ্ম সুতোয় প্রকাণ্ড বাসনা রূপ ফল ঝুলছে আর সেই ফল যতই বাড়ুক ততো ছেঁড়ে না। অর্থাৎ বাসনার শেষ নেই, যত মেটাবে তত নতুন নতুন বাড়বে। তাই বাসনা জয় করতে পারলে আর দুঃখ থাকে না; সে তোমার অধীন হল, তোমার যেমন অবস্থা সেই মত মেটাবে, না পার না মেটাবে, তাতে আর দুঃখ বোধ আসবে না কারণ মন আর তখন সেগুলো জোর করে ধরে নেই। আজ কাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় সেখানকার ভোগীদের নকল করছ। তারা এই ভোগকেই বড় করেছে বলে তোমরাও তাদের দেখাদেখি তাই করেছ, আবার তারাই যদি কখন এগুলো খারাপ বলে তখন তোমরাও খারাপ বলবে। এই শিক্ষা মানেই হচ্ছে তোমরা তোমাদের অবস্থার অতিরিক্ত ভোগকে জোর ক'রে ধরে নিয়েছ ও সেই ভাবে চলছ, এই অবস্থায় ত্যাগের শিক্ষা ভাল লাগে না। দুঃখ বলে ত আর কিছু আলাদা জিনিষ নেই। বাসনা পোরাতে না পারলেই দুঃখ, কাজেই এটা তোমার নিজের হাতে। নিজের অবস্থায় সুখী থাকতে পারলেই শান্তি পাবে, আর একটা দেখ, যখন কারুর ত্যাগ ভাব আসে সে তখন ধনীর নকল করতে চায় না গরীবেরই নকল করে। তাতেই বুঝবে ভোগে শান্তি আসে না কেবল দুঃখ বেড়ে যায়। শান্তি পেতে চাও ত ত্যাগ শিক্ষা নাও। সুখীর লক্ষণ হচ্ছে নিশ্চিন্ত ভাব, গাঢ় নিদ্রা, গান গাওয়া প্রভৃতিতে মনের আনন্দ রক্ষা করা; আর দুঃখীর লক্ষণ হচ্ছে সর্ব্বদাই চিন্তায় ভ্রূকুঞ্চিত, মুখ বিবর্ণ, গাঢ় নিদ্রা নেই, আনন্দ বলে জিনিষ জানে না ও মনে কেবল অশান্তি ভোগ করে। মন যত কম জিনিষ ধরে থাকবে তত শান্তি পাবে, আর মন যত বেশী ধ'রে থাকবে তত দুঃখ পাবে। তাই বলেছে ধনী কে? যার যত বাসনা কম। দরিদ্র কে? যার যত বাসনা বেশী।

জিতেন। জাগ্রত, সুষুপ্তি, স্বপ্ন এই তিনটে ত অবস্থা। স্বপ্ন

যা দেখা যায় তার সঙ্গে কি জাগ্রতের কোন সামঞ্জস্য আছে? একজন স্বপ্ন দেখেছে টক্‌টকে খয়ের রংএর কালীমূর্ত্তি; এ ত চিন্তা বা ধারণাতে আসে না।

ঠাকুর। সত্ত্বের প্রভাব এলে দেব স্বপ্ন দেখে, রজের প্রভাবে কাজ কর্ম্ম ইত্যাদি রজ গুণের স্বপ্ন দেখে আর তমঃ গুণের প্রভাবে ভূত, প্রেত ইত্যাদি নানা ভয়ের স্বপ্ন দেখে। কালী মূর্ত্তির রং ত আর কিছু নেই। যে রং যার ভাল লাগে, তাই আছে 'মা যে আমার পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী'

জিতেন। কুম্ভক কি মন স্থিরের লক্ষণ? কুম্ভক আদি ক্রিয়ার দ্বারা বাসনার একেবারে নিবৃত্তি হয় কি?

ঠাকুর। কুম্ভক ত ক্রিয়া, এর দ্বারা জোর ক'রে মন স্থির করা যায়। যতক্ষণ কুম্ভক অবস্থা ততক্ষণ মনস্থির। এ কি রকম জান, তোমায় ভীমরুল তাড়া করলে, তুমি জলে ডুবে রইলে ভীমরুল কামড়াতে পারলে না। যতক্ষণ ডুবে রইলে ভীমরুল কামড়াতে পারে না কিন্তু কতক্ষণ আর জলে ডুবে থাকবে? উঠলেই আবার কামড়াবে। সেই রকম কুম্ভক অবস্থা ছাড়লেই বাসনার ঠেলায় অস্থির। বাসনা নিবৃত্তি না হলে মন স্থির হয় না। সঙ্কল্পের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে তবে ঠিক মন স্থির হয়, তা ছাড়া কুম্ভক করা বা নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখা প্রভৃতি ত মনস্থিরের এক একটী কৌশল। তখনও কিন্তু মন স্থির হয় নি। শাস্ত্রে আছে শুধু রেচক ও পূরক দ্বারাও মন স্থির করা যায় কুম্ভকের প্রয়োজন হয় না। আবার কুম্ভক করলেই যে মন স্থির হয় তা নয়, ডুবুরিরাও অভ্যাস করেছে বলে অনেকক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে ডুবে থাকতে পারে; কিন্তু তা বলে কি তাদের মনস্থির হয়েছে? চোখের পাতা পড়ার সঙ্গে মনস্থিরের সম্বন্ধ আছে। চোখের পাতা যত বেশী পড়ে মন তত অস্থির। সেই জন্যেই ত্রাটক প্রভৃতি কৌশল আছে। আসল কথা বাসনার হাত থেকে মনকে

রক্ষা করতে না পারলে মন স্থির হবে না। তা ছাড়া কুম্ভকাদি যৌগিক ক্রিয়া করতে গেলেই কতকগুলো বাসনা জোর করে বাঁধা দরকার। ত্যাগী না হলে যৌগিক ক্রিয়া করা উচিত নয়। বিয়োগ বন্ধ না করলে যোগ হয় না অর্থাৎ যোগ করার আসল কাজ কিছু হয় না। সংসারীদের এ হওয়া বড় কঠিন। তাদের সঙ্গই সব চেয়ে সহজ উপায়। তবে এই সৎসঙ্গ করতে করতে বিচার করে সৎ অনুষ্ঠান অনুযায়ী চলবে। ভাল হওয়ার ওপর জোর দেবে। তখন সেদিকের বাধাগুলো ছোট হয়ে আসে। তবে যদি ত্যাগীর সঙ্গে প্রেম এসে যায় তখন তার আর কিছুর দরকার হয় না; তার সব আপনিই হয়ে যায়। চণ্ডীদাসে রামীর অবস্থা দেখ না। মন জোর করে এক দিকে পড়ায় এত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও মন কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করে সেই এক দিকেই ছুটছে। এই হল মনের স্বভাব। মন কখনও দুটো ধরে না; একটাকে জোর করে ধরলেই অপর সব আপনিই ছেড়ে যাবে। এখানে মন শুধু জোর করে একদিকে পড়া নয়, কোন লাভের আশা রক্ষা না করেই তার জন্যে ছুটছে। এই হ'ল প্রেমের লক্ষণ। যদি কোন লাভের আশা রক্ষা করে গতি কর ত তখন সেইটাই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটার জন্যও একলক্ষ্য হতে পার। কিন্তু এই লাভ লোকসান বই পড়া বা শোনা কথার ওপর অথবা পরের নকল করতে গিয়ে নিজের বাসনার উপযোগী মনগড়া ঠিক করে নাও। আসল লাভ লোকসান কি সে জ্ঞান নেই। যখন ঠিক ঠিক লোকসান কি বুঝবে তখন কি আর সে দিকে যাবে? আপনিই ছেড়ে দেবে। বিবেকের লক্ষণ হচ্ছে অনুতাপ আসবে, কষ্টবোধ হবে। বিবেক আসার পর বৈরাগ্য আসে তখন সব ছাড়ে। বৈরাগ্য যদি না আসে শুধু বিবেক এলে ছাড়বার ইচ্ছা হলেও ছাড়তে পারে না এবং তজ্জন্য ভয়ানক দুঃখ ভোগ করে। সাধারণ মানুষ মাত্রেরই কিছু বিবেক থাকে যা পশু পাখী প্রভৃতি জানোয়ারদের

থাকে না। কিন্তু সেটাকে জীবত্ব বুদ্ধি বলা যেতে পারে; তখন যে জ্ঞান থাকে সে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান। তাই সুরথ রাজা যখন মেধস মুনির কাছে গিয়ে বললে যে আমি ত জ্ঞানী, আমি জানি সংসার অনিত্য তত্রাচ এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কেন ওদিকে মন যাচ্ছে? মুনি বললেন এ হল জীবত্ব জ্ঞান, আসল জ্ঞান নয়। ইন্দ্রিয়গণ অধীন না হলে আসল জ্ঞান হয় না, আর এই জ্ঞান মানুষ ছাড়া আর কারুর আসে না। যখনই এই জ্ঞান আসবে তখনই নজর হবে ও ঠিক বোধ আসবে এ কি করছি? আমার পাথেয় ত কিছু সঞ্চয় করি নি! সংসারে ছেলে পরিবারকে খাওয়াতে, তাদের কিসে ভাল রাখব শুধু এই চিন্তায় সমস্তক্ষণ কাটাচ্ছি! অথচ ইচ্ছা করলেই এদের ভাল রাখতে পারি না, যে যার প্রারব্ধ ভোগ করবে। এরাও যার আমিও তাঁর, তবে কেন আমি এত চিন্তা ক'রে বৃথা সময় নষ্ট করি ও দুঃখ ভোগ করি। এই বিচার বোধ আসা বিবেকের কাজ; তারপর বৈরাগ্য এলে সব ছেড়ে যায়। যতক্ষণ না এ সব থেকে মন তুলে নিচ্ছ ততক্ষণ দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না কারণ সুখ দুঃখ বোধ ত আর কোন বস্তুর ওপর নয় সেটা মনে। বেদ বেদান্ত হিন্দুদের অনেকেই কিছু কিছু পড়েছে কিন্তু প'ড়েও যা না প'ড়েও তাই। দুই এক অবস্থা। তাই সঙ্গ করতে বলেছে।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন—

ঠাকুর। যেমন সঙ্গ করবে তেমনিই সব সংস্কার লাগবে। সংসারী মানেই জড়িত। সত্ত্ব জ্ঞান প্রকাশক, সত্ত্বগুণীর সংসারীর ত্যাগ থাকে, সে কিছুতে জড়ায় না; ইচ্ছা করলেই ছাড়তে পারে। সে নিজের বা আত্মীয় স্বজনের সুখের জন্য থাকে না। সে অপরের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ব'সে আছে। সে মায়ামুক্ত। আপনার লোকের দুঃখেও যেমন কষ্ট বোধ করে, অপরের দুঃখেও ঠিক তেমনি দুঃখ বোধ করে। সাধারণ কিন্তু, মায়ার প্রভাবে এই সমতা রাখতে পারে না। তাই সত্ত্বগুণী

সংসারীর বেশী অর্থ হলে কেবল নিজের বা আত্মীয় স্বজনের জন্যই খরচ করে না, তারা দান, সাধু সেবা, অতিথি সৎকার, পরের দুঃখ মোচন প্রভৃতি সৎকাজে ব্যয় ক'রে দেয় কারণ তারা সকল অবস্থাতেই ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্ন, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র ও মাথা গোঁজবার জায়গা এই তিনটী প্রকৃত প্রয়োজন ছাড়া অপর জিনিষে মন রাখে না। এতে তাদের জন্ম জন্মান্তরীন অনেক কর্ম্ম ক্ষয় হয়। তারা কিন্তু যশ, মান, বাহাদুরি প্রভৃতির দিকে কোন নজর না রেখে নিঃস্বার্থ ভাবে এই সব সৎকার্য্যে খরচ করে কেননা উপকার করাই তাদের স্বভাব। রজগুণী সংসারীর কার্য্যকরী শক্তি থাকে, সে এই সব কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখে, ইচ্ছা করলেই ছাড়তে পারে না ; স্বার্থ, বাসনা সবই থাকে। এরা বেশী অর্থ পেলে নিজের ভোগ বাসনার জন্যেও যেমন খরচ করে তেমনি যশ, মান, সম্ভ্রম প্রভৃতির আশাতেও প্রচুর কামনা নিয়ে বহু সৎকাজও করে। এদের এ নিঃস্বার্থ নয়, কোন কিছু লাভের আশা না থাকলে মোটেই খরচ করে না। আর তমগুণী সংসারীর কার্য্যকরী শক্তিই নেই, শুধু অলসতায় ভরা। এরা কারুর উপকার ত করেই না বরং অপকারের চেষ্টা করে, এমন কি কেউ উপকার করলেও তার অপকার করতে ছাড়ে না এবং অনেক সময় এই অপকার ক'রে আবার আনন্দ বোধ করে। এরা অর্থে বদ্ধ, সর্ব্বদাই মান অভিমানে অন্ধ হয়ে থাকে, এবং এদের ধর্ম্মভাব নেই বললেই হয়। এই খানে ঠাকুর 'ভগবান ও নারদের ধনী ও দরিদ্রের বাড়ী অতিথি হওয়ার গল্প বলিলেন। (অমৃতবাণী ১ম ভাগ ৫৭ পৃঃ)

তাই জীসাস বলেছেন 'একটা ছুঁচের ভেতর দিয়ে একটা উট যাওয়া বরং সম্ভব কিন্তু একটা ধনীর তাঁর কাছে যাওয়া সম্ভব নয়।' এর মানে হচ্ছে ধনীরা অর্থ, সম্পদ, মান, অভিমানে এত হিতাহিত জ্ঞান শূন্য যে গরীবদের চেয়েও অধম ; অবশ্য এ বদ্ধ তমগুণী ধনীর কথা। যে ধনী অর্থ থাকা সত্বেও ভগবানের চিন্তা করে ও তাঁর দিকে যাবার চেষ্টা করে সে ত খুব ভাল। গীতাতেই আছে যোগভ্রষ্টরা হয়

উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে না হয় ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। তাই বার বার বলেছে সাধু সঙ্গ। সঙ্গে এই সব ভাব আনিয়ে দেয়। সঙ্গে ভালবাসা হয়; হাজার বুঝিয়ে যা না হয় একটু ভালবেসে তা অতি সহজে হয়। সঙ্গের প্রভাবে ভেতরে সৎ হবার একটা ইচ্ছা হয় ও চেষ্টা আসে এবং সৎ নীতি নিয়ে চলতে পারে। সংসারীদের পক্ষে সাধু সঙ্গ ছাড়া কিছু হতে পারে না। তবে যাদের সে প্রেম এসে গেছে, তাদের কিছু দরকার হয় না; তারা সেই ভাব ছাড়া থাকতে পারে না। প্রেমে কিছু কর আর না কর আপনি নিয়ে যায় তখন আর অপর কোন দিকে লক্ষ্য থাকে না। এইখানে ঠাকুর 'রাধার তিনটী দূতী নয়ন, মন ও বাসনা'র গল্প বলিলেন।

কৃষ্ণ বিচ্ছেদে রাধা বলছেন সখী আমার কি আর কেউ নেই যে আমার কৃষ্ণকে এনে দেয়। এক দূতী ছিল নয়ন, তাকে পাঠালাম ওরে আমার কৃষ্ণকে নিয়ে আয়, তা সে সেই যে গেল আর আমার কাছে ফিরে এলো না; সে কৃষ্ণ রূপ দেখা মাত্র তাতে এত বিভোর হয়ে গেল যে সে সেই রূপ ছাড়া আর কিছু দেখে না। আর এক দূতী ছিল মন তাকে পাঠালুম ওরে আমার কৃষ্ণকে এনে দে কিন্তু সেও কৃষ্ণকে দেখা মাত্র সেই চিন্তায় বিভোর হয়ে গেল আর ফিরে এলো না অর্থাৎ কৃষ্ণ চিন্তা ছাড়া অপর কোন চিন্তা মনে আসছে না। আর এক দূতী ছিল বাসনা তা সে দিন দিন এত মোটাচ্ছে যে যতই তাকে বলি ওরে আমার কৃষ্ণকে নিয়ে আয় তা সে নড়তেই পারছে না। অর্থাৎ কৃষ্ণ দরশন বাসনা দিন দিন বেড়েই যাচ্চে। তাকে এমন কথাও বললুম যে ওরে, আমার কৃষ্ণকে একান্ত না আনতে পারিস ত অন্তঃত আমায় ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণের কাছে যা দিকি অর্থাৎ কৃষ্ণের বাসনা যদি এ রকম দিন দিন বাড়তে থাকে তা হলে সেই জোরেও যদি কৃষ্ণ আমার কাছে আসেন কিন্তু বললে হবে কি, সে এত মোটাচ্ছে যে একেবারেই নড়তে পারছে না। তা দেখ, এ ত আর সাধারণ নয়। সাধারণ সংসারীদের পক্ষে সঙ্গই প্রধান। সঙ্গে ভালবাসা দিয়ে আপন ক'রে নিয়ে যত

কাজ হয় তত আর কিছুতেই হয় না। তাই পরমহংসদেব সব আপন ক'রে নিতেন।

দ্বিজেন গাহিল—

(১)

কালো কালো বলিস্ না রে সে ত আমার তেমন নয়।
অজ্ঞান তিমির নাশে বাসনার করে ক্ষয়॥
কভু মাতা, কভু পিতা, ভক্তের ভাবে থাকে গাঁথা।
যে ভাবে যে ডাকে, তারে সেই রূপে এসে দেখা দেয়॥
আত্ম জ্ঞান হ'লে পরে ভেদাভেদ থাকে না রে।
এক সূর্য্যের আলো যেমন ঘটে ঘটে শোভা পায়॥
মন বৃত্তি রোধ হ'লে তবে নিত্যানন্দ মিলে।
চিত্ত শুদ্ধি হ'লে পরে ওঙ্কারে মিশে যায়॥

(২)

ভূপতি সুখ বাঞ্ছসি যদি ব্রজে কি আশা মিটে না।
নন্দালয়ে নন্দগোপে রাজা কি কেউ বলে না॥
তোমার রাজপাট হত কদম্বতলা, ডাল পালা তার হাতী ঘোড়া।
বৃকভানুর নন্দিনী হলে রাজরাণী তাও কি তোমায় মানাত না॥
আমি স্বজন সাজন সকলই দিতাম কেবল বাঁকায় বাঁকায় মিলত না॥
(শুধু কুব্জার মত বাঁকায় মিলত না)

তৃতীয় ভাগ—একবিংশ অধ্যায়

—০—

কলিকাতা; মঙ্গলবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সাল।
ইং ১৩ই জুন ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, দ্বিজেন, কৃষ্ণ দত্ত, জিতেন, কৃষ্ণকিশোর, নগেন, কালী, ললিত, শ্যাম, তারাপদ, ভোলা, দ্বিজেন সরকার, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, সুরেন পাল, ভগবান, ধনকৃষ্ণ, মনোরঞ্জন, হরপ্রসন্ন, জ্ঞান, পুত্তু ও অভয় আছে।

জিতেন। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ সব চেয়ে বড় বলেছে কেন? গুরু শিষ্যের সব ভার নেন ত? বিশেষতঃ, যাদের তিনি বলেন যে তোমার সব ভার নিলুম?

ঠাকুর। লৌকিক সম্বন্ধের মধ্যে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ সব চেয়ে বড়, কারণ সব চেয়ে বড় জিনিষ ধর্ম্ম ও শান্তি নিয়ে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ। সাধারণ সংসারের দিক দিয়ে পিতা, মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ সব চেয়ে বড় কেননা তাঁরা সন্তানের লালন, পালন, শিক্ষা ও সাংসারিক স্বচ্ছন্দের ব্যবস্থা প্রভৃতি মায়াজনিত সমস্ত ভার নেন। কিন্তু তাঁরা দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন না। গুরু এই দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন ব'লে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা এর চেয়ে বড় করেছে; আর এর চেয়ে বড় কোন জিনিষ পাবার নেই ব'লে এইটাকেই সব চেয়ে বড় সম্বন্ধ বলেছে। গুরু ত শিষ্যের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত এবং তার চেষ্টা করেন। তবে শিষ্যেরও সেইরূপ হওয়া চাই। যেমন বর বললেই বুঝতে হবে একজন কনে আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কনের চেলির কাপড় পরা প্রভৃতি যে যে লক্ষণ সব

বুঝিয়ে যায় তেমনি গুরু বললেই শিষ্য ও শিষ্যের যে যে লক্ষণ সব বুঝিয়ে গেল। শিষ্য কে? যে অবিচারে গুরুবাক্য পালন করে, কোন রকম দ্বিধা করে না ও যে দেহ, মন, প্রাণ সব অর্পণ করে সেই ঠিক শিষ্য। গুরু শিষ্য ঠিক যেন যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতি ও সৈন্য। সেনাপতি যা বলবে তখনই শুনতে হবে, জীবন যায় যাক।

সদ্‌গুরুর চেষ্টাই ত, সব ভাল হোক, কিন্তু যতক্ষণ না শিষ্যকে ঠিক ধরতে পারেন ততক্ষণ আর কি হবে? তোমার ভেতরে যদি খড় বালি ভরা থাকে ত সে গুলি পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত কাজ হবে কি ক'রে? এক সের দুধে এক পোয়া জল থাকলে সেই জল মেরে ক্ষীর করতে যে সময় লাগবে, সেই সময়ে কি এক মণ জল ম'রে ক্ষীর হতে পারে? গুরু ত সকলের প্রতি সমান ভাবেই কাজ করছেন, তবে আধার অনুযায়ী, ও জন্ম জন্মান্তরীন কর্ম্ম অনুযায়ী কাজ হবে। যার যেমন প্রাক্তন, সেই মত তাকে ধৈর্য্য ধ'রে গতি করতে হবে। কথায় আছে, গুরু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের ভার নেন। গুরুর প্রধান জিনিষ হচ্ছে ধর্ম্ম; তিনি ধর্ম্ম ভিত্তি করিয়ে দেন, সেই সংস্কার ধরিয়ে দেন। এই ধর্ম্ম ভিত্তি থাকলে সেই অনুযায়ী কামনা উঠবে, অর্থাৎ খুব বেশী কামনাও ওঠে না; আর যা ওঠে প্রায় সে গুলো সফল হয়। এই কামনা পূর্ণ হলেই, আপনি মোক্ষ আসে, তার জন্যে ভাববার বা আলাদা কিছু করবার দরকার হয় না। অর্থ প্রালব্ধ অনুযায়ী আসে; সাধারণ সংসারী টাকাকেই বড় করেছে ও তার অধীন হয়ে রয়েছে, কিন্তু ধর্ম্ম ভিত্তি থাকলে অর্থ অধীন করতে পারে না, আর সেই অর্থ কেবল সৎকার্য্যেই ব্যয় হয়। এ সমস্তই শিষ্যের অবস্থার উপর নির্ভর করে। শিষ্যের যতটুকু ধরবার ক্ষমতা আছে, তার বেশী তাকে দিলেও সে ত ধরতে পারবে না।

গুরু ভার নিলেন ব'লে যে তাকে প্রালব্ধ ভোগ করতে হবে না, বা কোন দুঃখ পেতে হবে না, তা ত নয়। যতক্ষণ

সংসারে বাসনা কামনা নিয়ে রয়েছ, ততক্ষণ সুখ দুঃখ বোধ আসবেই; তুমি যত বেশী জিনিষ ধ'রে থাকবে, তত লাভ লোকসান দেখবে, আর তত দুঃখ আসবে। এ সংসারের নিয়ম, এ তাঁর সৃষ্ট নিয়ম; তিনিই আবার সেটা ভাঙ্গবেন কেন? তাঁর যে ভাঙ্গবার ক্ষমতা নেই তা ত নয়; তাঁর অনন্ত শক্তি তিনি ইচ্ছা করলে কি না পারেন? কিন্তু তাঁর নিয়ম তিনি ভাঙ্গবেন কেন? তবে তাঁকে ধরলে তিনি প্রালব্ধ ভোগের সময় রক্ষা ক'রে যান, ডুবতে দেন না এবং শেষে ঠিক দাঁড় করিয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পঞ্চ পাণ্ডবের সব ভার নিয়েছিলেন, কিন্তু তত্রাচ তাদের বিরাট গৃহে দাস দাসী বৃত্তি, গুপ্ত হত্যায় পুত্রের মৃত্যু এ সব নানা কষ্ট ভোগ হ'ল। তবে, তিনি এই দুঃখের সময়ও বরাবর সঙ্গে সঙ্গে থেকে দুঃখের পরিমাণ কমিয়ে শেষে রাজত্ব পাইয়ে দিয়েছিলেন। যে কর্ম্মভোগ দশ বৎসরে হ'ত, সে জায়গায় হয়ত দু'বছরেই ভোগ শেষ ক'রে দিলেন। কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগ করতেই হবে, তা ছাড়া কিছুতেই হবে না; তিনি যা করবার ঠিক ক'রে যাচ্ছেন তোমার ত তা বোঝবার ক্ষমতা নেই।

আর গুরু যে ভার নেবেন, শিষ্য ভার দেবে তবে ত? তুমি একজন ধনী, কোন দরিদ্রের বাড়ী গিয়ে বল দেখি তোমার ছেলে পরিবারের ভার আমায় দাও। তখনই সে তোমার ওপর সন্দেহ করবে, বিশ্বাস করতে পারবে না। তেমনি শিষ্য সে রকম নিশ্চিন্ত হয়ে ভার দিতে পারলে তবে ত তিনি নেবেন। সন্দেহ করলে বা সে বিশ্বাস না থাকলে হবে না। শুধু শিষ্য কেন, তিনি ত সকলেরই ভার নিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁকে ভার দিচ্ছে কে? যতক্ষণ না গুরুর ওপর স্থির বিশ্বাস আসবে, ততক্ষণ কি ভার দিতে পারে? সে অবস্থা হওয়া চাই, তবে ত? ছেলে জানে যে সে তার বাপের সম্পত্তি পাবে; এ তার স্থির বিশ্বাস, তাই সে নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু তুমি অপর একজনকে বল যদি 'ওহে বাপু, আমার সম্পত্তি সব তোমায় দিয়ে

যাব।' সে কি সে কথা বিশ্বাস করতে পারে? সে তখন ভাবে, দেবে বল্লে ত কিন্তু কই লেখাপড়া ত ক'রে দিচ্ছে না, কি জানি দেবে কি না দেবে; তার সে বিশ্বাস নেই। যার সে রকম অবস্থা হয়েছে, যে গুরুতে স্থির বিশ্বাস রাখতে পারবে, সেই রকম শিষ্যকেই গুরু বলেন যে তোমার সব ভার নিলুম। এইখানে ঠাকুর নারদের কৈবল্য শান্তি দিবার গল্প বলিলেন। (অমৃতবাণী ২য় ভাগ ৩৩ পৃষ্ঠা।)

তুমি গুরুর কাছে এসেছ কি জন্যে? মূল, শান্তি পাবার জন্যে, দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে; তা যে ভাবেই হ'ক না তোমার ভাববার দরকার কি? বিনা ত্যাগে কখনও দুঃখের নিবৃত্তি হয়নি, হবে না। যতক্ষণ ভোগের মাত্রায় থাকবে ততক্ষণ দুঃখ বোধ অনিবার্য্য। ভোগের ইচ্ছা যখন প্রবল থাকে, তখন তাকে ত্যাগের কথা বললে কি সে দাঁড়াতে পারে? স্রোতের মুখে হঠাৎ বাঁধ দিলে থাকবে কেন? ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু তখন আবার, দুঃখ যাচ্ছে না বলা চলবে না। যে যে পরিমাণ ত্যাগে আছে, সে সেই পরিমাণ নির্ভীক ও সেই পরিমাণ শান্তিতে আছে। দারিদ্র আর ত্যাগ দুটো আলাদা জিনিষ; দারিদ্রে, ভেতরে প্রচুর বাসনা আছে কিন্তু অর্থের অভাবে ভোগের জিনিষ পাচ্ছে না এবং সে জন্যে সে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করে। আর ত্যাগে, ভোগের জিনিষ পেলেও তার ভোগের ইচ্ছা নেই; তাই তার দুঃখও নেই।

সাধু বা মহাপুরুষ আর অবতারে তফাৎ কি? সাধু নিজের ভাব দিলেন, তুমি সেই ভাব ধ'রে চলতে পারত হ'ল নয়ত হ'ল না। তাঁরা নানা প্রকৃতির নানা ভাবে দাঁড়াতে পারেন না। কাজেই তাঁরা বিভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গে যার যেমন ভাব সেই ভাবে মিশে তাদের ভার নিয়ে কাজ করতে পারেন না। খুব শক্তি থাকে ত বড় জোর দু' পাঁচটীর ভার নিয়ে যেতে পারেন। আর

অবতারদের অনন্ত শক্তি, তা থেকে তাঁরা বহুলোককে শক্তি দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁরা তোমার ভাবেই মিশবেন ও শেষে তোমার মনকে এমন ক'রে বদলে দেবেন যে যেটা আগে চাচ্ছিলে না, এখন সেইটাই ভাল লাগবে। তাঁরা সাধারণ ভাবে এসে সাধারণ ভাবে কাজ করেন। সাধারণ ব্যবহারে 'পারছি না', 'পারি না' এই সব কথার ওপর তাঁদের শক্তির মাপ করতে যেও না। অবতার ও সাধুতে তফাৎ কি রকম জান? যেমন বন্যার জল আর নদীর জল। বন্যার জলে সব ভেসে যায়, তখন যেখানে সেখানে, মাঠ, ঘাট, সকল জায়গার ওপর দিয়ে নৌকা যেতে পারে কিন্তু নদীর জলে সেই বাঁধা নদীর পথ ছাড়া নৌকা যেতে পারে না। অবতাররা সব ভাব দিয়ে গতি করাতে পারেন। তাঁদের ভাব 'আপনি আচরি কর্ম্ম অপরে শেখায়'। তাঁরা যদি একটু অসাধারণ ভাব দেখান তাহলে সাধারণ জীব তাঁদের সেই অসাধারণ ভাব নিয়ে চলতে পারবে না ব'লে তাঁদের দেখে গতি করবার আশা করবে কি ক'রে? তা ছাড়া, তিনি যদি একবার একটু বিভূতি দেখান, অর্থাৎ কাউকে যদি পর পর কি ভাবে যেতে হবে আগে থেকে ব'লে দেন বা কারুর কোন বাসনা পুরিয়ে দেন তা হলে কি আর তিনি টেঁকতে পারবেন; নানা লোকের নানা বাসনা তাঁকে ছেঁকে ধরবে।

অবতার ছাড়া সকলকেই প্রাক্তনের অধীন হতে হবে। যার যা প্রারব্ধ, তা ভোগ করতেই হবে। প্রারব্ধে যে কেবল দুঃখ ভোগই হচ্ছে তা ত নয়; প্রারব্ধে সুখ ভোগও করাচ্ছে সেই অনুযায়ী জ্ঞান আনছে, বুদ্ধি তুলে দিচ্ছে, সংসার দুঃখময় বোধ করিয়ে দিচ্ছে, ত্যাগ আনছে, সৎসঙ্গ করবার ও সৎ হবার বৃত্তি আনিয়ে দিচ্ছে এবং সাধু সঙ্গও জুটিয়ে দিচ্ছে।

গুরু শিষ্য এক, যেমন সূর্য্য হইতে চন্দ্র। যে দেহ মন প্রাণ সব গুরুকে অর্পণ করে সেই ঠিক শিষ্য কাজেই দুই এক হয়ে গেল; শিষ্য ত আর কিছু আলাদা রাখলে না। পূর্ণ বিশ্বাস না হলে এই

ভাবে পূর্ণ আমিত্ব ছেড়ে ভার দেওয়া যায় না, আর এই বিশ্বাস বড় শক্ত জিনিষ। সংসার ক্ষেত্রে ঠিক বিশ্বাস নেই বললেই হয় কারণ পূর্ণ ভালবাসা এলে আপনি ত্যাগ আসবে এবং তখনই ঠিক বিশ্বাস আসে। সেই জন্যে বিশেষতঃ সংসারীদের এত ক'রে সাধু সঙ্গ করতে বলেছে। সঙ্গের প্রধান জিনিষ হচ্ছে মনের শক্তি রক্ষা করা ও ত্যাগ শিক্ষা করা। মনের শক্তি না থাকলে দুঃখের সময় নিজেকে সামলাতে পারবে না, কারণ আগে থেকে ত আর জানতে পারবে না কখন কোন দুঃখ আসবে যে সেইটার জন্যে গোড়া থেকে তৈরী হয়ে থাকবে। কোথা থেকে, কি ভাবে যে দুঃখ আসে তা বলা বড় শক্ত, তাই মনের শক্তি বাড়াও সব অবস্থায় দাঁড়াতে পারবে। সেই জন্যে পূর্ব্বে সেই ভাবে শিক্ষা হ'ত। প্রথমে গুরু গৃহে নানা কঠোরতার ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে ত্যাগের ভিত্তির ওপর মনের শক্তি বাড়িয়ে দিত। তাতে পরে আর এত দুঃখ বোধ হত না। কিন্তু এখন সে প্রথা নেই; এখন গুরুজনেরা প্রথম থেকেই ভোগের জিনিষের ভেতর মানুষ ক'রে ভোগ বাড়িয়ে দেয়। কাজেই, পরে যখন অর্থের অভাব বশতঃ সেই সব ভোগ জোটাতে পারে না তখন দুঃখ ভোগ করে। এই সব গুরুজনরা প্রায়ই ধর্ম্ম পথে গতি করে না এবং তারা চায় না যে তাদের ছেলে মেয়েরা ধর্ম্ম পথে অর্থাৎ ত্যাগের পথে গতি করুক। এ ক্ষেত্রে যদি কারুর ধর্ম্ম ভাব আসে এবং সেই পথে গতি করবার ইচ্ছা হয় তখন ধর্ম্ম কার্য্যে বিরোধী হলে সেই সব গুরুজনদের কথা না শুনলে দোষ হয় না। অপর সকল বিষয়ে তাঁদের কথা শুনবে তাঁদের মতে চলবে এবং সকল সময়ে প্রাণপণে তাঁদের আজ্ঞা প্রতিপালন করবে কেবল ধর্ম্ম কার্য্যে বাধা দিলে শুনবে না তাতে কোন অপরাধ হয় না। যেমন প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুর হরিনাম ছাড়ার কথা শোনেন নি। সঙ্গে মনের শক্তি বাড়লে ভালবাসা পড়ে, তখন আপনা আপনি সব ছেড়ে যায় ও ক্রমশঃ গুরুর ওপর বিশ্বাস আসে। তবে যার একেবারে প্রেম এসে যায়, তার কথা আলাদা, সে তখনই

গুরুকে মন প্রাণ সব অর্পণ ক'রে ফেলে এবং তাঁকে পূর্ণ ভার দেয় ও সেই ভাবে থাকে।

নগেন। 'সকল বাসনা ত্যাগ কর' কথাটী বড় চমৎকার। আমি সকল বাসনা ত্যাগ করতে চেষ্টা করছি। কিন্তু দেখছি সকল বাসনা ত্যাগ করলে রাত্রে ঘুম আসেনা তখন একটা ছোট বাসনা ধরলে তবে ঘুম আসে।

ঠাকুর। তোমার সব বাসনা এখনও যায়নি ত, জোর ক'রে ছাড়তে চাচ্ছ তাই এরকম হচ্ছে। বাসনার স্বভাব মনে ওঠে; সব বাসনা ঠিক না গেলে শান্তি আসবে না। ছোট বাসনা নিয়ে ঘুমোও, তা দেখো, যেন এমন বাসনা নিও না যাতে মনকে অধিকার ক'রে বসে।

নগেন। আমার কাশী জায়গাটী সব চেয়ে ভাল লাগে।

ঠাকুর। হ্যাঁ, কাশী জায়গা ত ভাল বটেই। কিন্তু যারা চিন্তাশীল, যারা চিন্তা ক'রে মনকে অপর জায়গায় রাখতে পারে তাদের কাছে সব জায়গাই ভাল; তবে স্থান মাহাত্ম্য আছে বৈকি।

জিতেন। মানুষ কখন সুখ কখন দুঃখ পাচ্ছে; কখন তার সুবুদ্ধি উঠছে, কখন কুবুদ্ধি উঠছে এ সবই যদি প্রাক্তনে হয় অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের প্রাক্তন এ জন্মে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের প্রাক্তন পূর্ব্ব জন্মে এইরূপ ক্রমাগত এবং পর জন্মে এই জন্ম জনিত প্রাক্তন ভোগ হতে লাগল, তা হ'লে মানুষের কোন কাজের ওপরই ত হাত নেই। চেষ্টা করাতেও যা আর চেষ্টা না ক'রে গা ভাসিয়ে দেওয়াতেও সেই একই ফল।

ঠাকুর। তোমার যেটুকু দেওয়া আছে তার মধ্যে তোমার হাত আছে। আবার আছে, এই করলে এই প্রাক্তনের খণ্ডন হবে। মনের স্বভাব হচ্ছে যদি কোন বস্তুতে জোর ক'রে মন লাগিয়ে রাখতে পার ত, মন সেই বস্তু তখন জোর ক'রে ধরবে। কোন বড় জিনিষে মন থাকলে ছোট জিনিষ গুলো আপনি ছেড়ে আসবে। চেষ্টা করা না করা সেও ত প্রাক্তন। প্রাক্তনে এমন বুদ্ধি তুলে দেবে যাতে তুমি চেষ্টা করবে অথবা বসে থাকবে। রজগুণে উত্তম,

স্পৃহা বা চেষ্টা আসবে; তমগুণে অলসতা আনবে আর সত্ত্ব গুণে ত্যাগ নিয়ে আসবে, নিত্য অনিত্যতা বোধ আনবে ও মন শান্ত হয়ে আসবে। মানুষ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে। তুমি যে রকম কাজ করবে সেই রকম ইচ্ছা প্রাক্তনে তুলে দেবে। তোমার যদি গতি করবার বিলম্ব থাকে ত প্রাক্তন এমনি বুদ্ধি তুলে দেবে যে তুমি গা ঢেলে দিয়ে ব'সে থাকবে কিছু করবে না।

নগেন। ধরুন শোক পেয়ে ঠিক করলুম সব বাসনা ত্যাগ করব। পারি আর না পারি জোর ক'রে শক্ত হয়ে থাকব: বাসনাকে আসতে দোব না।

ঠাকুর। প্রালব্ধই তোমায় এ বুদ্ধি এনে দিচ্ছে। সকলকেই ত রোজ বার বার বলছি 'বাসনা ত্যাগ কর', তা এর মধ্যে কটা সে কথায় মন দিচ্ছে, কটাই বা বাসনা ছাড়বার চেষ্টা করছে; বরং কতগুলো দেখ, আরও বাসনা বাড়িয়ে যাচ্ছে। আবার তোমারই বা এমন ইচ্ছা হচ্ছে কেন ?

দ্বিজেন গাহিল—

(ওমা তারা) তনয়ে তার তারিণী।
ত্রিবিধ তাপেতে তারা নিশিদিন হতেছি সারা।
বার বার দুঃখ আর দিও না মা অনিবার।
অধম সন্তানের দুঃখ নাশ দুঃখনাশিনী ॥
সংসার রাঙ্গা ফলে ভুলিব না মা আর।
খাইয়ে দেখেছি, তায় নাহিক কোন স্বতার।
পূরিত গরলে, খাইলে কুফল ফলে।
খেলে যেন হারাই, তোমা ধনে ভুলে যাই।
মা হয়ে সন্তানে আর দুঃখ দিও না জননী ॥

আমার আমার ক'রে মত্ত হই মা অনিবার।
ইন্দ্রিয়াদি দারা সুত সকলই ভাবি আমার।
কিন্তু আমি কোন স্থানে খুঁজিয়া না পাই ধ্যানে।
কোথা গেলে 'আমি' মিলে ব'লে দেনা মা আমায়
দীন রামে আর ভ্রমে রাখিস না মা নিস্তারিণী॥

বিজয় গাহিল—

মা আছেন আর আমি আছি ভাবনা কি আছে আমার।
মায়ের হাতে খাই পরি মা নিয়েছেন আমার ভার॥
সংসার পাকে ঘোর বিপাকে যখন দেখি অন্ধকার।
সে অন্ধকারে মা আমার শোনায় 'মাভৈ' অনিবার॥
মিলে ছয় জনাতে, লয়ে সাথে পথ দেখায় যে বারেবার।
সেই বিপথ হ'তে ধ'রে হাতে মা যে করছেন উদ্ধার॥
ভুলেও থাকি তবু দেখি, বুঝিও না মা একটী বার।
এমন দয়ার আধার মা যে আমার, মা আমার আমি মার॥

———

তৃতীয় ভাগ—দ্বাবিংশ অধ্যায়

কলিকাতা ; বৃহস্পতিবার ১লা আষাঢ় ১৩৪০ সাল,
ইং ১৫ই জুন ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, ললিত, নগেন, কালু, পুত্তু, কৃষ্ণ দত্ত, দ্বিজেন, তারাপদ, শ্যাম, কৃষ্ণকিশোর, জিতেন, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, ভোলা, স্থরেন পাল, সুধাময়, পঞ্চানন, ভগবান, নৃপেন, দ্বিজেন সরকার, জ্ঞান, হরপ্রসন্ন ও অভয় আছে।

জিতেন। জপ করবার সময় নামের ওপর লক্ষ্য রাখা ভাল না রূপের ওপর লক্ষ্য রাখা ভাল ?

ঠাকুর। নাম বা রূপ যেটা ইচ্ছা নিয়ে জপ করতে পার। তবে রূপের ওপর জপ করা ভাল ; কারণ নাম ধ'রে জপ করলেও সেই রূপের ছায়া মনে পড়ে।

জিতেন। রূপের ওপর লক্ষ্য ক'রে জপ করতে গেলে অনেক সময় রূপটা এত বড় হয় যে জপ বন্ধ হয়ে যায়। তখন ত আর জপ রইল না ধ্যানে দাঁড়িয়ে গেল।

ঠাকুর। রূপ বড় হয়ে জপ বন্ধ হয়ে গেলে ক্ষতি কি ? যার জন্যে জপ করছ সেই জিনিষ সামনে দেখছ যখন, তখন আর জপের দরকার কি ? ধ্যান, জপের উদ্দেশ্য কি ? মনকে স্থির করা, তা যে ভাবেই হ'ক না ক্ষতি কি ?

জ্ঞান। রূপ জপ করবার সময় হয় ত সামনে একটা ছবির মত এলো।

ঠাকুর। ছবি মনে করবে কেন ? তোমার বাপের ফটোকে কি কেবল ছবির মত দেখ, না সেই ভাব আরোপ ক'রে দেখ ?

পাথরের কালী মূর্ত্তিকে কি পাথর ব'লে ভাব না মায়েরই রূপ মনে ক'রে ডাক ?

এইখানে ঠাকুর তাঁহার রচিত গানখানি গাহিলেন—

মায়ের রূপের তুলনা কি হয় ?
নিজে ভোলা, আপন ভোলা যে রূপেতে রয়।
বেদ বেদান্ত তারাও ভ্রান্ত অন্ত নাহি পায় ॥
ঐ রূপ লাগি দিবানিশি ধ্যানে আছেন যোগী ঋষি।
তারা যুগে যুগে আছে বসি সন্ধান না পায় ॥
রূপে জগত আছে ভ'রে রূপের খেলা জগত জুড়ে।
(আবার) রূপের মোহে সবাই প'ড়ে পাগল হয়ে রয় ॥
'মা' 'মা' ব'লে যে জন ডাকে ভবের ভয় তার কি থাকে ?।
মা যে এসে আদর ক'রে কোলে তুলে লয় ॥
বুঝিয়ে দীন মনকে বলে দেখতে পাবি 'আমি' ম'লে।
দয়াময়ী দয়া ক'রে ভালবেসে দেখা দেয় ॥

জ্ঞান। সেই কালী মূর্ত্তির পেছনে যে সচ্চিদানন্দ রূপ রয়েছে এবং সাধকদের কাছে তিনি যে ঐ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হয়েছেন ?

ঠাকুর। সচ্চিদানন্দ রূপ পেছনে কেন আগাগোড়া ওতপ্রেত ভাবেই রয়েছে। তিনি যখন সর্ব্বত্রই রয়েছেন, তখন দেওয়ালটাকে ডাক না কেন ? ঐ মূর্ত্তিটা দেখলে তাঁর ভাব মনে আসে ব'লে ঐ মূর্ত্তিটাকে চিন্তা করতে তোমার ভাল লাগে।

জিতেন। জপ ঠিক হচ্ছে কিনা বুঝব কি ক'রে ?

জ্ঞান। তখন রূপ টুপ দর্শন হয় ?

ঠাকুর। রূপ দর্শন যে খুব একটা বড় জিনিষ তা নয়। সাধারণ, চিত্ত স্থির কিছু হলেই রূপ আদি দেখতে পাওয়া যায়। ভেতর ঠিক না হলে রূপ দর্শনে লাভ কি ? বাসনা, কামনা, আসক্তি না গেলে, মনে শক্তি না পেলে, সুখ, দুঃখ, রোগ, শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেলে ত, রূপ দেখেই বা কি হ'ল ? আর যদি

এগুলো সব ঠিক হয়ে যায় অথচ রূপ আদি কিছু নাই দেখতে পাও, সে ঢের ভাল। তাঁর জন্যে জপ করা ছাড়া অপর জিনিষের জন্যও জপের ব্যবস্থা আছে, যেমন সংসার সুখের জন্যে সাধারণে জপ করে। তাঁকে জপ করতে করতে দেখবে ক্রমশঃ বাসনা কমছে কি না, ক্রমশঃ মনের শক্তি বাড়ছে কি না? তা হলেই বুঝবে জপ ঠিক হচ্ছে। জপের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের শক্তি বাড়ান, মন স্থির করা। অর্থাৎ যে যে জিনিষ দ্বারা মন অস্থির হয় সেগুলোকে অধীন করা।

জিতেন। সকাল সন্ধ্যায় নীতি পালনের জন্য জপ করতে ব'সে হয় ত ১৫ দিন ঠিক হ'ল আর ১৫ দিন হয় ত মন বসল না। কেবল মুখেই বিড় বিড় করছে। এতে কি কাজ হবে?

ঠাকুর। এক দিনেই কি হবে? জপ করতে করতে অপর ভাব আস্তে আস্তে কমতে থাকে। গাছে আগে খুব জল ঢালতে হয়, সার দিতে হয়, তবে ত ফুল ফল হবে। সার দিতে দিতেই কি ফুল হয়? জপ, সৎনীতি, সৎসঙ্গ হচ্ছে সার। তা ছাড়া আবার দেখ কতটুকু সার দিচ্ছ। যে গাছে দু'গাড়ী সার দরকার হবে সেখানে সামান্য কিছু দিলে কি ফল পাবে? দিতে দিতে সারের পরিমাণ বেশী হলে তবে কাজ হবে। 'লাগি রহ ভাই, বানাতে বানাতে বান যাই।' মুখে বিড় বিড় করে বলছ। সে ও দরকার, কারণ মন যে হিজিবিজি ক'রে রেখেছ। আগেই কি ঠিক ভাব আসে? প্রথমে এই রকম কত বাজে জিনিষ আসবে, তারপর ত ঠিক ভাব বেরুবে। লিখতে আরম্ভ করলেই কি অ, আ, ক, খ লিখতে পার? কত হিজিবিজি কাটতে কাটতে ঠিক অক্ষর লিখতে শেখ।

জিতেন। দেবস্থানে ব'সে জপ করলে কি বেশী ফল হয়?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তা হয় বই কি? ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গায় ব'সে ধ্যান করতে কত আনন্দ পাওয়া যায়, আর দুর্গন্ধওলা খারাপ জায়গায় ব'সে ধ্যান করতে গেলে কখন শেষ হবে, কখন এই দুর্গন্ধের হাত থেকে নিস্তার পাব এই মনে হবে। তেমনি স্থান মাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীঠাকুর জিতেন্দ্রনাথ

আছে। সেখানে বেশী কাজ হয়। যেখানে অনবরত সাধু সন্ন্যাসীরা এসে জপ করেন সেখানে তাঁর শক্তি বেশী থাকে। সেখানে ব'সে জপ করলে চট্ ক'রে মন স্থির হয়ে আসে ও মনের শক্তি বেশী বাড়ে। দেবস্থান, সাধুস্থান তাঁর বৈঠকখানা। তিনি বাড়ীওয়ালা, তিনি বাড়ীর সব জায়গায় আছেন বটে কিন্তু বেশীক্ষণ বৈঠকখানায় থাকেন। যেখানে সাধু থাকেন, সেখানে দেব দেবী তাঁর সঙ্গে থাকেন, সেখানে তাঁর বেশী শক্তি থাকে। তাই সৎসঙ্গ, সাধুস্থান প্রধান জিনিষ বলেছে। জল ত সব জায়গায় আছে, খুঁড়লেই পাবে, কিন্তু নদীর ধারে গেলে সামনেই পেলে আর কষ্ট ক'রে খুঁড়তে হ'ল না।

জিতেন। সকল কাজ করছে অথচ সব সময় মনে তাঁর জপ করছে এ কি রকম ?

ঠাকুর। মনের একটা অবস্থা আছে, যখন সকল সময়ই আপনা আপনি তাঁর জপ হয়ে যায়, এমন কি নিদ্রার সময়ও তাঁর জপ হয়। এইখানে ঠাকুর 'অহল্যাবাই ও নিদ্রিত স্বামীর শ্বাস প্রশ্বাসে রাম রাম জপ'এর গল্প বলিলেন।

অহল্যাবাইএর মনে বড় দুঃখ ছিল যে তার স্বামী কখনও ভগবানের নাম করত না ও ভগবানের নাম করলেই খুব চ'টে উঠত। একদিন অহল্যাবাই দেখে যে তার স্বামী ঘুমুচ্ছে আর তার নিশ্বাস প্রশ্বাসে 'রাম রাম' নাম জপ হচ্ছে। তখন সে বুঝতে পারলে যে তার স্বামী একজন ভক্ত অথচ কাউকে জানতে দেয়নি, এমন কি অহল্যাবাইও নিজে জানতে পারেনি। এই দেখে তার মনে খুব আনন্দ হ'ল, তাই সকালে উঠে মন্ত্রীকে ডেকে ব'লে দিলে আজ বড় আনন্দের দিন, চারিদিকে উৎসবের আয়োজন কর এবং দান ও কাঙ্গালী ভোজন প্রভৃতির ব্যবস্থা কর। রাণীর আদেশ অনুযায়ী রাজবাড়ীতে নহবৎ ব'সে গেল, চারি ধার সাজান হচ্ছে এবং রাজ্যময় একটা হৈ চৈ প'ড়ে গেল। রাজার ঘুম ভাঙ্গতেই

চারি দিকে এই সব আনন্দ ধ্বনি ও কোলাহল শুনে মন্ত্রীকে ডেকে রাজা জিজ্ঞাসা করলে, আজ এ আনন্দের কারণ কি? মন্ত্রী বললে আমি ত কিছু জানি না রাণীমার হুকুম। রাজা তখন রাণীকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় অহল্যাবাই বললে দেখ, আমার বড় দুঃখ ছিল যে তুমি ভগবানের নাম কর না, কিন্তু কাল রাত্রে তোমার শ্বাস প্রশ্বাসে রাম নাম জপ হচ্ছে শুনে আমার ভারী আনন্দ হয়েছে তাই আজ এই উৎসবের আয়োজন করিছি। রাজা বললে 'এঁ্যা,! তুমি আমার গুপ্ত ভাব টের পেয়ছ!' প্রবাদ আছে এই ঘটনার পর অহল্যাবাই এর স্বামীর দেহত্যাগ হয়।

সব সময় সব অবস্থায় নাম করতে পার ত খুব ভাল, 'নগর ফের আর মনে কর প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মাকে'।

নগেন। বাঃ, বেশ কথাটী ত। তাহলে আমিও ঘুমুবার সময় জপ করব, জোর ক'রে চেষ্টা করব।

ঠাকুর। তা পার কই? পারলে ত খুব ভাল। সে অবস্থা আসা চাই তবে ত পারবে; তবে এ উদ্দেশ্য থাকা ভাল।

জিতেন। স্মরণ, মনন কি?

ঠাকুর। স্মরণ—স্মৃতির মধ্যে নিয়ে আসা; মনন—মনের মধ্যে এনে চিন্তা করা।

জিতেন। তা হলে ছবি দেখা বা তিনি খাচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন এ চিন্তা করলে স্মরণ, মনন হয় কি?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তা হয়।

জিতেন। স্মরণ মনন করলেও সঙ্গ হ'ল ত?

ঠাকুর। হ্যাঁ তাতেও সঙ্গ হয়।

জিতেন। তা হলে, এখানে এসে এত ভীড়ের মধ্যে সামনে ব'সে থাকার চেয়ে বাড়ীতে ঘরের ভেতর দোর দিয়ে একলা ব'সে স্মরণ মনন করলেও হয় ত?

ঠাকুর। হ্যাঁ, ঠিক মত করতে পারলে হয়। যতক্ষণ সংসারে

রয়েছ, যতক্ষণ লাভ, লোকসান, সুখ, দুঃখের ভেতর দিয়ে গতি করছ, ততক্ষণ দুঃখ আসবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। দুঃখ এলে মনকে ঠিক রাখা বড় কঠিন; তখন আর মনে থাকে না এবং এই বিশ্বাস রাখতে দেয় না যে দুঃখ ত আসবেই, এ ত সকলকেই ভোগ করতে হবে, এর হাত থেকে কারুর নিষ্কৃতি নেই এবং একটু ভোগ হ'ক না। কিন্তু সাধুসঙ্গে এই গুলো ঠিক করিয়ে দেয়, কাজেই অতি সহজে কাজ হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, যার ঠিক ঠিক বিশ্বাস এসে গেছে তার কথা আলাদা; তার পক্ষে সব জায়গায় সমান। কিন্তু এ ত সাধারণ নয়। তাই সঙ্গকে বড় করেছে। তা ছাড়া আর এক ভাব আছে, সচরাচর মানুষ দেখে, মানুষকে খোসামোদ করতে পারলেই সে খুসী হয় এবং তখন তার দ্বারা অনেক স্বার্থ সিদ্ধি করা যায়। অনেকে গুরুকেও সেই রকম সাধারণ মানুষ ধারণা ক'রে তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে তাঁর কাছে আসে। কিন্তু তারা জানে না যে সদ্‌গুরু তাদের চেয়ে বেশী চিন্তা করেন এবং তারা দুঃখে পড়লে তাদের চেয়েও তিনি বেশী দুঃখ ভোগ করেন। তিনি যে আপন; তিনি ত সকল সময়েই তোমাদের টানছেন কিন্তু এ সব শোনা থাকলেও দুঃখে পড়লে আর বোধ থাকে না। গবর্ণমেণ্টকে আমমোক্তারনামা দিলে গবর্ণমেণ্ট কি কিছু ভাবেন না?

নগেন। মানুষ ম'রে গেলে অন্নময় কোষ গেল বাকী চারিটী কোষ রইল, তখনও কি সুষুপ্তি, নিদ্রা, জাগ্রত তিনটী অবস্থা থাকে?

ঠাকুর। অন্নময় কোষ গেলে সুষুপ্তি থাকে না, আর সব থাকে। সুষুপ্তি অন্নময় কোষের, দেহকে বিশ্রাম দেবার জন্যে।

নগেন। অন্নময় কোষে থাকতে রাতদিন বাসনার পর বাসনা উঠবে। ম'রে গেলেও কি বাসনা ওঠে? এখানকার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করবার বাসনা ওঠে কি? আর দেখা হয় কি?

ঠাকুর। অন্নময় কোষ ত্যাগ করলে তখন মন বুদ্ধি অহঙ্কার সুক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করে। কাজেই প্রবল বাসনা গুলো থেকে যায়।

এখানে মায়ার টানে যত দুঃখ পায় ওপরে তত পায় না। অন্নময় কোষ গেলেই মায়ার কার্য্য অনেক ক'মে যায়। সাধারণতঃ সেখানে মায়া কম থাকার দরুণ তারা এ লোকে আর আসতে চায় না কিন্তু কারুর কারুর মায়া এত বেশী থাকে যে সে মাঝে মাঝে এ লোকে আসে। আবার কতক লোক থেকে ইচ্ছা করলেই আসতে পারে না ব'লে তারা বেশী দুঃখ পায়, সেই জন্য মৃতের জন্য বেশী কান্না নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতে আকর্ষণ আরও বেশী হয়। মরণের পর আত্মীয় স্বজনের দেখা হয়, চিনতে পারা যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর জীবিত স্ত্রীরা মৃত স্বামীর দেখা পেয়েছিল।

নগেন। ভক্তদের যত ভক্তি বাড়ে, তত ভেতরে আনন্দ বাড়ে ত?

ঠাকুর। হ্যাঁ,

আশু (ইন্‌স্পেক্টর)। ক্রমোন্নতির কথা যে বলে, যেমন পশু, পক্ষী থেকে মানুষ হয়, তা পশু পক্ষীদেরও কি সেই রকম বাসনা হয়?

ঠাকুর। বাসনা সকলেরই আছে, তবে তাদের বিবেক নেই। বিবেক না থাকায় বাসনার মর্ম্ম বোঝে না।

আশু। আবার মানুষের ক্রমোন্নতি হয় ত? এক জন্মে না হলে দু' তিন জন্মে হয় ত?

ঠাকুর। হ্যাঁ, দেহের যেমন শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য আসে মনেরও তেমনি ক্রমশঃ উন্নতি হয়। আর, এক জন্মে যদি না হয় দু' তিন জন্মে হতে পারে।

আশু। মানুষ থেকে আবার পশু জন্মও ত হতে পারে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, যেমন ভরত রাজার হরিণ জন্ম হয়েছিল; সে ত হ'ল অবনতি। বিশেষ গুরুতর অপরাধ না হলে অবনতি হয় না। অফিসে যখন চাকরি কর খুব বেশী রকম অপরাধ না করলে কি সেখানে সহজে অবনতি হয়? তবে এরা সেই পশু জীবন থেকে একেবারে মানুষ হয়। আবার মানুষের ভেতরই পশুভাব রয়েছে। পশু-প্রকৃতি—রিপুর বশবর্ত্তী, তাকে গুঁতোও আর নাই গুঁতোও সে

গুঁতোবে। মানুষ প্রকৃতি—রিপুদের বোঝাবার চেষ্টা করে, সব সময় পেরে ওঠে না। তাকে গুঁতোলে সে গুঁতোবে। দেব প্রকৃতি—সকল জিনিষ উপেক্ষা করতে পারে, তাকে গুঁতোলে সে উপেক্ষা করে, কারণ সে জানে প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার রাখতে গেলে, নানা প্রকৃতির নানা ভাব আসবেই। ব্রহ্মভাব—এ হ'ল প্রকৃতির অতীত। প্রকৃতির কোন ভাবই তাকে লাগে না, কাজেই উপেক্ষার কথাও আসতে পারে না। তোমরা রিপুর অধীন, দেহের অধীন, বোঝাবার চেষ্টা ক'রেও কিছু ক'রে উঠতে পার না। মনের শক্তি বাড়াও, ভেতর সাফ কর, তা না হলে ত হবে না। ভেতরের শেওলা সব ঠিক রয়ে গেল শুধু ওপরের শেওলা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলে হবে কেন? যখন দেহটাকে মন থেকে পৃথক করতে পারবে তখনই কিছু কাজ হবে।

নগেন। মৃত্যুর পর কত দিন পরে আবার জন্ম হয়?

ঠাকুর। এ ত ঠিক নেই, যার যার কর্ম্মের ওপর নির্ভর করে; সকলের ত সমান হতে পারে না। এক আছে, বিন্দুভাবে অপর শরীর আশ্রয় ক'রে তবে পূর্ব্ব শরীর ছাড়ে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হয়। আর আছে, কর্ম্ম অনুযায়ী অপর লোক ভোগের পর পুনরায় জন্ম হয়। আবার আছে, অপর লোক ভোগ হবার পর ওপর দিকেই গতি করে, এখানে আর আসে না। এ ছাড়া আর এক আছে, লোক ভোগ না হয়েই একেবারে চ'লে যায়।

ডাঃ সাহেব। রাত্রে কখনও কখনও হঠাৎ বেশ ধূপ, ধূনা, চন্দনের সুগন্ধ পাওয়া যায়, আবার কখনও কখনও দুর্গন্ধ আসে।

ঠাকুর। অনেক সময় নিজের ভেতর সত্ত্বের প্রভাব এলে বা সৎ আত্মা এলে এ রকম সুগন্ধ আসে; আবার মনে তমগুণের প্রভাব এলে বা তামসিক আত্মা এলে দুর্গন্ধ বেরোয়।

জ্ঞান। বেশ আছি, হঠাৎ মনে বেশ আনন্দ হ'ল, আবার কখনও কখনও মনটা খারাপ হ'ল।

ঠাকুর। বায়ু সরল থাকলে মনে আনন্দ আসে ও বায়ু কুপিত হলে মন খারাপ হয়। তা ছাড়া, হঠাৎ আনন্দ হওয়া অনেক সময় তোমার পূর্ব্ব জন্মের আত্মীয় স্বজনের কাজের ওপর হয়। হয়ত তোমার উদ্দেশ্যে দান, শ্রাদ্ধাদি সৎ অনুষ্ঠান করেছে, তার ফল পেলে মনে আনন্দ হয়।

জিতেন। ধ্যান মানেই ত চিন্তা? নানা দেব দেবীর ধ্যান করার চেয়ে গুরু মূর্ত্তির ধ্যান করা ভাল ত?

ঠাকুর। হ্যাঁ, ধ্যান মানেই কোন একটা মূর্ত্তি নিয়ে তাইতে মন লাগান, কারণ ধ্যান বললেই ধ্যেয় বস্তু থাকা চাই। সকল সময়েই মনে নানা জিনিষ ধ্যান করছ তবে সেই গুলো সব গুটিয়ে একটার ওপর ধ্যান করলে মনের শক্তি বাড়ে; তার ওপর আবার যেটা নিয়ে ধ্যান কর সেটা যদি খুব শক্তিসম্পন্ন হয় তা হলে মনের শক্তি ঢের বেশী বাড়ে। যে মূর্ত্তি যার ভাল লাগে তার পক্ষে সেইটাই ভাল। কেউ বা ইষ্ট মূর্ত্তি আবার কেউ বা গুরু মূর্ত্তি ধ্যান করে। জিনিষ ত একই তবে যে মূর্ত্তিটা মনে প্রথমেই আসে সেইটা ধ্যান করা ভাল। যে ছবিটা মনে বেশী লেগে আছে, চোখ বুজলে সেইটাই সহজে প্রথমে মনে আসে। কারুর গুরু মূর্ত্তি চট্ ক'রে চোখের সামনে আসে, তখন সেটা ছেড়ে জোর ক'রে ইষ্ট মূর্ত্তি ধ্যান করার চেয়ে গুরু মূর্ত্তি ধ্যান করা ভাল। যার যে মূর্ত্তিটার ওপর বেশী সংস্কার থাকে তার সাধারণতঃ সেইটাই আগে আসে। আবার মূর্ত্তি মনে ধ'রে নিলেই যে বিশ্বাস হ'ল তা ত নয়। হয়ত গুরু মূর্ত্তিই সহজে মনে আসে, এবং আমার কাছে শুনেছও ত যে গুরু ও ইষ্ট এক, তত্রাচ মনে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে বিচার করছ, তাইত গুরু আর ইষ্ট এক বললেন বটে, কিন্তু ইষ্ট এত বড় শক্তিমান জিনিষ মানুষ গুরুর সঙ্গে সমান হবে কি? কাজেই তখন ইষ্ট মূর্ত্তিকে এনে ধ্যান করতে ভাল লাগবে। ধ্যান ধারণার উদ্দেশ্য হচ্ছে যার ধ্যান কর তার গুণ গুলো অমনি

এসে পড়ে। ধ্যান দু'রকমে হয়—এক গুণজ ভালবাসায়, তার গুণ আছে ব'লে সেই গুণের আদর ক'রে তাকে ভালবাস। তার যখন এত গুণ তখন সে ত ভাল লোক, তাকে ভালবাসলে আমার ভাল হবে, এই লাভের আশা রক্ষা ক'রে তাকে ভালবাস। যখন তোমার লাভের কিছু ইচ্ছা আছে তখন লাভ রেখেই চলতে হবে। সাধুসঙ্গ মানেই সাধুকে বড় ধ'রে নিয়েছ অর্থাৎ তার কাছ থেকে কোন লাভের আশা রেখেছ। ভগবানকে যখন ডাক তখন তিনি শক্তিমান, তাঁকে ডাকলে মঙ্গল হবে, এই লাভের আশা রেখেছ। সৎ হবার ইচ্ছা বা তাঁর দিকে গতি করবার ইচ্ছা রেখে ডাকলেও সেটা লাভের আশা রেখে ডাকা হ'ল, তবে এ না হয়, সৎ জিনিষ লাভের ইচ্ছা এবং সাধারণ সংসারীর লাভের ইচ্ছার চেয়ে ঢের বেশী বড় জিনিষ। আর প্রেমে, এখানে তার গুণ আছে কি না আছে, এদিকে লক্ষ্য থাকে না। তাকে ভালবাসে, সে বড় হোক ছোট হোক এর তাতে কিছু আসে যায় না; এর লাভ লোকসান ব'লে কোন বোধ নেই। এই হ'ল পূর্ণ ভালবাসা। প্রেমে গুরু শিষ্য বোধ থাকে না। পরমহংসদেব বল্‌তেন 'গুরু, কর্ত্তা এ সব কথা শুনলে আমার প্রাণ কেমন করে, মনে হয় যেন সরলতা, প্রেমের ভাব, আপনত্ব সব নষ্ট হয়ে গেল।'

জিতেন। সঙ্গ করলে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কামনা, বাসনা সব আপনি যায় কি? আলাদা সাধনার আর দরকার হয় না?

ঠাকুর। কাম্য বস্তু প্রাপ্তির চেষ্টা বা বাসনা ত্যাগ করার চেষ্টার নাম সাধনা। তখন ত আর বাসনা ত্যাগ হয়ে যায় না। যে সকল বস্তুতে মন আছে সে গুলো থেকে তফাৎ করার নাম প্রত্যাহার। ইচ্ছা থাকলেও সে জিনিষগুলো আর মনে নিতে নেই। এই রকম প্রত্যাহার করতে করতে বাসনা ধীরে ধীরে ত্যাগ হয়ে আসবে, তবে যার মনের শক্তি আছে সে জোর ক'রে এটা নোব না, এটা করব না ব'লে শীঘ্র ছাড়তে পারে। মন স্থির না হলে কাম ক্রোধ আদি একেবারে ছাড়তে চায় না; আবার মন না পেলেও এরা কাজ করতে পারে না।

তাই মনকে যদি অন্য চিন্তায় ফেলে রাখ তাহলে এ সব চিন্তা আর মনে আসতে পারলে না, তাদের কাজও করতে পারলে না। ইংরাজীতে একটা চলিত কথা আছে 'Idle brain is the devil's workshop' তার মানে 'অলস মন একটা দৈত্য দানবের কারখানা' অর্থাৎ মন ফাঁকা থাকলেই কাম ক্রোধ আদি এসে সেটা অধিকার ক'রে বসে ও তাদের কার্য্য করতে থাকে। ঠিক মন দিয়ে সঙ্গ করলে মনের শক্তি বাড়ে, তখন কাম ক্রোধাদি আপনি ক'মে আসে। ধর, মনকে বুঝিয়ে সৎস্থানে নিয়ে এলে; তোমার খাতিরে প'ড়ে মন সেখানে এল বটে কিন্তু এসেও স্থির হচ্ছে না বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনও হতে পারে, এখানে বসে আছে বটে কিন্তু আমার একটা কথাও তার কানে গেল না। এ জায়গায় একটু সাধনা করতে হবে, মনকে জোর ক'রে ঘুরিয়ে এইখানে এনে ফেলতে হবে। তবে, মন স্থির না হলেও এখানে এসে বসায় কিছু কাজ হবে বই কি। বাড়ীতে থাকলে মন অপর জিনিষ নিয়ে ডুবে থাকত, এখানে মাঝে মাঝে কিছু ত কানে যাবেই, আর এই শুনতে শুনতে ক্ষণিকের জন্যও হয়ত 'ভাল হব' এই ইচ্ছা মনে উঠবে। গুরুতে বা সাধুতে ভালবাসা না পড়ুক, 'আমি ভাল হব' এটার ওপর কিছু ভালবাসা পড়লেও কাজ হবে। তখন ওগুলো আপনি ম'রে আসবে। যার গুরুতে ঠিক ভালবাসা পড়েছে তার অপর সকল জিনিষ তুচ্ছ হয়ে যায় ও সে সমস্ত তাঁতে অর্পণ করে। তখন তার স্থির বিশ্বাস আসে। তার আর সাধনার দরকার হয় না, আপনি কাজ হয়। নিজের বুদ্ধি একটু রাখলেই শুধু সঙ্গ ও উপদেশ শোনা ছাড়া গুরু উপদেশ অনুযায়ী কিছু সাধনা করা দরকার।

নগেন। মরার পর সূক্ষ্ম শরীরে নরক ভোগ হয় বলে, এটা কি ঠিক ?

ঠাকুর। নরক মানে দুঃখ। যে সব বস্তুর দ্বারা দুঃখ ভোগ হয় সে গুলো নরক। তা সূক্ষ্ম শরীরে এই দুঃখ ভোগ হলেই বলে

নরক ভোগ আর সুখ ভোগ হলেই বলে স্বর্গ ভোগ। সূক্ষ্ম শরীরে দুঃখ ভোগের সময় পর পর দুঃখ ভোগ হতে থাকে, আবার সুখ ভোগের সময় পর পর সুখ ভোগ হয়, আর এখানে স্থূল শরীরে সুখ দুঃখ মিশিয়ে ভোগ চলছে। অর্থাৎ এখানে জমা খরচ, আর ওখানে খতেন। এইখানে ঠাকুর কথক, ব্যবসাদার ও মুটের গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ২য় ভাগ, ১৪৩ পৃঃ)

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন—

ঠাকুর। সঙ্গই প্রধান; যেমন সঙ্গ করবে তেমনি সব বৃত্তি হবে। সঙ্গের প্রভাব হচ্ছে চির শান্তিতে আনে। সব কথাই ত পুরাতন, যখন যে কথাটা মনে লাগে তখন তার ভাব উঠতে থাকে ও তখন তার নতুন অনুভূতি হয়। সেই জন্যে প্রত্যেক কথা মন দিয়ে শুনতে হয়; যখন যে কথাটা মনে লেগে যায়, তখন সেইটাই চায়। স্থান জায়গার মাহাত্ম্য আছে; তা ছাড়া, সাধুদের প্রত্যেক কথাতে শক্তি পোরা থাকে, সেই শক্তিতে কর্ম্ম ক্ষয় ক'রে টেনে নিয়ে যায়। বাসনা সব লোকেই; তবে লোক বিশেষে বাসনার কম বেশী আছে। বৈকুণ্ঠে বাসনা, কামনা, ক্রোধ, অভিশাপ রয়েছে। জয়, বিজয় স্বয়ং ভগবানের সেবা করত; তাদেরও অভিশাপে প'ড়ে আবার এখানে জন্ম নিয়ে আসতে হ'ল। সদ্‌গুরু বাসনা, কামনার অধীন নন, সেইজন্যে তাঁর কোন স্বার্থ থাকে না। তিনি দেহসেবা প্রভৃতি কোন জিনিষ চান না, তাই গুরু সেবা বড় সোজা নয়। সাধারণের ধারণা গুরুর গা, হাত, পা টিপে দিলেই বা গুরুকে ভাল ভাল জিনিষ খাওয়ালেই তাঁর খুব সেবা হ'ল; কিন্তু তা নয়, গুরু সেবা হচ্ছে গুরুতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রক্ষা ক'রে অবিচারে গুরু বাক্য পালন করা এবং গুরুর উপদেশ মত চলা। গুরুর কাছে থাকলেই যে সেবার অধিকারী হয় তা নয়। যার গুরুতে ঠিক ঠিক বিশ্বাস আছে, যার লাভ লোকসানের দিকে লক্ষ্য নেই ও যে দেহসুখ আদি তাঁর জন্যে তুচ্ছ করতে পারে, সেই কেবল তাঁর কাছে সকল সময়

থাকা ও সেবা করার উপযুক্ত এবং সেও কেবল সেই সেবার দ্বারাই তার জন্ম জন্মান্তরীন সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় ক'রে মুক্তি লাভ করে। তার আর অন্য সাধনার প্রয়োজন হয় না।

দ্বিজেন গাহিল—

(১)

শঙ্কর মহাদেব দেব সেবক সুর যাকে।
ব্রহ্মাদিক, ইন্দ্রাদিক, সনকাদি তাকে॥
লপটি লপটি যাত বেয়াল ওড়ানক কো বাঘছাল।
রুণ্ডমাল, চন্দ্রভাল, দৃগ্ বিশাল যাকে॥
পাওয়ত নাহি পার শেষ নারদ শারদ সুরেশ।
গাওয়ত গুণ গুরু গণেশ ইন্দ্রাদিক যাকে॥
কহত দ্বিজ তুলসীদাস গৌরীপতি চরণ আশ।
এই সে ভোলা ভেক ধরই রঙ্গ ভঙ্গ যাকে॥

(২)

যা বিশাখা যা ঘরে ফিরে যা।
তোরা যা গো, আমি আর যাব না, রইলাম যমুনার কূলে॥
চাঁদ মুখে মধুর হাসি, শ্যাম বাজাচ্ছে মোহন বাঁশী।
ডুবল আমার কুল কলসী শ্যাম কলঙ্ক সাগরে॥
কিবা উজ্জ্বল বৈজয়ন্তী মালা লম্বিত শ্যামের গলে।
শ্যামের মালা দোলে আর আমার প্রাণ দোলে।
(মালার সনে আমার প্রাণ দোলে,
মালা দোলে আমার প্রাণ দোলে)
সনাতন দাসে ভনে কুল না ডুবলে কি কুল মেলে॥

(৩)

ননদিনী ব'ল নগরে।
ডুবেছে রাই রাজ নন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে॥
কাজ কি গোকুল, কাজ কি গো কুল।
ব্রজকুল সব হ'ক প্রতিকুল।
আমি যে সঁপেছি গো কুল (দু কুল) সেই অকুল কাণ্ডারি করে॥
কাজ কি বাসে কাজ কি বা সে।
কাজ কেবল সেই পীতবাসে।
সে যার হৃদয়ে বাসে, বাসে কি সে বাস করে॥

(৪)

আমি মায়ের চরণ সার করেছি আর কি করি ভয়।
মা যে আমার আমি মায়ের এই ত মনে হয়॥
মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ডাকব ব'সে 'মা' 'মা' ব'লে।
শমন এলে বলব তারে (এখন) তোমার সাধ্য নয়॥
যা ছিল সব পুঁজি পাটা ফেলেছি সব নাইক লেঠা।
এখন কেটে গেছে মায়ার আটা (শুধু) প্রেমের হাওয়া বয়॥
প্রেমানন্দে দীন যে বলে (বেশ) আনন্দে দিন যাচ্ছে চ'লে।
(আর) যে কটা দিন আছে প'ড়ে, মা গো মন যেন তোমার ভাবে রয়॥

তৃতীয় ভাগ—ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

কলিকাতা ; রবিবার ৪ঠা আষাঢ় ১৩৪০ সাল ;
ইং ১৮ই জুন ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, ললিত, নগেন, পুত্তু, জিতেন, কৃষ্ণকিশোর, দ্বিজেন, তারাপদ, শ্যাম, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, ভোলা, কালু, কেবল, পঞ্চানন, দাশরথী, শিরিশ, দ্বিজেন সরকার, গতিকৃষ্ণ, মহাবিষ্ণু, অপূর্ব্ব, কিশোরী ও অভয় আছে।

শিরিশ আসিয়া জানালার বাহির হইতে নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঠাকুর। তুমি ক'দিন বাইরে থেকে নমস্কার ক'রে যাচ্ছ কেন ?

শিরিশ। সময় হয় না।

ঠাকুর। এতদিন সময় হচ্ছিল, আর এখন কি হ'ল যে সময় পাচ্ছ না ? আগে আসতে, বসতে, এখন সে সব ইচ্ছা গেল কেন ?

শিরিশ। আপনার ইচ্ছা নেই, আপনি সরিয়ে দিচ্ছেন।

ঠাকুর। দেখ, যখন কারুর কাছে কিছু পাবার আশা নেই, তখন ইচ্ছা হওয়া না হওয়ায় লাভ কি ? এরা এখানে এসে বা কোন্ ২০।২৫ বিশ পঁচিশ হাজার টাকার চেক কাটছে, আর তুমিই বা এসে কি নিয়ে যাচ্ছ যে তোমায় আসতে দেবার আমার ইচ্ছা থাকবে না। এ পর্য্যন্ত কি কোন শাস্ত্র গ্রন্থে কোথাও লিখেছে যে টাকায় কেউ কিছু ক'রে দিয়েছে ? চট্ ক'রে বললেই কি কিছু হয় ? তোমার শরীর ত এখন আগের চেয়ে ঢের ভাল দেখছি, তবে চোখ কি এক দিনে কমবে ? ব্যাধি কর্ম্মজনিত ; কর্ম্ম শেষ হওয়া চাই তবে ত হবে। এর জন্যে কি মনে দুঃখ বা অভিমান করতে আছে যে তোমার ওপর আমার কৃপা নেই ? বেশ ধৈর্য্য রাখবে, এখানে

যেমন আসতে সেই রকম আসবে, বসবে। দেখ, কথা কওয়া যদি বল, হয় ত এক জনের সঙ্গে কথা হচ্ছে, তখন মনটা সেই দিকেই থাকে অপর কারুর সঙ্গে আর কথা চলে না। আবার তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর ত তোমার সঙ্গে কথা হবে। এখানে এত লোক আছে, অনেকেরই সঙ্গে ত কথা কই না। তা ছাড়া, তোমাকে ত জিজ্ঞাসা করেছিলুম তোমার কিছু বলবার আছে কি না? তুমি বলেছিলে যে না তোমার জানাবার কিছু নেই। ভেতরে এসে বসো, এ সব ভাল ভাল কথা হচ্ছে শোন।

শিরিশ ভেতরে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিল।

শিরিশ। কোন মহাপুরুষ বা কোন দেবতার কাছে যেতে গেলে শুধু আমাদের ইচ্ছা থাকলেই হয় না, তাঁর কৃপা ও ইচ্ছা না হলে আমরা আসতে পারি না।

ঠাকুর। বেশ, এ তো তোমার ভাবের কথা বললে। ইচ্ছা অনিচ্ছা কর্ম্মে করায়। যখন গ্রহ বৈগুণ্য হয় তখন এই রকম বুদ্ধি উল্‌টে দেয়। মহাপুরুষ ত সর্ব্বদাই ইচ্ছা করেন সকলেই আসুক, সকলের মঙ্গল হোক; তাঁর অনিচ্ছা হবে কেন? এমন কি তিনি শত্রুরও মঙ্গল কামনা করেন তবু হয় না কেন? কর্ম্মের দরুণ সংশয় ওঠে, মান, অভিমান আসে; গ্রহ আদি ভোগবার জন্যে অধৈর্য্য ও অশান্তি আনে। কর্ম্মভোগ শেষ না হলে ত হবার যো নেই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন তবু তাদের কত দুঃখ ভোগ করতে হ'ল।

জিতেন। মনের স্বভাব দেখছি, একবার বেশ স্থির আছে আবার এক সময় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ঠাকুর। হ্যাঁ; বাসনার বিরুদ্ধ হলেই মন চঞ্চল হয়; এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে গেলে সঙ্গই প্রধান জিনিষ।

কৃষ্ণকিশোর। যারা সদ্‌গুরু পেয়েছে তারা ত নিশ্চিন্ত থাকবে। গ্রহ তাদের ওপর ত বিশেষ কিছু করতে পারে না।

ঠাকুর। হ্যাঁ, যারা সদ্‌গুরু পেয়েছে তারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে; যতদিন বাপ আছে, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকে, কোন ভাবনা, চিন্তা রাখে না। বাপ ম'রে গেলে যখন নিজের ওপর দাঁড়াতে হয়, তখন অনেক চিন্তা আসে। গ্রহ সব সময় যার যতটুকু ক্ষমতা, সেই মত ক'রে যাচ্ছে; সদ্‌গুরু সে সব কাটাবার চেষ্টা করছেন। কেউ যখন ইট ছোঁড়ে তখন সমান জোরেই ছোঁড়ে, কারুর জন্যে বেশী জোরে বা কারুর জন্যে আস্তে ছোঁড়ে না, তবে কোন বলবান লোক যদি সামনে পিট পেতে দেয়, তাহলে আর তাকে খেতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ নিজের গায়ে শর নিয়ে অর্জ্জুনকে বাঁচিয়ে দিলেন। আবার জনার অভিসম্পাত থেকে অর্জ্জুনকে বাঁচাতে গিয়ে একটা গাছ জ্বলে গেল এবং নিজের দেহের অর্দ্ধেকটা পুড়ে গেল। সেই রকম, গ্রহ সকলের জন্য সমান জোরেই কাজ করছে কিন্তু সদ্‌গুরু সেটা নিজে ঘাড়ে নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারেন; তবে ঘাড়ে নেবার মত শক্তি থাকা চাই। তা ছাড়া, এক জন ত নয়, এত লোকের সব কর্ম্ম; কারুর বা আবার এত কর্ম্মের জোর যে সে সব ঘাড়ে নিতে গেলে অনেক সময় তাঁর দেহ থাকে না। তাই কতক নিজের ঘাড়ে নিয়ে আর কতক তার ওপর দিয়ে ভোগ করিয়ে কাটিয়ে দেন। যারা পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে বসে আছে তারা নিশ্চিন্ত। তাদের কর্ম্ম আপনিই আসে। নদীর সঙ্গে খাল যোগ থাকলে জল আর জোর ক'রে আনতে হয় না, আপনিই আসে। নিশ্চিন্ত হওয়া অর্থাৎ আমমোক্তারনামা দেওয়া বড় শক্ত জিনিষ। নিশ্চিন্ত ছিল পাণ্ডবরা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করলেন কাল পঞ্চ পাণ্ডব বধ করবেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই কথা যুধিষ্ঠিরকে বললেন শুনেছ, ভীষ্ম কাল সব পাণ্ডব বধ করবেন তখন যুধিষ্ঠির বললেন ওকথা আমাদের বলছ কেন? সে তুমি বোঝ; আমাদের যেতে হয় যাবো। সঙ্গে অনেকটা সাহস হয় ও মনের শক্তি বাড়ে। না হলে এত মান অভিমান নিয়ে বেড়াচ্ছ, বললেই কি পার?

কৃষ্ণকিশোর। লাভ লোকসানের দিকে লক্ষ্য না ক'রে, মনে যা উঠবে সেইরকম ভাবে চললে কি হয়?

ঠাকুর। মন সর্ব্বদাই লাভ লোকসানের দিকে রয়েছে; সেটা নষ্ট ক'রে মন ঠিক রাখতে পার ত ভাল। কিন্তু তা ত হয় না, বড় শক্ত; যার সে শক্তি আছে সে পারে। আর, তুমি যা বলছ, ও রকম খেয়াল বশে চ'লে মানুষ বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না।

জিতেন। কিছু পারলে কতক পরিমাণ সাহস ও বিশ্বাস বাড়বে ত?

ঠাকুর। ক্ষণিকের জন্যে হয় ত পারলে কিন্তু তাকে বিশ্বাস বলে না। বিপদ ত সব সময়েই রয়েছে, তবে যে সব দ্বারা বিশেষ দুঃখ পাওয়া যায় কেবল সেই গুলোই ঠিক বিপদ। সেই সময় মন মাথা ঠিক রেখে কাজ করা বড় কঠিন। নইলে কাজ করছ আঙ্গুলটা কেটে গেল বা চলছ হোঁচট খেলে এগুলোকে ত আর বিপদ ব'লে ধরবে না।

পুত্তু। দুঃখ পাচ্ছে সে অবশ্য আলাদা, কিন্তু অনেক সময় ভবিষ্যতে কি হবে ভেবে ভয়ানক দুঃখ ভোগ করে।

ঠাকুর। মানুষ ভবিষ্যত ভেবেই ত বেশী চিন্তা করে। চিন্তা মানেই ভবিষ্যত। এখন যে দুঃখ পাচ্ছে তার চেয়ে ঢের বেশী চিন্তা জনিত কষ্ট ভোগ করে। মনে ফেনিয়ে ফেনিয়ে এমন একটা ভয়ানক গ'ড়ে নিলে যে হয় ত সে কখন ঘটবেই না। এরই ওপর মানুষ বেশী দুঃখ ভোগ করে। মনের কাজই এই, কেবল ভাঙ্গছে, আর গড়ছে। তবে কতকগুলো ভবিষ্যত চিন্তা স্বাভাবিক। যেমন চাকরি করতে গেলে, খাটলে ভবিষ্যতে উন্নতি হবার আশা আছে এই ভেবে সে খাটে এবং ওকালতি করতে গেলে, খুব পড়া শোনা করলেও খেটে মোকর্দ্দমা জিতিয়ে দিতে পারলে, ভবিষ্যতে ভাল উকিল হতে পারবে ও বেশী রোজগার হবে এই ভেবে সেই মত কাজ করতে থাকে।

জিতেন। এ চিন্তা বন্ধ করা যায় কি ক'রে?

ঠাকুর। সঙ্কল্প বন্ধ কর, বাসনা নিবৃত্তি কর, আপনি চিন্তা কমবে, তা ভিন্ন হয় না।

জিতেন। ওপর থেকে এমন কিছু করা যায় না যাতে চিন্তা বন্ধ করা যায়?

ঠাকুর। হ্যাঁ, সঙ্গ করা চাই। সঙ্গ করলে বা মনে যে মূর্ত্তিটা ভাল লাগে তখন সেইটাতে মন লাগাতে পারলে বা যে জপ ব'লে দেওয়া হয়েছে সেই জপ মনের সহিত করলে মনের শক্তি বাড়বে ও বাসনা কমবে। যত বাসনার অধীন হবে ও ভোগের জিনিষে থাকবে তত চিন্তা বাড়বে, আর যত বাসনাকে অধীন করবে ও ত্যাগে আসবে এবং যত মান, অভিমান, দেহসুখ ও প্রয়োজন কমাবে তত চিন্তাশূন্য হবে, ও শান্তি আসবে। তোমরা ত নিজেদের ঠিক ভাবের ওপর, নিজেদের প্রয়োজন মত চলতে পার না, কেবল পরে কি বলবে এই ভেবে পরের ধন্যবাদ (thank you) এর ওপর পরের ভাবে চলতে চেষ্টা কর আর বেশী দুঃখ সৃষ্টি কর! মনের শক্তি একটু বাড়লেই দেখবে তোমার প্রয়োজন কতটুকু। তখন সেই মত চলতে পারলে অনেকটা শান্তি আসবে।

জিতেন। মন যখন লাগে, তখন লাগে, কিন্তু কোন সময় জোর ক'রে একটা জিনিষে লাগাতে গেলে পারা যায় না।

ঠাকুর। তখন সঙ্গ করবে। সঙ্গই প্রধান। আর, মনকেও জোর ক'রে লাগাতে চেষ্টা করবে।

পুত্তু। যদি অনেক রাত্রে এমন কোন চিন্তা ওঠে যখন সঙ্গ করবারও উপায় নেই?

ঠাকুর। তখন ভোগ করবে। মনকে জোর ক'রে একটা মূর্ত্তিতে লাগাতে পারবে না, জপ করতে পারবে না, আবার সঙ্গও করতে পারবে না ত কাজে কাজেই ভোগ করা ছাড়া উপায় কি?

কৃষ্ণকিশোর। আমরা যে স্তোত্র পড়ি বা মন্ত্র পড়ি তার ত মানে অনেক জায়গায় বুঝি না, তাতে কাজ হয় কি?

ঠাকুর। হ্যাঁ, পড়লে কাজ হয়। আর, মানে ত জেনে নিতে পার, তবে মানে জানলেও যা না জানলেও তাই। গায়ত্রীর জপ কর যে তার কি জান ?

কৃষ্ণকিশোর। গুরু মূর্ত্তি ধ'রে জপ করতে করতে হয়ত অন্য সাধু মূর্ত্তি সামনে আসে তখন কোন্‌টা ধরব।

ঠাকুর। গুরু মূর্ত্তির সঙ্গে সাধু মূর্ত্তি এলে দোষ হয় না। মনের স্বভাব হচ্ছে, যে মূর্ত্তিটা মনে বেশী ধরা আছে সেইটাই সহজে আসবে। অনেক সময় অনেক মূর্ত্তি সামনে আসে ; তবে যে মূর্ত্তিই আসুক না সেটাকে গুরুমূর্ত্তি ভেবে জপ করবে ; তখন কোন খারাপ মূর্ত্তি হলে গুরুশক্তিতে সেটা স'রে যাবে। সত্ত্ব মূর্ত্তিতে ক্ষতি করে না ; রজ বা তমের মূর্ত্তি না হলেই হ'ল। মূর্ত্তি ত মায়ারূপ, যার যেটা ভাল লাগে। আলো ত সেই এক, চিমনি অনেক রকমের হয়।

ললিত। কোন অন্যায়ের জন্য রাজদণ্ডে দণ্ডিত হলে আর তার আলাদা ভোগ হয় কি ?

ঠাকুর। যদি অন্যায়ের উপযুক্ত রাজদণ্ড হয়ে যায় ত আর ভোগ করতে হয় না ; যদি কম হয় তা হলে কিছু ভোগ বাকী থাকে। রামচন্দ্র বালিকে বধ করার সময় বলেছিলেন তোমার যে অপরাধ নিজে তা ক্ষয় ক'রে ওঠা কঠিন। তাই এই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে তুমি সে পাপ থেকে মুক্ত হলে।

কৃষ্ণকিশোর। পীঠস্থানে ত বেশী শক্তি জমাট হয়ে আছে ; তা হ'লে পীঠস্থানে জন্মালে অপর জায়গায় জন্মানর চেয়ে বেশী শক্তি লাভ হয় ত ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, পীঠস্থানে জন্মান আর অন্যস্থানে জন্মান তফাৎ আছে বৈ কি। যেমন সৎকুলে ও অসৎকুলে জন্মান। সুবুদ্ধি, কুবুদ্ধি সবই ত তোমার ভেতর আছে। যখন যে ভাবে থাক সেই মত কাজ হয়। সেই জন্য সৎস্থান, সৎসঙ্গ বলেছে কেন ? স্থান জায়গায় ও সঙ্গে শক্তি বৃদ্ধি হয়।

কৃষ্ণকিশোর। আমরা সংসারী, আমাদের কি রকম লাভ হবে ?

ঠাকুর। দেখ, সংসার ত সবাই করছ, তবে তাঁকে ডেকে সংসার করলে অনেক শান্তি আসে। কর্ম্ম দুই প্রকার—এক হচ্ছে কর্ম্মে বদ্ধতা ; সুখ ইচ্ছা প্রভৃতি ভোগ মার্গের কর্ম্ম ; এতে বদ্ধতা যায় না। আর হচ্ছে নিবৃত্তি মার্গের কর্ম্ম এতে ত্যাগ আসে এবং বদ্ধতা নষ্ট হয়।

নগেন। আপনার 'বাসনা ত্যাগ কর' এই কথাটী কি চমৎকার। এ আর কোথাও শুনিনি বা কোথাও পড়িনি। গীতাতেও এ কথা নেই। অবশ্য নেই মানে যে তাঁরা জানতেন না তা নয়, তাঁরা তখনকার ভাবে ব'লে গেছেন। আমরা একালে সে ভাব ধরতে পারছি না। এ কালের ভাবে হচ্ছে 'বাসনা ত্যাগ কর'। আচ্ছা, গীতায় সুকৌশলের দ্বারা পারা যায় এই ভাবের একটা কথা আছে ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, যোগ মানে চিত্ত বৃত্তি নিরোধ ; চিত্তবৃত্তি নিরোধ হলে তবে যোগ হল তার আগে যোগ হয় না। সেটা যোগের কৌশল। যেমন সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে যাওয়া। ঘরে গেলে তবে যোগ হয়, আর সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় ত ঘরে যাওয়া হয়নি, তাই সেটা কৌশল মাত্র তখনও যোগ হয় নি। দুটো একের নাম যোগ ; তখন সব নিবৃত্তি হয়ে যায়। তখন মৃত্তিকা, স্বর্ণ, পাষাণে সব সমজ্ঞান। এর দুটো ভাব আছে। এক হচ্ছে মন এমন একটা স্তরে ওঠে যে তখন সব এক হয়ে যায় ; মৃত্তিকা, পাষাণ, স্বর্ণে ভেদ জ্ঞান থাকে না। তখন একে বহু, বহুতে এক বোধ হয়। এক মাটী থেকেই সব, আবার সব সেই মাটীই হয়। আর হচ্ছে মৃত্তিকা, পাষাণ, স্বর্ণ কি সে জ্ঞান ঠিক আছে কিন্তু তার কোনটীতেই প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নিয়েই না বড় ছোট। এত কষ্ট ক'রে টাকা রোজগার করছ কিন্তু বাড়ী তৈরী করার সময় প্রয়োজন হয় ব'লে সেই টাকা দিয়েই মাটী কিনছ। সহস্রারে মন গেলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয় তখন আর সৃষ্টির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না, মন স্থির হয়ে যায়। যোগবাশিষ্টে অমৃত

সমাধির কথা আছে, এ অবস্থায় ভোগ মোক্ষ দুই এক সঙ্গে রক্ষা করা যায়; অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে ও ভোগের জিনিষের মধ্যে রয়েছে অথচ প্রকৃতি তাকে ধরতে পারে না; সে ভোগের জিনিষ থেকে তফাৎ থাকে; যেমন বায়ু হিল্লোল গাছের পল্লব কাঁপাতে পারে কিন্তু মূল কাণ্ডকে নড়াতে পারে না। এ আরও কঠিন কারণ মনকে উঠিয়ে নিলে ত সে আপনি আরও উঠে যেতে পারে কিন্তু মনকে মাঝে রেখে দুদিক রক্ষা করা ভয়ানক শক্ত।

পুত্তু। প্রকৃতির ছাপ গায়ে লাগে না বলছেন বটে কিন্তু শিষ্যের জন্য চঞ্চল হন ত?

ঠাকুর। এটা দোকানদারী; যেমন দোকানে নানা জিনিষ সাজান থাকে, তেমনি সাধুরা হাসি, কান্না সমান ভাবে রেখেছেন অথচ তাঁরা সেই হাসি কান্নার অধীন নন। রামচন্দ্র যখন সীতার জন্যে কাঁদছেন তখন লক্ষ্মণ বলছে 'একি! আপনার আবার শোক!' তখন তিনি বলছেন 'দেখ, যে সীতা আমায় এত ভালবাসে যে রাজ-ঐশ্বর্য্য, সম্পদ সব ছেড়ে আমার সঙ্গে বনে এসেছে, তার এ ভালবাসার দাম দোব না? তার জন্যে যদি একটু না কাঁদি তা হলে যে লোকে আমায় নিষ্ঠুর বলবে।' আবার সেই রামচন্দ্রই সীতাকে বনে দিলেন। তাঁরা জানেন যে এ সব ত তাঁর থেকেই উৎপন্ন—চিন্তা করলেও তাঁর আর না করলেও তাঁর। যেমন তোমার হাত, তোমার চিন্তা থাক বা না থাক তোমারই হাত ত।

পুত্তু। তবে একজনকে বেশী একজনকে কম কৃপা করেন কেন?

ঠাকুর। সাধুরা কাউকেও কম বেশী কৃপা করেন না। তাঁরা সকলকেই সমান ভাবে দেখেন; তবে যে অপর সব ছেড়ে তাঁকে ভালবাসে, সে যে নিজে জোর ক'রে কতকটা টেনে নেয়। তিনি সকলকেই সমান দিতে প্রস্তুত। তোমার এক পোয়াতে খিদে মেটে আর একজনের আধসেরের দরকার হয়। তুমি সেখানে আধসের নিয়ে কি করবে তোমার ত দরকার নেই। নদী কি কাউকে বলে

তুমি এক জালা জল নিও না; যার যে রকম পাত্র সে সেই রকম ভাবে নিয়ে যায়। তেমনি যার যেমন প্রয়োজন তাকে তিনি সেই ভাবে দেন। এ দেখে তোমার নিজের ভাবে বললে চলবে কেন যে তোমায় কম আর তাকে বেশী দিচ্ছেন।

পুত্ত। মুক্তিপথে যারা গতি করতে চায় তিনি তাদের সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন ত? প্রথম অবস্থাতেই সদ্‌গুরু লাভ হয়, না পরে হয়?

ঠাকুর। গুরু ত গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত। সদ্‌গুরু পাওয়া মানে তাকিয়া পাওয়া কিন্তু তোমার সে বোধ নেই। সে বোধ থাকলে কোন ভাবনা চিন্তা থাকবে না। তখন ত একেবারে শরণাগত ও নিশ্চিন্ত ভাব; যেমন খাওয়ার পর তাকিয়া পেলে ভাবনা চিন্তা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আরাম কর। তোমার ঠিক সে বোধ থাক আর নাই থাক, তবে সদগুরু পেলেই যে তাকিয়া ঠিক পেয়েছ, এই বোধ হলেই ত নিশ্চিন্ত, তখন ত হয়ে গেল। প্রথম অবস্থায় এ বিশ্বাস হয় না।

জিতেন। বশিষ্ঠ জীবন্মুক্ত, রামচন্দ্রও জীবন্মুক্ত। তা রামচন্দ্রকে কেবল অবতার বলে কেন? এর কি কোন মাপ আছে?

ঠাকুর। যাঁর দ্বারা বহু লোকের কল্যাণ হয় এবং বহু লোকের কল্যাণের জন্যই যিনি আসেন তাঁকেই অবতার বলে। ইনি বহু লোকের উপকার করেন এবং তাদের প্রকৃতি ঘুরিয়ে দিয়ে গতি করান। কিন্তু সাধু বা মহাপুরুষ সাধন ভজন দ্বারা নিজে গতি করেন এবং কেবল সেই ভাব ছাড়া অপর ভাবের লোককে গতি করার সাহায্য করতে পারেন না। যেমন নদীর জল বাঁধা পথ দিয়ে গতি করে কিন্তু বন্যার জল মাঠ, ঘাট, গ্রাম সব ভাসিয়ে নিয়ে যেখান দিয়ে ইচ্ছে চ'লে যায়। অবতার হচ্ছেন বন্যার জল যে ভাবে হোক গতি করাবেনই। আর দেখ, বড় ছোট মাপবার প্রয়োজনই বা কি? এ সব মাপতে যেও না। কখন কি ভাবে কি শক্তি নিয়ে কে এসেছেন তা যখন জান না তখন এ নিয়ে কি মাপ করা

চলে? আর দরকারই বা কি? তুমি ত দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি চাচ্ছ, শাস্তি চাচ্ছ; তোমার নিজের সে দিকে কোন উপকার হচ্ছে কি না দেখ। যাঁর কাছে তুমি উপকার পেলে, তোমার কাছে তিনিই সব চেয়ে বড়। অপরের কাছে হয়ত আর এক জন সেই রকম বড় হতে পারেন, তাতে তোমার কি? তোমার কাছে ত আর তিনি বড় হচ্ছেন না। যাঁর কাছ থেকে তুমি উপকার পেয়েছ তিনিই তোমার কাছে সব চেয়ে বড়।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। সঙ্গই প্রধান; যেমন সঙ্গ করবে তেমনি সব বৃত্তি উঠবে। ত্যাগ ব্যতিরেকে শান্তি হয় না। যতক্ষণ ভোগে আছ ততক্ষণ দুঃখ অনিবার্য্য। সাধুরা কোন স্বার্থ রাখেন না। তাঁরা সকলকেই নিঃস্বার্থ ভালবাসেন ও আপন ক'রে নেন। আপন ব্যতিরেকে গতি করান কঠিন। তাঁদের ত ইচ্ছা সকলকেই টানেন তবে যে সব ছেড়ে আসছে তার শক্তি বেশী, অনেক সময় সে নিজে জোর ক'রে টেনে নেয়। সচ্চিদানন্দ কি? সৎ নিত্য, চিৎ চৈতন্য, আনন্দ, যিনি নিত্য এবং যাঁর নিত্য চৈতন্য ও আনন্দ আছে। যত সঙ্গ করবে তত হিংসা, বাসনা কমবে, তত ত্যাগ আসবে। বেদ, বেদান্ত, যতই পড়া থাকুক না কিছু করতে পারে না। গুরুতে বিশ্বাস রাখলে বা কিছু সময় অন্ততঃ নিয়মিত সাধুসঙ্গ করলে অনেক কাজ হয়। ২৪ ঘণ্টা ত সংসারে রয়েছ, রোগ, শোক, তাপে জর্জ্জরিত হচ্ছ; এরই মধ্যে হয়ত কারুর প্রারব্ধ অনুযায়ী কিছু অর্থ এলো বা কিছু সুখ হ'ল কিন্তু তাতে দুঃখের হাত থেকে ত নিষ্কৃতি পাও না। তাই সঙ্গ করতে বলেছে। সাধুসঙ্গের এত প্রভাব যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সঙ্গ করলেই তার ফল আছে। এইখানে ঠাকুর 'কথক, ব্যবসাদার ও মুটের গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ২য় ভাগ ১৪৩ পৃষ্ঠা)। তা দেখ, এই সংসারের ভেতরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অল্প কিছু সময়ও তাঁকে দিলে তিনি তোমার অনেক ভার বহন করেন। এতে তোমার

জন্ম জন্মান্তরীন কর্ম্মক্ষয় হয়ে শান্তি আসে। সঙ্গই প্রধান, যতই ভাল কথা শোন সঙ্গ ছাড়া কিছু করতে পারবে না। এক ভাবে এক প্রাণে তাঁকে ডাকলে তিনি না এসে থাকতে পারেন না। তা, একমন দিয়ে ডাকতে পার কই? মন বহুতে দিয়েছ, বহুকে ডাকছ কাজেই তাঁতে পুরো মন দেবে কি ক'রে? তাই সাধুসঙ্গ। তোমরা নিজে চেষ্টা ক'রে বহু পরিশ্রম ক'রেও যা করতে পারবে না সাধুসঙ্গে অতি সহজে সেটা হয়ে যায়। এইখানে ঠাকুর মৃগয়ার জন্য নিবিড় জঙ্গলে রাজপুত্রের পথ হারান ও সাধুর গল্প বলিলেন।

এক রাজপুত্র মৃগয়ায় গিয়ে মৃগের অনুসরণ করতে করতে নিবিড় জঙ্গলের ভেতর প্রবেশ করল। মৃগের ওপর লক্ষ্য থাকায় সে যে ক্রমশঃ নিবিড় জঙ্গলে ঢুকছে এ দিকে তার লক্ষ্য নেই এবং সে যে তার লোক জন, সৈন্য, সামন্ত প্রভৃতিকে ফেলে রেখে একলাই চলেছে সে হুঁসও নেই। ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এল, বনের অন্ধকারে যখন মৃগ আর বড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে না তখন মনটা আর সেই শিকারের ওপর না থাকায় রাজপুত্রের কিছু চৈতন্য হল এবং সে বুঝতে পারলে যে মৃগের পেছনে দৌড়ুতে দৌড়ুতে সে গভীর বনের মধ্যে এসে পড়েছে এবং বেরুবার পথ হারিয়ে ফেলেছে। যারা জঙ্গলের পথে শিকার করতে গেছে তারা জানে জঙ্গলের ভেতর পথ হারিয়ে গেলে কি বিপদ। রাজপুত্র যতই বন থেকে বেরুবার জন্যে এদিক ওদিক যাচ্ছে ততই সে আরও গভীর বনের মধ্যে যেতে লাগল; এদিকে ক্রমে অন্ধকার ছেয়ে গেল আর দৃষ্টি চলে না, তখন রাজপুত্র হতাশ হয়ে ভাবছে তাই ত এখন কি উপায়! এই অন্ধকারে তার অস্ত্র শস্ত্রও ত কিছু সাহায্য করতে পারবে না, এখনই ত হিংস্র জন্তুর হাতে প্রাণ হারাতে হবে। যখন সে বেশ বুঝতে পারলে যে তার নিজের বুদ্ধির বা ক্ষমতার জোরে আর নিজেকে রক্ষা করবার কোন উপায় নেই তখন শেষ চেষ্টা ভগবানের ওপর নির্ভর ক'রে প্রাণ ভয়ে কাতর ভাবে ভগবানকে

ডাকতে লাগল, দয়াময় আমায় রক্ষা কর। এই বিপদে আর আমার কোন সহায় নেই তুমি না রাখলে এখনই হিংস্র জন্তুর হাতে আমায় প্রাণ হারাতে হবে! এই ভাবে ডাকতে ডাকতে একটু যেতেই দেখে দূরে একটী আলো দেখা যাচ্ছে। আলো দেখেই তার মনে আশার সঞ্চার হয়েছে যে তা হলে কাছেই গ্রাম আছে। ভগবানকে এক মনে প্রাণের সহিত ডাকলে তিনি তাকে রক্ষা করেন।

সেই আলো ধ'রে কিছু দূর গিয়ে দেখে যে একটী কুটীর, ভেতরে একজন সাধু ব'সে আছে। সাধুকে দেখে রাজপুত্র বললে 'দেখুন আমি বড় বিপন্ন, সমস্ত দিন এক মৃগের পেছনে দৌড়ুতে দৌড়ুতে নিবিড় জঙ্গলে ঢুকে প'ড়ে অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি আর বেরুতে পারছি নি। এখন আপনি একটু আশ্রয় না দিলে হিংস্র জন্তু আমাকে মেরে ফেলবে।' সাধু রাজপুত্রের চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে সে বড়ই ক্লান্ত ও প্রাণ-ভয়ে ভীত হয়েছে। তখন তিনি সাহস দিয়ে বললেন 'ভয় কি? আজ রাত্রে এইখানে কুটীর মধ্যে শুয়ে থাক, তোমার কোন ভয় নেই এখানে কোন হিংস্র জানোয়ার আসতে পারে না।' রাজপুত্র একটু স্থির হয়ে বসার পর সাধু তাকে কিছু খেতে দিলেন। সমস্ত দিন অনাহারের পর খাবার ও জল খেয়ে একটু সুস্থ হলে তার লোকজন ও সৈন্য সামন্তের কথা মনে হ'ল। তখন সে সাধুকে বললে 'দেখুন আমার সঙ্গে যারা ছিল তারা যে কোথায় হারিয়ে গেছে, কিছুতেই খুঁজে পেলুম না'। সাধু বললেন 'তাদের জন্যে কোন চিন্তা নেই, তারা ভাল আছে কোন বিপদে পড়ে নি; আজ রাত্রে তুমি এখানে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়ে থাক; কাল সকালে তারা কোথায় আছে পথ ব'লে দোব তাদের কাছে চ'লে যেও।' রাজপুত্র রাত্রিটা সেখানে কাটালে এবং সকালে উঠতেই সাধু ব'লে দিলেন এই পথ ধ'রে যাও তোমার লোকজনদের দেখতে পাবে। সেই পথ ধ'রে একটু যেতেই সে সকলকে দেখতে পেলে তখন

আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবলে বা! এরা এত কাছে রয়েছে অথচ কাল রাত্রে অন্ধকারে কত ঘুরেছি কিছুই করতে পারি নি, আর আজ সাধুসঙ্গে সাধুর উপদেশে এত সহজে পেয়ে গেলুম!

এখানে দেখ, রাজপুত্রের ত সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র সব ছিল কিন্তু তত্রাচ নিবিড় জঙ্গলে অন্ধকারে ভয়ে এমন বুদ্ধিহারা হয়ে গেল, যে আত্মরক্ষার জন্য আর অস্ত্রের ওপর নির্ভর করতে পারলে না। হিংস্র জন্তুর হাতে পাছে প্রাণ হারায়, এই ভয়ে তার নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার ওপর এবং অস্ত্র শস্ত্রের ওপরও আর কোন বিশ্বাস রাখতে পারলে না। তেমনি, এই সংসারে গুরুতে বিশ্বাস রেখে চলবার চেষ্টা করলেও মায়ার এমনই প্রভাব যে অনেক সময় এই বিশ্বাস টলিয়ে দেয়, তবে সেই সময় জোর ক'রে বিশ্বাস রাখলে দেখবে, যে দিক দিয়ে হোক সব আপনি রক্ষা হয়ে যাবে। তাই বার বার বলেছে সঙ্গ; সঙ্গে সব ঠিক ক'রে দেয়। এমন কি গুরুতে অবিশ্বাস এলেও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করা কিছুতেই উচিত নয়। তখন জোর ক'রে তাঁর সঙ্গ করলে দেখবে, আবার আস্তে আস্তে সেই ভাব আসবে, পূর্ব্বের সেই বিশ্বাস আবার ফিরে আসবে, এবং তখন তুমি আবার বুঝতে পারবে যে আগেকার মতই তুমি তাঁর আশ্রয়ে সর্ব্বদা রয়েছ।

দ্বিজেন গাহিল—

(১)

এ মায়া প্রপঞ্চময় এ ভব-রঙ্গ-মঞ্চ মাঝে।
রঙ্গের নট নটবর হরি যারে যা সাজান সে তাই সাজে॥
কর্ম্মক্ষেত্রে জীব মাত্রে মায়া সূত্রে সবে গাঁথা,
কেহ পুত্র কেহ মিত্র কেহ ভার্য্যা কেহ ভ্রাতা।
কেহ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা,
কত রঙ্গের অভিনেতা আসেন কত সাজে সেজে॥

মাতৃ সাজে সেজেছিস মা করিতে স্নেহের অভিনয়,
কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মসূত্রে আমি সেজেছি গো তোর তনয়।
এ নাটকের এই অঙ্কে স্থান পেয়েছি মা তোর অঙ্কে,
আবার হয় ত পর অঙ্কে চ'লে যাব পর অঙ্কের পুত্র সেজে ॥
যার যখন হতেছে সাঙ্গ এ রঙ্গ ভূমির অভিনয়,
কা কস্য পরিবেদনা, তখন আর কেউ কারুর নয়।
কোথা রয় প্রেয়সীর প্রণয় পুত্র কন্যার কাতর বিনয়,
শোনে না কারুর অনুনয় চ'লে যায় সাজ সজ্জা ত্যেজে ॥
না হইলে কর্ম্ম শেষ কত আসিব কত যাইব,
সং সেজে সংসার নাট্যে কত হাসিব কত কাঁদিব।
অহি বলে যবে আসিব মায়া মোহ কবে নাশিব,
মহাযোগে কবে বসিব মিশিব হরির পদরজে ॥

(২)

ওগো কে তুমি আমারে বল।
অযাচিত ভাবে ফের আশে পাশে বিপদেতে আগে চল ॥
ডাকি নাই তোমায় তবু কাছে আস, চাহি নাই তোমায় তবু ভালবাস।
জেনেছি হে মম হৃদয় আকাশ তোমারই আভায় আলো ॥
কভু স্বামী কভু সখা রূপ ধ'রে কখন 'মা' হয়ে আস স্নেহ ভরে।
এ ধনে ধনী নহে গো যে জন তার জীবন বিফলে গেল ।

(৩)

লোকে বলে আছ তুমি ভেবে দেখিনি আছ কিনা।
তখন আমি বুঝিনি প্রভু নাস্তি গতি তোমা বিনা ॥
তোমার গৃহে বসতি করি, খেতেছি তোমার অন্ন।
তোমার বায়ু দিতেছে আয়ু বেঁচে আছি তোমার জন্য ।
ক্ষুধা হরেছে তোমার ফলে, পিপাসা গেছে তোমার জলে।
সে কি ভুল, যে ভুলে ভুলে, ভুলেও তোমার নাম করি না ॥
তোমার মেঘে শস্য আনে ঢালি পীযুষ বারি ধারা।
অবিরত দিতেছে আলো তোমার রবি শশী তারা ॥
শীতল তব বৃক্ষছায়া সেবে নিয়ত ক্লান্ত কায়া।
তোমার দেওয়া মন রয়েছে ভুলে তোমার গুণ গরিমা ॥

তৃতীয় ভাগ – চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

কলিকাতা ; বৃহস্পতিবার ৮ই আষাঢ় ১৩৪০ সাল,
ইং ১৫ই জুন ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে—ডাক্তার সাহেব, ললিত, নগেন, শিরিশ, পুত্তু, তারাপদ, শ্যাম, অপূর্ব্ব, মৃত্যুন, জিতেন, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, কেবল, প্রফুল্ল, ভোলা, জ্ঞান, দ্বিজেন, কালী, কৃষ্ণকিশোর, কালীমোহন, দ্বিজেন সরকার, কৃষ্ণ দত্ত, ভগবান ও অভয় আছে।

পুত্তু। দুঃখে কষ্টে বিশ্বাস রাখা বড় শক্ত।

ঠাকুর। দুঃখে কষ্টে বিশ্বাস রাখার নামই ত বিশ্বাস। অন্য সময়ে ত বিশ্বাস রাখা যায় কিন্তু দুঃখে প'ড়ে যদি ঠিক বিশ্বাস রাখতে পার তবেই না জানা যাবে তোমার ঠিক বিশ্বাস আছে। স্থির বিশ্বাস একটা অবস্থা ; সে অবস্থায় না এলে স্থির বিশ্বাস থাকে না। পঞ্চ পাণ্ডব যখন বিরাট গৃহে দাস দাসী হয়ে রয়েছেন তখন ভীমের কৃষ্ণের ওপর অবিশ্বাস এসেছিল। ভীম অর্জ্জুনকে বললে ভাই, 'এই কি কৃষ্ণ সেবার ফল? এতদিন যে আমরা কৃষ্ণ সেবা করলুম তার ফলে আজ আমরা রাজ্য ছেড়ে বনে বনে ভ্রমণ ক'রে এখানে দাস দাসী হয়ে রয়েছি!' অর্জ্জুন বললে 'হ্যাঁ ভাই, তোমাদের হয়নি কি? সুখ হয়নি। এতেই একেবারে অবিশ্বাস এসে গেল, আর কৃষ্ণ নিন্দা করছ? তা হলে তুমি কৃষ্ণকে ভালবাস না, কৃষ্ণকে চাওনা, সুখ চাও সুখকে ভালবাস ; সুখের জন্য কৃষ্ণ সেবা করেছ, কৃষ্ণের জন্য কৃষ্ণ সেবা করনি। আর দেখ দিকি তাঁর কত ভালবাসা, তিনি ত এত দুঃখেও আমাদের ছাড়েন নি,

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। যখন রাজা তখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে, আবার যখন বনে বনে তখনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন।' তখন ভীম বললে, 'তাই ত ভাই, তুমি আজ আমার বড় উপকার করলে, আমার চৈতন্য এনে দিলে, দুঃখে কষ্টে মন ঠিক রাখতে পারিনি সব ভুলে গিছলুম; যথার্থই কৃষ্ণের মত আপনার আর আমাদের কেউ নেই।' তা দেখ, এদেরই যখন অবিশ্বাস আসে, তখন ঠিক বিশ্বাস রাখা কত শক্ত। পরমহংসদেব বলতেন 'গিরীশের পাঁচ সিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস।' তা, তারও একবার কিছু সময়ের জন্য অবিশ্বাস এসেছিল কিন্তু আবার চ'লে গেল। সুখ দুঃখের হাত থেকে কাহারও নিষ্কৃতি নেই। তবে যার যত মনে শক্তি আছে সে তত কম পরিমাণ বিচলিত হয়। মানুষের প্রকৃত দুঃখ তিনটী—ব্যাধির যন্ত্রণা, ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্ন, ও মাথা গোঁজবার জায়গা। এ ছাড়া বাকী সব ধার করা দুঃখ।

পুত্তু। চিন্তাতেও অনেক সময় বড় দুঃখ দেয়।

ঠাকুর। চিন্তা কোনটা? যে জিনিষ মনে বেশী ধ'রে থাকে সেইটাই দুঃখ দেয়। তা ছাড়া মনের স্বভাব হচ্ছে, জল বুদ্বুদের মত নানা চিন্তা আসছে যাচ্ছে, সে গুলোতে বড় দুঃখ দিতে পারে না। ধর, মনে একটা নিয়ে বেশ চিন্তা করছ এমন সময় তোমার সামনে লোক জন এলে নজর হ'ল হয়ত কিন্তু সে জন্য আর কোন চিন্তা রইল না কেননা তুমি তখন আর একটা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছ এটা চাচ্ছ না। কাজেই আপনা আপনি এলো গেল তাতে আর দুঃখ হ'ল না কিন্তু যদি এক মিনিটের জন্যও মনকে ধরতে পারত তা হলে দুঃখ দিত।

পুত্তু। স্বপ্নে চিন্তা থাকে কি?

ঠাকুর। হ্যাঁ, স্বপ্নও চিন্তাশূন্য অবস্থা নয়।

স্ত্রী স্বাধীনতার কথা উঠিতে পুত্তু বলিল।

পুত্তু। মেয়েদের যে স্বাস্থ্যের জন্য একটু মুক্ত হাওয়ায় বেরুবার

যো থাকবে না, একটু লেখাপড়া শিখতে বা গান গাইতে বা নাচতে পারবে না, এটা কি ভাল? পুরুষরা যা খুসি তাই করবে, আর মেয়েদের অন্যায় ভাবে দাবিয়ে রাখবে, এটা ঠিক নয়।

ঠাকুর। প্রথমেই দেখ দাবিয়ে রাখা কথার মানে কি? আগে কথার মানে বোঝ, কোন্ কথা কোথায় কি ভাবে ব্যবহার হয় বোঝ, তবে ত ঠিক ধরতে পারবে। দাবিয়ে রাখে কাকে? মানুষ শত্রুকে দাবিয়ে রাখে যাতে সে মাথা তুলতে না পারে ও পরে আর অনিষ্ট করতে না পারে। যেখানে পরস্পর ভালবাসা থাকে, বিচ্ছেদে দুঃখ আসে, সেখানে কি দাবিয়ে রাখে? সেখানে বরং ভয় করে; মায়ার জিনিষ, ভাবে কি জানি বাবা কি হবে। তারা দুর্ব্বল, বাইরে গেলে পাছে কোন বিপদে পড়ে বা কোন অনিষ্ট হয় পরে সামলাতে না পারি তার চেয়ে ঘরের ভেতর থাক কোন ভয় নেই। তাদের ওপর হিংসা ভাব রেখে কখনও এ রকম করে না। বাপ ছেলেকে শাসন করে, যেখানে সেখানে যেতে দেয় না, এবং অবাধে মেলা মেশা করতে দেয় না কেন? এ কি তাকে দাবিয়ে রাখবার জন্য, না তারই মঙ্গলের জন্য পাছে সঙ্গে প'ড়ে বদ হয়ে গিয়ে দুঃখ পায়? আর দেখ, এই মেয়েদের জন্যই সারাদিন খেটে, কত অপমান, গালাগাল সহ্য ক'রে টাকা রোজগার ক'রে আনছ, নিজে না খেয়ে না প'রে তাদের ভাল ভাল জিনিষ খাওয়াচ্ছ, ভাল ভাল কাপড় পরাচ্ছ, কত রকম গহনা পরাচ্ছ, আর তাদেরই কিনা শুধু শাস্তি দেবার জন্যে জোর ক'রে ঘরে আটকে রাখছ? এই যে ভাব, এটা তোমরা আজকালকার ছেলে ছোকরারাই তাদের মাথায় জোর ক'রে ঢুকিয়ে দিচ্ছ।

তারা বরাবর জানত যে লজ্জাই স্ত্রীলোকের প্রধান ভূষণ; তারা জানত যে পর পুরুষ তাদের মুখ দেখতে পাওয়া বড় লজ্জার কথা ও তাতে অনিষ্ট আছে। এ গুলো তাদের স্বতঃই সংস্কার ছিল; কিছু জোর ক'রে করতে হ'ত না বা এই সবের জন্য তারা কোন রকম দুঃখ বোধ করত

না বরং বেশ আনন্দের সহিত তাতেই সুখী থাকত। তোমাদের যে মুসলমানের হাতে খেতে নেই। যারা এ সংস্কার মানে তারা কি জোর ক'রে মুসলমানের হাতে খাওয়ার লোভ সামলায় তা নয়, তাদের এ জিনিষে লোভই হয় না। তাদের যে লোভ গেছে তা বলছি না। যে জিনিষ তারা খায়, তাতে লোভ ঠিকই আছে • হয় ত কিন্তু যেটা সংস্কারে নেই তার জন্যে লোভ করে না, বা কোন চিন্তাও রাখে না; বরং যদি সংস্কার একবার ভেঙ্গে যায় পরে বন্ধ করতে গেলে জোর করতে হবে। যাদের ওপর এত ভালবাসা, তাদের কেনই বা আটকাচ্ছে সেটা দেখ। অবশ্য, দস্যু প্রভৃতি বা অনেক জাতির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য মাঝে অবরোধ প্রথাটা খুব বেশী এসেছিল; এখনও যে সে ভয় একেবারে নেই তা বলতে চাই না। এখনও মেলায় বা তীর্থস্থানে স্ত্রীলোক চুরি আছে তবে অনেক কম। ঘরের কোণে যে শুধু ঘোমটা দিয়ে পুঁটলি হয়ে ব'সে থাকবে তা বলছি না, তবে বেশী বার মুখো করলে দুঃখ বাড়বে।

ঋষিরা অনেক দেখেছেন, বুঝেছেন, তাই তাঁরা দুটো ভাগ ক'রে গেছেন। মেয়েরা স্বতঃই দুর্ব্বল, বাইরে তারা অনেক বিপদে পড়তে পারে তাই তাদের ওপর ভেতরের সমস্ত ভার ছিল। পুরুষ সবল, বাইরের কাজ নিয়ে থাকুক; মেয়েরা সংসারে রান্না, সন্তান প্রতিপালন, ঘরের কাজকর্ম্ম, আত্মীয় স্বজনের যত্ন, রোগীর সেবা প্রভৃতি ভেতরের ভার নিলে। তাতে তাদের এত খাটুনি ছিল যে তারা অন্য বাজে চিন্তার সময় পেত না এবং তাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকত। আগে ত ৯।১০ বছরের মেয়ে বিয়ে হত; তার পর কেউ হয়ত ১০।১২টী সন্তান প্রসব করেছে অথচ তাদের যে খাটুনি ছিল এবং যে স্বাস্থ্য ছিল তার এক আনা খাটুনি আজকালকার মেয়েরা পারবে না, আর এদের স্বাস্থ্যই বা ভাল কই? তবে আজকালকার স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার প্রধান কারণই হচ্ছে খাঁটী জিনিষ খেতে পায় না ও সে রকম ভাবে শরীরকে চালনা করে না।

আবার আজকাল হাওয়াও অপর জিনিষে মিশে মিশে আগের চেয়ে ঢের খারাপ হয়েছে। আমার বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অতিরিক্ত কোনটাই ভাল নয়। একেবারে ঘরে বদ্ধ রাখাও ভাল নয়, আবার বেশী বারমুখো হতে দেওয়াও ঠিক নয়। আগে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ছিল, এক জনের বিপদ আপদে পাড়ার সকলেই দেখত, করত, কাজেই তখন মেয়েদের বাইরে বেরুবার দরকার হত না। বাড়ীতে কোন পুরুষ না থাকলেও হঠাৎ কোন দরকার হ'লে পাড়ার ছেলেরা তখনই এসে পড়ত। এখন ত আর সে ভাব নেই, স্ব স্ব প্রধান। আগে সকলে এক সংসারে মিলে মিশে থাকত, যার বেশী রোজগার সে বেশী খরচ করতেও কুণ্ঠিত হত না, তাতে যারা কম রোজগার করত তাদের খুব বেশী দুঃখে পড়তে হত না। কিন্তু এখন যেই একজন বেশী রোজগার করতে আরম্ভ করলে অমনি তার স্ত্রী স্বামীকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। মুখে অবশ্য, 'এ না করলে অপরে ঠিক খাটবে না, চেষ্টা করবে না' ইত্যাদি অনেক কথা বলবে, কিন্তু আসলে তা নয় খরচ কমিয়ে টাকা জমানই প্রধান উদ্দেশ্য।

এখন তোমাদের চাঁদা তুলে দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করতে হয়, কারণ এখন কেউ কাউকে দেখে না কেবল নিজে ও ছেলে পরিবার নিয়েই ব্যস্ত। পুরাকালে গ্রামে একজন ধনী থাকলে, সে, গ্রামের অপর গরীবদের দেখত। ধনী কে? যে বহুকে প্রতিপালন করত সেই ধনী। জমীদাররা গ্রামের সকলের অভাব অভিযোগ শুনত ও ব্যবস্থা করত, হিন্দু, মুসলমান বা বড় ছোট কোন বিচার করত না; যার অভাব হ'ত তাকেই সাহায্য করত; আর তারাও জমিদারের বাধ্য থাকত, জমিদারের বাড়ীতে কোন কাজ কর্ম্মে প্রাণপণ খাটতে এবং বিপদ আপদে জমিদারকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকত। সে ভালবাসার এক আনা আছে কি কাজেই এখন যার যা কাজ সমস্তই

নিজেকেই করতে হয়। বাড়ীতে স্বামী স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই তাই স্বামীর অসুখ হ'লে বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে ডাক্তার ডাকতে বা ওষুধ আনতে বেরুতে হয়। এ আলাদা কথা, কিন্তু এখন যে ভাবে তোমাদের মেয়েদের বার করতে চাইছ তাতে ভেতরটা একেবারে নষ্ট ক'রে সংসারটা ভেঙ্গে দিতে যাচ্ছ। আগে মেয়েরা সংসারের ভার নিয়ে স্বামীর অল্প আয়েও নিজেরা খেটে চালিয়ে দিত; বেশী দুঃখ আসতে দিত না, কিন্তু এখন বামন, চাকর, ঝি না হলে চলবে না। এ আর অবস্থার ওপর নয়; প্রায় সকলেরই চাই, অবস্থায় কুলুক আর নাই কুলুক। যত চেষ্টা কর, এখনও মেয়েদের এত দিনের পূর্ব্ব সংস্কার সব নষ্ট করতে পারনি, তাই এখনও তত দুঃখ আসে নি। আর কিছুদিন এই ভাবে চললে, যেটুকু সংস্কার আছে সেটুকুও সব চ'লে যাবে, তখন দেখবে কি ঘোর অশান্তি আসে; এবং নিজেরাই বুঝবে যে কি ক্ষতি করলে কিন্তু তখন আর ফেরাবার উপায়ও থাকবে না।

লেখাপড়া শেখা বা গান বাজনা শেখা ত খারাপ নয়। আগে কি এ সব ছিল না? ধনীর ঘরের মেয়েদের আঠার কলা বিদ্যা না থাকলে তাদের সভ্য সমাজে মেশাই চলত না। তবে তখন কি শেখাত? শাস্ত্র গ্রন্থ পড়াত, ধর্ম্ম ভাবের গান শেখাত, যাতে ভোগ না বড় করে। লেখাপড়া বা গান বাজনা শেখাতে ত দোষ নেই, তবে সেই ভাবে শেখাও। ত্যাগটা বড় ক'রে সব শেখাও ক্ষতি নেই, কিন্তু এই নিয়ে অবাধে মেলা মেশা করা ভাল নয়। আজকাল ত কেবল ভোগের জিনিষ শেখাচ্ছ, ফলে ভোগ বাসনা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছ। একে ভোগের জিনিষ না পেলেই দুঃখ, তার ওপর আবার যত ভোগ বাসনা বাড়িয়ে দেবে তত দুঃখ বাড়তে লাগল। যখন মানুষ ভোগের অধীন থাকে তখন ভোগ আর চেষ্টা ক'রে শেখাতে হয় না, ও আপনিই বাড়ে; তার ওপর আবার ভোগের উপদেশ পেলে ত আরও ভয়ানক রূপ ধারণ করবে

এবং দুঃখকে আহ্বান ক'রে ঘরে নিয়ে আসবে। বাসনা এমন জিনিষ যে একে বেশী রকম বেড় না দিলে ঠিক দাবিয়ে রাখা যায় না। তার সাক্ষ্য দেখ না, পুরুষরা বাইরে বেড়াচ্ছে ব'লে মেয়েদের চেয়ে ঢের বেশী স্বেচ্ছাচারী। সেই জন্য মেয়েদের এত ক'রে বেড় দিয়ে রেখেছে। হিন্দুদের ধর্ম্মভাব এখনও কিছু থাকে ত মেয়েদের ভেতরই আছে; সেটা কোথায় বজায় রাখবার চেষ্টা করবে না ভেঙ্গে ফেলতে চাচ্ছ।

দেখ, মানুষের ভেতরই মনুষ্য ও পশু এই দুই প্রকৃতি পাওয়া যায়। মনুষ্য প্রকৃতির লক্ষণ হচ্ছে ধৈর্য্য, উপেক্ষা, ক্ষমা আর পশু প্রকৃতির লক্ষণ অধৈর্য্য, হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা ও বাসনা চরিতার্থ করা। বিশেষতঃ আমাদের হিন্দুস্থানে ত্যাগকে বরাবর প্রধান করেছে। এখানকার বিশেষত্বই দান, অতিথি সৎকার, নৈতিক চরিত্র ও স্ত্রীলোকের সতীত্ব। এ সব রক্ষা করবার জন্য দরকার হলে আনন্দে মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করেছে এবং এই হিন্দুস্থানের স্ত্রীলোকেরাই পতির মৃত্যু হলে হাঁসতে হাঁসতে মৃত পতির সঙ্গে সহমরণে গেছে। এ আর অপর কোন দেশে পাবে না। তা ছাড়া, কাম রিপু বড়ই দুর্জ্জয়, ইহা সহজে জয় করা যায় না। স্ত্রী পুরুষের সংসর্গে এ অতি প্রবল ভাবে কাজ করে। তাই শাস্ত্রে এদের ঘৃত ও অগ্নির সঙ্গে উপমা দিয়েছে। যেমন অগ্নির তাপে ঘৃত গ'লে যায় তেমনি পুরুষ সংসর্গে কামিনী মন অতি সহজে গ'লে যায় এবং কামিনীর সঙ্গে পুরুষের মনও তদ্রূপ গলে। সেই জন্যই শাস্ত্রকাররা চরিত্রের ওপর এত কড়া বেড় দিয়েছে, কারণ বিশেষরূপে বেড় না দিলে চরিত্র রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। এ বিষয় অনেক বড় বড় কথা মুখে বলা বা বক্তৃতা করা ত খুব সহজ কিন্তু কাজে দেখান খুবই শক্ত। তাই সর্ব্বদাই খুব সাবধান থাকা উচিত এবং যতক্ষণ না রিপুরা অধীন হয়, ততক্ষণ বেড় দিতেই হবে; রিপু অধীন হয়ে গেলে অবাধে মেলা মেশায় তত ক্ষতি হয় না। আর দেখ, অবাধে

মেলামেশা বা স্বেচ্ছাচার বৃত্তি পুরুষ বা স্ত্রী কারুর পক্ষেই ভাল নয়; তবে এতে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকেরই বেশী ক্ষতি হয় এবং সংসারে বেশী অশান্তি উৎপত্তি হয়। কারণ, একটী পুরুষের যদি পাঁচটী বিবাহ হয় ত তার পাঁচটী সন্তান হতে পারে; কিন্তু একটী স্ত্রীলোক যদি পাঁচটী বিবাহ করে তা হ'লেও তার একটীর বেশী সন্তান হয় না। আবার এ ক্ষেত্রে আমাদের হিন্দুদের ধর্ম্ম অনুযায়ী শ্রাদ্ধাদি কোন কার্য্যে পিতৃ নির্ণয় হবে না কেননা মা নিজেই ঠিক বলতে পারবে না কার ঔরসে পুত্র জন্মেছে। তা ছাড়া স্ত্রীলোক দুর্ব্বল ব'লে গৃহে কলহ প্রভৃতি ঘোর অশান্তির সৃষ্টি হবে। এই জন্যে স্ত্রীলোককে এত কড়া বেড় দিয়েছে। কারণ যদি একটাকে বেড় দিয়ে রাখতে পারা যায় তা হলে আর একটার দ্বারা তত ক্ষতি হওয়া সম্ভব নয়। এখানে সমাজ ও সংসারের বিশেষ ক্ষতি হয় না ব'লে পুরুষকে তত কড়া বেড় দেয়নি বটে কিন্তু ভগবানের কাছে সকলেই সমান, কাহারও অন্যায় করা উচিত নয়।

পুত্তু। কত পুরুষ মদ খেয়ে বাড়ী এসে স্ত্রীর ওপর অমানুষিক অত্যাচার করছে; তা ছাড়া এ রকম আরও কত অত্যাচার করছে।

ঠাকুর। সে ত পুরুষের দোষ, তাকে শোধরাও। বাড়ীর একজন মদ খেয়ে এসে অত্যাচার করছে ব'লে, তাকে না শুধরে, বাড়ীর অপর সকলকে মদ খাইয়ে তাকে জব্দ করতে যেও না। এত নীচ হ'য়ো না। এ ত হ'ল হিংসা প্রবৃত্তি। বড় দিকে নজর দাও। যে মদ খেয়ে আসছে তাকে সাজা দাও, তাকে শোধরাও তবেই না বড়ত্ব। একজন নষ্ট হয়েছে ব'লে তার বাড়ী শুদ্ধ সব নষ্ট ক'রে দেবে? এ যে ঘোর অন্যায় কথা।

নগেন। খুব দুঃখ না পেলে ত সাধারণতঃ মানুষ ভগবানকে ডাকে না। তা হলে দুঃখই ত বড়।

ঠাকুর। দুঃখে পড়লে মানুষ তাঁকে ডাকে; আবার দুঃখে না পড়লে সে কতটা তৈরী হয়েছে তাও জানা যায় না। প্রকৃতির

ধাক্কায় কতদূর দাঁড়াতে পার, দুঃখে কতটা মন ঠিক রাখতে পার এই না পরীক্ষা। যে মনকে যত শক্ত করেছে সে তত দুঃখকে জয় লাভ করেছে।

কেষ্ট। ভগবান সুখময়। আমরা, মানুষ সর্ব্বদাই সুখ খুঁজছি, তা হলে ত আমরা ভগবানকেই চাচ্ছি, আমরা ক্রমশঃ তাঁর দিকে এগোচ্ছি ?

ঠাকুর। এখন দেখ, তোমরা ঠিক সুখ খুঁজছ কি না। যদি ঠিক সুখ খোঁজ তা হলে দুঃখ চাও না ত? প্রথমে কোন জিনিষ-গুলো সুখ, কোন গুলো দুঃখ জানতে শেখ; তারপর দুঃখকে ছেড়ে দাও। এই হলেই না বোঝা যাবে তুমি ঠিক সুখ খুঁজছ। সংসারে ত দেখছ অনেকের পুত্র মরছে। পুত্রশোক যে কি ভয়ানক দেখছ, তোমার পুত্র যে এ রকম ম'রে তোমায় দুঃখ দেবে না তা বলতে পার না। তত্রাচ তুমি পুত্র কামনা করছ কেন? পুত্র থাকার সুখ খুঁজতে গিয়ে দেখছ সামনে মস্ত বড় দুঃখ রয়েছে, জেনেও তুমি সেই সুখের আশায় যাচ্ছ। এটা কি ঠিক সুখ খোঁজা হল, এ ত স্বার্থ। তুমি চাচ্ছ তোমার পুত্র হোক ও সে বরাবর তোমার সামনে বেঁচে থাক। এখানে অনেকেরই পুত্র মরছে, প্রকৃতির এই নিয়ম দেখেও কেবল নিজের স্বার্থের জন্যে তোমার বেলা আলাদা আইন চাচ্ছ। এ কত বড় স্বার্থ বুঝতে পারছ! এটা তুমি ভুল বলতে পারবে না, কারণ ভুল কোনটা? যেটা জান না সেইটাই ভুল কর; যা জান, যা রোজ চোখের সামনে অপরের বেলা দেখছ, অথচ নিজের বেলা জানি না, এটা ভুল বললে চলবে কেন? এমন লোক কি আছে যে সুখ চায় অথচ দুঃখ কি জানে না? সুখ চাচ্ছ মানেই কতক গুলো দুঃখ ব'লে জান ও চাচ্ছ না। জান, অথচ এই রকম ভুলের হাতে পড়ার নামই মায়া। তুমি যদি ঠিক সুখ চাইতে, তা হলে যে যে জিনিষ সুখ নষ্ট করে, তাকে দূরে রাখতে ও যে গুলো দুঃখ ব'লে জান সে গুলোও অন্তঃতু ছাড়তে। তাই প্রথম অবস্থায়, যে গুলো যথার্থ দুঃখপ্রদ, যার দ্বারা ভগবানের দিকে

যাবার বিঘ্ন হয়, সেগুলো ত্যাগ করতে হয়। উঁচুতে উঠলে সুখ বা দুঃখ সব সমান; তখন আর অপ্রিয় ব'লে কোন জিনিষ থাকে না।

আর জিনিষ চাওয়ার লক্ষণ কি? যে জিনিষ চাও তার জন্যে তোমার কতটা চিন্তা, আগ্রহ ও ব্যাকুলতা এসেছে এবং তার জন্যে কত পরিমাণ লোকসান স্বীকার করতে প্রস্তুত, এই গুলো দেখে তবে বোঝা যাবে। সুখ কি? ক্ষণিক বাসনা তৃপ্তির ও নিজের স্বার্থ পূরণের নামই সুখ। যেটা চাও সেইটা পেলে সুখ আর তার বিরুদ্ধ হলে দুঃখ। যে ভগবানকে পাবার চেষ্টা করছে, তার ভগবান পাওয়া সুখ কিন্তু যে ভগবান চায় না তার পক্ষে ভগবান পেতে যাওয়াটা দুঃখ। তুমি অর্থ চাইছ আর যদি দেখ যে এই দুঃখ স্বীকার ক'রে গতি করলে অর্থ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে তখন তুমি আনন্দের সহিত সে দুঃখ সহ্য করতে প্রস্তুত। তা হলেই দেখছ তুমি যেটাকে সুখ ব'লে ধ'রে নিয়েছ সেই স্বার্থ পূরণের জন্যে দুঃখকেও নিতে রাজী। স্বার্থ হচ্ছে রিপুর হুকুম। ভেতরে রিপুরা যে বাসনা তুলে দিচ্ছে, তুমি সেইটাকে সুখ ব'লে ধ'রে নিয়ে সেইটে লাভের জন্যে ছুটছ। আসল সুখ পাওয়া বা দুঃখ ছাড়া ত চাচ্ছ না। আর যদি বল ভগবানকে চাই ব'লে সুখ চাচ্ছি, কারণ তিনি সুখময়, তা ভগবান ত সর্ব্বময়, তিনি দুঃখময়ও ত। দুঃখ ত আর অপর এক ভগবান এসে তৈরী করেন নি। ইনিই সুখময় ও দুঃখময়। ভগবানকে চাইলে তাঁর সবটাই চাইবে, বিচার ক'রে বেছে চাইবে না। তাঁর যা আছে, ভাল হ'ক, মন্দ হ'ক, সুখ হ'ক, দুঃখ হ'ক সবটাই আনন্দ ক'রে নেবে, কোনটায় ভয় করবে না; কিন্তু তা ত করছ না। দুঃখকে চাচ্ছ না মানেই দুঃখকে ভয় করছ, দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পেতে চাচ্ছ। হয় সুখ, দুঃখ কিছুই চেও না কেবল তাঁকেই চাও, তাঁর কি আছে না আছে জানবার দরকার নেই। না হয় সুখ, দুঃখ আদি তাঁর যে যে

জিনিষ আছে, সবটাই চাও কোন বিচার ক'রো না ; সবটাকেই সুখ বোধ ক'রে নাও তাহলেও তাঁকে পাবে। এ ছাড়া তাঁকে পাবার আর উপায় নেই ত। সুখ, দুঃখ কিছুই চাইবে না কখন? যখন তোমার সব বাসনা গেছে, অর্থাৎ সাধুরা কেবল তাঁকেই চায়।

ভগবানের কাছে এগোবার কথা বলছ—এগোয় কোথায়? তুমি এক জায়গায় আছ, ভগবান আর এক জায়গায় আছেন ; তোমার জায়গা ছেড়ে তাঁর জায়গার কাছে যাওয়ার নামই এগোন হবে ত? তুমি যেখানে আছ সেটা কার জায়গা? সেও ত ভগবানের জায়গা, তিনি সর্ব্বময়, তা হলে তুমি ত সর্ব্বদাই তাঁর কাছে রয়েছ, আবার এগোবে কি? সমুদ্রের মাঝখানে কি এগোনো পেছন বুঝতে পার? ছেলে যেমন মার কোলে ঘুমুতে ঘুমুতে কেঁদে ওঠে আবার যখন জানে যে সে মার কোলেই আছে, তখন চুপ করে। তেমনি সকলেই তাঁর কোলে রয়েছ তবে মায়ার ঘুমে অচৈতন্য হয়ে আছ ; এবং সে বিকাশ নেই ব'লে তাঁকে পাবার জন্যে আবার এত ছুটোছুটি করছ? সর্ব্বদাই যে তাঁর কাছে রয়েছ এই বোধ আনবার জন্যে, এই আত্মবিকাশের জন্যে এত চেষ্টা। তিনি যখন সর্ব্বময় তখন তোমাতেও আছেন। তাঁকে চাও আর নাই চাও, তিনি ঠিকই আছেন ; তবে তুমি তাঁকে চাও কেন, তাঁর জন্যে এত চেষ্টা কর কেন? কেবল তোমার নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য তাঁকে ডাকছ, আর যে বস্তু আপনার ব'লে জান সে বস্তুর জন্যে মন ব্যস্ত হয়।

কেষ্ট। তা হলে আমরা সব মার কোলে শুয়ে আছি। তিনিই তা হলে আমাদের ঘুম পাড়াচ্ছেন, ভাঙ্গাব কি ক'রে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তিনিই আবার জাগিয়ে দিচ্ছেন, যেমন ছেলে দিনের বেলা অনেকক্ষণ ঘুমুলে মা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয় পাছে রাত্রে না ঘুমিয়ে তাকে বিরক্ত করে। তা ছাড়া ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন আছে ত? স্বপ্ন দেখেও অনেক সময় ঘুম ভেঙ্গে যায়? আবার স্বপ্নের স্বপ্ন

আছে ত? অর্থাৎ স্বপ্নের ভেতর স্বপ্ন দেখছ। সময় এলে আপনি ঘুম ভেঙ্গে যাবে। একটী ছেলে মাকে বলেছিল 'মা, আমার হাগা পেলে ডেকে দিও।' মা বললে 'ওরে হাগাই তোকে জাগিয়ে দেবে।' তোমার মনের মধ্যে সে আবেগ এলেই তোমার ঘুম ভেঙ্গে যাবে। তোমরা যে এখানে আসছ, এতে তোমরা খানিকটা মানুষ হতে পারবে, এতে মনের শক্তি বাড়বে, ভাল মন্দ কিছু বিচার করতে পারবে, কিছু ধর্ম্মভাব আসবে ও সৎনীতি নিয়ে খানিকটা চলতে পারবে। যেমন ময়ান না দিলে লুচি মোলায়েম হয় না, অর্থাৎ সে লুচি টেনে ছেঁড়া যায় না, সেই রকম ধর্ম্মের ময়ান না দিলে ঠিক মানুষ হয় না। ধর্ম্ম মানুষের বৃত্তি গুলো সৎ দিকে ঘুরিয়ে দেয় তখন তাঁর দিকে গতি করা সুবিধা হয়। এখন, তোমরা সংসারটাকে বড় করেছ এবং ওদিক সব বজায় রেখে যতটুকু পার এখানে এস, কোন দিন সময় না করতে পার ত এলে না। আর, যখন তাঁকে বড় করবে তখন সংসারে নেহাৎ যে টুকু না থাকলে নয় সেই সময়টুকু মাত্র থেকে বাকী সব সময়টাই তাঁকে দেবে। যদি কোন বিশেষ কারণে আর একটু বেশী সময় সংসারে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়, তা হলে তার জন্য মনে ভয়ানক অশান্তি ভোগ কর এবং যত শীঘ্র পার সেই সময়টা আবার সংসার থেকে বের ক'রে নাও। এই রকম উন্মাদনা না এলে এক পাও তাঁর দিকে বাড়াতে পারবে না। যে কাজই করবে তাতে রোক থাকা চাই, তার জন্যে পাগল হওয়া চাই তবে কিছু হবে। তাঁর জন্যে পাগল হলে সংসার বাসনা সব ছেড়ে যাবে তখন ঠিক তাঁর দিকে গতি করতে পারবে, তা ভিন্ন পি, পু, ফি, স্থু'র দলের অর্থাৎ যারা অকর্ম্মন্য ও যাদের কার্য্যকরী শক্তি নেই তাদের দ্বারা কোন কাজ হওয়া শক্ত।

'মা,' 'মা' সারিবার পর ঠাকুর অপূর্ব্বকে মঠে সন্ধ্যা হইতে না দেখিতে পাইয়া কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তারাপদ বলিল বিশেষ দরকারী কাজে ৪টার সময় বাহিরে গিয়াছে। এই শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন।

ঠাকুর। এটা ঠিক নয়। মঠে যখন থাকবে তখন মঠের সব নিয়ম মেনে চলবে। দুপুর বেলা খাওয়ার পর সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ এই ঘর তোমাদের কাছে বন্ধ থাকে, যথেষ্ট সময়, তার মধ্যে যদি কারুর কিছু বাইরের কাজ থাকে সেরে আসা উচিত। মঠে রয়েছ, খাচ্ছ, ঘুমুচ্ছ, আনন্দ করছ, এমন কোন কঠোরতা করতে হয় না, সাধন ভজন করতে হয় না, তবুও মঠের বাঁধা সময় মত ঠিক হাজির থাকা এই একটা নিয়মও যদি মেনে চলতে না পার তাহলে এখানে থাকার দরকার কি? আলাদা বাসা ভাড়া ক'রে থাকলেই পার এবং তোমাদের সময় মত এখানে আসতে পার। তোমরা মঠে রয়েছে; মঠের সব নীতি ঠিক মত পালন হচ্ছে কিনা এ দেখার ভার তোমাদের ওপর। বাইরে থেকে যারা আসে, তারা তোমাদের নীতি পালন দেখে কোথায় শিখবে, আর তোমরাই নীতি ভেঙ্গে ফেলছ! তোমাদের দেখা দেখি তারাও সব ইচ্ছামত নীতি ভাঙ্গবে আর তোমাদের নজির দেখাবে। তা হ'লে এ আর মঠ রইল কোথা? এ ত সরাইখানা হ'য়ে দাঁড়াল। মঠে থেকে মঠের সব নীতি ঠিক মত পালন না করলে, মঠের সম্মান নষ্ট হয় ও তাতে তোমাদেরও অকল্যাণ হবে আর সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও অকল্যাণ হবে কারণ তারা তোমাদের দেখা দেখি ঠিক মত মঠের নীতি পালন করবে না।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে; সঙ্গই প্রধান, সঙ্গ ব্যতিরেকে যাওয়া যায় না। বালক, যুবা, বৃদ্ধ যে যার ভাব নিয়ে আসে কিন্তু সঙ্গে সেই সব বিভিন্ন ভাব ঘুরিয়ে এক দিকে ক'রে দেয়। ভেতরের ভাব যেমন যেমন বদলে আসবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে একই জিনিষকে ভিন্ন ভাবে দেখতে থাকবে। এইখানে ঠাকুর 'ব্যাস, শুকদেব ও মেয়েদের স্নান করার' গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ১ম ভাগ ১৫৪ পৃষ্ঠা)। শুকদেবের মনের ভাব আলাদা ব'লে উলঙ্গ মেয়েদের দিকে তাঁর নজরই ছিল না। তিনি লক্ষ্যই করেন নি যে সেখানে

কতকগুলি মেয়ে গা ধুচ্ছিল। ভেতরে যার যেমন ভাব সেই অনুযায়ী দৃষ্টি হয়; মনে যেমন ভাব উঠবে তেমনি অপর জিনিষে সেই রকম আরোপ করবে ও বিচার করবে। এইখানে ঠাকুর 'সুন্দরী মেয়েকে দেখে রূপের মোহ ও ভগবৎ প্রেমের উদ্দীপনা'র গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ১ম ভাগ ২১ পৃষ্ঠা)। সঙ্গের এত প্রভাব যে ভাল লোকও যদি মন্দ সঙ্গ করে তাহলে ক্রমশঃ তার মনে মন্দের ছাপ লাগবে, আবার মন্দ লোক ভাল সঙ্গ ক'রে ক্রমশঃ ভাল হয়ে যায়। এইখানে ঠাকুর 'রাজপুত্র ও শুকপাখীর' গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ২য় ভাগ ৩৮ পৃষ্ঠা)। তবে এমন অসাধারণ কেউ কেউ আছে যাদের মনের এত শক্তি যে তারা যত বড়ই মন্দ সঙ্গ করুক না কেন তাদের মনে কোন ছাপ লাগে না। কেউ কেউ আবার পূর্ব্ব সংস্কার অনুযায়ী ভাল হয়েই জন্মায় ও গোড়া থেকেই ভাল ভাবে চলে। এইখানে ঠাকুর 'রাণী ভবানী ও পুরোহিত কন্যার' গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ১ম ভাগ ২৯৩ পৃষ্ঠা)। বিনা সঙ্গে মানুষ গঠন হয় না আর কার্য্যও ঠিক হয় না। উপদেশ ত অনেক বইএ আছে কিন্তু শুধু পড়লেই হয় না; সঙ্গে মনের শক্তি বাড়বে, তখন উপদেশের ঠিক ঠিক মানে বুঝতে পারবে ও সেই মত চলতে শিখবে। মন দুটো ধরে না, একটা জোর ক'রে ধরলে অপর গুলো সব আপনি ছেড়ে যায়। সঙ্গে ভালবাসা আসে, আর সেই ভালবাসায় আপন হয়ে যায়। যার ওপর ঠিক ঠিক ভালবাসা পড়ে সে তখন সব চেয়ে আপন হয়ে যায় এবং তখন তার সব ভাব আপনা আপনি এসে পড়ে ও মনে তারই ছাপ লাগে। এক হচ্ছে নীতি পালন—সাধুসঙ্গ করলে, সাধুর কথা শুনলে, এই এই লাভ হয় জান, তাই সংসারের সব গোছ ক'রে, নিজের স্বার্থ সব ঠিক বজায় রেখে, কিছু সময় করতে পার ত সঙ্গ কর। এ আলাদা, তবে এও ভাল কারণ এই রকম নীতি পালন করতে করতে একদিন হয় ত ভাব লেগে যেতে পারে। আর হচ্ছে প্রেম বা ভালবাসা; এতে গোছগাছ করা, বা অপর কোন

দিক বজায় রাখা বা তার চিন্তা করা, অথবা কোন রকম লাভ লোকসানের দিকে নজর রাখা, এ সব থাকে না। কখন, কি ক'রে তাঁর কাছে পৌঁছুবে এই চিন্তাই কেবল তার মাথায় থাকে ; সে কারুর দেখাদেখি কোন কাজ করে না বা নীতি পালনের জন্যও যায় না ; সে যে না গেলে থাকতে পারে না।

দ্বিজেন গাহিল—

(১)

আর কবে দেখা দিবি মা হর মনোরমা।
ফুরায়েছে ভবের খেলা আয় গো মা এই বেলা ॥
দিন দিন তনু ক্ষীণ ক্রমে আঁখি হ'ল জ্যোতি হীন।
এখনও না এলে, পরে কি চিনিব শ্যামা ॥
খাওয়ালি পরালি মা গো, করিলি কতই যতন।
আছ মাত্র জানি তারা, হেরি নাই সে রূপ কেমন ॥
সন্তানের চোখে ঠুলি তুমি ত দিয়াছ কালী।
ভেবে ভেবে কাল বরণ, তবু দেখা দিলি না মা ॥
অজপা ফুরালে, দুটী নয়ন মুদে শোব যবে।
তখন আসিলে শিবে, বল কিবা ফল হবে ॥
এ আঁখি আর না হেরিবে, মনের দুঃখ মনে রবে মা।
এ মুখে আর 'মা' 'মা' বুলি বলিতে নারিব শ্যামা ॥
আপনারই কর্ম্মদোষে (মা) ভুগিতেছি বটে তারা।
দিবস রজনী তাই দু'নয়নে বহে ধারা ॥
বেগ হীনা নদী প্রায় পঙ্কিল হতেছে কায়।
তুই কি আসিয়া রামের অশ্রু মুছাবি না মা ॥

(২)

রণেতে নাচিতে মায়ের রাঙ্গা পায়ে বেজেছে গো।
তাই ব্যথার ব্যথী কেউ নাই দেখে হর হৃদি পেতেছে গো ॥
কি জানি কি ভাবে এলো নরা ভেবে আকুল হ'ল।
মায়ের কাঁচা সোনার বরণ ছিল ভেবে কালী হয়েছে গো ॥

(৩)

নিঠুর শ্যাম ওগো ভুলেছে আমারে সই।
(ওগো) মরণ নিকটে মম, দরশন (আমার শ্যাম দরশন) হ'ল কই ॥
(ওগো) যদি হের শ্যামেরে মম দেহান্তের পরে।
ব'ল সখি শ্যামেরে, তোদের মজেছে মরেছে রাই॥
শ্যামের যে ভালবাসা তাহাতে মিলন আশা!
দেখা হবে না হবে না পুনঃ, আমি এ দুঃখ কাহারে কই ॥

তৃতীয় ভাগ—পঞ্চবিংশ অধ্যায়

কলিকাতা; রবিবার ১১ই আষাঢ় ১৩৪০ সাল;
ইং ২৫শে জুন ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, দ্বিজেন, কৃষ্ণদত্ত, জিতেন, পুত্তু, ইঞ্জিনিয়ার, ভোলা, সুরেন বটব্যাল, অপূর্ব্ব, তারাপদ, ললিত, নগেন, কালু, শ্যাম, কৃষ্ণকিশোর, সুধাময়, পঞ্চানন, দ্বিজেন সরকার, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, প্রফুল্ল, দাশরথি, শিরিশ, গজানন, ভগবান, বটুক, শ্রীপাণ্ডা, জ্ঞান ও অভয় আছে।

গজানন। মনুষ্য জীবনে সাধনের লক্ষ্য কি?

ঠাকুর। যে বস্তু পাইবার ইচ্ছা হয় তাহা প্রাপ্তির জন্য সাধনা। মনুষ্য জীবনে সাধনার উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ করা, অর্থাৎ নিজেকে নিজে ভুলে আছ, সেই নিজেকে জানা। এ দুই প্রকারে হয়—এক হচ্ছে

পরোপকার; এ সাধারণ সংসারীদের পক্ষে। সংসারে থেকে পরোপকার করলে আত্মোন্নতি হয়। আর, আত্মজ্ঞান লাভ। কিন্তু সংসারীদের পক্ষে এই আত্মজ্ঞান লাভ করা বড় কঠিন কারণ বিনা ত্যাগে আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয় অর্থাৎ সব ছেড়ে ত্যাগ মার্গে সাধনা করা ব্যতীত আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। তাই সংসারীদের পক্ষে দান, অতিথিসেবা, সাধুসেবা, পরোপকার, সাধুসঙ্গ এই সব দিয়েছে। এ দ্বারা জন্ম জন্মান্তরীণ কর্ম্ম ক্ষয় ক'রে মনকে সহজে ত্যাগের পথে আনা যায় এবং ক্রমশঃ আত্মোন্নতি হতে থাকে। গৃহস্থের বাড়ীতে সাধু ভোজন করালে সাধু সেই গৃহস্থের কর্ম্ম গ্রহণ ক'রে বিনিময়ে তার সঞ্চিত পুণ্য দিয়ে যায়। তাই এই সব ব্যবস্থা। তবে পরোপকার দুই ভাবে করা যায়—এক হচ্ছে স্থূলে, অভাব নষ্ট ক'রে; আর হচ্ছে সূক্ষ্মে, অভাবের আসল মূল কারণ নির্ণয় ক'রে গোড়া মেরে দিয়ে। স্থূলে অভাব নষ্ট করা আবার দুই প্রকার হয়—যে জিনিষের অভাব হল সেই জিনিষ দিয়ে অথবা দৈহিক সাহায্য দ্বারা অভাব নষ্ট ক'রে। যেমন ধর, একজনের ব্যাধি হয়েছে, যে ধনী সে অর্থ ব্যয় ক'রে ডাক্তার, ঔষধ, পথ্যাদির উপায় ক'রে দিলে; আর যার অর্থ নেই সে দৈহিক সেবার দ্বারা রোগীর শুশ্রূষা প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রে দেয়। কিন্তু এই স্থূলে অভাব মোচন ক্ষণিক, একটা অভাব নষ্ট হ'ল আবার আর একটা অভাব আসবে। তাই অভাবের কারণ নির্ণয় ক'রে মূলে নষ্ট ক'রে দিলে আর অভাব হয় না। যেমন ব্যাধি কর্ম্মজনিত, সেই কর্ম্ম নষ্ট ক'রে দিলে আর ব্যাধি হবে না। এই হ'ল আসল পরোপকার কিন্তু ত্যাগী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া ত আর কেউ কর্ম্ম নষ্ট করতে পারবে না, কাজেই আত্মজ্ঞান লাভ না করলে ঠিক ঠিক পরোপকার করতে পারা যায় না।

গজানন। মুক্তি কি? নিজের সত্ত্বা লোপ হয়ে যাওয়ার নাম মুক্তি ত?

ঠাকুর। তা কি ঠিক হ'ল? যখন ঘুমোও তখন নিজের সত্তা লোপ হয়ে যায়; তা ব'লে কি শুধু ঘুমুলে মুক্তি লাভ হবে? মুক্তি তিন প্রকার—সারোপ্য, সাযোজ্য, সালোক্য, অর্থাৎ সেই রূপ ধারণ করা, সেই আনন্দ ভোগ করা ও সেই লোকে বাস এবং সেই ভাব প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু এরও কোন কোন অবস্থায় কিছু বাসনা থাকে। ঠিক পূর্ণ জ্ঞান এলে সমস্ত বাসনা নিবৃত্তি হয়ে যায়, তখন সুখ, দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। মন বাসনার দাস। সারা-জীবন খেটে খেটে এদের কাছে ছুটী নিলে অর্থাৎ সব বাসনা নিবৃত্তি হয়ে গেলে যে কি শান্তি পাওয়া যায় সেটা যে উপলব্ধি করেছে কেবল সেই জানে। এ আরাম ব'লে বোঝান যায় না, কারণ বলতে গেলেই তখন সুখ, দুঃখের ভেতর এসে পড়লে। সমস্ত দিন অফিসে হাড় ভাঙ্গা খেটে এসে সন্ধ্যার সময় একটু হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লে কত আরাম বোধ কর। আর সে আরাম যে কি, তা ব'লে বোঝান যায় না, যে পেয়েছে সেই জানে।

ডাঃ সাহেব। নির্ভরতা এলে কি এ আরাম পাওয়া যায়?

ঠাকুর। নির্ভরতা এলে ভয়শূন্য ভাব আসে, তখন চিন্তাশূন্য হয়ে যায়। একেবারে বাসনা শূন্য হয়ে গেলে নির্ভরতাও থাকে না, আর পূর্ণ নির্ভরতায় কর্ম্ম থাকে না; মন শান্ত হয়ে যায়। মন শান্ত হয়ে গেলে যোগী আত্মদর্শন করে, জ্ঞানী স্বরূপ উপলব্ধি করে, এবং ভক্ত ভগবানকে পায়। ভগবানকে পেতে গেলে কত দুঃখের মধ্য দিয়ে গতি করতে হবে। প্রথমেই দেখ, সাংসারিক হিসাবে যে গুলো বড় বড় গালাগাল সে গুলো না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। যেমন 'লক্ষ্মীছাড়া হ', 'তোর সব যাক', 'তোর সর্ব্বনাশ হোক', প্রভৃতি সংসারের বড় বড় গাল; তা সর্ব্বনাশ না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। তবেই দেখ, সংসার থেকে একেবারে উল্টো দিকে যেতে হবে। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, যশ, মান, অভিমান, দেহ-সুখ প্রভৃতি সব ছাড়তে হবে। কিন্তু তখন অপর একটাকে ভালবেসেছ

ব'লে এতটা দুঃখও সহজে সয়ে যায়। তখন যদি বলা যায় দুঃখের ভেতর থাকলে তাঁকে পাবে তা হলে দুঃখকেই সুখ ব'লে ধ'রে নিয়ে দুঃখই চায়। কুন্তী অত দুঃখ পেয়েও, কৃষ্ণ দ্বারকা যাবার সময়, কৃষ্ণের কাছে দুঃখ চেয়ে নিলে কারণ সে বললে যে এত দুঃখ পেয়েছি বটে কিন্তু কৃষ্ণ ত আমাদের ছাড়েন নি বরাবর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন; আর যেই আজ রাজ্য পাবার ও সুখের আশা হয়েছে অমনি কৃষ্ণ বিদায় নিচ্ছেন। তখন দুঃখ ভোগটাও আনন্দ হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা যে একটা নীতি পালন ক'রে এখানে রোজ আসছ এটা ভালবাসা নয়, তবে এও ভাল; এই নীতি পালন করতে করতে হয়ত একদিন ভালবাসা আসতে পারে, প্রেম লাগতে পারে, তখন আর আমায় আসতে বলতে হবে না, তুমি আপনিই আসবে কারণ তুমিই না এসে থাকতে পারবে না ও এখনকার মত যাবার জন্যেও ঘড়ির দিকে আর চাইবে না।

গজানন। বুড়ো বয়সেও কি এ প্রেম হতে পারে?

ঠাকুর। এ প্রেমের কি বয়স আছে না এর কোন বিচার আছে? সাধু সঙ্গ করতে করতে হয় ত এমন একটা ক্ষণ আসবে যে তখন প্রেম লেগে সব চট্ চট্ ক'রে ম'রে যাবে।

নগেন। সৎগুরু চিনব কি ক'রে? এই প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন 'সদ্গুরু আপন'; আমি কিন্তু অন্য ভাবে বলতে চাই। আপন ব'লে ত তখন বুঝতে পারি না, সে অবস্থা এলে হয়ত পরে বুঝব কিন্তু তিনি যে একটা অদ্বিতীয়, মহা শক্তিশালী সেটা ত বুঝতে পারছি। আমাদের ত স্বাধীন ইচ্ছা নেই যে আমরা বাসনা ত্যাগ করব; আমাদের সে ক্ষমতাই নেই। তবে সদগুরুর কাছে শুনে তখন খুব সহজেই বাসনা ত্যাগ ক'রে ফেলছি। এ ত আর কেউ কখনও বলেনি, আমি কোথাও শুনিনি। সদ্গুরুই কেবল বাসনা ত্যাগ করাতে পারেন।

ঠাকুর। হ্যাঁ, এটা তোমার নিজের অনুভূতির রাজ্য দিয়ে গেলে।

আর একটা আছে যথার্থ আপন হয়ে যায়। মনে বাসনা ওঠে কেন? তাদের আপন ক'রে নিয়েছিলে ও ভালবেসেছিলে ব'লেই তারাও ছাড়তে চায় না। যেমন প্রথমে কুকুরকে ভালবেসে কোলে করলে কিন্তু পরে কুকুর খারাপ শুনে হঠাৎ ছেড়ে দিতে চাইলে কুকুর তা শোনে না; গোড়ায় ভালবাসা পেয়েছে, কোলে উঠেছে ব'লে এখন ফেলে দিলেও শুনবে না জোর ক'রে কোলে ওঠে। যাদের এতদিন ভালবেসে এসেছ তারাই ত বাসনা রূপে আসছে। মন যখন এক বস্তুতে জোর ক'রে পড়ে তখন অপর জিনিষগুলো আসতে পারে না। তবে এই আপনত্বের স্তর আছে। যেমন বাপ মাকে আপন ব'লে ধর তাদের কথায় পাড়া পড়শী সব ছেড়ে দিতে পার কিন্তু ছেলে পরিবার ছাড়তে কষ্ট বোধ কর কারণ তাদের বাপ মার চেয়েও বেশী আপন করেছ। আবার যদি বাপ মাকে ছেলে পরিবারের চেয়ে বড় কর, তা হলে তাদের ছাড়তে কষ্ট বোধ হবে না। যাকে যত আপন করবে তার জন্যে তত স্বার্থ ত্যাগ করতে পারবে এবং খুব জোর আপনত্ব এলে অর্থাৎ মন ষোল আনা পড়লে সব ছেড়ে যাবে। তখন সে বস্তু ছাড়া অপর কিছু আর মনে ধরতে চায় না। পরে পূর্ণ আপন হয়ে গেলে সম্পূর্ণ ত্যাগ হয়ে যায়। আর সম্পূর্ণ স্বার্থ ত্যাগ না হলে প্রেম আসে না। প্রেম মানেই ত্যাগ, তখন মনে আর কোন চিন্তা ভাবনা থাকে না; কেবল ঐ এক চিন্তাই মন সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে থাকে। প্রথমে শ্রদ্ধা, অর্থাৎ তখন ভাল লাগছে বটে কিন্তু তার জন্য নিজের কোন লোকসান স্বীকার করতে পারে না; নিজের সবটা বজায় রেখে ওটা চায়। তারপর লালসা, তখন একটু জোর ভালবাসা লেগেছে এবং তার অভাবে দুঃখ বোধ করছে; জোর ক'রে, কষ্ট ক'রে সব বজায় রাখতে যায় কারণ তখনও বাসনা যায়নি ত, তবে আগের চেয়ে কিছু লোকসান স্বীকার করতে পারে। তার পর অনুরাগ, তখন আর চাওয়া চাওয়ি নেই; কে কি বলবে বা কিসে কি হবে এই লাভ লোকসানের দিকে আর নজর থাকে না। দড়ি

ছিঁড়তে চাচ্ছে। তখন এক লক্ষ্য হয়ে যায়। তার পর প্রেম, প্রেম এলে আর কোন চিন্তা নেই, স্থির হয়ে যায়। তখন 'গুরু দুরজন কহে কুবচন সে মোর চন্দন চুয়া'; কিছু মাত্র স্বার্থ বা দুঃখ, কষ্ট, মান, অভিমান বোধ থাকে না কেবল তারই চিন্তা, তাকে চায়, এমন কি দেহ পর্য্যন্ত তার জন্যে ছাড়তে পারে। তখন ভাব হচ্ছে 'তারে নয়নে হেরিয়া গো যুবতী ধরম নাহি রয়।" মানে হচ্ছে যুবতীর ধর্ম্ম কাম, ক্রোধ আদি কিছুই থাকে না; এ সব ভুল হয়ে যায়, কেবল তাকেই চায়। কারণ এ গুলো ত সব স্বার্থ; কাম মানেই নিজের স্বার্থ পোরান; সেই স্বার্থ পোরাবার জন্যই ভালবাস, আসল তাকে ভালবাস না। আবার 'তার জোড়া ভুরু যেন কামের কামান' অর্থাৎ যেমন কামান ছুঁড়লে সব দিক উড়ে যায়, তেমনি তাকে দেখলে কাম সব উড়ে যায়, সে ভাবই আসে না। এ সবই দেখ একভাব। ভক্তের ভাব হচ্ছে, চাই তোমাকে, তার জন্যে নরক হয় নরক ভাল, স্বর্গ হয় স্বর্গ ভাল। সংসারীদের ভাব কি জান? আমার স্বার্থ কিছু ক্ষতি না হয় তোমার ক্ষতি হয় হোক; নিজের স্বার্থে একটু আঘাত পড়লেই শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, এমন কি পিতা মাতাও বিরুদ্ধ হবে। অর্থাৎ নিজের গণ্ডা ষোল আনা বজায় রেখে আসতে চায়। এ ভালবাসা নয়, তবে এ দিকে আসছে সৎ হবার ইচ্ছা হচ্ছে এও ভাল। ওই করতে করতে সৎ হয়ে যেতে পারে, ভালবাসা লেগে যেতে পারে। ভোগের পথে থাকলে বেশী ক্ষণ ধর্ম্ম কথাও শুনতে পারে না কিন্তু সংসারী কথা বার্ত্তায়, বাজে গল্পে, বাজে কাজে, তাস দাবা খেলায় হয় ত সারারাত কাটিয়ে দেবে। ত্যাগ না এলে এদিকে আসতেই পারবে না হিন্দুদের সংসারে বরাবর ত্যাগ নীতি ছিল ব'লে হিন্দু স্ত্রী কেবল নিজের স্বার্থের জন্য স্বামীকে ভালবাসত না; তারা স্বামীর জন্য দিবা রাত্র আনন্দের সহিত খাটত, আর স্বামীর কাছে কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্ন ও লজ্জা নিবারণের বস্ত্র ছাড়া অপর কোন ভোগ বাসনার দিকে মন রাখত না।

জিতেন। মানুষ যে দুঃখ পায়, ধরুন ছেলে ম'রে গেল, শোক হ'ল, এ সব কি বাসনা জনিত?

ঠাকুর। হ্যাঁ, বাসনা থেকে উৎপত্তি বই কি। ছেলে বেঁচে থাক এইটা বাসনা, তাই ম'রে যাওয়া বাসনার বিরুদ্ধ ব'লে দুঃখ দেয়।

কৃষ্ণকিশোর। কালীঘাটে নাটমন্দিরে যে অনেক লোক শিব নিয়ে ব'সে পূজা করে সে কি ঠিক শিব?

ঠাকুর। সে ত শিব ব'লে পূজা করছে। শিবের শক্তি থাক বা না থাক—সে ত শক্তি আছে ব'লে পূজা করছে।

কৃষ্ণকিশোর। কিন্তু অপরে তাকে শিব ব'লে মানতে পারে, নাও মানতে পারে ত?

ঠাকুর। তোমার পিতার ফটোটা যে তোমার পিতা নয় তা ত জান, তবুও পিতার মূর্ত্তি ব'লে নমস্কার কর, শ্রদ্ধা কর, তেমনি শিবের আকৃতি যখন তখন সেই রকম শ্রদ্ধা করবে।

কৃষ্ণকিশোর। ঐ শিব ছুঁয়ে দিব্য গালতে পারা যায় কি?

ঠাকুর। যে স্বার্থ নিয়ে দিব্য গালতে যাচ্ছ সেটা যদি শিবের চেয়ে বড় ক'রে থাক ত দিব্য গালবে, আর যদি শিবকে বড় কর তা হ'লে দিব্য গালবে না।

জিতেন। সদ্‌গুরুর কাছে থাকলে তিনি অনেক দুঃখ কমিয়ে দেন ত?

ঠাকুর। সদ্‌গুরুর কাছে থাকলে ত্যাগ আসে, মনের শক্তি বাড়ে, কাজেই দুঃখ আর তত জোর লাগে না। সদ্‌গুরুতে যেমন ভালবাসা পড়ে অমনি অপর সব ছাড়তে থাকে; আর প্রেমে তখনই সব আপনি ছেড়ে যায়।

নগেন। ছোট বেলায় 'রাই কালো ভালবাসে না' এই গানটী আমার ভাল লাগত, কিন্তু এখন দশ মহাবিদ্যা গানের ভাবটীই ভাল লাগে; সে গান আর ভাল লাগে না। তেমনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের

মনের ভাব ভিন্ন, এবং ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ তাদের ভাল লাগে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পাঁচটী মোহের প্রত্যেকটী সম্বন্ধেই এই রকম, এ কথা ভাবতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

ঠাকুর। রূপ ওপরের জিনিষ; ছালটা ছাড়ালেই সব এক। মাথা খারাপ করবে কেন? ভাববে যে এই সব মোহ সেই এক জনেরই ত। এখন মোহে প'ড়ে রয়েছ, ছাড়তে পারছ না; এই মোহ আস্তে আস্তে কেটে গেলে তাঁকে বুঝতে পারবে। যেমন গাছের ডাল, এমন কি পাতা যদি বেশ ক'রে ধ'রে থাকতে পার ত মূল কাণ্ডতে পঁহুছিতে পারবে। এক ভাবের লোক আবার অপর ভাবের লোককে ঠাট্টা করে। ওসব দেখবার দরকার কি? মায়াই থাক আর মোহই থাক তোমার কাজ হচ্ছে বাসনা ত্যাগ করা।

জিতেন। রূপ রসের আকর্ষণ ভেতরের আকর্ষণ থেকেই হয় ত?

ঠাকুর। উৎপত্তি ভেতরে বটে, কিন্তু বাইরে থেকেও কাজ হয়। তুমি একটা অন্য বিষয় নিয়ে ভাবছ, মনে স্ত্রীলোকের কোনও চিন্তা করছ না, এমন সময় তোমার সামনে দিয়ে একটী যুবতী চ'লে যেতে দেখে তোমার মন আকৃষ্ট হল। এখানে তোমার ভেতরে সে বৃত্তি ছিল ব'লে বাইরে দেখা মাত্র উদ্দীপনা হ'ল, নইলে তখন হত না।

জিতেন। সেই জন্যে সংসার ত্যাগ করার কথা বলেছে?

ঠাকুর। সংসার ত্যাগ মানে আসক্তি শূন্যতা। যতক্ষণ না ভেতরের কামনা বাসনা গুলো যায়, ততক্ষণ কোথাও গেলে হবে না। তবে সংসারে আত্মীয়রা বড় উৎপাত করে, কাজের বিঘ্ন করে, তাই তাদের কাছ থেকে তফাৎ থাকলে, এই গুলোর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়, খানিকটা সুবিধা হয়। তা ছাড়া, সংসারে প্রলোভনের দ্রব্য খুব বেশী ও সহজে পাওয়া যায়, সেই জন্যে এ থেকে দূরে ও নির্জ্জনে থাকতে হয়। মন যতক্ষণ রিপুগণের অধীন, ততক্ষণই লোকালয়; আর রিপুগণ যখন মনের অধীন, তখনই বন। তবে কি

জান ? এক জন অনার্য্য ভাবে রয়েছে, আর এক জন আর্য্য ভাবে রয়েছে ; ছ'জনে যে যার সংস্কারে রয়েছে, অবাধে মেলা মেশা করলে মন চট্ ক'রে খারাপটা ধ'রে নেয় ; সেই জন্যে তফাৎ থাকতে বলেছে, তফাতে থাকলে এ ভয়টা আর থাকে না। তবে যার মন তৈরী হয়ে গেছে তার কথা আলাদা ; মাখন একবার উঠে গেলে জলেই থাক আর দুধেই থাক মিশবে না।

জিতেন। বিশ্বাস এলেই হয়ে গেল ত ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, সে হ'ল পূর্ণ বিশ্বাস। বিশ্বাস মানেই অন্ধ, যাকে জান না বা দেখনি তাকে বিশ্বাস করা। সেই হ'ল বিশ্বাস। এক জনের কাছে শুনে বিশ্বাস হ'ল, কিন্তু এ বিশ্বাস পাকা নয়, কারণ আবার অপর আর এক জনের কাছে বিরুদ্ধ শুনলে বিশ্বাস ভেঙ্গে গেল। প্রথমে শুনে বিশ্বাস করলে, এবং তার সেই বিশ্বাস যত বাড়তে লাগল, তত সেই সম্বন্ধে জ্ঞান হতে লাগল ও বিশ্বাস পাকা হতে লাগল। ঠিক বিশ্বাসে জ্ঞানের উদয় হয়, পরে বিশ্বাস পাকা হয়ে গেলে আর অবিশ্বাস আসতে পারে না।

কালু। তা হলে উপলব্ধির আগে জ্ঞান, আর জ্ঞানের আগে বিশ্বাস ?

ঠাকুর। বিশ্বাস না এলে এক পাও এগোতে পারবে না। কেউ বললে 'বাইরের গাছে একটা লাল পাখী ব'সে আছে' এই শুনে যদি দেখতে ওঠ, তা হলে বুঝতে হবে তুমি তার কথায় বিশ্বাস করেছিলে যে একটা পাখী ব'সে আছে। আর যদি অবিশ্বাস করতে ত উঠতেই না, কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতে। এক জনের কাছে ধর, ললিতের কথা শুনলে, শুনে বিশ্বাস করলে যে ললিত ব'লে একজন আছে। সেই বিশ্বাসে ললিতের বাড়ী গেলে ও ললিতের সঙ্গে আলাপ করলে এবং তার আত্মীয়, বন্ধু সকলের সঙ্গে তোমার চেনা হ'ল ; তখন ললিত সম্বন্ধে বিশ্বাসটা পাকা হয়ে গেল। এখন আবার কেউ যদি বলে 'না ও ললিত নয়,' তুমি কিন্তু আর সে কথা বিশ্বাস কর না। শুনে

বা বই প'ড়ে জানলে যে ভগবান আছেন, সে কথায় গোড়ায় বিশ্বাস কর, তার পর না হয় সাধন ভজন ক'রে পরে দেখে নিতে পার, সত্যি আছেন কি না। গোড়ায় যদি এ বিশ্বাস না কর, তবে সাধন ভজন করতে যাবে না। লোক হিসাবে হয় ত কারুর কথা বিশ্বাস কর বা না কর, কিন্তু সাধু বাক্য, ঋষি বাক্য বিশ্বাস করতে হয়, কারণ তাঁদের দূরদৃষ্টি ও অনুভূতি আছে এবং তাঁরা বাজে কথা বলেন না। ধর এক জন বললে মনুমেণ্ট আছে সে কথা যে ঠিক এ বিশ্বাস আনতে গেলে যেমন গিয়ে জিনিষটা সত্যি আছে কি না দেখা দরকার তেমনি মনুমেণ্ট নেই এ কথাও বলতে গেলে তার কথা মত সেই জায়গা দেখে না এলে ত জোর ক'রে 'নেই' এ কথাও বলতে পারবে না। তাই অবিশ্বাসের কথাও জোর ক'রে বলতে গেলে তোমায় আগে দেখে আসতে হবে ঠিক আছে কি না; কাজেই সাধু, ঋষিদের কথায় বিশ্বাস করা ছাড়া নিজে সাধন ভজন ক'রে না পাওয়া পর্য্যন্ত ভগবান নেই এ কথা বলতে পার না। **পূর্ণ ভালবাসা এলে পূর্ণ বিশ্বাস থাকে।** আবার **পূর্ণ ভালবাসায় বিশ্বাসও নেই অবিশ্বাসও নেই;** সে দুয়েরই পারে চ'লে যায়; সে শুধু তাকেই চায় আর অন্য কিছুই চায় না; বা কোন লাভ লোকসান রাখে না। কারণ লাভের ওপর বিশ্বাস আর লোকসানের ওপর অবিশ্বাস আসে। পূর্ণ ভালবাসাকে তাই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়েছে। একেই প্রেম বলে; তখন সব দিতে পারে, এমন কি দেহটাও ছাড়তে পারে।

নগেন। সাধারণ জীব কখনও দেহাত্ম, কখনও প্রাণাত্ম, কখনও বা মনাত্ম, এই তিন ভাবে থাকে। কিন্তু যাঁরা এই তিনের ওপরে উঠেছেন, তাঁরা নেমে এসে কি এই তিন ভাবে থাকেন?

ঠাকুর। হ্যাঁ, নেমে এলে এ সব থাকে। বাসনাও কিছু উদয় হয়। সেটা মনের স্বভাব, জল বুদ্বুদের মত উঠছে আবার যাচ্ছে; কিন্তু তাদের বাসনার জোর থাকে না, বাসনা তাদের বাঁধতে

পারে না। যত ক্ষণ দেহ থাকে, তত ক্ষণ সীমার মধ্যে। দেহের স্বভাব কিছু মায়া থাকবে ; সীমা মানেই মায়া।

কৃষ্ণ দত্ত আসিল—

ঠাকুর। কেষ্ট কাল কোথায় ছিলে ? সন্ধ্যার সময় কিছু সময়ের জন্য এস, তা এই একটা নীতি রাখতে পাচ্ছ না ? অথচ দোকানে ঠিক কখন থেকে কখন বসতে হয়, বিষয় কাজ কখন থেকে কখন করতে হয় এ সব নীতি ত বেশ বজায় রেখেছ ; এর বেলা ত কামাই কর না।

কেষ্ট। নীতি একেবারে ছাড়িনি ঠাকুর। যে দিন এখানে না আসতে পারলুম, সে দিন অন্ততঃ একটা দেব স্থানে সেই সময় যাব, এটা চেষ্টা করি।

ঠাকুর। এ ত 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' হ'ল। এটাকে নীতি বলে না। **যখন আমি এখানে থাকব না, তখন বটে সেই সময় দেব স্থানে যাবে বা ধ্যান, জপ করবে; কিন্তু আমি এখানে থাকলে এখানেই আসবে, অন্য কোথাও যাবার দরকার নেই।** নিজের শক্তির ওপর বিচার ক'রে চলতে পারতে ত আলাদা, কিন্তু তা ত পার না। তোমাদের বিচার করবার ক্ষমতা কই ? ঠিক বিচার করতে পারতে যদি, তা হলে আজ যেটায় দুঃখ পেলে কাল আবার তার পেছনে ছোট কি ? নিজেরা বড় জোর কাম্য পূজা করলে, তাতে হয় ত সেই অনুযায়ী কিছু ফল হ'ল, কিন্তু দুঃখ ত গেল না, শান্তি ত এল না। রোগ, শোক, তাপ, অভাব এ সংসারের ধর্ম্ম, এ সব থাকবেই। তবে সাধু সঙ্গে মায়া ক'মে যায়, কর্ম্ম ক্ষয় হয় ও মনের শক্তি বাড়ে, তাই এ গুলো আর ততটা দুঃখ দিতে পারে না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা যে সব উঠে গিয়ে চির বসন্ত থাকবে, তা ত হয় না।

গায়ে কাপড় দাও শীতের হাত থেকে বাঁচবে, তেমনি নিজের মনকে তৈরী কর সব অবস্থায় ঠিক থাকতে পারবে। তোমরা যে আমাকে ভালবাস না তা ত বলছি না, ভাল না বাসলে আস কেন? আমায় যখন ভালবাস, তোমাদের বন্ধনটা অন্তঃত কিছু ঢিলে হয় যাতে, সেটা ত আমার দেখা দরকার। তাই একটা কড়া নীতি নিয়ে জোর ক'রে এ দিকটা ঠিক বজায় রাখবে, তবে ঠিক ভালবাসা লাগবে এবং তারই জোরে কিছু ছাড়তে পারবে। এ টুকু না হ'লে ত দুঃখ গুলো সহ্য করবার মত শক্তিও থাকবে না।

নগেন। আসক্তি থেকেই ত এই দেহ, ইন্দ্রিয় সব হয়েছে? এমন কি 'দর্শন' যাকে আমি এত দিন বড় বলতুম সেও আসক্তি থেকে। তা হলে আসক্তি চ'লে গেলে ত এ সব কিছুই থাকবে না—এ ভাবলে যেন কেমন একটা ভয় আসে।

ঠাকুর। আসক্তি যদি না রইল তবে ভয় কিসের? দেহের ওপর যদি আসক্তি না থাকে তা হলে দেহ গেলে কষ্ট কি?

প্রফুল্ল। আসক্তি না থাকলে দেহ থাকে কি?

ঠাকুর। হ্যাঁ, আসক্তি না থাকলেও সমাধি অবস্থায় কিছু দিন থাকে।

নগেন। পাড়াগাঁয়ে একজন সাধু গেলেই, তা সে ভণ্ড হোক আর সত্যি সাধুই হোক, বহু লোক তার কাছে যায়, তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। এরা ত সাধু সঙ্গ করলে? আর দেখতে পাওয়া যায় শতকরা প্রায় ৮০।৯০ জন এই রকম সাধু সঙ্গ করে।

ঠাকুর। ওটা কি ঠিক সাধু সঙ্গ হ'ল? ও ত সংস্কার। সাধুকে নমস্কার করতে হয়, সাধুর কাছে গেলে মঙ্গল হয়, ও সংসার দুঃখ নষ্ট হয়ে সুখ আসে, এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে তারা সাধুর কাছে যায়। পাড়াগাঁয়ে প্রায় লোকই অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত ব'লে এই সংস্কারটা এখনও ধ'রে আছে। আজকালকার লেখাপড়া একটু বেশী শিখলেই ওটা প্রায় ক'মে আসবে। তাদের সে ব্যাকুলতা কই? ব্যাকুলতা এলে

তবে ত কাজ হয় এবং খুব ব্যাকুলতা এলে তাঁকে পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁর কৃপা আলাদা জিনিষ। তাঁর কৃপায় সব হ'তে পারে।

ভোলা। শরীর আর মনের মধ্যে খুব নিকট সম্বন্ধ আছে কি? শরীর একটু খারাপ হলে মন সঙ্গে সঙ্গে খুব খারাপ হয়, তখন আর কিছু করা যায় না।

ঠাকুর। হ্যাঁ, যত ক্ষণ দেহের ওপর মায়া রয়েছে, তত ক্ষণ দেহের সঙ্গে মনের খুব নিকট সম্বন্ধ।

ললিত। অমৃতবাণীতে আছে মঠে কোন জিনিষ রান্না হলে সেটা যদি সাধু না খান, তা হলে সেটা প্রসাদ হয় না, সেটা প্রসাদ হিসাবে খাওয়া উচিত নয়; কিন্তু কোন কারণে সাধু যদি কোন দিন কেবলমাত্র একটী তরকারী ছাড়া অপর কোন তরকারি না খান তা হলে মঠে সে সময় অন্য যে তরকারি রান্না হয় সেটা ত প্রসাদ হল না, কাজেই সে গুলো ত খাওয়া উচিত নয়?

ঠাকুর। এ দুটো কি ঠিক এক হ'ল। সাধু যখন সাধারণ ভাবে মঠে যে সব জিনিষ রান্না হয় খান, তখন যদি কোন জিনিষ রান্না ক'রে তাঁকে না দেওয়া হয় বা কোনটী তাঁকে দিতে গেলে তিনি না খান তা হলে সেটা প্রসাদ হয় না এবং প্রসাদ হিসাবে সেটা অপরের খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু যেখানে সাধু ইচ্ছা ক'রে স্বাস্থ্যের জন্যে বা অন্য কোন কারণে কোন দিন তাঁর সচরাচর খাওয়ার নীতি বদলে দেন এবং তাঁর আদেশ অনুসারে কেবল তাঁরই মত তৈরী একটী মাত্র তরকারি খান, তখন মঠে সাধারণতঃ তিনি প্রত্যহ যে সব তরকারি খান সে রকম তরকারি রান্না হলে সেটা যদিও সে দিন ঠিক তাঁর ভোগ প্রসাদ হ'ল না, তা হলেও সেই গুলোর সঙ্গে সাধুর পাতের প্রসাদী তরকারি মিশিয়ে অপরে খেতে পারে, তাতে দোষ হয় না কারণ তখন সাধু সব বন্ধ করেছেন বলেই সে গুলো খেলেন না। তা ছাড়া, যখন তিনি জানছেন ও বলেছেন 'অপরের জন্যে সাধারণ যা রান্না হয় হোক' তখন তাঁর অনুমতি ত

রয়েছেই। ধর, সাধুর যদি অসুখ হয় এবং তিনি শুধু সাবু খেয়ে থাকেন, তখন মঠে অপর সকলেও কি শুধু সাবু খাবে? তা ত হতে পারে না এমন জায়গায় তাঁর অনুমতি থাকলে প্রসাদ মিশিয়ে খাওয়া যায়। আর, মঠে সব সময় তোমরা সবাই যে সব ছেড়ে ত্যাগ নীতি নেবার জন্যে রয়েছ তা নয়; এবং তোমরা বাইরে বা বাড়ীতে যখন অন্য জিনিষ খাও সেটা ত সাধু খান না কাজেই সাধু যেটী খান কেবল সেটী ছাড়া যে কিছু খাও না তা নয়। তাই, সে হিসাবে এ রকম বিশেষ স্থলে তিনি যখন, মঠে নিজে যেটী খাচ্ছেন সেটী ছাড়া সচরাচর চলিত অন্য রান্না তরকারি অপরকে খেতে বলছেন তখন তাতে কোন দোষ হয় না। তবে হ্যাঁ, তোমাদের ভেতর কারুর যদি এমন নিষ্ঠা ভাব থাকে যে সে কোন কারণে কোন সময়েই সাধুর প্রসাদ ছাড়া আর কোথাও বা অন্য কিছুই খায় না বা সাধু যখন সাধারণ ভাবে সব জিনিষ খান তখনও একটী মাত্র প্রসাদী তরকারি ছাড়া খায় না তার কথা আলাদা; সে এ সব বিশেষ স্থলে সাধুর অনুমতি নিয়ে তিনি যেটী খেতে বলবেন সেটী খাবে।

ভোলা। প্রসাদ কি পাতে ফেলে রাখা উচিত? না যত টুকু খেতে পারবে তত টুকুই লওয়া উচিত?

ঠাকুর। দেখ, প্রসাদ বলতে ঠিক তাই বোঝা উচিত যে পাতে প্রসাদ ফেলা যাবে না। সেই জন্যে প্রসাদের নিয়ম হচ্ছে, অপরের পরিবেশন করতে নেই, যে যত টুকু খেতে পারবে সে নিজে হাতে ঠিক সেই টুকু তুলে নেবে। কিন্তু সাধারণ প্রসাদ খাওয়া কি রকম জান? প্রসাদের ভক্তিও রইল, অথচ রসনা তৃপ্তির উপযুক্ত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সব রকম খাদ্য প্রসাদ ব'লে প্রচুর (পেট ভ'রে) খাওয়া। কাজেই এ অবস্থায় প্রসাদ পাতে ফেলতে নেই এ নীতি রাখা বড় শক্ত। তা ছাড়া, প্রসাদে খাদ্যের কোন বিচার বা জাতি বিচার বা কোন রকম বিচার করতে নেই। এমন কি প্রসাদ কুকুর বেড়ালের উচ্ছিষ্ট হলেও বা চণ্ডালে ছুঁলেও বা চণ্ডালের

এঁটো হলেও খেতে কোন রকম দ্বিধা হওয়া উচিত নয়। কারণ প্রসাদ হচ্ছে তাঁর করুণা অতএব যে সেই প্রসাদ খাচ্ছে সে তখনই পবিত্র হয়ে যাচ্ছে, কাজেই আর ভেদাভেদ থাকতেই পারে না। এমন কি যদি কোন জিনিষ কেউ না খায় অথচ প্রসাদ হিসাবে সেই জিনিষ এসে পড়ে তখনও বিনা বিচারে বিনা দ্বিধায় তা খাওয়া উচিত। তবে সংসারীদের ভেতর দেশীয় সংস্কার এবং সামাজিক সংস্কার খুব প্রবল থাকে ও প্রসাদের ওপর ঠিক সে রকম ভক্তি থাকে না ব'লে এ রকম সকলের ছোঁয়া বা সকলের উচ্ছিষ্ট বা যা কখনও খায় না এমন জিনিষ ঠিক প্রসাদ হিসাবে বিনা বিচারে খেতে পারা বড় শক্ত।

ললিত। কায়স্থের বাড়ীতে বিগ্রহ থাকলে, আমি নিজে তার ভোগ দিয়ে খেতে পারি ত? আর যদি তারা ভোগ রেঁধে দেয় খেতে পারি কি?

ঠাকুর। বিগ্রহের ভোগ, প্রসাদ, এ সব জায়গায় খেতে আছে। বিগ্রহের ভোগ যখন বললে, তখন প্রসাদ হিসাবে কোন দোষ থাকে না কারণ কায়স্থ বাড়ীতে আছে ব'লে, বিগ্রহ ত কায়স্থ হয়ে গেল না; তবে তোমার সামাজিক সংস্কার রয়েছে, সেই জন্যে তুমি ভয়ে খেতে পার না। তুমি নিজে রেঁধে খেলে ত কোন দোষই হয় না, আর তারাও ভক্তি ক'রে রেঁধে ভোগ দিলে প্রসাদ হিসাবে খেতে দোষ হয় না। তা ছাড়া ভক্তি ভাবে দিলে সকলেরই খাওয়া চলে, তখন জাতি বিচার চলে না। আসল জিনিষ হচ্ছে ভাবেব ওপর, মনের সঙ্গে সম্বন্ধ। 'ভক্তি ভাবে দিলে আমি চণ্ডালেরও খাই, অভক্তের আমি ব্রাহ্মণেরও নই।' তবে এ ভাব সাধারণ সংসারীদের জন্যে নয়। যত ক্ষণ সংসারে রয়েছ তত ক্ষণ সামাজিক সংস্কার, সামাজিক নিয়ম সব মেনে চলতে হবে নইলে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় পেলে তোমাদের অনিষ্ট হবে। তা ছাড়া, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতির বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত দেব দেবীর পূজা বা ভোগের ব্যবস্থা কেবল ব্রাহ্মণ দ্বারাই হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্ন ভোগ আর কেউ দিতে পারে না।

তবে যদি কেউ নিজে বাড়ীতে কোন দেব দেবী রেখে পূজা করে এবং নিজে যা খাবে সেটা নিবেদন ক'রে খায় তা হ'লে সে তার ভাবের ওপর অন্ন ভোগ দিয়েও খেতে পারে, তাতে তার দিক দিয়ে কোন দোষ হয় না কিন্তু সেটা সাধারণতঃ ঠিক প্রসাদ বলতে যা বোঝায়, তা হ'ল না, কারণ শাস্ত্র অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত দেব দেবীর ভোগ ছাড়া আসল প্রসাদ হয় না। তবে কেউ যদি সেটাকে প্রসাদ জ্ঞানে ভক্তি ক'রে খায় তাতে তার দিক দিয়ে ঠিক হতে পারে কিন্তু সাধারণের পক্ষে নয়। প্রতিষ্ঠিত দেব দেবী ছাড়া আসল প্রসাদ না হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে ত সেই মূত্তির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল না, কাজেই তার ভেতর শক্তির আবির্ভাব কই যে প্রসাদ হবে?

ললিত। তা হলে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর বর্ণের লোককে যদি গুরু করা যায় তা হলে ব্রাহ্মণ শিষ্য তার প্রসাদ খেতে পারে কি?

ঠাকুর। দেখ, যখনই গুরু করলে তখনই তার প্রসাদ খাবে। এখানে আর কোন বিচার চলবে না। কিন্তু গুরু করবার আগে বিশেষ বিবেচনা ক'রে গুরু করা উচিত। তবে যার চিত্তশুদ্ধি হয়েছে সে যে বর্ণেরই হোক তাকে গুরু করায় দোষ হয় না; তা ভিন্ন, ব্রাহ্মণের অপর বর্ণের কাহাকেও গুরু করা বা তার প্রসাদ খাওয়া নিষিদ্ধ।

ললিত। অপরের নিষ্ঠাবান ভাল গুরু থাকলে এবং তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করলে তাঁর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খাওয়া যায় কি?

ঠাকুর। ঠিক মত ধরতে গেলে নিজের গুরু ছাড়া আর কাহারও উচ্ছিষ্ট খাওয়া উচিত নয়। বিশেষতঃ যখন ধর্ম্মের দিকে গতি করতে চাচ্ছ, যখন মনের ময়লা পরিষ্কার করতে যাচ্ছ, তখন কাহারও এমন কি অনাচারী পিতা মাতারও উচ্ছিষ্ট খেতে নেই। কারণ তোমার পিতা মাতা হয় ত সাধারণ বদ্ধ সংসারী কাজেই তোমার ভাব আর তাদের ভাব আলাদা, তুমি একটা ভাব নিয়ে এক পথে গতি করতে চাচ্ছ, আর তারা অপর ভাবে অপর দিকে যাচ্ছে; এ ক্ষেত্রে

তাদের উচ্ছিষ্ট খেলে তোমার কিছু ক্ষতি হবে। তবে সংসার ক্ষেত্রে এতটা চলে না কারণ যখন তাদের কাছে মানুষ হয়েছ, তাদের প্রসাদ খেতে পারা যায়।

ললিত। গুরু-ভাইভগিনীদের নিয়ে এক সঙ্গে এক পাতে খাওয়া বা পরস্পরের উচ্ছিষ্ট খাওয়া চলে কি? গুরুর প্রসাদ হলেও কি এ রকম খাওয়া যায়?

ঠাকুর। ধর্ম্ম পথে গতি করতে গেলে কাহারও উচ্ছিষ্ট খেতে নেই। এক গুরুর আশ্রয়ে থাকলেই যে ভাব সব এক হবে তা ত নয় কাজেই উচ্ছিষ্ট খেলে ক্ষতি হবে। অবশ্য গুরুর প্রসাদ বা দেব দেবীর প্রসাদ উচ্ছিষ্ট হয় না সে হিসাবে কোন দোষ হয় না তবে তোমরা ত সাধারণ সংসারী। তোমাদের প্রসাদের ওপর ত সে রকম ভক্তি বিশ্বাস ঠিক নেই, মুখে অনেক কথা বলতে পার। কাজেই তোমাদের কাছে এই নীতি রাখাই ভাল যে উচ্ছিষ্ট কেউ কারুর খাবে না তা সে যত বড় আপন গুরু ভাইই হোক, কারণ তোমরা সবাই গুরুকে লক্ষ্য ক'রে চলছ বটে কিন্তু সবাইকার ভাব ত সমান নয়, সবাই ত এক রকম ভাব নিয়ে চলছ না। তা ছাড়া, তোমরা যত ক্ষণ সংসারের ভেতর রয়েছ, সমাজ সংস্কারের বশে রয়েছ, তত ক্ষণ সামাজিক সংস্কার গুলো মেনে চলবে। তাই, যদিও প্রসাদে দোষ নেই তত্রাচ অন্ন প্রসাদ ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর কাহারও সকলকে পরিবেশন করা উচিত নয়।

ললিত। ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর বর্ণের লোক কি প্রণব মন্ত্র 'ওঁ' উচ্চারণ করতে পারে?

ঠাকুর। প্রণবের মন্ত্র 'ওঁ' ব্রহ্ম মন্ত্র। অ উ ম মানে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। এ ত্যাগের মন্ত্র। 'ওঁ' শব্দটী ত্যাগের। 'ওঁ তৎ সৎ' মানে হচ্ছে তিনিই কেবল সৎ, আর সব অসৎ, অনিত্য। এই ধারণা যার হয়েছে, এবং যে এই ভাবে চলবে সেই কেবল 'ওঁ' শব্দ ব্যবহার করবে, আর যাদের সে বোধ নেই, শুধু সংসারটাকে বড় ব'লে ধরতে চায় তাদের 'ওঁ' শব্দ নিয়ে দরকার কি? তাদের এ ব্যবহার করাও উচিত নয়। পূর্ব্বে

ব্রাহ্মণ মানেই সত্ত্ব গুণী, ত্যাগী। তারা সর্ব্বদাই ত্যাগের পথে থাকত এবং তারা প্রকৃতির হাত থেকে নিস্কৃতি চেয়েছিল তাই ব্রাহ্মণদের 'ওঁ' মন্ত্র দিয়েছিল এবং তারাও নিয়েছিল। আজকালই না হয় ব্রাহ্মণ বংশের ব'লে শুধু পৈতা ধারী ব্রাহ্মণ হয়েছে। 'ওঁ' শব্দ লওয়া বা না লওয়ার ত অন্য মানে নেই। ভোগীর জন্য এ শব্দের কোন দরকার নেই, তাই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ত্যাগীদেরই কেবল অধিকার দিয়েছে।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর জাতি ত আর ত্যাগের পথে যেত না, তাই তাদের বারণ করেছিল কারণ ভোগীর এই ত্যাগ মন্ত্রে কোন প্রয়োজন নেই। যে ত্যাগ চায় না সে এই ত্যাগ মন্ত্রের মহিমা ও অর্থ বুঝবে কেন; আর তাকে জোর ক'রে এই মন্ত্র দিলে সে সহ্য করতে পারবে কেন? সে তার অপব্যবহার করবে এবং দুটো একটা ত্যাগের ঘটনা ঘটলেই সে তখনই সেটা ফেলে দেবে। তাই ত্যাগী বা যে ত্যাগ করবার চেষ্টা করছে এ ভিন্ন ব্রহ্ম মন্ত্রে অধিকারী হয় না, এমন কি ব্রাহ্মণও যদি ত্যাগী না হয় এবং সে যদি ভোগ পথে থাকে সেও এ ব্রহ্ম-মন্ত্রে অধিকারী নয়। যারা ত্যাগী, যাদের ভোগের আসক্তি গেছে বা অন্তঃত যারা যথার্থ ত্যাগ করবার চেষ্টা করছে তারাই কেবল এই ব্রহ্ম মন্ত্রের অধিকারী। তা ছাড়া, অপরে এ মন্ত্র ব্যবহার করতে জানে না কাজেই তাদের নিয়ে লাভই বা কি? তাই ব্রাহ্মণও ত্যাগী না হলে তারও এ মন্ত্র লওয়া উচিত নয়। তবে পূর্ব্ব পুরুষরা সব ক'রে এসেছে (যদিও তারা সবাই ত্যাগী ছিল) ব'লে সেই সংস্কার হিসাবে নেয়, সে আলাদা কথা কিন্তু ন্যায্য মতে কেবল মাত্র ত্যাগীরই ঐ মন্ত্র লওয়া উচিত; এমন কি অপর জাতির লোকেরও ঠিক ঠিক ত্যাগের ভাব থাকলে তাকে এ মন্ত্র দেওয়া যেতে পারে। আর উচ্চারণের কথা বলছ, তা যখন বইতে ছেপে বেরিয়ে গেছে তখন আর উচ্চারণ করতে বা পড়তে বাধা দিচ্ছে কে?

কেষ্ট। তা হলে ত্যাগী হলে সবাই এই মন্ত্র নিতে পারে ত? তা সে শূদ্রই হোক আর চণ্ডালই হোক?

ঠাকুর। শূদ্রত্ব কাকে বলে? তামসিক গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই শূদ্র যে ত্যাগী তার আর শূদ্রত্ব কোথায়? চণ্ডাল ব'লে কি আলাদা কিছু আছে? মানুষ চেহারা ত সবই এক, বৃত্তি আর সংস্কার গুলোই না খারাপ। এই প্রবৃত্তি ও সংস্কার বদলে গেলে তখন আর সে চণ্ডাল রইল না। এ ত হিংসা দ্বেষের কথা নয়। যার যথার্থই ত্যাগের ইচ্ছা ভেতরে বলবৎ আছে, ধর এই ব্রহ্মমন্ত্র জপ ক'রে তার স্ত্রী, পুত্র, মারা যেতে লাগল, বিষয় সম্পত্তি সব নষ্ট হতে লাগল তাতে তার বরং মনে মনে আনন্দই হতে লাগল যে এই বন্ধনের হাত থেকে সে মুক্ত হচ্ছে,—এমন লোকের 'ওঁ' ব্রহ্মমন্ত্র জপ করতে কোন দোষ নেই, তা সে জাতিতে শূদ্রই হোক আর চণ্ডালই হোক।

কেষ্ট। ত্যাগ করতে পারি আর না পারি, এই মন্ত্র নিয়ে ত্যাগ শিখব এই রকম জেদ নিয়ে ব্যবহার করতে পারি ত?

ঠাকুর। হ্যাঁ, A, B, C, D পড়বার সময় খুব রোক নেবে যে এম্ এ পাশ করবই। সৎ হব, ত্যাগ শিখব এই রোক নিয়ে চলা খুব ভাল। কিন্তু শুধু মুখে রোক নিয়েছি বললে ত হবে না। তার লক্ষণ আছে। সংসার থেকে কত ক্ষণ দূরে থাকতে পার, কতটা সাধু সঙ্গ ভাল লাগে এই সব দেখে বোঝা যাবে ত?

দাশরথী। কিছু ত্যাগের ইচ্ছা আছে, কিছু হয় ত ছেড়েছে, এ অবস্থায় প্রণবের মন্ত্র ধ'রে কাজ করলে পূর্ণ ত্যাগ আনিয়ে দেবে ত?

ঠাকুর। 'কিছু ইচ্ছা' মানে কি জান? অনেক সময় শুনে মেনে হুজুকে হ'ল হয় ত। কিন্তু ঠিক ইচ্ছা কিনা দেখ। ত্যাগের ঠিক ইচ্ছা থাকা চাই তবে সে এই ব্রহ্ম মন্ত্র নিতে পারবে। ত্যাগ ভিন্ন ব্রহ্ম মন্ত্রে বা বেদান্তে অধিকারী হয় না। ত্যাগের অনেক জিনিষ রয়েছে ত? আগে সেই গুলো করুক না, পরে অবস্থা এলে নিতে পারে। যে যেমন অধিকারী তার সেই ভাবে চলাই ভাল। আমার কথা হচ্ছে সদ্‌গুরু যা মন্ত্র দেন, তা অবস্থা

এবং প্রকৃতি বুঝে, কাজেই সেইটা ঠিক ঠিক পালন করতে পারলেই অবস্থা লাভ হয়। আর 'একটু ছেড়েছে' শব্দের অর্থ কি ? কোম্পানীর কাগজ গুলো আর নিজে না রেখে ব্যাঙ্কে ব্যবস্থা ক'রে দিলে বা বিষয় সম্পত্তি সব ছেলেদের বোঝাপড়া ক'রে দিয়ে নিজের মাসহারার ব্যবস্থা ক'রে কাশী বাস করলেই যে ত্যাগ করা হ'ল তা ত নয়। আসল ত্যাগ হচ্ছে আসক্তি শূন্যতা—সব ম'রে যাক, বিষয় সম্পত্তি সব চ'লে যাক, তবু স্থির থাকতে হবে। নইলে সাময়িক একটা বিরক্তি এল তাতে কি হবে ? দাঁত নেই, বাধ্য হয়ে শক্ত জিনিষ খাওয়া ছেড়েছ, এতে কিছু হয় না। এক, যদি কোন বিষয়ই জোর ক'রে ধর না, সঙ্গে সঙ্গে এটাকেও ধর না তা হলে বুঝতুম—কিন্তু তা ত নয়। অপর সকল জিনিষ প্রয়োজন হিসাবে এক সময় না এক সময় জোর ক'রে ধরছ কাজেই শুধু বাধ্য হয়ে একটা ছাড়লে সেটাকে ত্যাগ বলে না। আসল কথা হচ্ছে ত্যাগের প্রয়োজন বোধ কর না ; প্রয়োজন বোধ করলে ত্যাগকে জোর ক'রে ধরতে। তবে কতক জিনিষ মনকে বলের দ্বারা আকর্ষণ করে, 'বলাদিব নিয়োজিত'। অর্জ্জুন বলছেন জানা সত্ত্বেও কোন পুরুষ আমাকে বলে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে, আমি পারছি না। তখন কৃষ্ণ বলছেন যে এ সব কাম, ক্রোধ, লোভের কার্য্য, এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাও ত, আমার শরণাগত হও। তা শরণাগত হওয়াও বড় কঠিন, কেন না যশ, মান, দেহসুখ, অর্থ, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদিতে মন সর্ব্বদাই কেড়ে নিচ্ছে, মুখে বলছি বটে শরণাগত কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কার্য্যে এদেরই শরণাগত হয়ে আছি। তাই দিয়েছে সাধু সঙ্গ। সাধু সঙ্গ মানে তাঁরই সঙ্গ করা। ভোগী মন কখনও ভগবান পেতে পারে না, তাই সাধু সঙ্গ দ্বারা মনকে তৈরী করতে বলেছে। মন একবার তৈরী হয়ে এলে সহজে কাজ হয়। যেমন গরুকে ধরা বড় কঠিন কিন্তু বাছুরকে ধ'রে টানলে গরু আপনি আসে। তোমাদের বিচার করা আর না করা, ধর্ম্ম পুস্তক পড়া আর না পড়া সব সমান,

কারণ বই বন্ধ করলেই পূর্ব্ববৎ অবস্থা। তবে অপর বাজে চিন্তায় সময় নষ্ট করার চেয়ে ধর্ম্মপুস্তক পড়া অবশ্য ঢের ভাল। তাই দিয়েছে সাধু সঙ্গই প্রধান; অভাবে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ। কিন্তু যত ক্ষণ না মনে সৎ হবার জোর ইচ্ছা আসছে তত ক্ষণ এটাও নিয়ম ক'রে কিছু করতে পারবে না। শুধু শাস্ত্র প'ড়ে কিছু হয় না; অন্তঃত যত ক্ষণ না একটা উপদেশ ঠিক মত মেনে চলবার শক্তি হচ্ছে তত ক্ষণ তোমার অবস্থা আর যে শাস্ত্র পড়েনি তার অবস্থা এক।

জ্ঞান। ধরুন ক্রোধ উঠল, তখন ক্রোধকে জোর ক'রে চেপে রাখলে ক্রোধ ক'মে আসবে ত ?

ঠাকুর। ক্রোধ দমন করবার কিছু শক্তি হতে পারে কিন্তু ক্রোধ কমবে না। ক্রোধের উৎপত্তি কোথায়? বাসনা দুষ্পূরণে ক্রোধ; ভেতরের কামনা, বাসনা না কমাতে পারলে কি হবে? ঝড়ে গাছ কাঁপাচ্ছে, সেই ঝড় কমাও, তবে ত গাছ কাঁপা থামবে: ঝড় না কমিয়ে গাছকে থামাতে পারবে না। সেই জন্য সঙ্গ সব চেয়ে বড়। বই পড়ার চেয়ে সাধুর মুখে শুনলে তার ঢের বেশী শক্তি থাকে। যত ক্ষণ আমি তুমি ভাব, তত ক্ষণ আসক্তি আছে, তবে ভাল আর মন্দ। সেই আসক্তির প্রভাবে তোমাকে নাচাচ্ছে। ভগবানে আসক্তি ভাল, তাতে ভেতরের কামনা, বাসনা কমিয়ে আনে। ভগবানে বিশ্বাস থাকলেও ভেতরের কামনা, বাসনা ক'মে আসবে কিন্তু ভগবানে ঠিক বিশ্বাস থাকা চাই। ভগবানের ওপর ত সে বিশ্বাস রাখতে চাও না। ছেলের অসুখ, আগেই ডাক্তার ডাকলে, ডাক্তার সারাতে পারছে না দেখে তখন ভগবানকে ডাকলে; ছেলে ম'রে গেল, অমনি ভগবানের ওপর অবিশ্বাস এল, ভগবানকে ছাড়লে। ডাক্তারও ত সারাতে পারে নি কিন্তু ডাক্তারের ওপর অবিশ্বাস এল না, ডাক্তারকে ছাড়লে না, আবার আর একটা ছেলের অসুখ হলে সেই ডাক্তারকেই ডাকছ।

জিতেন। আসক্তি ত কর্ম্ম থেকে? আমরা ইচ্ছা করলে কমাতে পারি কি?

ঠাকুর। যদি ভগবান সর্ব্বময় হন, তখন আসক্তি কি তিনি ছাড়া? তাঁরই আসক্তি, আবার এই আসক্তি কমাবার যে শক্তি সেও ত তাঁর। তাঁকে ধর আসক্তি আপনি ক'মে আসবে, কারণ দেখছ ত, তুমি চেষ্টা ক'রে আসক্তি কমাতে পারছ না। তবে কর্ম্ম থেকে আসক্তি এও আছে। কর্ম্ম ক্ষয় হ'লে আসক্তি চ'লে যাবে। এ ভাবও আছে। হয় বীর হও নয় ত বীরের শরণাগত হও। তবে বীর হওয়া বড় শক্ত। বীরের শরণাগত হওয়াই সব চেয়ে ভাল।

পুত্তু। তাহলে তিনিই এই আসক্তিতে ফেলেছেন, তবে আমাদের আর দোষ কি?

ঠাকুর। বেশ ত, তুমি যদি জান যে মা তোমায় নাচাচ্ছে, তাহলে আর ভাবছ কেন? কিন্তু তা ত ঠিক বুঝতে পার না। কেউ নাচাচ্ছে বটে, কিন্তু কে যে নাচাচ্ছে তা বোঝ না ব'লে কাঁদ, আঁতকে ওঠ, ও ভয় পাও। বোঝ আর নাই বোঝ, নাচানর ফলটা ঠিক পাচ্ছ, তাই ছট্‌ফট্‌ করছ।

পুত্তু। দুঃখ ব'লে কোন জিনিষ যদি না থাকত, তা হলে এত হাঙ্গামা করতে হত না।

ঠাকুর। দুঃখ না থাকলে বিরুদ্ধটার খোঁজ করতে কি? অন্ধকার না থাকলে আলোর খোঁজ কর কি? তা ছাড়া দুটো দুটো নিয়েই সৃষ্টি—ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, পুরুষ প্রকৃতি। মাটী হলেই জল চাই, শুধু মাটীতে গড়ন হয় না।

পুত্তু। কলির পর একেবারে সত্য আসবে না আগে দ্বাপর, তার পর ত্রেতা, তার পর সত্য আসবে?

ঠাকুর। অত্যন্ত দুঃখের পরই সুখ আসবে। কলির পর সত্য আসবে। চক্রেও তাই হয়—সত্য ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, তার পর আবার সত্য ইত্যাদি। এই রকম পর পর চক্রবৎ ঘুরে আসে।

পুত্ত্ু। কলিতে মন নিম্নতম স্তরে, তা থেকে একেবারে সত্ত্বে উচ্চতম স্তরে উঠবে কি ক'রে?

ঠাকুর। মনের উত্থানের অবস্থা গুলো কলির ভেতর হয়ে যায়। যেমন যুদ্ধের পরই শান্তি। যুদ্ধের ভেতরই মিটমাটের কথা হয় যখন, তখন যুদ্ধ স্থগিত থাকে বটে কিন্তু স্টোও যুদ্ধের ভেতরই বলা হয়।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন—

ঠাকুর। সঙ্গই প্রধান। যেমন সঙ্গ করবে তেমনি সব বৃত্তি উঠবে। সাত্ত্বিক কামনা—জ্ঞান প্রকাশক; সংসার অনিত্য, দুঃখময় জেনে তা থেকে মুক্তির বা আত্মোন্নতির কামনা করে; তখন ভগবানের প্রয়োজন বোধ করে। রাজসিক কামনা—সাংসারিক বাসনা; নিজের এবং সংসারের সুখ ইত্যাদি চায়। তামসিক কামনা—অপরের অনিষ্টকারী কামনা, হয় ত তাতে নিজেরও কোন মঙ্গল নেই; এটা হিংসা জনিত। সেই জন্যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর বর্ণের সাধনা করবার অধিকার ছিল না। শম্বুক শূদ্র, দেবতাদের ওপর হিংসা পরবশ হ'য়ে তাদের ধ্বংস করবার জন্য তপস্যা করছিল। তাই রামচন্দ্র তাকে বধ করলেন।

তবে বিশ্বাস আলাদা জিনিষ, সে স্থির বিশ্বাস যার আছে তার আর কিছু দরকার নেই। এইখানে ঠাকুর রাবণের কথা বললেন (অমৃতবাণী প্রথম ভাগ ১৪৬ পৃষ্ঠা)। তোমরা ত ভগবানকে ডাকছ, গঙ্গাস্নান করছ, দেবস্থানে যাচ্ছ তবু আবার 'পাপ, পাপ' করছ। এতে যে পাপ খণ্ডন হয় সে বিশ্বাস কই? স্থির বিশ্বাস থাকলে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এইখানে ঠাকুর 'হর পার্ব্বতী ও মাতালের গঙ্গাস্নানের' গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ২য় ভাগ ৬১ পৃষ্ঠা)। কার্য্যে পড়লে দেখা যায় বিশ্বাসের ঠিক অবস্থা কি? এইখানে ঠাকুর 'দিনান্তে দুই বার মাত্র ভগবানের নাম করা ভক্ত ও নারদের গল্প' বলিলেন। (অমৃতবাণী ১ম ভাগ ৩৯৪ পৃষ্ঠা)।

তাই ব'লে এই গল্প সাধারণের অনুসরণের জন্য নয় কারণ তারা কেবল দিনে দুই বার ভগবানের নাম করবে আর বাকী সকল সময় সংসারে মজে থাকবে। যার স্থির বিশ্বাস এসেছে 'এক নামে মুক্তি পায় নরে' কেবল তারই পক্ষে এক বার নাম করা চলে অন্যের সাধনা করতে হবে। তাই দিয়েছে সৎ সঙ্গে অন্তঃত কিছু সময়ের জন্য মনকে অপর জিনিষ থেকে তফাৎ রাখবে। সঙ্গ করতে করতে আপন হয়ে আসে, তখন সেই আপনত্বে টেনে নিয়ে যায়। ঠিক আপন হয়ে গেলে তবে গতি করা যায়। সাত্ত্বিক ভাবে প্রেমে বা ভালবেসে গতি করে; রাজসিক ভাবে লোভে গতি করে; আর তামসিক ভাবে ভয়ে গতি করে। সদ্‌গুরু যার যেমন দরকার তাকে সেই ভাবে আপন ক'রে নিয়ে গতি করান। তখন যে ভয়ে গতি করে, এই আপনত্বে তার সে ভয়ও ক'মে গিয়ে ভালবাসা আসে এবং তখন সে অতি সহজে গতি করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর গাহিলেন—

আমায় লও লও তুলে ও পদ কমলে, দীন ব'লে পায়ে ঠেলো না।
আমি অতি দীন ভকতি বিহীন, তোমার সাধন ভজন জানি না॥
(আমি সংসার মায়ায় বদ্ধ আছি তোমার সাধন ভজন জানি না)
আন আলাপনে বিষয় পরশনে আমার মনের ময়লা গেল না।
আমি কত নাম শুনি (সাধু গুরু বৈষ্ণবের মুখে কত নাম শুনি)
কত গুণ শুনি, (তবু) অনুরাগ প্রাণে এলো না॥
(আমার কিছু হ'ল না;
এমন পরশ মণির পরশনে আমার কিছুই হ'ল না;
আমি যেমন ছিলাম তেমনি রইলাম, আমার কিছু হ'ল না;
আমার কঠিন হিয়া গলিল না; আমার পাষাণ হৃদয় গলিল না;
তোমার পাষাণ গলান নামে এ পাষাণ হৃদয় গলিল না;
বুঝি হিয়া পাষাণ হতেও অতি পাষাণ, তাইতে হিয়া গলিল না;
সে যে পাষাণ হলে গ'লে যেত, হিয়া পাষাণ হতেও অতি পাষাণ
তাইতে হিয়া গলিল না)।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিতেন্দ্রনাথ

অসার জগতে আমার (আপন) বলিতে তুমি ছাড়া আর কেহ মোর নাই।
তুমি যে আমার বড় আপনার তাই সকল সঁপেছি তায় হে।
(আর কেহ নাই ; আমার বলতে আর কেহ নাই ;
এই অসার সংসার মধ্যে আমার বলতে আর কেহ নাই ;
তুমি আমার বড় আপন, তুমি বিনা আর কেহ নাই ;
এ অসার জগত মাঝে তুমি ছাড়া আর কেহ নাই।)
তুমি পতিত পাবন, দীন শরণ, দেখো দেখো যেন ভুলোনা (পায়ে ঠেলো না) ॥
(আমি ঐ চরণে শরণ নিলাম ;
তুমি আমার আপন জেনে ঐ চরণে শরণ নিলাম ;
আমার যা কিছু সব তোমায় দিলাম, ঐ চরণে শরণ নিলাম ;
তোমা ছাড়া হব না আর ;
জীবনে মরণে তোমার, তোমা ছাড়া হব না আর ;
এবার আমি তোমার হ'লাম ;
তুমি আমার বড় আপন জেনে এবার আমি তোমার হ'লাম ;
জয় গুরু গোবিন্দ ব'লে এবার আমি তোমার হ'লাম।)
[আমায় লও লও তুলে ও পদ কমলে, দীন ব'লে পায়ে ঠেলো না
আমি অতি দীন ভকতি বিহীন, তোমার সাধন ভজন জানি না]
(নাই বা জানলাম সাধন তোমার ;
যে জন করে তোমার চরণ সার সে নাইবা জানল সাধন তোমার ;
কি কাজ আছে সাধন ক'রে ;
যে জন আছে তোমার চরণ ধ'রে, কি কাজ তার সাধন ক'রে ;
প্রভু (ওহে) তুমি আমার আমি তোমার
আমি নাই বা জানলাম সাধন তোমার।)

তৃতীয় ভাগ—ষড়বিংশ অধ্যায়

কলিকাতা ; সোমবার ১২ই আষাঢ় ১৩৪০ সাল,
ইং ২৬শে জুন ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, ললিত, নগেন, জ্ঞান, জিতেন, কৃষ্ণকিশোর, দ্বিজেন, শ্যাম, তারাপদ, অপূর্ব্ব, ভগবান, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, পুত্তু, কালু, দ্বিজেন সরকার, মতি, হর প্রসন্ন, কালী মোহন, প্রফুল্ল, ভোলা, ধনকৃষ্ণ, মনোরঞ্জন, অজয় দাশরথী, কৃষ্ণ দত্ত, ও অভয় আছে।

নগেন। বাসনা থেকে আশা, আশা থেকে ভক্তি আসে। ভগবান আছেন এই আশায় ভক্তি করে। যারা ভক্ত তারাই ভাল, কিন্তু যারা ভগবান আছেন এ কথা মানে না তাদের ত বড় মুস্কিল।

ঠাকুর। যা হোক একটা কিছু মান ত? দুঃখ পাচ্ছ এবং সেই দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি চাচ্ছ। তা ভগবানকে ডেকেই হোক, আর দুঃখকে জয় ক'রেই হোক, যেন তেন প্রকারে দুঃখের কতটা নিবৃত্তি করতে পারলে এই ত কথা? বাসনা নিবৃত্তি ক'রে দিলেই দুঃখ যায়, বাসনা পূর্ণ ক'রে দুঃখ যায় না; একটা পূর্ণ হলেই আবার একটা আসে। তোমার বাড়ীর বাসনা উঠল, তুমি একটা বাড়ী তৈরী করলে, কিন্তু সেটা তোমার মনোমত হ'ল না। তোমার অর্থের অভাবে এই রকম করতে হ'ল কিন্তু বাসনা আছে আরও ভাল আরও বড় কর। জ্ঞান অনুযায়ী প্রয়োজন হয়, আর প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাকুলতা আসে। ব্যাকুলতাই প্রয়োজন ঘোষণা করে। সংসারে এত দুঃখ পেয়েও ছাড় না কেন, বরং আরও ভাল ক'রে করতে যাও কেন? কারণ সংসারের প্রয়োজনটা বেশী বোধ কর এবং তাই

তার জন্য এত ব্যাকুলতা। প্রথমে সংসার, তারপর ভগবানের প্রয়োজন বোঝ ব'লে ভগবানের জন্যে তত ব্যাকুল হও না। সংসারে যে যার কর্ম্ম নিয়ে এসেছ। সংসারের নিয়ম—সুখ দুঃখ থাকবেই। এখানে বুদ্ধিমান বোকা দুয়েরই এক অবস্থা, তবে তার মধ্যে সেই কিছু বুদ্ধিমান যে বুঝেছে 'এতদিন কি করেছি, শুধু অনর্থক খেটেছি, কিন্তু মুনফা কই ?' তখন সে দেখে বাসনা তাকে ধ'রে রেখেছে ও দুঃখ দিচ্ছে। এই বাসনা নিবৃত্তি হলেই সুখ। সংসারী মুখে অনেক বড় বড় জ্ঞানের কথা বলে কিন্তু আসলে কিছু নয়। বেদান্তের ভাব ত্যাগ ; এ দিকে বেদান্ত পড়াচ্ছে আবার নিজে ভোগ বাসনা নিয়ে সংসার করছে—এ ত একেবারেই উল্টা হ'ল। তাই বলেছে 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ।' অর্থাৎ নিজের ধর্ম্মে চলতে বলেছে ; কারণ পরের দেখে নকল করতে গেলে আছাড় খেতে হবে। যখন বালক, তখন বালকের ধর্ম্মে থাক, লাফিয়ে যৌবধর্ম্ম ধরতে যেও না ; তাতে বালকত্ব ত নষ্ট করলে অথচ যৌবধর্ম্মও নিতে পারলে না, কারণ সে শক্তি নেই।

বেদ, বেদান্ত ঋষিদের ধর্ম্ম। তোমরা ভোগ সুখের জন্য ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছ, তোমরা ও সব পারবে কেন ? তোমরা সংসারে এত লোহা পেটা খেয়েও সংসারকে ধ'রে রয়েছ, মায়ায় বদ্ধ হয়ে নানা জিনিষকে ভাল বেসেছ, হঠাৎ ত্যাগের কথা ভাল লাগবে কেন ? ত্যাগের নীতি নিয়ে দাঁড়াতে পারবে কেন ? তাই তোমাদের জন্যে সাধু সঙ্গ, সদ্‌গুরু সঙ্গ। অপর জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে সৎ এও কিছু ভাল বাসতে শেখ। সৎগুরু তোমার অবস্থা মত ঠিক চালিয়ে নেন ; তোমার কাজ হচ্ছে শুধু তাঁতে মন দেওয়া, তাঁকে ভালবাসা। **গুরুতে ভালবাসা পড়লে খুব সহজে গড়ন হয়,** কারণ যাকে ভালবাস, মনে সেইটা প্রিয় ব'লে ধর ; তখন মন তাকে জোর ক'রে ধরতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে অপর জিনিষ গুলো মন থেকে আপনা আপনি ক'মে আসে। ভালবাসা

মানেই ত্যাগ; আর সাধনা মানে হচ্ছে জোর ক'রে ত্যাগ করা, তাই এতে খুব কষ্ট সহ্য করতে হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন 'সাধক অব্যক্ত ব্রহ্মে বহু ক্লেশে পায়, বহু কষ্টে সেই নিষ্ঠা লাভ করা যায়।' কিন্তু ভালবাসা পড়লে আপনি সব ছেড়ে যায়, কিছু কষ্ট বোধ হয় না; কারণ মন কখনও দুটো এক সঙ্গে ধরে না।

ভগবানকে ভালবাসা তোমাদের পক্ষে কঠিন, কেননা যাকে কখনও দেখনি বা যার সঙ্গে আলাপ নেই তার ওপর মন রাখা সহজ নয়। তাই গুরুকে ভালবাসতে বলেছে; গুরুকে সামনে দেখছ, তাঁর সঙ্গে কথা কইছ, ব্যবহার করছ, কাজেই তাঁর ওপর ভালবাসা সহজে আসতে পারে। আর **গুরুকে ভালবাসলে তাঁকেই ভালবাসা হ'ল।** যার ওপর ভালবাসা পড়ে, স্বতঃই তার গুণ আপনিই আসে। সাধুকে ভালবাসলে আপনিই সাধুর স্বভাব অর্থাৎ ত্যাগ আসে। তাই সংসারীদের পক্ষে একমাত্র সাধু সঙ্গই প্রধান এবং তাতেই কাজ হবে। বিবেক বৈরাগ্য না এলে ত সাধনা করবারই অধিকারী হয় না। সংসারীরা মায়ায় বদ্ধ, তাদের ২৪ ঘণ্টা সংসারের লাভ লোকসানের চিন্তা, তারা কখনও সাধনা ক'রে এগোতে পারে না।

দেখ, আজ সকালে গোপেন এসে সে দিন বাগবাজারে কালী মন্দিরে প্রণাম করতে করতে যে ছেলেটী বাস (Bus) চাপা প'ড়ে মারা গেল, সেই প্রসঙ্গ তুলেছিল। তার ভাব এই যে, ছেলেটী যখন মাকে প্রণাম করছে তখন তার এ ভাবে মৃত্যু হওয়া উচিত হয় নি। এই ঘটনায় সকলের প্রাণেই আঘাত লেগেছে, গোপেন সরল, তাই তারও প্রাণে লেগেছে ব'লে বলতে এসেছিল।

প্রথমে দেখ, ছেলেটী মাকে কি ভাবে প্রণাম করছিল? হিন্দুদের সাধারণ সংস্কার আছে দেব দেবীকে দেখলেই প্রণাম করতে হয়। প্রায় অধিকাংশ লোকই এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে, বা সংসারের দুঃখে পীড়িত হয়ে, তাঁকে প্রণাম করলে হয়ত কিছু শান্তি আসতে পারে, এই ভাব নিয়ে প্রণাম করে। যথার্থ ভক্তিভাবে প্রণাম করা

অতি বিরল। ছেলেটির বাসে (Bus) চাপা পড়া কর্ম্ম রয়েছে, সে কর্ম্ম ক্ষয় হবে কি ক'রে? তার জন্যে সে কি করেছে? এ জগতে প্রারব্ধ ভোগ হবেই। পাণ্ডবেরা রাজপুত্র, এক এক জন মহাবীর, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাদের সহায়, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে তবু তাদের পাঁচ পাঁচটী ছেলে গুপ্ত হত্যায় প্রাণ হারালে ও তাঁদের বিরাট গৃহে দাস দাসী হতে হ'ল। লালাবাবু এক কথায় সব ছেড়ে গিয়ে বৃন্দাবনে কত সাধনা করলে, কিন্তু তার মৃত্যু হল ঘোড়া থেকে প'ড়ে গিয়ে। জীবনে সে কত ঘোড়া চেপেছে, কত ভোগ করেছে, আবার সেই সব ভোগ অনিত্য ব'লে নিজেই ত্যাগ ক'রে চলে এল কিন্তু দেখ এমনি প্রারব্ধ, সে অবস্থায় এত সাধনা করার পরও তার ঘোড়ায় চড়বার সাধ হল, আর তাতেই মৃত্যু।

এরা সাধু প্রকৃতি সর্ব্বদাই তাঁর চিন্তায় রয়েছে, সৎ স্থানে বাস করছে, এদেরই যখন এমন হতে পারে, তা এই ছেলেটী এক মূহুর্ত্তের জন্য সংস্কার বশতঃ প্রণাম করতে এসেছে ব'লে তার প্রারব্ধ উল্টে যাবে? সে ত্যাগী নয়, হয় ত দশটা কামনা বাসনা নিয়ে প্রণাম করতে এসেছে, এর পূর্ব্বে হয় ত কত অসৎ স্থানে, অসৎ সঙ্গে কাটিয়ে এসেছে, আবার পরেও হয় ত তাই করত। তবে হ্যাঁ, রাস্তায় অপর জায়গায় চাপা প'ড়ে মরার চেয়ে মার মন্দিরের সামনে চাপা পড়ায় কিছু সদ্গতি হবে। দেবস্থান, সাধুস্থান, তীর্থস্থান প্রভৃতি সৎ স্থানে সৎ এর কাছে মৃত্যু হলে অপমৃত্যু হয় না। 'আমি মাকে প্রণাম করছি যখন, তখন আমি পাপ মুক্ত' এ বিশ্বাস কার আছে? ক'টী লোক ঠিক এই বিশ্বাস নিয়ে দেব দেবীর মন্দিরে যায় ও প্রণাম করে? নিজের মনেই ভেবে দেখ না, যদি ঠিক বিশ্বাস করতে ত এত নাম জপ ইত্যাদি করতে না। তোমরা ভাব, কি জানি বাবা, কি হয়, তার চেয়ে ডেকে যাই ক্ষতি ত হবে না। সকলের ভাব ত সমান নয়,—মনে অনেক শক্তি না এলে এ বিশ্বাস আসে না। মন বড় পাজী জিনিষ। গোপেন তখন বললে যে

এমন লোক আছে যে এ রকম বিশ্বাস নিয়ে প্রণাম করে। আমি তখন তাকে বললুম আচ্ছা বেশী দরকার নেই, সে রকম লোক তুমি একটী আমার কাছে নিয়ে এস। [গোপেন আনব বলে গেল বটে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এমন লোক কাউকে আনে নি।]

দেখ, দুই ভাবে মানুষ সাধারণতঃ তাঁর কাছে আসে। এক কাঙ্গালী ভাবে, অর্থাৎ দুঃখ, কষ্ট ও অভাবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ভিখারীর মত কৃপা প্রার্থী হয়ে। তাই সে প্রণাম করে ও পূজা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চায়। যেমন বাবুর কাছে ভিক্ষা নিতে গেলে বাবুকে খোসামোদ ক'রে সন্তুষ্ট করতে হয়। আর আসে সন্তান ভাবে। সে কৃপা ভিক্ষা করে না। ছেলে কি বাপ মার কাছে কৃপা বা দয়া চায়? সে স্থির জানে বাপ মায়ের সম্পত্তির অধিকারী সেই। তাই সে বাপ মার কাছে জোর করে, ও নির্ভীক হয়ে থাকে। এ ছাড়া, আর এক ভাবে আসে, প্রেমে। সে শুধু তাঁকেই চায়, তাঁর ঐশ্বর্য্য থাক আর নাই থাক, সে দিকে তার লক্ষ্য থাকে না, কারণ সে ত তাঁর কোন ঐশ্বর্য্যের ওপর আশা রাখেনি সে কেবল তাঁকেই চায়। বেশীর ভাগ লোক কাঙ্গালীর ভাবেই যায়; সন্তান ভাব খুব কম। আর নিষ্কাম না হলে প্রেমে যাওয়া যায় না। তিনি সকল সময়েই সকলকে ভালবাসেন—**তুমি ভালবাস আর নাই বাস, তিনি তোমাকে ভালবাসবেনই, তাঁর মতন এত আপন আর ত্রিজগতে কেউ নেই।**

দুঃখে কষ্টে প'ড়ে মানুষ তাঁকে কত দোষ দিচ্ছে, এমন কি গালাগালও দিচ্ছে, কারণ মানুষের স্বভাবই হচ্ছে, আনন্দ পেলে দুটো (thank you) ধন্যবাদ দিলে আর কষ্টে পড়লে দুটো গালাগাল দিলে। তাতে কি তিনি কিছু মনে করেন, না রাগ করেন? তা হ'লে আর তাঁর বড়ত্ব কোথায়? তিনি যদি রাগ করতেন তা হলে আমাদের কি অবস্থা হ'ত একবার ভাব দেখি? তা ছাড়া

তিনি যদি রাগ করেন বা কিছু মনে করেন, তিনিই ঠকবেন, কারণ তিনি যখন সব তৈরী করেছেন, তখন গালাগালটাও ত তাঁরই তৈরী। যেমন কালীয় দমনের সময় কৃষ্ণ যখন বললেন 'তুমি এত গুলো রাখাল বালক ধ্বংস করেছ, আমি তোমায় বধ করব'; তখন কালীয় বললে 'আমি কি করব ?, আমার কি অপরাধ ? তুমিই ত আমাকে বিষ দিয়েছ, আমি তাই দিয়িছি। আমার যা আছে আমি তাই ত দোব। তুমি যদি অমৃত দিতে ত তাই দিতাম।'

কেষ্ট। এটা বুঝি, যে সংসারের চেয়ে সৎ স্থানে বেশী তেজ আছে। কাজেই সৎ স্থানে একবার এলেই অনেক কাজ হবে না কি ? সংসারে যে এখনও বেশী সময় থাকি, এটা সংস্কার।

ঠাকুর। বেশ কথা। তুমি ত বলছ সৎ স্থানে একবার এলেই কাজ হবে না কি ? আচ্ছা, আমি যদি বলি সংসারে একবার অল্প সময়ের জন্য মন দিলে চলে না কি ? তা ছাড়া তুমি নিজেই বলছ সংসারে শক্তি নেই, যেখানে শক্তি নেই সেখানে বেশী সময় থাকবার দরকারই বা কি ? সংস্কার কত ক্ষণ ? যতক্ষণ জানছ যে তাতে শক্তি আছে। এটা তুমি শুধু ভাষা বললে। যদি সাধু স্থানের জোর বেশী বুঝতে তা হ'লে এখানেই বেশী ক্ষণ থাকতে। সাধু সঙ্গ মিষ্টি লাগলে কি তার জন্যে এত টানাটানি করতে হ'ত ? আবার মনের এত শক্তি যে যেটাকে জোর ক'রে ধরবে, সেটা হতেই হবে। কোন মূর্ত্তিতে ষোল আনা মন দিলে তার আত্মাকে আকর্ষণ ক'রে সেই মূর্ত্তিতে নিয়ে আসা যায়। এরই নাম প্রাণ প্রতিষ্ঠা। ষোল আনা মন দেওয়া মানে ত্যাগী হওয়া। **ত্যাগ ছাড়া কিছু হবে না।**

কেষ্ট। সংসারটা ছোট বেলা থেকে অভ্যাস হয়ে রয়েছে, তাই ছাড়তে পারি না। তা হলে কি আমাদের আশা নেই ?

ঠাকুর। আশা নেই কেন ? পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই

ক্রমান্বয়ে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে মনুষ্য জন্ম পায়। আবার মানুষ ক্রমান্বয়ে কয়েক জন্ম কর্ম্ম ভোগ ক'রে অবশেষে মুক্তি লাভ করে। তোমরা ছোট বেলার কোন্ অভ্যাসটা বরাবর রেখেছ যে এখন সংসার না ছাড়তে পারার কারণ দেখাচ্ছ, 'ছোট বেলার অভ্যাস' ? যদি ছোট বেলার সব অভ্যাস গুলি ঠিক রাখতে পারতে, তা হলে এত দুঃখ পেতে না। ছোট বেলায় কোন বাসনা ছিল কি ? শুধু দুধ খেয়েই কাটাতে ; এত রকম রসনা তৃপ্তির জিনিষ খুঁজতে কি ? ছোট বেলায় উলঙ্গ হয়ে মার কোলে শুয়ে থাকতে, কাপড়ের প্রয়োজন ছিল কি ? আর, এখন মনে ক'রে দেখ, কত রকম রকম বাসনা উঠছে এবং তার জন্যে কত ছুটোছুটী, কত অশান্তি।

দ্বিজেন গাহিল—

পিতার কোন গুণ পেলাম না আমি।
আমার পিতা পরম যোগী নির্ব্বিকার নিরোগী॥
আমি ঘোর সম্ভোগী, বিকারগ্রস্ত রোগী।
আমার পিতা বিরাগী, আমি অনুরাগী।
পিতা নিষ্কাম আমি কামী॥
পিতা আশুতোষ অল্পে তোষ তাঁর।
আমি কিছুতেই নই তুষ্ট আশা মোর অপার।
পিতা শ্মশানচারী আমি ঘোর সংসারী।
সতত কুপথ গামী॥
বিশ্বদাহ বহ্নি পিতার ভালে জ্বলে।
মোর পোড়া কপাল স্বীয় কর্ম্মানলে।
আত্ম বিস্মরিত প'ড়ে মোহ জালে।
আমার পিতা অন্তর্যামী॥
পিতার ভালে চাঁদ, মোর ভালে কলঙ্ক।
পিতা কালের কাল আমার সেই কালে আতঙ্ক।
আমার নিজের যাহা বিত্ত তাতেও নেই কর্ত্তৃত্ব।
আমার পিতা ভবের স্বামী॥

একটী মাত্র গুণ পেয়েছি পিতার।
সুধা ফেলে করি সদা বিষ আহার।
তার ফল বিপর্য্যয় পিতা মৃত্যুঞ্জয়।
আমি সতত মৃত্যুর অনুগামী ॥
গোবিন্দ কয় মন কেন ভাবরে বিষাদ।
পিতার গুণ পেতে যদি থাকে সাধ।
ত্যেজে বিষয় সাধ, পিতায় গিয়ে সাধ।
দেহ মন প্রাণ দিয়ে প্রণামি ॥

তৃতীয় ভাগ—সপ্তবিংশ অধ্যায়

কলিকাতা ; বৃহস্পতিবার ১৫ই আষাঢ় ১৩৪০ সাল ;
ইং ২৯শে জুন ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, ললিত, নগেন, কালু, কৃষ্ণ দত্ত, তারাপদ, অপূর্ব্ব, শ্যাম, দ্বিজেন, কৃষ্ণ কিশোর, হর প্রসন্ন, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, অজয়, সুধাময়, বিভূতি, পঞ্চানন, দ্বিজেন সরকার, প্রফুল্ল, মতি, মৃত্যুন, দাশরথি, জ্ঞান, শিরিশ, পুতু, ভগবান, গোপেন, কালী মোহন, ভোলা ও অভয় আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—

ঠাকুর। দেখ, দেবতা ও সাধুরা সংসারীদের কাছ থেকে গালা-গালিও খায়, আবার (thank you) ধন্যবাদও পায়। তাদের এ দুটোরই কোন মূল্য নেই। ভোগীরা দশটা কামনা বাসনা নিয়ে দেব স্থানে বা সাধু স্থানে যায়, দুটো ফললেই ধন্যবাদ (thank you) দেয়, আবার যদি না ফলে, তা হলে গালাগালি দেয়। এমন কি মনের মতন না হলে, তার ভাবও অনেক সময় উল্টে যায়। কিন্তু ত্যাগীরা যে ভাব নিয়ে আসে শেষ পর্য্যন্ত সেই ভাব থেকে যায়, কারণ যে ত্যাগী সে ত কিছুই চায় না। চাইলেই গণ্ডগোল, তা তিনি সাধুই হ'ন আর যিনিই হ'ন। সাধু মানে কি? **যিনি তাঁকে পাবার জন্যে সব ছেড়ে আছেন এবং সর্ব্বদাই তাঁর ভাবে আছেন তিনিই সাধু।** ছাড়া মানে কাপড় ছাড়া জামা ছাড়া নয়, এমন ঢের পাবে যে খালি গায়ে শুধু একটা কৌপীন প'রে আছে বা ভাত, রুটি ছেড়ে ফল খেয়ে জীবন ধারণ করছে, অথচ তারা সাধু নয়। সাধু এ সব নয়, **সাধু হচ্ছে মন। এমন ত্যাগ**

দেখান চাই, যে সাধু ছাড়া অপর আর কেউ করতে পারবে না, অর্থাৎ হিংসা, দ্বেষ, মান, অভিমান প্রভৃতি বৃত্তি গুলো কতটা নষ্ট করতে পেরেছে, তার ওপর সাধুত্বের প্রমাণ হবে।

হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান—যেখানে যে ধর্ম্মই দেখনা কেন, সকলেই এই সবে ডুবে রয়েছে ; এমন কি সাধু হতে গিয়েও এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। বেশ রয়েছে হয় ত, কিন্তু যেই একটু চল বেচল হয়েছে অমনি ফোঁস ক'রে উঠেছে। ভেতরের এই সব বৃত্তি গুলো ম'রে না এলে, রীতিমত তিতিক্ষা গ্রহণ না করলে, কিছুই হবে না ; তবে হ্যাঁ, জামা, জুতা ছাড়লে কিছু দেহ সুখ নষ্ট করা হ'ল, অনেক প্রয়োজন ক'মে এল, খানিকটা কষ্ট সহিষ্ণু হতে পারলে এবং তাতে সাধন পথে যাবার খানিকটা সুবিধা হয়ে গেল। তখন কিছু কিছু অগ্রসর হতে পারে বটে কিন্তু সাধু হতে বহু বিলম্ব। অনেক সময় সাধুদের মনে একটা ভাব ওঠে যে 'সকলে আমার কথা শুনবে।' তখনই জানবে তিনি দুঃখের ঝুড়ি নিয়ে বসলেন। নিজের ছেলে পরিবারই যখন কথার বাধ্য নয়, তখন নানা প্রকৃতির লোক যে তোমার কথা শুনবে বা মানবে, এটা আশা করা মস্ত ভুল। সাধুদের এ সমস্ত উপেক্ষা করা চাই। **যেখানে উপেক্ষা সেইখানে শান্তি যেখানে আশা সেইখানেই দুঃখ।**

নগেন। এ জন্মে যে আপনার কাছ থেকে শিখলুম 'বাসনাই দুঃখের মূল, সকল বাসনা ত্যাগ করলেই সুখ।' আর যখন সেই মতে সকল বাসনা ছাড়তে চেষ্টা করছি, তখন বিজ্ঞানময় কোষের ছাপ লেগে গেছে ত? এ জন্মে যদি পুরো না পারি পর জন্মে সে ছাপ থাকবে ত?

ঠাকুর। নিশ্চয়ই, এ যাবে কোথায়? জামা ছাড়লেই সব ভুল হয়ে যায় কি? আর এ জন্ম, পর জন্ম ভাব কেন? কার

কখন কি অবস্থা হয়, তা কি কেউ জানে? এক মুহূর্ত্তে তোমার ভাব বদলে যেতে পারে, তখন তুমি সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পার। লালাবাবু এক কথায় সব ছেড়ে চ'লে গেলেন। তোমার আসল দরকার হচ্ছে দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। এই ভাব টুকু নাও, পর জন্মে কি হবে না হবে, তা ভাববার প্রয়োজন কি?

কৃষ্ণ কিশোর। মঠে এসে আপনাকে না ব'লে চ'লে গেলে কি কোনও অপরাধ বা পাপ হয়?

ঠাকুর। পাপ না হোক, নীতি রক্ষার দিক থেকে দোষ হয়। যেমন স্কুলে গিয়ে মাষ্টারকে না ব'লে চ'লে গেলে স্কুল পালান হয় এবং তার জন্যে মাষ্টার সাজা দেয়।

বিভূতি। স্কুলের মাষ্টার ত অন্তর্য্যামী নয়, বুঝতে পারে না, কিন্তু আপনি ত অন্তর্য্যামী, মনে মনে ব'লে চ'লে গেলে আপনি বুঝতে পারেন ত?

ঠাকুর। শুধু ওটার বেলায় কেন? সবই তা হলে মনে মনে কর।

দাশরথি। 'ফটোর দিকে এক মনে চেয়ে থাকলে তার আত্মাকে আকর্ষণ করে' বলছেন কিন্তু চোখ বুজে যেমন রূপ ধ্যান করা যায়, ফটোর দিকে চেয়ে কি সেই রকম ধ্যান করব? আর কোনটাই বা ভাল?

ঠাকুর। ফটোর দিকে চেয়ে থাকলে, সেই মূর্ত্তিই ত সামনে দেখছ, তবে আবার ধ্যান করবে কেন? চোখ বুজে ধ্যান করা মানে চিন্তা ক'রে ধ্যান করা, কাজেই চিন্তা ঢিলে হয়ে গেলেই ধ্যানটা ঢিলে হয়ে যায়। কিন্তু ফটোর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকলে মনটা তাইতে গিয়ে চট্ ক'রে লাগে। একে ত্রাটক যোগ বলে, এতে মন শীঘ্র স্থির হয়। চোখের পাতা যত পড়ে মন তত চঞ্চল হয়।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে। সঙ্গই প্রধান, যেমন সঙ্গ

করবে তেমনি সব বৃত্তি উঠবে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, অনাত্মাবাদ, শরণাগত, সাধুসঙ্গ, এই চার প্রকার সাধনার মধ্যে সাধু সঙ্গই সংসারীদের পক্ষে সব চেয়ে প্রধান। সঙ্গে মন্দ বৃত্তি গুলো নষ্ট ক'রে সৎ দিকে ঘুরিয়ে দেয়। সংসারীদের ভাল কথা জানা থাকলেও তারা কাজে করতে পারে না। 'জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।' যেমন বাঁধা ব্যক্তি এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় যেতে পারে না। যখন মার পেট থেকে পড়েছ, তখন উলঙ্গ, কিছুই ছিল না। কেবল স্তন্য দুগ্ধ খেয়েই আনন্দে কাটিয়েছ, কোনও প্রয়োজন বা অভাব বোধ করনি, যত বড় হয়েছ, তত বহু জিনিষ ধ'রে নিয়েছ, আর ততই দুঃখ ভোগ করছ। এ সব দুঃখ ধার করা। ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্ন, অর্থাৎ শাক অন্ন, লজ্জা নিবারণের সামান্য বস্ত্র, আর মাথা গোঁজবার একটু স্থান, এই কটা থাকলে এবং ব্যাধির যন্ত্রণা না থাকলে, তোমার সুখী হওয়া উচিত আর ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে তোমার প্রতি তাঁর অশেষ করুণা, তিনি তোমার কোনও অভাব রাখেন নি। তখন তাঁকে খুব ডাকবে।

বহু বাসনা মানেই বহু জিনিষকে ধরা, বহু জড়ান। মানুষ নিজের অবস্থায় সুখী থাকতে চায় না ব'লে দুঃখকে টেনে আনে। এইখানে ঠাকুর 'রাজা ও অনামুখো ব্রাহ্মণের শূল' এর গল্প বলিলেন। (অমৃতবাণী ২য় ভাগ ৩৭৮ পৃষ্ঠা)। এখানে ব্রাহ্মণ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট না থেকে বড়র নকল করতে গেল, কিন্তু একবার ভেবে দেখলে না যে সে বাস্তবিক দুঃখী কিনা। সংসার জগতে সুখের নামই অর্থ, তাই অন্য ভাবে বেশী অর্থ আনা সম্ভব নয় দেখে রাজার কাছে দাসত্ব স্বীকার ক'রে রাজ সরকারে এক চাকরি নিলে। যেই সেখানে খুব ভাল ক'রে সৎ ভাবে কাজ ক'রে রাজার নজরে প'ড়ে ক্রমান্বয়ে উচ্চ পদে উঠে উঠে প্রধান মন্ত্রীর পদ পেলে, অমনি অপর সকলের হিংসা হ'ল। তিন প্রকার লোক আছে—তামসিক, নিজের কোন ভাল হোক না হোক অপরের অনিষ্ট চিন্তা ও চেষ্টা করে; রাজসিক,

নিজের ভাল চায় ও তার জন্য খুব চেষ্টা করে, তাতে পরের ভাল হয় হোক ক্ষতি নেই ; সে চেষ্টা করে কিসে সে নিজে তার চেয়ে বড় হবে। সাত্ত্বিক, তার সকলের মঙ্গলেই আনন্দ, সে কখনও অপরের অমঙ্গল কামনা করে না।

রাজাও আবার দুই প্রকারের সাত্ত্বিক ও রাজসিক গুণ মিশ্রিত, এদের স্বার্থ অধীন থাকে, স্বার্থের জিনিষের সঙ্গে ব্যবহার রাখে অথচ যশ, মান, কামনা ইত্যাদির বশবর্ত্তী হয় না ; রাজত্ব এবং প্রজার কিসে মঙ্গল হবে কেবল সেই দিকেই নজর থাকে। আর রাজসিক ও তামসিক গুণ মিশ্রিত রাজাদের স্বার্থই পরমার্থ হয়, যদিও রজ গুণের প্রভাবে শাসন কার্য্য চালাবার ক্ষমতা থাকে। এদের নিজের গণ্ডার দিকে সম্পূর্ণ নজর থাকে, এরা যশ মানের অধীন হয় এবং যেখানে স্বার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ সেখানে কোনও বিচার বা বিবেচনা রক্ষা করে না। **সম্পদে মানুষ খেয়ালী হয়** এবং তখন তার সকল দিকে সামঞ্জস্য ক'রে চলা বড় কঠিন, তাই বলেছে 'বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীষুরাজকুলেষু চ' **কখনও স্ত্রীলোক ও রাজকর্ম্মচারী অর্থাৎ সাধারণ ধনী ব্যক্তিকে বিশ্বাস করো না।** কারণ এদের সংসর্গে কখন বা কি অবস্থায় বিপদ আসতে পারে তার ঠিক নেই। এখানে যেমন অপর কর্ম্মচারীরা প্রধান মন্ত্রীর ওপর হিংসা পরবশ হয়ে তার নামে রাজার কাছে মিথ্যা অপবাদ রটালে ও মিথ্যা প্রমাণ ক'রে দিলে, রাজা অমনি তাদের কথায় বিশ্বাস ক'রে নিলে ; আর বিবেচনা বিচার কিছু নেই, অমনি শূলের আদেশ ! আবার সে যেমনি শূল হবার আগে বুঝিয়ে দিলে যে এ সব মিথ্যা তখন রাজার চৈতন্য হল। কারণ রাজসিক তামসিক গুণ সম্পন্ন রাজারা সাধারণতঃ প্রায় সকলেই চোখে কিছু দেখে না, তারা কানেই দেখে অর্থাৎ যে যা বললে সেটা বিশ্বাস করে আর না ভেবে চিন্তে একেবারে হুকুম দিয়ে বসে।

সে তখন রাজাকে বললে 'মহারাজ আমার নিজের অবস্থায়

যত দিন সন্তুষ্ট ছিলুম, তত দিন কেউ আমার শত্রু ছিল না, কিন্তু বাসনার তাড়নায় স্থির থাকতে না পেরে আপনার কাছে চাকরি স্বীকার ক'রে যেই বড় পদ পেলুম এবং ধনী হলুম, অমনি পদে পদে কত শত্রু। তাই আমি আমার পূর্ব্ব অবস্থার ছেঁড়া কাপড় খানি একটী ভাঙ্গা বাক্সে রেখে মাঝে মাঝে দেখে আসতুম আর মনকে বোঝাতুম 'মন! এই তোমার প্রকৃত অবস্থা; দু দিনের প্রধান মন্ত্রীত্বের নেশায় যেন নিজের সাবেক অবস্থা ভুলে যেও না।'

মানুষ মায়ায় জড়িয়ে দুঃখ ভোগ করে, আর এমনি মায়ার প্রভাব যে সাধু সঙ্গ, সৎ কথা তখন কিছুই ভাল লাগে না। **একা এসেছ একা যেতে হবে, মাঝে দুদিনের এই রং ঢং নিয়ে ঠিক যিনি আপনার তাঁকে ভুল না।** যিনি তুমি জন্মাবার পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুধ দিয়ে তোমার আহার জুগিয়ে রেখেছিলেন, যিনি সেই অসহায় অবস্থায় পদে পদে রক্ষা করেছেন, মাতৃহৃদয়ে স্নেহ দিয়ে লালন পালন করেছেন এবং পরেও কত বড় বড় বিপদ থেকে সর্ব্বদা রক্ষা করছেন, তাঁকে সেই সব চেয়ে আপনার জনকে কখনও ভুল না। সংসারে মেলা মন দিও না, আর সর্ব্বদা নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকবার চেষ্টা করবে। রোগ, শোক, তাপ, অভাব, বড় বড় দুঃখ যখন পাবে তখন তোমার চেয়েও যে আরও দুঃখী সেই অবস্থার লোকের দিকে নজর রেখে তাঁকে এই ব'লে ধন্যবাদ দেবে যে 'তোমার কি দয়া, এর চেয়েও আমাকে কত সুখে রেখেছ।' নীচের দিকে যত নজর রাখবে ততই শান্তি পাবে। এইখানে ঠাকুর 'খোঁড়া ও গলিত কুষ্ঠ রোগীর গল্প বললেন (১২ পৃষ্ঠা)। সাধু সঙ্গে সদগুরুর সঙ্গে জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্ম ক্ষয় হয়। প্রারব্ধে যদি থাকে, তোমার অর্থ সম্পদ আসে ভালই, কিন্তু তার অধীন হয়ো না তবে কিছু শান্তি পাবে। বিনা ত্যাগে শান্তি আসতে পারে না। ত্যাগ আনতে হলে, ত্যাগীর সঙ্গ কর, আর নয়ত ভক্ত হও; সব ভুলে গিয়ে তাঁতে মন দাও। কপটতা

ছেড়ে ঠিক ভালবাসতে শেখ, তাহলে আপনি সব হবে। সকল সময় না পার অন্তঃত কিছু সময় নিয়ম ক'রে সৎ সঙ্গ কর কিছু সময় ঠিক ঠিক তাঁর ভাবে থাকলে তিনি অনেক ভার গ্রহণ করেন ও অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

তাই গীতায় স্বয়ং ভগবান বলছেন—

আমা ছাড়া অন্য কিছু নাহি জানে যেই জন।
আমারই ধ্যানে রূপ করে উপাসনা
সেই যুক্ত যোগী, তার অভাব যা হয়
নিজে চেষ্টা করি আনি পুরাই তাহায়
উপস্থিত ধন তার করিয়া রক্ষণ
দুঃখ নাশ করি আর দেই মোক্ষধন। বহাম্যহম

আমি তার সকল ভার গ্রহণ করি। এর এক গল্প আছে।

কাশীতে চৌষট্টি ঘাটে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী থাকত। ব্রাহ্মণ প্রত্যহ নিজেদের খোরাকের মত ভিক্ষে ক'রে আনত, আর ব্রাহ্মণী রেঁধে স্বামীকে দিত ও নিজে খেত। বাকী সময় তারা ভগবানের চিন্তায় কাটাত। এক দিন ব্রাহ্মণের শরীর খারাপ হওয়ায় সে দিন আর ভিক্ষায় বেরুতে পারে নি। ঘরে কিছু নেই আর ব্রাহ্মণীও আশে পাশে চেষ্টা ক'রে কিছুই পেলে না; বেলা ২টা বেজে গেল তখন ব্রাহ্মণী কাঁদছে আর বলছে 'এমনও অদৃষ্ট করেছি যে এত বেলা হ'ল স্বামী উপবাসী, তাকে দুটো খেতে দিতে পারলুম না। আমি না হয় উপোস করলুম তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু স্বামী উপবাসী হয়ে ঘরে পড়ে রইল, আর আমাকে তা চোখে দেখতে হচ্ছে, এর চেয়ে আমার মরণ ভাল ছিল।'

এদিকে চৌষট্টি ঘাটের ওপর দিয়ে একটা ভারী সিধার ভার নিয়ে যাচ্ছে এবং সঙ্গে একজন সরকার চলেছে। তারা যাচ্ছে এমন সময় লাল পেড়ে সাড়ী পরা একটী ন বছরের সুন্দরী

মেয়ে তাদের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলে 'হ্যাঁগা, তোমরা এ সব কোথা নিয়ে যাচ্ছ?' সরকারটী সেই সুন্দরী মেয়েটীকে দেখে ও তার মিষ্টি কথায় মুগ্ধ হয়ে বললে, 'কেন বাছা, তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? আমি অমুক জমিদার বাড়ী থেকে আসছি অমুক জায়গায় অমুক ব্রাহ্মণের বার্ষিক পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।' এ কথা শুনে মেয়েটী বললে 'তাদের আজ খাবার ব্যবস্থা আছে ত?' সরকার বললে 'হ্যাঁ, তা আছে বই কি, তবে এটা তাদের বার্ষিক পাওনা তাই দিতে যাচ্ছি; তা, তুমি এত কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করছ কেন?' তখন সেই মেয়েটী বললে 'ওগো, আমার বুড়ো বাপ মার আজ খাওয়া হয়নি, এত বেলা পর্য্যন্ত উপবাসী রয়েছে, খাবার কোন জোগাড়ও নেই, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম তাদের আজ খাবার ব্যবস্থা আছে কিনা, তা যদি থাকে তা হলে দয়া ক'রে এই ভারটী আজ আমাদের বাড়ী দিলে আমার বাপ মা খেতে পায়।' মেয়েটীর কথায় তারা এত মুগ্ধ হয়ে গেল যে সরকার বললে 'তা তুমি এত কাতর হয়ো না, চল আজ এটা তোমাদেরই বাড়ী দিয়ে যাচ্ছি; যাদের বার্ষিক পাওনা তাদের আর এক দিন দিয়ে আসব।'

এই ব'লে তারা সেই মেয়েটীর সঙ্গে পেছন পেছন যে বাড়ীতে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী থাকত সেই বাড়ীতে গিয়ে সেই মেয়েটীকে আর সামনে দেখতে না পেয়ে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে 'হ্যাঁগা, তোমাদের কি আজ খাওয়া হয় নি?' ডাক শুনে ব্রাহ্মণী বেরিয়ে এসে বললে 'না বাবা, আজ আমাদের খাওয়া হয় নি।' সরকার তখন বললে 'তোমার মেয়ে এই কথা বলায় এই ভারটী আজ তোমাদের দিতে এলুম।' ব্রাহ্মণী শুনে বললে 'না বাবা, তোমার বাড়ী ভুল হয়েছে, আমার কোন মেয়ে নেই, এ বাড়ী নয়, অন্য বাড়ী হবে।' সরকার বললে 'না মা, এই বাড়ী, তোমার মেয়ে আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে আগে আগে এসে এই বাড়ীতে ঢুকল, আমরা দেখলুম, আর আমি বাড়ী ভুল করলুম!' ব্রাহ্মণী আবার বললে 'না বাবা, আমার ত

কোন মেয়ে নেই, তুমি নিশ্চয়ই বাড়ী ভুল করেছ।' এই শুনে ব্রাহ্মণও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে 'না বাবা, সত্যিই আমাদের কোন মেয়ে নেই, তুমি বাড়ী ভুল করেছ। এই রকম দুই পক্ষে কথা হচ্ছে এমন সময় সরকার ঘরের কোণে মেয়েটীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বললে 'ঐ দেখ, ! ঐ ত তোমাদের মেয়ে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর তোমরা বলছ তোমাদের মেয়ে নেই।' ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তখন ঘরের দিকে ফিরে দেখে কাঁদতে কাঁদতে স্তব করতে লাগল 'এ্যাঁ, তোমার এত দয়া যে আমরা উপবাসী দেখে আমাদের মেয়ে সেজে খাবার জোগাড় ক'রে এনে দিলে! কিন্তু কই, আমরা ত সব সময় তোমাকে দিতে পারিনি, আমরা ত তোমায় সে ভাবে ডাকতে জানিনি! কিছু সময় তোমায় ডেকেছি তাতেই তোমার এত করুণা, এত ভালবাসা!' তার পর থেকে তারা সর্ব্বদাই তাঁর নামে থাকত।

ভক্ত নিজের কোন স্বার্থ রাখে না, সে সব ছেড়ে গুরুকে ভালবাসতে চায়। কিন্তু সাধারণ, স্বার্থ প্রভৃতি সকল দিক বজায় রেখে ভক্তি করতে পারে, একটু স্বার্থে ঘা পড়লেই আর টিঁকতে পারে না। ভক্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে ব'লে জোর ক'রে টেনে নেয়। সংসারে যত বুদ্ধি খাটাও না কেন দুঃখ আসবেই, কোথা থেকে বা কি ভাবে আসবে তা বুঝতে বা ধরতে দেবে না। এ সংসারে চালাক আর বোকা একই মাপে ওজন হচ্ছে। তবে সেই কিছু চালাক, যে বোঝে যে সংসারে দুঃখ অনিবার্য্য, আর সেটা বুঝে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেবার জন্য তাঁর দিকে গতি করে। খেটে খুটে হয়ত কিছু বিভূতি আসতে পারে, কিন্তু তাতে আর কি হ'ল? দুঃখ যেমন তেমনই রইল, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি হ'ল কই? **দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি নিতে হলে, বিশেষতঃ সংসারীদের পক্ষে, সাধু সঙ্গ একমাত্র**

উপায়ঃ সংসারের নানা প্রলোভনের ভেতর থেকে মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে সৎ জিনিষে লাগিয়ে দেওয়া ও মায়াজনিত দুঃখ নাশ করা বড় শক্ত কথা। খুব মনের শক্তি না থাকলে এ হয় না। সাধু সঙ্গের কিন্তু এমনই প্রভাব যে **সাধুতে ভালবাসা পড়লে আপনিই এ সব হয়ে যায়।** তাই সাধুরা সকলকে ভালবেসে আপন ক'রে নেন, আর তারাও সেই আপনত্বে মুগ্ধ হয়ে সংসারের এত বড় আকর্ষণ ছেড়ে তাঁর কাছে ছোটে।

দ্বিজেন গাহিল—

(১)

মা যে আমার ক্ষেপা মেয়ে।
শ্মশান পেলে ভাল থাকে নেচে বেড়ায় ধেয়ে ধেয়ে ॥
হৃদয় শ্মশান পেলে পরে মা নাচে গো তার উপরে।
তাই এলোকেশী হয়ে খুসি নাচে শিবের বুকে পা (টা) দিয়ে ॥
বিনা ত্যাগে যোগে যাগে মা আমার ত নাহি জাগে।
তারে অহঙ্কারে অন্ধ করে পায় না মাকে কাছে পেয়ে ॥
সকল ছেড়ে আপন ভুলে ডাকলে পরে মাকে মিলে।
তাই জেনে শুনে ভক্ত প্রসাদ প'ড়ে ছিল মাকে নিয়ে ॥
এ দীনের এ বাসনা শোন মা গো শবাসনা।
যেন দিবা নিশি থাকি বসি ঐ কাল রূপে পাগল হ'য়ে ॥

(২)

যাবো গো করিতে (মোরা) সবে শ্যাম দরশন।
হেরে সে ধনে হবে মনোবাঞ্ছা পূরণ ॥
সে যে রাজা হয়েছে মথুরাধামে।
কুব্জা দাসী রাণী হ'য়ে বসেছে তার বামে।
দেখি, দেখে মান রেখে যদি করে সম্ভাষণ।
ব্রজেরই দুঃখের কথা বলব তখন ॥

কেঁদে অন্ধ হ'ল নন্দ নন্দরাণী।
রাধা আছে কি না আছে অনুমানি।
শুনি এ কেশব সব দুঃখ বিবরণ।
দেখি করে কি না করে ব্রজে প্রত্যাগমন ॥
যদি প্রিয় ভাষে না তোষে বংশীধারী।
তখন সবে মিলে মোরা করব আইন জারি ॥
রীতিমত দাসখত দেখায়ে সমন।
সেই জোরে মনচোরে করব বন্ধন ॥
সবে সখি মিলে ধ'রে আনব তারে।
দেখি বাধা দিয়ে কেবা তারে রাখতে পারে।
এমন পলাতক খাতকের শাসন কারণ।
রাই রাজ দরবারে করব অর্পণ ॥

তৃতীয় ভাগ—অষ্টাবিংশ অধ্যায়

কলিকাতা ; রবিবার, ১৮ই আষাঢ় ১৩৪০ সাল ;

ইং ২রা জুলাই ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, ললিত, নগেন, কালু, জ্ঞান, শিরিশ, জিতেন, দ্বিজেন, শ্যাম, অপূর্ব্ব, তারাপদ, কালীমোহন, ললিত ভট্টাচার্য্য, দাশরথী, মতি, পঞ্চানন, সুধাময়, চুণী, প্রফুল্ল পুত্তু, কৃষ্ণকিশোর, গোষ্ঠ, কৃষ্ণ দত্ত, দ্বিজেন সরকার, ভোলা ও অভয় আছে।

জিতেন। যা যা ঘটে সবই ত প্রাক্তন অনুযায়ী ঠিক করা আছে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, সবই ঠিক করা আছে, তবে ছোট গুলো বদলান যায়, বড় গুলো বদলান যায় না ; যেমন পাড়াগাঁয়ে চাষার ছেলে কলিকাতায় এলে অনেক ছোট ছোট সংস্কার গুলো বদলে ফেলে, কিন্তু জোর সংস্কার বা বৃত্তি কিছু বদলায় না।

জিতেন। তা হলে 'আমি করি' এটা ত ঠিক নয় ?

ঠাকুর। তাই বটে, তবে যতক্ষণ আমিত্ব বুদ্ধি থাকে ততক্ষণ মানুষ 'আমি করি' এই বোধ রাখে ও এইটার ওপরই চলে ; 'আমার কোন হাত নেই' এটা অনেকে মুখে বললেও কার্য্যে ঠিক বোধ রাখতে পারে না।

নগেন। রিপুর হাত থেকে মুক্ত হলেই ত মোক্ষ ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, বাসনা থেকে মুক্ত হলেই মোক্ষ।

নগেন। যত বাসনা ত্যাগ হয়, তত দুঃখ কম, এইটে বড় ভাবে ধরলে মরণের কষ্টও কম হয় ত ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, কম হয়ে যায়। বাসনা জনিত যন্ত্রণা বোধ হয় না, অর্থাৎ দেহ ছাড়ার জন্যে দুঃখ হয় না, তবে মরণের সময় প্রাণ

অপানকে যখন টানে তখন হয় ত কিছু কষ্ট হয়। মনে শক্তি থাকলে সেটাও কম অনুভব হয়।

ললিত। তখন কি মনের সে শক্তি থাকে?

ঠাকুর। নিশ্চয়ই, তার জন্যেই ত এত চেষ্টা। মৃত্যুর পর একটা কষ্ট আসে, কিন্তু সৎ আত্মা সে কষ্ট ভোগ করে না।

ললিত। তা হলে গুরুমূর্ত্তি ধ্যান করতে করতে মৃত্যু হলে মরণের কষ্ট ত অনেক কম হবে?

ঠাকুর। নিশ্চয়ই; যাতে সে সময় ঐ রকম ধ্যান করতে পার, সেই চেষ্টা করার নামই ত সাধনা। তখন মরণে কোন কষ্ট হয় না, বরং আনন্দ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর গাহিলেন—

আমি চলিলাম রে সেই আনন্দ কাননে।
এ সংসারে লোকে যারে শ্মশান ব'লে ভয় পায় মনে॥
ভূতের বোঝা আজকে ভূতে মিশাইবার শুভদিন।
ঘটাকাশ আজকে আমার, মহাকাশে হবে লীন।
জল যাবে সেই জলাধারে, তেজ যাবে সেই বৈশ্বানরে।
রন্ধ্রগত বায়ু আমার মিশবে মহা সমীরণে॥
তোমরা ব'লছ বিকারে বা দারুণ বিভীষিকা ভয়ে।
করছি আমি নানারূপ বিকট ভঙ্গী ভীত হয়ে।
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত এরাই ত এই কারাগারে
দারুণ মায়া শৃঙ্খলে ভাই বেঁধে রেখেছিল মোরে।
তাই এরা সব এলে কাছে, আমি ভয় পাই আবার বাঁধে পাছে।
তাই তে এদিক ওদিক চাই ভাই, বিকট আকৃতি বদনে॥
শয্যা কণ্টক ছলে রে ভাই করছি আমি এপাশ ওপাশ।
পাশ ফিরে দেখছি আমার ছিঁড়ল কি না এ মায়া পাশ।
স্থির নেত্র দেখে আমার, তোরা বলছিস্ হরিবোল।
আমি ত ভাই স্থির নয়নে দেখছি শ্যামা মায়ের কোল।

মা আমার ব্যাকুলা হ'য়ে, দুটী বাহু প্রসারিয়ে।
আমায় বলছেন 'আয় বাপ কোলে, কি ভয় দুরন্ত শমনে।'
শির লুণ্ঠন ছলে মায়ের কাছে মাথাটী নেড়ে রে ভাই।
আর হবে না ব'লে কৃত পাপের ক্ষমা চাই।
তোমরা ভাবছ মৃত্যু কাল তাই মৃত্তিকায় শুয়েছি আমি।
আমি ত ভাই চারিদিকে হেরিতেছি স্বর্ণ ভূমি।
বৈতরণীর নহে তপ্ত জল, আনন্দ উথলে কেবল।
আনন্দময় হংস তাহে পার হচ্ছে সুখে সন্তরণে॥
আনন্দময় ফুল ফল তার, বহিছে আনন্দ বায়
নিত্যানন্দ ধাম সেই, কিছু নাই আনন্দ বই।
পিতা সদানন্দ আমার মাতা যে আনন্দময়ী।
যদি কারো লাগে ক্ষুধা, খেতে দেয় আনন্দ সুধা।
তাই ত ভাই গোবিন্দের আজ এত আনন্দ মরণে॥

পুত্তু। সংসার করতে ইচ্ছে আছে, এবং তাঁকে ডাকবারও খুব ইচ্ছে আছে, কিন্তু সংসারের কাজের জন্য তাঁকে ডাকবার সময় পাচ্ছি না ব'লে অশান্তি আসছে। এ কেন?

ঠাকুর। যে কাজে লেগেছ, সেটা ত করতে হবে। তবে যদি সে বিশ্বাস থাকে 'ভগবানকে ধরেছি, যা হয় হোক,' তাহলে আলাদা কথা। আর যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, এবং তার জন্যে কোনও পথ অবলম্বন ক'রে থাক, তাহলে সেটা করতে হবে বই কি? তবে সৎ ভাবে করতে চেষ্টা করবে। শুধু 'খাটলেই খুব অর্থ হবে' এ কথার ওপর থেক না, কারণ যা তোমার ভাগ্যে আছে তা ঠিক আসবেই।

প্রফুল্ল। গুরুকে সব চেয়ে আপনার লোক বলেছে কেন?

ঠাকুর। বিপদে যিনি সর্ব্বদা দেখেন তিনি বেশী আপন। **মহা বিপদের সময় গুরু ভিন্ন আর কেউ দাঁড়াতে পারে না ব'লে গুরুকে সব চেয়ে বড় করেছে।**

কৃষ্ণকিশোর। সং স্থানে জোর ক'রে বসলেও মন অন্য জায়গায় চ'লে যায় কেন ?

ঠাকুর। মনের স্বভাব চ'লে যাওয়া। উড়ু উড়ু মন নিয়ে এসেছ কিনা ? মনকে জোর ক'রে ধ'রে রাখতে হবে ; তবে অপর স্থানে হয়ত মনের অন্য দিকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনও ক্রিয়া হ'য়ে যায়, কিন্তু সৎ স্থানে থাকলে সেটার হাত থেকে বেঁচে গেলে ত ? যেমন তেঁতুল মনে করলেই জিবে জল আসতে পারে কিন্তু যদি না খেয়ে ফেল ত জ্বর হবে না।

খানিক পরে ঠাকুর বলছেন—

ঠাকুর। দেখ, সংসার মায়ায় এসে সুখ দুঃখের মধ্যে পড়বেই। তবে, যেমন বিকারের অবস্থায় কিছু চৈতন্যের প্রকাশ দেখতে পেলে ডাক্তার জানে যে এইবার বিকার কাটতে আরম্ভ হ'ল, তেমনি সংসার দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে যখন চেষ্টা হয়, তখন বিকার সারবার লক্ষণ আসে। বিকার কাটাবার প্রধান ঔষধ হচ্ছে, সাধু সঙ্গ, গুরুতে বিশ্বাস। গুরুতে বিশ্বাস থাকলে সব কাজ আপনি হ'য়ে যাবে কারণ গুরুর শক্তি সর্ব্বদাই রক্ষা করছে কাজেই তার আর কোনও ভাবনা থাকে না।

কালু। একটা পিঁপড়ে মারলে কিছু হয় না, আর একটা মানুষ মারলে রাজদণ্ড নিতে হয়, ভগবানের কাছেও কি এ রকম তারতম্য আছে ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, যে জিনিষটার যত উপকারিতা তাকে রক্ষা করবার তত চেষ্টা করে, এই স্বভাব। মানুষের দ্বারা সৃষ্টির বেশী বিকাশ ও সৃষ্টির বৃদ্ধি হয় ব'লে, মানুষকে সব চেয়ে বড় করেছে।

জ্ঞান। এক সময় হয়ত কোন কাজ নেই, শুধু চুপ ক'রে ব'সে আছি, তবু তাঁর নাম করতে ইচ্ছা যায় না কেন ?

ঠাকুর। প্রেমটা লাগেনি ত ? যেটুকু নাম কর, সেটা সংসার দুঃখের ঠেলায় প'ড়ে ; শুনেছ তাঁর নাম করলে কিছু লাভ

হয়, সেই লোভে প'ড়ে কিছু ডাক। তারপর আবার বায়ু যখন কুপিত থাকে, কিম্বা মনটা যখন তমোগুণাশ্রিত থাকে, তখন নাম করতে ভাল লাগে না।

কালীমোহন। প্রথমে আনন্দ না পেলে প্রেম আসবে কেন?

ঠাকুর। সব কাজে আগে আনন্দ পাও তারপর গতি কর কি? না, আনন্দ পাবার আশায় ছুটোছুটি কর?

কালীমোহন। যখন খাচ্ছি তখনই আনন্দ পাচ্ছি ত।

ঠাকুর। খাবার সময় আনন্দ পেলে বটে, কিন্তু যতক্ষণ জোগাড় করেছ, রেঁধেছ, ততক্ষণ ত সে আনন্দ পাও নি; তবে আনন্দের আশায় অত খেটেছ, আয়োজন করেছ। সেই রকম গুরু বা সাধুর মুখে তাঁর রূপ, গুণের কথা শুনে মন শ্রদ্ধান্বিত হয়। তার জন্য ব্যস্ততা বাড়লে তখন লালসা হয়। এই পর্য্যন্ত সংসারের বাধা বিঘ্ন আটকাতে পারে। লালসা বাড়তে বাড়তে যখন অনুরাগ আসে, তখন আর বাধা বিঘ্ন কিছুই মানে না, আর কোন দিকে লক্ষ্য থাকে না এবং সংসারের আকর্ষণ তাকে আর কিছু করতে পারে না। অনুরাগের পর প্রেম; অনুরাগ প্রেমে নিয়ে গিয়ে ফেলে। তখন মিলন; তখন শুধু 'তুমি আর আমি কোন বাধা নাই ভুবনে'। দেখা না হলে ত জ্ঞান হয় না। দর্শন দুই রকম- স্থূলে দর্শন আর ভাবে দর্শন, স্থূল রূপ বলতে যে কেবল একটা রূপ এল তা নয়, সে একটা অবস্থা, তখন সব বোধ আসে। মহান শক্তি কাজ করছে দেখা যায়, এই চোখেই দেখা যায়। তোমরা যেটাকে জ্ঞান বল সেটা জীবত্ব জ্ঞান, জীব মাত্রেরই থাকে। ওটা না থাকলে জীবত্বই রইল না। কিন্তু দর্শনের পর যেটা হয় সেই আসল জ্ঞান। দর্শনের পর আলাপ। কি রকম জান? অনুরাগে টেনে নিয়ে ঘরের দরজায় এনে দিলে, তখন ঘরের বাবুকে দেখলে, বাবু সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান হ'ল। তারপর বাবুর সঙ্গে যত আলাপ হয় তত বিজ্ঞান ভাব আসে।

প্রফুল্ল। সংসার ভাল লাগছে না অথচ সংসারে রয়েছে, অশান্তি ভোগ করছে এর কারণ কি?

ঠাকুর। সৎ হবার ইচ্ছা রয়েছে কিন্তু সংসারের আকর্ষণও রয়েছে, ছাড়তে পারে না।

প্রফুল্ল। এই অশান্তি ক্রমশঃ বাড়লে পরে সংসার ত্যাগ হয় কি?

ঠাকুর। যদি ঠিক বোঝে যে সংসারে অশান্তি, আর ভগবানের দিকে এলেই শান্তি, তবে ত ছেড়ে আসবে। প্রবর্ত্তক অবস্থায় বেশী অশান্তি ভোগ হয়, কারণ তখন যেটা ভাল ব'লে চাচ্ছি সেটা পাচ্ছি না, অথচ মায়ার আকর্ষণে মন্দটাও ছাড়তে পাচ্ছি না।

কালু। এত যে ত্যাগের কথা হয়, কিন্তু কলিতে কি ঠিক ত্যাগী হতে পারে?

ঠাকুর। ত্যাগীর ভেতর কি কলি আছে? ত্যাগী মাত্রেই সেই, যে সব যুগ ত্যাগ করেছে। ত্যাগীর মন যে অবস্থায় ওঠে সেখানে কলির ধর্ম্ম পৌঁছায় না।

কালু। সংসারে যা যা ঘটে সবই আগে থেকে ব্যবস্থা করা আছে বলেন, অথচ এও দেখা যাচ্ছে যে মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে অন্য রকম করে। এই ধরুন, এক স্থানে ম্যালেরিয়ায় মড়ক হ'ল, চেষ্টা ক'রে সেই জায়গায় ম্যালেরিয়া তাড়ালে, তখন আর মড়ক হ'ল না। এই ত উল্‌টে গেল। আর যারা চেষ্টা ক'রে তাড়ালে তারা যে ভগবানের আরাধনা ক'রে 'আগে থেকে ব্যবস্থা করা আছে' এই জেনে করেছে তা ত নয়।

ঠাকুর। সংসার ব'লে কি কিছু আছে? বাসনাই সংসারটা গড়েছে। ম্যালেরিয়ার মড়ক বন্ধ হ'ল ত কি হয়েছে? হয় ত কলেরায় সব উজাড় ক'রে দিলে। আর ম্যালেরিয়া যে ক'মে গেল, সেও ত তাঁর ইচ্ছা; তিনি তাদের মাথার ভেতর সেই রকম বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিলেন, তাই তারা চেষ্টা ক'রে পারলে। তোমার বাগানে জঙ্গল হয়েছে, তুমি সাফ করাতে চাও; তুমি দশ জন মজুর লাগালে, তাদের ব'লে দিলে এই ভাবে এই জঙ্গল সাফ ক'রে দাও। তারা

তাদের বুদ্ধি খাটিয়ে সাফ ক'রে দিলে, তাই ব'লে কি তারা তোমার সাধনা করে? তেমনি ভগবান তোমাদের মধ্যে থেকে কয়েক জনকে বেছে নিয়ে সে রকম বুদ্ধি তুলে দিয়ে তাদের মারফত তাঁর কাজ করিয়ে নেন। তা ব'লে তারা ত তাঁকে চায় না বরং তারা হয়ত যশ, মান, অর্থ চায় এবং তিনিও হয়ত তাদের এই ভাবে কিছু দেন। যে দুঃখ পায় এবং যথার্থ কিসে দুঃখের নিবৃত্তি হয়, এইটা চায়, সেই তাঁকে ধরে।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে। স্থান জায়গায় উদ্দীপনা হয়; সাধু সঙ্গই প্রধান। এ জগতে যত প্রকার জ্ঞানের কথা আছে তার মধ্যে সাধু বাক্য, সদ্‌গুরু বাক্য, ঋষি বাক্য এবং ভগবৎ বাক্য সব চেয়ে বড়। সাধু সঙ্গে যত কাজ হয়, ততটা আর কিছুতে হয় না। ত্যাগীর সঙ্গ করলে আপনি ত্যাগ আসবে। তারা হয় ভালবেসে ত্যাগ করাবে আর নয় নীতি পালন করিয়ে ত্যাগ করিয়ে নেবে; যে ভাবে হ'ক মনকে ঘুরিয়ে আনবে। **ত্যাগ না হ'লে শান্তি আসতে পারে না।** ত্যাগ আসার লক্ষণ আছে; সংসারে যে টুকু নইলে নয় সেই টুকু সময় দিয়ে বাকী সময় তাঁকে দেওয়া। আর যারা ভোগী, তারা তাদের সংসারের জিনিষেই ২৪ ঘন্টা মন লাগিয়ে রাখে এবং বড় জোর যে সৎ কথায় সংসারীয় ভাব পায় সেই কথায় কিছু মন দেয়। কৃষ্ণলীলার ভেতর সংসারীয় ভাব আরোপ করে ব'লে অনেকের ভাল লাগে, কিন্তু তার মধ্যে যে মূলে ত্যাগের কথা আছে সে দিকে নজর দেয় না। কীর্ত্তনের মূলেই ত্যাগ। গোপিকারা কৃষ্ণের জন্য সব ত্যাগ করেছে, কৃষ্ণ প্রেমে কি পরিমাণ দুঃখকে আলিঙ্গন করেছে, কত দুঃখে পড়েছে তবু কৃষ্ণকে ছাড়েনি, এ সব নিলে না। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণ নিজেই ত তাদের দুঃখ দিচ্ছেন তবু তারা কৃষ্ণ ছাড়া আর জানে না, সব দুঃখ কষ্ট উপেক্ষা ক'রে তাঁকেই পাবার চেষ্টা! এ সব ভাব কেউ গ্রহণ করে না। সংসারী মন হিংসার

ওপর চলে; যেমন, আমাকে ভালবাসে অতএব আর কাউকেও যেন না ভালবাসে। কৃষ্ণ তাদের ছেড়ে মথুরায় গিয়ে অপরকে ভালবাসছে, অপরকে নিয়ে রাজা হয়ে বসেছে, তবু তাদের মনে কোন হিংসা নাই। কত লাঞ্ছনা, কত অপমান সহ্য ক'রে কৃষ্ণ দর্শনের আশায় সমস্ত উপেক্ষা ক'রে সেই খানে গতি করবার চেষ্টা! কৃষ্ণ কি করেছে না করেছে, সে ভাল কি মন্দ, সে সব দিকে কোন লক্ষ্য নেই, চাই শুধু তাকে। প্রেমেও যে অবস্থা হয় জ্ঞানেও সেই অবস্থা হয়। জ্ঞানে ভাল মন্দ দুটোর সমতা রক্ষা করে। মন্দ কথায় উদ্বিগ্ন হলে ত মন চঞ্চল হ'ল। **মন্দটাকে ভাল ক'রে নিতে জানলে তবে আনন্দ।** কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে কোন কথা হোক, গোপীদের ভাল লাগে, কারণ এ ত কৃষ্ণেরই কথা, অপর কারুর নয়। **যাকে ভালবাসা যায় যে উপায়েই হোক তার কথা শুনলেই আনন্দ।** সংসারীরা এ সব ভাব নিতে ত যায় না, তারা চায় সংসারীয় ভাবের রং, তামাসা, বিচ্ছেদ এবং মিলন রস ইত্যাদি; তাই কীর্ত্তন ভেঙ্গে গেলেই আবার সেই সম্পূর্ণ সংসারীয় ভাব নিয়ে থাকে। আমাদের হিন্দুদের ত ভাল কথা শুনতে বা জানতে বাকী নেই; শাস্ত্র গ্রন্থে ঢের ভাল কথা লেখা আছে কিন্তু সে গুলো কি ধ'রে চলতে পারে? সৎ সঙ্গে থাকলে সেই গুলো ধরিয়ে দেয় ও সেই মত কাজ করিয়ে নেয়। যে ত্যাগী নয়, তার কথা শুনে অনেক সময় কেউ কেউ মুগ্ধ হয়ে হয়ত তার কথা অনুযায়ী কিছু চলতেও চেষ্টা করে, যদিও সে নিজে হয়ত কিছুই মেনে চলতে পারে না, কারণ যেখানে বেশী পয়সা সেই খানে তার বেশী কথা বেরয়। কেউ বা আবার তার কথা শুনে প্রাণে প্রাণে তার ভাব গ্রহণ ক'রে ত্যাগী হয়ে বেরিয়ে যায়। তবে এ অতি বিরল। নিজে **ত্যাগী না হলে তার বাক্যের কোন শক্তি**

থাকে না। ত্যাগীর সঙ্গে শীঘ্র শীঘ্র কাজ হ'তে থাকে ; তবে এই ত বললুম কেউ হয়ত এমন থাকতে পারে, যে ভোগীর মুখেই সৎ কথা শুনে বেরিয়ে গিয়ে সাধনা করতে থাকে।

এর একটী গল্প আছে।

এক গুরু ঠাকুর শিষ্য বাড়ী গেছেন ; শিষ্য বড় লোক, দরকার বোধ করুক আর নাই করুক একটা গুরু ক'রে রাখতে হয় সেই ভাবে গুরু করেছে এবং গুরু এলে উপযুক্ত খাতির, যত্ন ও বিদায়ের ব্যবস্থাও ঠিক ক'রে রেখেছে। আর গুরুও সেই ভাবে মাঝে মাঝে শিষ্যের বাড়ী এসে, 'অহঃরহ তার মঙ্গল কামনা করছে' প্রভৃতি নানা মিষ্ট কথায় শিষ্যকে তুষ্ট ক'রে বিদায়ের ব্যবস্থাটা ঠিক বজায় রেখে যায়। শিষ্যের একটী চাকর ছিল, অনেক দিন থেকে তার বড় ইচ্ছা যে সে এই গুরু ঠাকুরের কাছে মন্ত্র নেয়, কিন্তু কি ক'রে বলে। সে গরীব মানুষ, তার ত আর এত টাকা নেই যে সে গুরু ঠাকুরকে তার মনীবের মত এত যত্ন করতে বা ঠিক মত বিদায় দিতে পারবে। এই ভেবে সে প্রায়ই নিরস্ত হয়, কিন্তু তার মন কিছুতেই মানতে চায় না ; আরও যেন দিন দিন আকাঙ্খা বেড়ে যেতে লাগল। এবার তার মন বড়ই অস্থির হ'ল, তাই সে আর থাকতে না পেরে এক দিন একটু আড়াল পেয়ে গুরু ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে পড়ল এবং বলতে লাগল, 'ঠাকুর মশাই, আপনি ত মহাপুরুষ, কত লোকের মঙ্গল করছেন, কত লোককে দীক্ষা দিয়ে উদ্ধার করছেন কিন্তু আমি অধম, এই দাসত্ব ক'রে যে কয়টী টাকা পাই কোন রকমে সংসার প্রতিপালন ক'রে দিন কাটাই ; আমি অতি গরীব আমার এক পয়সাও সংস্থান নেই। এত দিন এই জীবন কেবল টাকা রোজগারে কাটিয়ে দিলুম তা ছাড়া আর ত কিছু জানিনি বা করিনি, কিন্তু আমার প্রাণে একটা বড় জোর ইচ্ছা হয়েছে আপনার কাছে একটু কিছু মন্ত্র নিয়ে দেহটা শুদ্ধ করি। ঠাকুর মশাই, অনেক দিন থেকেই আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে, তবে গরীব মানুষ

আমার ত টাকা পয়সা নেই তাই আপনাকে সাহস ক'রে বলতে পারি-নি। যদি নিজ গুণে এই অধমের প্রতি দয়া ক'রে কিছু দেন ত এই দেহটা শুদ্ধ হয়, নইলে আমার ত কোন গতি হবে না।' গুরু ঠাকুর এই শুনে ভাবলে, এ চাকর, এ আবার মন্ত্র নিয়ে কি করবে তবে এত ধরেছে যা হোক একটা কিছু ব'লে দিয়ে যাই। এই ভেবে, যেন উপস্থিত একটা যা হোক কিছু ব'লে তার হাত থেকে ছাড়ান পাবার জন্যে, খুব তাচ্ছিল্য ভাবে বললে 'আচ্ছা যা বেটা যা, তোর 'ইষ্ট' রইল 'শূকর'।' কিন্তু সেই চাকর গুরু ঠাকুরের সেই কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে প্রণাম ক'রে বললে 'ঠাকুর মশাই আপনার বড় কৃপা, আজ আপনি দয়া ক'রে মন্ত্র দিলেন ব'লে এই দেহটার কিছু সদ্‌গতি হবে, তা ছাড়া আমার ত কিছুই করবার ক্ষমতা নেই।' গুরু ঠাকুর আর কিছু বললেন না তবে ওর হাত থেকে যা হোক চালাকি ক'রে ছাড়ান পেয়েছেন দেখে মনে মনে একটু হাসলেন। এদিকে সেই চাকরের ঠাকুর মশায়ের মন্ত্রের ওপর ভারী জোর বিশ্বাস; সে সম্পূর্ণ মন দিয়ে রোজ 'শূকর' 'শূকর' নাম জপ করে, আর কেঁদে বলে 'দয়াময়! আমি ত কিছু জানিনা, আমার ত কিছু মাত্র ভক্তি নেই, আমার প্রেম নেই, আমার শাস্ত্র পড়া নেই বা কোন রকম স্তব স্তুতি জানা নেই যে তাই দিয়ে আপনাকে ডাকব। ঠাকুর মশাই দয়া ক'রে এই নাম দিয়ে গেছেন তাই শুধু সেই নাম করি, আর ত কিছু আমি পারি না। যদি আপনি নিজ গুণে দয়া করেন, তবেই এই অধমের গতি হবে।' এই ভাবে সে রোজ ডাকে ও কাঁদে। ক্রমশঃ তার যত নামে ভক্তি আরও বাড়তে লাগল তত সে চব্বিশ ঘণ্টাই প্রাণ ভ'রে 'শূকর' 'শূকর' নাম জপ করে ও কেঁদে ভাসায়, এবং নিজে যা কিছু খায় সমস্তই আগে তাঁকে নিবেদন করে তারপর খায়। এই দেখ ভালবাসার স্বভাব; ইষ্টকে নিবেদন ক'রে খাবার কথা ত তাকে ব'লে দেওয়া হয় নি; কিন্তু এখানে যে জোর ভালবাসা পড়েছে তাতে যার ওপর ভালবাসা পড়েছে,

বল আর নাই বল, আপনা হতেই তাকে নিজের যেটা প্রিয় সেটা নিবেদন না ক'রে থাকতে পারে না ব'লে এই ভাবে সে প্রতিদিন নিজের খাবার প্রস্তুত ক'রে তাঁকে নিবেদন ক'রে তবে সে খেত। সে রোজ খাবার সাজিয়ে দিয়ে ডাকে আর কেঁদে বলে 'আমি অতি গরীব, আমার ত আর কিছু নেই যে আপনাকে দোব ; গরীবের প্রতি দয়া ক'রে যদি এই সামান্য খাবার খান তাহলে আমি চরিতার্থ হই।' তা দেখ ভালবাসার লক্ষণ, যাকে ভালবাসে তাকে না খাইয়ে খেতেও পারে না আর ভালও লাগে না। যত সামান্যই হোক, আমার যখন ভাল লাগছে, তখন যাকে ভালবাসি তাকে ত দিতে হবে। রাখাল বালকেরা মাঠে ফল খেতে খেতে যেই মিষ্টি লেগেছে অমনি ছুটে এসে কৃষ্ণকে বলছে 'দেখ ভাই কি মিষ্টি ফল, একটু খেয়ে দেখ।' এ যে তাদের এঁটো সে লক্ষ্য নেই, মিষ্টি লেগেছে কৃষ্ণকে খাওয়াতে হবে। আর কৃষ্ণও রাখাল বালকদের সরল ভালবাসায় এত মুগ্ধ যে তাদের সেই এঁটো ফলই আনন্দের সহিত তৃপ্তি ক'রে খেলেন। রোজ এই ভাবে ডাকতে ডাকতে ও কাঁদতে কাঁদতে এক দিন দেখে সত্যি সত্যি এক শূকর মূর্ত্তি এসে তার থালা থেকে খাচ্ছে। এই দেখে সে বললে 'দয়াময়! এসেছেন! আমি ত আপনার পূজা জানিনি, ধ্যান জানিনি, আমি ত আপনাকে ঠিক ভাবে ডাকতে জানিনি, ও পারিনি তবু আপনি নিজে দয়া ক'রে এসেছেন! আজ আমার কি অদৃষ্ট! কি সৌভাগ্য! ভাগ্যিস গুরু ঠাকুর দয়া ক'রে এই নাম দিয়েছিলেন তাই ত প্রভু আজ আপনার দর্শন পেলুম।' এই ভাবে কিছুদিন যায়, রোজই সে দেখে যে খাবার নিবেদন করলেই শূকর মূর্ত্তি এসে খান, এমন সময় একদিন গুরু ঠাকুর আবার শিষ্য বাড়ী এসেছেন। চাকরটী এসে প্রণাম করতেই গুরু ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে কেমন আছিস্, জপ তপ কেমন করছিস্।' তখন সে কেঁদে বললে 'আহা! ঠাকুর মশাই, আমি ত বেশ ভাল আছি ও জপ তপ বেশ করি, কিন্তু আপনার মন্ত্র কি জাগ্রত!' গুরু ঠাকুর বললে 'কি রকম?

জাগ্রত কি রকম?' চাকরটী বললে, 'হ্যাঁ, ঠাকুর মশাই, আমি রোজ আমার খাবার তৈরী ক'রে থালায় সাজিয়ে দিয়ে নিবেদন ক'রে কেঁদে কেঁদে আপনার দেওয়া শূকর মন্ত্র জপ করি আর ডাকি 'দয়াময়! দয়া ক'রে এই গরীবের খাবার খেয়ে আমায় কৃতার্থ করুন আর অমনি তিনি শূকর রূপ ধ'রে এসে খেয়ে যান ও আমার জন্যে পেসাদ রেখে যান এবং আমি সেই পেসাদ রোজ খাই। গুরু ঠাকুর শুনে চমকে উঠে বললেন 'সে কি রে, বলিস কি রে! শূকর রূপে এসে খেয়ে যান! আমায় দেখাতে পারিস্?' চাকরটী বললে, হ্যাঁ, ঠাকুর মশাই, আপনাকে দেখাব।' তারপর খাবার দিয়ে রোজ যেমন ডাকে সেই রকম ডাকতেই শূকর রূপ এসে খেতে লাগলেন। চাকর তখন ব'লে উঠল 'ঐ দেখুন ঠাকুর মশাই! ঐ দেখুন খাচ্ছেন! প্রায় সব খাওয়া হয়ে এল, আর আমার জন্যে একটু প্রসাদ রাখলেন!' গুরু ঠাকুর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না বটে তবে থালার ভাত যে ক'মে আসছে এটা বেশ দেখতে পাচ্ছেন। তখন গুরু ঠাকুর কাতর ভাবে বললে, 'ওরে তুইই ধন্য, আমি যে মহা পাপী রে, আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, আমায় একবার দেখা! ওরে আমায় একবার দেখা!' তখন চাকর বললে 'দয়াময়! আজ এই ঠাকুর মশায়ের কৃপাতেই আমি আপনাকে দেখছি, দয়া ক'রে তাঁকে একবার দেখা দিন।' তখন শোনা গেল 'তুই স্পর্শ কর তবে ও দেখতে পাবে।' চাকরটী গুরুঠাকুরকে স্পর্শ করতেই দু'জনে দেখতে পেলে যে সত্যি শূকর মূর্ত্তিতে এসে থালা থেকে খাচ্ছেন। চাকর তখন কেঁদে গুরুর পায়ে প'ড়ে বললে ঠাকুর মশাই এ কেবল আপনারই দয়ায় হয়েছে; আমার কোন সাধ্য নেই যে আমি তাঁকে ডাকি; আপনি দয়া ক'রে আমায় কি নামই দিয়েছিলেন যে আপনার দয়ায় আমার ইষ্ট দর্শন হ'ল।

তা দেখ, গুরুর ওপর কি বিশ্বাস! এখনও গুরুতে কি ভক্তি! এখনও তার বিশ্বাস গুরু দয়া ক'রে দিয়েছেন তাই দর্শন পেয়েছে তার নিজের সেই কাতর ভাবে অহঃরহ ডাকা, কান্না কিছুই ধরছে

নিলমণি সুরেন ঈশ্বরীপ্রসাদ অমূল্য দ্বিজেন সরকার তপেন কৃষ্ণকিশোর বীরেন

না, গুরুই সব করেছেন। তা দেখ, গুরু ঠাট্টা ক'রে যা তা ব'লে দিয়ে গেলেন কিন্তু শিষ্য গুরুতে এই অটল ভক্তি বিশ্বাসের জোরে সেই ঠাট্টার জিনিষকেও আসল জিনিষে দাঁড় করালে। তাই দিয়েছে 'যদিও আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায় তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।' এক বার যাঁকে গুরু ব'লে মেনে নিয়েছ আর তাঁ... কার্য্যের বিচার করতে যেও না। সদ্‌গুরু কখন কি ভাবে কি করেন তা কি তুমি ধরতে পার? তা হলে তুমিই ত সদ্‌গুরু হয়ে যেতে। তাঁর কি জ্ঞান আছে বা না আছে এ জানবার তোমার দরকার কি? একটা ঘটি নিয়ে সমুদ্র মাপতে যেও না। তাঁর একটী ভাবের সামান্য একটু বিন্দু মাত্র সহ্য করবার ক্ষমতা নেই, আর তুমি তাঁর সকল ভাবের ভেতর গিয়ে, তাঁর কাজের বিচার ক'রে, তাঁর ওপর আইন খাটাতে চাও? তাঁর অনন্ত শক্তি, তাঁর অনন্ত ভাব, তাঁর অনন্ত প্রেম! যেখানে যে ভাবে প্রয়োজন সেখানে সেই ভাবে কাজ করছেন। তাঁর অনন্ত প্রেম ছড়িয়ে কখন কি ভাবে কাকে কৃপা করছেন, তার এক কণামাত্রও বোঝবার শক্তি কাহারও নেই। তোমারও যখন সে ক্ষমতা নেই, তখন সে সব দেখবার বা বিচার করবারই বা তোমার প্রয়োজন কি? তোমার কাজ হচ্ছে **গুরুতে একনিষ্ঠ হওয়া এবং তাঁর বাক্য অবিচারে পালন করা, তা হ'লেই মঙ্গল হবে;** কারণ তুমি নিজের মঙ্গল অমঙ্গল মোটেই বোঝ না।

ঘোড়াকে সায়েস্তা করতে হলে, যেমন তার চোখে ঠুলি দিতে হয় যাতে সে কেবল সামনে ছাড়া আশে পাশে দেখতে না পায়, সেই রকম তোমার নিজের চোখের দু'দিকে ঠুলি দিয়ে অপর কোন দিকে না চেয়ে কেবল মাত্র তোমার গুরুর দিকে নজর রাখ। তোমার যে ভাব দরকার, অর্থাৎ যে ভাবে গতি করলে তোমার উপকার হবে, তোমার গুরুই বুঝে তোমাকে ঠিক সেই ভাব দিয়ে নিয়ে যাবেন। তোমার নিজের ভাব বা খেয়ালের ওপর চলতে চেষ্টা ক'রো না, কারণ নিজেই যদি

ঠিক ভাবে গতি করতে পারতে তা হলে ত গুরুর প্রয়োজন হ'ত না। গুরু অপরের সঙ্গে যে ভাবে ব্যবহার করেন তা নিতে যেও না, বা বিচার করতে যেও না, কারণ তাঁর বহু প্রকৃতি নিয়ে কার্য্য, কাজেই তিনি সকলের সঙ্গে ত তোমার ভাবে ব্যবহার করতে পারেন না। যখন তুমি নিজে সায়েস্তা হবে, যখন গুরুর সব ভাবই তোমার মিষ্টি লাগবে, যখন তাঁর সব ভাব ধরতে পারবে ও বুঝতে পারবে তখন চোখের ঠুলি খুলে ফেললে ক্ষতি হবে না। তাই অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত, স্থির বিশ্বাস না আসা পর্য্যন্ত সর্ব্বদা গুরুর সঙ্গ করতে নেই, সামলাতে পারবে না, লাভে প'ড়ে নিজের যে টুকু ভাব আছে সে টুকুও হয়ত ভেঙ্গে যেতে পারে।

সেই জন্য যত দিন না সে অবস্থা হয়, তত দিন অন্ধের মত কেবল গুরুকে ধ'রে তিনি যা বলবেন অবিচারে শুধু তাঁর কথা পালন ক'রে যাও। যত রকম বাধা, বিঘ্ন, সুবিধা, অসুবিধা সব তুচ্ছ ক'রে কাহারও কথায় কান না দিয়ে কেবল তাঁর কথা পালন ক'রে চ'লে যাও, তবে ত বোঝা যাবে সত্যিই তুমি নিজেকে অন্ধ ব'লে ধারণা করতে পেরেছ, সত্যিই তুমি গুরুর কাছে পথ খুঁজতে এসেছ, আর তখনই বোঝা যাবে তুমি ঠিক পথে গতি করতে পারবে। তা ছাড়া চোক বেঁধে কানা সেজে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে বাঁধার নীচে দিয়ে দেখছ অথচ গুরুর কাছে এসে অন্ধ সেজে তাঁর কাছে পথ দেখতে চাচ্ছ—এ ত ঘোর কপটতা। মনে ক'রোনা যে তিনি তোমার কপটতা ধরতে পারেন না। তবে **তিনি কাহারও দোষ গ্রহণ করেন না।** তাঁর কাজই হচ্ছে প্রত্যেকের ভাবে মিশে গতি করান; ভাল বল বা মন্দ বল, সুখ্যাত কর বা নিন্দা কর, ভালবাস বা গালাগাল দাও তিনি এ সব কিছুই ধরেন না। এ সব ভাব তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। **তিনি সদা মঙ্গলময়,** সর্ব্বদাই সকলের মঙ্গল চিন্তা করেন। **তিনি যখন যাকে যা বলেন, এমন কি যখন কাউকে**

কোন কারণে বা অকারণেও বকেন, সেও কেবল তার মঙ্গলেরই জন্যে। যে এইটে ঠিক বোঝে তারই বাস্তবিক কিছু লাভ হয়। আর যে তাঁর কাজের ওপর বিচার রাখে, নিজের বুদ্ধি খাটায়, তার পদে পদে পদস্খলন হয়। গুরুতে যার বিশ্বাস নেই, সে যদি গুরু না করে তার ততটা অপকার হয় না, কিন্তু এক বার গুরু ব'লে ধ'রে তাঁর কার্য্যের বা ভাবের ওপর দোষারোপ করলে, বড় অপরাধ হয়, এবং আত্মার অধোগতি হয়।

যদি বাস্তবিক নিজের উন্নতি করতে চাও, তবে এক মনে গুরু বাক্য পালন কর। গুরু তোমাকে যেটী যে ভাবে ব'লে দেবেন, কোন রকম বিচার বা দ্বিরুক্তি না ক'রে ঠিক সেইটী সেই ভাবে পালন ক'রে যাও। গুরুর তিরস্কারে কখনও বিচলিত হয়ো না বা গুরুর উপর বিশ্বাস হারিও না। গুরু তোমাকে যেটী বলেন বা আদেশ করেন, সেইটীই বীজ মন্ত্র ব'লে জ্ঞান করবে। এই ভাবে গতি করাই সংসারীদের পক্ষে প্রধান এবং একমাত্র সাধনা, অন্য সাধনার তাদের আর বিশেষ প্রয়োজন নেই। এটা জানবে যে আত্মার উন্নতির জন্য যেমন গুরু ভক্তি ও গুরুতে বিশ্বাস প্রধান ও একমাত্র সাধনা, তেমনি গুরুতে অবিশ্বাস ও তাঁর কার্য্যে দোষারোপ করার মত এ জগতে আর কোন জিনিষ এত সহজে ও এত তাড়াতাড়ি আত্মার অবনতি করাতে পারে না। গুরুতে অবিশ্বাস এলেই বুঝবে, উন্নতি ত দূরের কথা, অনেক নীচে প'ড়ে গেলে। যাহাতে গুরুর ওপর কিছুমাত্র অবিশ্বাস না আসে এ বিষয়ে নিজের জোর চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কখনও কোন রকমে বিন্দু মাত্র সন্দেহের ছায়া মনে লাগে, তখনই গুরুর কাছে সরল ভাবে সে সব ব'লে সন্দেহ মিটিয়ে ফেলবে, কিন্তু কখনও তাঁর সঙ্গ ছাড়বে না। কখনও কাহারও কথায়, সে যত বড়ই আপনার লোক হোক না কেন, এমন কি গুরু

সম্বন্ধে কাহারও তার নিজের চোখে দেখা প্রমাণ দিলেও, সে কথায় তিল মাত্র আস্থা রেখে মনে অবিশ্বাসের ছায়া লাগতে দিও না। **এটা স্থির জানবে যে তোমার কাছে তোমার গুরুর চেয়ে বড় ত দূরের কথা, গুরু/সমকক্ষ বা তাঁর মত এত আপনার লোক এ জগতে আর কেহই নাই এবং কেহ হতেও পারবে না।** যার গুরুতে ভালবাসা এসে গেছে, তার কথা আলাদা, কিন্তু অপরের পক্ষে নীতি বলই প্রধান। **যে ঠিক ঠিক নীতি পালন করতে পারে, ভগবান তার ওপর সদয় হন ও তার মঙ্গল করেন। আর যে তাঁর ওপর নির্ভর করে, তিনি তার সকল ভার নিজে গ্রহণ করেন। তিনি ভক্তের দুঃখ দেখতে পারেন না।**

দ্বিজেন গাহিল—

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
হ'য়ে পূর্ণকাম বলব হরি নাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রু ধার॥
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন।
সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার॥
কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন।
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তি পথে অনিবার॥
(হায়) কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম।
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার॥
মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্ত পদ ধুলি, কাঁধে লয়ে ি বৈরাগ্যের ঝুলি।
পিব প্রেম বারি দুই হাতে তুলি অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার॥
প্রেমে পাগল হ'য়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব।
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরি পদে নিত্য করিব বিহার॥

তৃতীয় ভাগ—উনত্রিংশ অধ্যায়

কলিকাতা ; বৃহস্পতিবার ২২শে আষাঢ় ১৩৪০ সাল ;
ইং ৬ই জুলাই ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, প্রফুল্ল, নগেন, পুণ্ড্র, শিরিশ, কালু, জিতেন, শ্যাম, তারাপদ, কৃষ্ণ দত্ত, হর প্রসন্ন, কৃষ্ণ কিশোর, ললিত ভট্টাচার্য্য, দ্বিজেন সরকার, সুধাময়, পঞ্চানন, ললিত, জ্ঞান, দ্বিজেন, কালী মোহন, অরুণ, মতি, ভোলা ও অভয় আছে।

জিতেন। বৃদ্ধের দ্বারা কঠোরতা করা চলে না, আর লোল চর্ম্ম, পাকা চুল, এই সব দেখলেই বৃদ্ধ ব'লে বোঝা যাবে ত ? তখন এদের আর সংসার ছাড়া উচিত নয় ত ?

ঠাকুর। কেন, শাস্ত্রেই ত ব্যবস্থা রয়েছে 'পঞ্চাশ উর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ'। তুমি যা বলছ সেটা ত দেহের লক্ষণ, কিন্তু ভেতরের শক্তির দ্বারা বোঝা যাবে বৃদ্ধ কি যুবা। যুবা অবস্থায় যদি বৃদ্ধের মত ব্যবহার করে, সে বৃদ্ধ, আর বৃদ্ধ বয়সেও যদি যুবার মত গতি করতে পারে সে যুবা। পাকা চুল ত কলপ দিলেই কাল করা যায়, লোল চর্ম্ম ইত্যাদি দেহের তদ্বির করলে খানিকটা কমতে পারে, কিন্তু তাতে এসে যায় না, ভেতরের শক্তিই আসল। তবে হ্যাঁ, যখন দেহটা শক্ত এবং সবল থাকে, তখন কঠোরতা ও সংসার ছাড়ার কথা বরং ভাবা চলে। তা ছাড়া যেখানে বহু কামনা, সেইখানেই জনতা, সংসার ; আর যেখানে শুধু একটী কামনা, যেমন ভগবৎ কামনা, সেখানেই বন। বন মানেই ত্যাগ ; ত্যাগীরা বনে গিয়েও আনন্দে থাকে। কিন্তু বনে গিয়েও যদি নিরানন্দ, দুঃখ এ সব আসে তাহ'লে আর বন হ'ল কোথায় ? যে দেহটাকে তুচ্ছ করতে পারে, রোগ বা অনাহারে যার ভয় নেই, যার ভেতর 'কুছ্ পরোয়া নেই' এই ভাব আছে, সেই কেবল বনে যাবার উপযুক্ত। ভোগীদের কাছে বন বললেই

ভয় হবে। ত্যাগের ভাবকে খুব জোর ক'রে মনে না ধরলে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না।

নগেন। বাসনা গেলে 'আমি' আর থাকে না ব'লে ভয় হয়, তখন নির্ভর ভাব।

ঠাকুর। 'আমি' থাকে না ব'লে যে ভয় খাচ্ছ এইটাই ত বাসনা কাজেই বাসনা চ'লে গেলে 'আমি' আপনিই চ'লে যাবে তখন আর ভয় কোথায়? যত ক্ষণ ভয় রয়েছে তত ক্ষণ বাসনাও রয়েছে। নির্ভর করা খুব ভাল। যত নির্ভর করতে পারবে তত আনন্দ, তত শান্তি।

নগেন। অহঙ্কার তাড়াবার উপায় কি?

ঠাকুর। বাসনাই অহঙ্কারকে বাড়িয়ে দেয়। রাজা হবার ইচ্ছা আছে ব'লেই রাজাকে বড় কর। তাই বড় হলেই অহঙ্কার। বাসনা গেলেই অহঙ্কার আপনি চ'লে যাবে।

হরপ্রসন্ন। 'রসনা বিজয়ে বাসনা বিজয়' এ কথার মানে কি?

ঠাকুর। রসনা রস আস্বাদন করে। রস সকল জিনিষের সার এবং উপভোগের বিষয়। রস বেরিয়ে গেলে শুক্‌নো ছিবড়ে প'ড়ে রইল বই ত নয়। তেমনি যে কোন জিনিষের সারাংশ থেকেই বাসনার উৎপত্তি। তাই এখানে রসনা বিজয় বলতে শুধু খাওয়ার লোভ জয় বোঝায় না, মন যে যে রস উপভোগ করে সমস্ত জয় বোঝায়, কারণ শুধু রসনা লোভ অর্থাৎ খাওয়ার লোভ জয় হলেই সব বাসনা নিবৃত্তি হয় না।

পুত্তু। সে কালে মুনি ঋষিরা কথায় কথায় রাগ করতেন এবং অভিশাপ দিতেন, তাঁরা যদি এত রাগের বশীভূত হলেন তবে আর কি হ'ল?

ঠাকুর। দেখ, সাধুদের দুই ভাব আছে, শান্ত ও রুদ্র। সাধারণ মানুষের ভেতর পশু প্রকৃতি আছে। পশুদের যেমন দণ্ড না দেখালে তারা মানে না, তেমনি রুদ্র মূর্ত্তি না দেখালে পশু প্রকৃতি লোকদের সঙ্গে সব সময় ব্যবহার করা চলে না। আবার যখন প্রেমে বা

ভালবেসে গতি করে, তখন শান্ত ভাব। মুনি ঋষিরা কখনও বাজে কাজে বা নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য শাপ দেন নি। যেখানেই অভিশাপ দিয়েছেন সেই খানেই দেখা গেছে ভবিষ্যতে অপর কাহারও কোন উপকার হয়েছে। মুনির আবার বহু স্তর আছে; হয়ত নিম্ন-স্তরে যখন সাধনা করছে তখন হঠাৎ একটা অন্যায় ক'রে ফেলতে পারে, কিন্তু যে ঠিক মুনি অর্থাৎ যে মনকে জয় করেছে, সে যদি কখনও ক্রোধ দেখায় তখন সেটা লোকের মঙ্গলের জন্যই, কারণ তার নিজের ত আর কোন স্বার্থ নেই। যত ক্ষণ ঠিক সে অবস্থায় না পৌঁছুচ্ছে, তত ক্ষণ কিছু হের ফের হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন সৌভরী মুনির হয়েছিল। গরুড় মাছ ধ'রে খেত; এক দিন মাছেরা এসে সৌভরীকে বললে 'তোমার এখানেও আমরা নির্ভয়ে বেড়াতে পারছি নি, এখানেও গরুড়ের ভয়! এখানেও হিংসা!' এই শুনে তিনি এই ব'লে গরুড়কে অভিশাপ দিলেন 'আজ যে তোমাদের খেতে আসবে সে ধ্বংস হবে।' গরুড় এ কথা জানতে পেরে সৌভরীকে বললে 'এ আমাদের খাদ্য খাদকের সম্বন্ধ, এখানে হিংসা কোথায়? তুমি যখন সাধারণ মানুষের মত অকারণে রাগের বশীভূত হয়ে অন্যায় ব্যবহার করলে, তখন তোমার তাদের মত বৃত্তি হ'ক, তুমি সংসারে যাও।' সেই জন্যে সৌভরীকে বহু কাল যাবৎ জলের ভেতর ব'সে তপস্যা করা সত্ত্বেও জলের ভেতর দুটো মাছকে খেলা করতে দেখে তাঁর বিয়ে করতে ইচ্ছা হ'ল এবং তিনি সংসারে গেলেন।

কালী মোহন। শিষ্য সদ্‌গুরুর সঙ্গ করতে করতে দেহ রাখলে তার পরও সূক্ষ্ম শরীরে তাঁর কাছে আসে ত?

ঠাকুর। যাদের ঠিক ভালবাসা বা ঠিক বিশ্বাস আছে তারা আসতে পারে। তবে সব সময় সব আত্মা এখানে আসতে পারে না, কারণ দেহ যাবার পর হয়ত এমন লোকে আছে যেখান থেকে ও ভাবে এখানে সূক্ষ্ম শরীরে আসা যায় না। তা ছাড়া সৎগুরু কে? যাঁর

ভেতর ভগবৎ শক্তি খেলছে তিনিই সৎগুরু। তিনি ত সর্ব্বদাই শিষ্যের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করছেন, কাজেই শিষ্য দেহ ত্যাগ করবার পরও সেই শক্তির প্রভাবে তার সেই সব লোকের বন্ধন মুক্ত হয়ে গেলে সে আসতে পারে।

নগেন। রাধাস্বামীদের কিন্তু এ মত নয়; তারা বলে যত ক্ষণ এই দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে তত ক্ষণই কাজ হবে।

ঠাকুর। অথচ তাদের মতে গুরুই সব। আর ধারাবাহিক জীবন মানেই সেই গুরু অপর দেহে এসেছেন। অন্য দেহের ভেতর দিয়েও কাজ হয়। ছেলে এখানে ব'সে তার মৃত পিতার উদ্দেশ্যে কাজ করলে হতে পারে, আর গুরু দূরে থেকে কাজ করতে পারবেন না? তাও কি হয়?

অরুণ। মোহ আর ভালবাসা কি এক?

ঠাকুর। মোহের মধ্যে ভালবাসা থাকে। স্বার্থশূন্য হ'লে ভালবাসা হ'ল আর রূপে আকর্ষণ থাকে ব'লে মোহ। পূর্ণ ভালবাসা এলে কিছুই নজর থাকে না, সব তাকে অর্পণ ক'রে ফেলে। মানুষ মাত্রেরই 'নিজের মত' ব'লে একটা জিনিষ আছে। এটা যত ক্ষণ থাকে তত ক্ষণ নিজের ব'লে কিছু রইল; কিন্তু পূর্ণ ভালবাসা এলে 'আমার' ব'লে কিছুই থাকে না, তখন 'আমি কি বুঝি' এই রকম একটা ভাব আসে। তখন আমিত্ব নষ্ট হতে থাকে এবং সে ভাবে 'আমার শক্তি বা বুদ্ধি কত টুকু যে আমি বিচার করব?' তোমরা মৌখিক যা সব বল, 'আপনাকে ভালবাসি তাই আমি আসি', এ ত ঠিক প্রাণের কথা নয়। অবশ্য কিছু যে না ভালবাস তা নয়, তা না হলে ত মোটেই আসতে না। ঠিক যদি আমায় ভালবাস, তবে আমার কথা মত চল, নিশ্চয়ই ভাল হবে। সে ভাবে যে চলে তার আলাদা অবস্থা।

কালু। 'সকাল দেখলেই সন্ধ্যা বোঝা যায়' এ কথার অর্থ কি?

ঠাকুর। সকাল কি ভাবে আরম্ভ হ'ল দেখে সন্ধ্যা কি ভাবে হবে নির্ণয় করা; কিন্তু সাধু ভিন্ন এ কথা ঠিক নির্ণয় করতে পারে না।

কিছু ক্ষণ পরে ঠাকুর বলছেন—

ঠাকুর। নিজের দোষ না দেখে মানুষের দোষ দেখাটা বড় খারাপ। অপরের দোষ দেখার চেয়ে নিজের দোষ গুলি ছাড়তে পারলে ঢের উপকার হয়। দোষ সকলেরই আছে, নিজের দোষটা নষ্ট করবার চেষ্টা কর। যদি নিজের উন্নতি করতে চাও ত অপরের গুণ নেবে, দোষ দেখবে না; দোষ দেখলে বড় হতে পারবে না। সাধারণ লোকের যদি সঙ্গ করতে হয় তা হলে সেই সঙ্গটা শুধু তার গুণ দেখবার জন্যেই হওয়া উচিত। তার পর তার গুণ জেনে নিয়ে সঙ্গ ছেড়ে দিতে পার।

কালু। গুণ দেখতে গিয়ে তার দোষটাও নিয়ে ফেলতে পারে ত ?

ঠাকুর। সেটা ত তোমারইভুল। সংসারে এত সাধু, সৎ লোক থাকতে গুণের জন্য প্রথমেই অসৎ লোকের সঙ্গ করতে যাচ্ছ কেন ?

অরুণ। মন নীচগামী হয়ে গেলে, তাকে কি ক'রে আবার তোলা যায় ?

ঠাকুর। সেই জন্যেই ত সৎ সঙ্গ। সঙ্গই প্রধান। সব সময় যদি না পার, অন্তঃত নিয়মিত কিছু সময় সাধু সঙ্গ করলে এবং তাঁর উপদেশ পালন করলে, আবার মনকে তুলতে পারবে।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। তাঁর ইচ্ছায় তোমাদের সব মঙ্গল হোক। রোজ অন্তঃত কিছু সময়ের জন্য নীতি পালন ক'রে সঙ্গ করবে। সঙ্গই হচ্ছে প্রধান। ত্যাগীর সঙ্গ করলে ধীরে ধীরে ত্যাগ শিক্ষা করবে এবং ক্রমশঃ শান্তি পাবে। মুখে খুব বড় বড় ত্যাগের কথা বললেই যে ত্যাগী হ'ল, বা সাধু হ'ল তা নয়। শাস্ত্র অনুযায়ী যে শুধু বলে সে ত্যাগী নয়, শাস্ত্র অনুযায়ী যে চলে সেই ত্যাগী। শাস্ত্র মানে যার দ্বারা মনকে শাসন করা যায়; তা শুধু শুধু কতক গুলো পড়লে বা মুখস্থ করলেই ত হবে না, সেই সেই উপদেশ অনুযায়ী চললে মন তৈরী করতে পারবে। এখানে সুখ দুঃখ ভোগ করতে এসেছ, বিশেষতঃ কলিতে ত্রিপাদ দুঃখ, এক পাদ সুখ।

সদ্‌গুরুর সঙ্গ করলে অনেক দুঃখ কেটে যায় ও কর্ম্ম ক্ষয় হয়; তখন সে ঠিক পথে গতি করতে পারে। সদ্‌গুরুর কার্য্যই হচ্ছে শিষ্যের কর্ম্ম ক্ষয় করিয়ে ত্যাগ শিক্ষা করান। বিনা ত্যাগে শান্তি আসবে না।

গুরু তিন প্রকার—এক হচ্ছে টাকা নেয়, মন্ত্র দেয়, আবার বার্ষিকের সময় শিষ্যের সঙ্গে দেখা করতে আসে, এ হচ্ছে অধম গুরু। আর আছে টাকা নেয়, মন্ত্র দেয়, এবং শিষ্যকে কিছু উপদেশ দেয় ও শিষ্যের খোঁজ রাখে, এরা হচ্ছে মধ্যম গুরু। কিন্তু সদ্‌গুরুর কাছে টাকা, কড়ি, দিন, ক্ষণ, হোম, যাগ, যজ্ঞ এ সব কিছুরই সম্বন্ধ নেই। এঁদের কোন স্বার্থ বা অভাব থাকে না। এঁরা ভালবেসে আপন করেন এবং যাহা দ্বারা শিষ্যের বাস্তবিক উন্নতি হবে সেই রকম কাজ জোর ক'রে করিয়ে নেন। এঁরা পূর্ণ ত্যাগী। ত্যাগী না হলে ভোগ বাসনার ভেতর থেকে ভক্তকে ঠিক আপনার মত ভালবাসতে পারবে না। তবে সংসারীয় ভক্তদের নিয়ে যাবার জন্য কিছু সংসারীয় ভোগের জিনিষ রক্ষা করতে হয়, তা না হলে তারা যে আসতে পারবে না। এতে আবার অনেকের হয়ত মনে হতে পারে যে 'বা! ইনি ত নিজে বেশ ভোগের ভেতর রয়েছেন, আর মুখে ত্যাগের শিক্ষা দিচ্ছেন!' কিন্তু তারা যদি কিছু দিন ঠিক ঠিক সঙ্গ করে তা হ'লেই বুঝতে পারে যে তাঁর ভোগের দ্রব্যে কোন আসক্তি নেই, এবং নিজের কোনও প্রয়োজন নেই।

ত্যাগীদের প্রধান আনন্দ ভক্ত সঙ্গ। শিষ্যেরও আবার ঠিক সৈন্যের মত ভাব হওয়া চাই। সেনাপতির হুকুমের মত গুরুর আদেশ অবিচারে পালন করা চাই। যে উন্নতির জন্য ভাল, মন্দ, লাভ, লোকসান, স্বার্থ

ইত্যাদি ছাড়তে পারে সেই ঠিক উন্নতি করতে পারে। **অবিচারে গুরু বাক্য পালনের নামই গুরুসেবা।** গা, হাত, পা টেপা, ভাল ভাল খাওয়ান ইত্যাদি লৌকিক সেবা; এ সব ভোগী গুরুদের ভাল লাগতে পারে, ত্যাগী গুরু এ সব মোটেই চান না; তিনি দেখেন শিষ্য তাঁর জন্যে কতটা স্বার্থ ত্যাগ করতে পারছে, তাঁর জন্যে কতটা কষ্ট করতে পারে এবং তাঁর ওপর কতটা বিশ্বাস ও ভক্তি রেখেছে। ত্যাগী না হলে কি বিভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গে মিশে তাদের প্রত্যেকটীকে যার যার ভাবে গতি করাতে পারেন? সংসারে লোকে দু' একটী প্রকৃতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে মাথা খারাপ ক'রে ফেলবার জোগাড় করে, আর তাঁদের বহু প্রকৃতি নিয়ে কাজ, সকলেই তাঁকে বড় আপনার লোক ভেবে তাঁর উপদেশ শুনে গতি করছে। **বিচার করতে গেলেই সংশয় আসবে।** তাই গুরু সেবায় সকলে থাকতে পারে না, কারণ সেবা করতে গেলে সর্ব্বদা তাঁর কাছে থাকতে হবে ও তাঁর সকল ভাবের সঙ্গে মিশতে হবে। তাঁর প্রত্যেক ভাবটী মিষ্টি না লাগলে এ ভাবে সেবা করা শক্ত কেননা যেই তাঁর কোন ভাব ভাল লাগবে না অমনি সে সম্বন্ধে তাঁর কাজের ওপর বিচার আসবে ও সংশয় আনিয়ে দেবে। তাই স্থির বিশ্বাস না এলে ভক্ত হয় না, এবং যত ক্ষণ তা না আসে তত ক্ষণ গুরু সেবার ভার লওয়ার যোগ্য হয় না। এইখানে ঠাকুর 'শিখ গুরু নানক, তাঁর দুই পুত্র ও ভক্তের' গল্প বলিলেন। (অমৃতবাণী ১ম ভাগ ১৪৫ পৃষ্ঠা)।

যে গুরুতে মন প্রাণ সব দিয়েছে সেই আসল ভক্ত; সে জোর ক'রে গুরুর ভালবাসা টেনে নেয়। অপরে তার হিংসা করে; বিশেষতঃ আত্মীয়রা আরও বেশী হিংসা করে। তারা মনে করে যে 'আমরা আপনার লোক, আত্মীয়, আমরা থাকতে ও আবার একটা কোথাকার কে, যে সে আমাদের চেয়েও বেশী আপনার হ'ল?' এই রকম ভেবে তারা অনেক সময় আবার শিষ্যের অনিষ্ট করবার চেষ্টা করে। যখনই গুরুসেবা

করতে গিয়ে মনে সংশয় আসে এবং তাঁর কোন কার্য্য ভুল বা অন্যায় ব'লে মনে হয়, তখনই বুঝতে হবে যে তুমি তাঁর বুদ্ধির ওপর বিচার রাখছ, এবং তাঁর চেয়ে নিজেকে বেশী বুদ্ধিমান ঠাওরেছ। এটা প্রাণ হীন গুরুসেবা। **প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধাই হচ্ছে গুরুসেবার প্রাণ। বিচার করতে গেলেই গুরুর শক্তিটা ছোট ক'রে ফেললে।** যদি ঠিক ভাব রক্ষা করতে না পার, ত দূরে চ'লে যাও, মেলা সংসারীয় ভাব নিয়ে তাঁর কাছে সব সময় থাকতে যেও না। এমন দেখা যায়, সকলে সব ছেড়ে বেরিয়ে এসে সর্ব্বদা গুরুর কাছে প'ড়ে আছে, সকলেরই বেশ উন্নত অবস্থা, সকলেই দেহ, মন, প্রাণ সব দিয়ে গুরুসেবা করবার চেষ্টা করছে তবুও তাদের ভেতর ভাবের তফাৎ থাকে। এইখানে ঠাকুর লালা বাবু, চরণ দাস ও ভগবান দাসের গুরুসেবার গল্প বলিলেন (৩৬ পৃষ্ঠা)।

সকলেই সব ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে এবং সবাই বলে যে দেহ, মন, প্রাণ দিয়ে গুরুসেবা করছে। সকলেরই উন্নত অবস্থা তত্রাচ সকলে অকপটে গুরুসেবা করলেও এবং সকলে এক কথা বললেও তাদের ভাবের তারতম্য রয়েছে। লালা বাবু ও চরণ দাস দু'জনের কেহই কুষ্ঠ রোগ বা অপর কোন জিনিষের জন্য ভ্রূক্ষেপ করলে না বটে কিন্তু গুরুর শ্রীঅঙ্গে পা দিতে পারলে না। ভগবান দাস গুরুকে বললে পা দিয়ে টিপে দিলে যখন আপনার আরাম হবে বলছেন, আর আমি যখন দেহ, মন, প্রাণ সব আপনাকে দিয়েছি তখন এ পাও ত আমার নয়, আপনারই পা দিয়ে আপনার সেবা করব তাতে আবার চিন্তা কি। এই ব'লে পা দিয়ে টিপে দিলে। তা দেখ, এর ভেতরেও ভাবের স্তরের কত তারতম্য রয়েছে। কাজেই শুধু মুখে বললেই বা মনে মনে ভাবলেই হয় না যে আমি দেহ, মন, প্রাণ সব দিয়ে গুরুসেবা করছি। পূর্ণ বিশ্বাস আসা ও বাস্তবিক দেহ, মন, প্রাণ ঠিক ঠিক সমর্পণ ক'রে ভক্ত হওয়া বড় শক্ত এবং অতি বিরল। যার এসে গেছে তার

ত সব আপনি হয়ে যায়; তা ভিন্ন এ অবস্থা আসা বড় শক্ত। তবে সংসারে থেকে নীতি ঠিক ঠিক পালন করতে পারলেও তিনি অনেক মঙ্গল করেন। ঠিক নিয়ম ক'রে নীতি পালন করলে এবং গুরু যেটী ব'লে দেবেন সেই আজ্ঞাটী ঠিক মত পালন করতে পারলে বোঝা যাবে যে মনটা একলক্ষ্য হয়ে আসছে। **মন কিছু উন্নত হলে তবে মনে কৃতজ্ঞতা ব'লে জিনিষ আসবে।** এখানে শিক্ষিত, অশিক্ষিত নেই, এটা মনের অবস্থার ওপর নির্ভর করে। কৃতজ্ঞতা ভুল হওয়া মনের অতি নিম্ন অবস্থা, এতে বোঝা যায়, ভেতর সব খুব সঙ্কীর্ণ জিনিষে তৈরী। এই খানে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাধের একলক্ষ্যতা ও কৃষ্ণ দর্শনের গল্প বলিলেন।

এক দিন একটী ব্যাধ বনের মধ্যে এক পাখি লক্ষ্য ক'রে শরে বিদ্ধ করতে পাখিটী প'ড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও প'ড়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেল। নিকটেই এক ঋষির আশ্রম ছিল; ঋষি তাই দেখে তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে দেখলে যে ব্যাধের গায়ে অনেক গুলি বিষধর পিপীলিকা কামড়ে ধ'রে রয়েছে এবং তাদের কামড়ে ব্যাধ অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। ঋষি তখনই ব্যাধের গা থেকে পিঁপড়ে গুলো ছাড়িয়ে তাকে আশ্রমে নিয়ে এসে মুখে জল দিয়ে বাতাস করতে করতে তার জ্ঞান হ'ল। খানিক পরে সুস্থ হ'য়ে ব্যাধ ঋষিকে বললে "আপনি কে? আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন; আমি এক জন সামান্য ব্যাধ, বলুন আমার দ্বারা আপনার কি উপকার হ'তে পারে? আমি প্রাণ দিয়েও তা করতে প্রস্তুত।' ঋষি তখন বললে 'ব্যাধ, তোমার যে একাগ্রতা ও এক লক্ষ্য তাতে তুমি আমার খুব বড় একটী উপকার করতে পার; আমার একটি ছেলে হারিয়েছে শ্যাম বর্ণ, মাথায় পাখির পালক ও হাতে বাঁশী, আমি তাকে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ব'লে ডাকি। অনেক দিন ধ'রে খুঁজছি কিন্তু পাচ্ছি না, যদি তুমি তাকে খুঁজে এনে দিতে পার ত আমার

বড় উপকার হয়'। ব্যাধ বললে 'আপনি যখন আমায় বাঁচিয়েছেন, আমি আপনার ছেলে খুঁজে আনবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করব, তাতে আমার দেহ যায় ক্ষতি নেই।' এই ব'লে ব্যাধ চারিধারে অনেক খুঁজে বেড়াতে লাগল কিন্তু কোথাও সে রকম ছেলে খুঁজে পেলে না। তখন সে ভাবলে যে রোজ নাওয়া খাওয়ায় ও ঘুমিয়ে ত অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে, সে সময়টাও খুঁজে দেখতে পারি। এই ভেবে সে আহারাদি সব বন্ধ ক'রে দিবা রাত্র বনে বনে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কয়েক দিন কেটে গেল কিন্তু কোন সন্ধানই পেলে না। ব্যাধ আবার ভাবলে যে তারা পরস্পর কেউ কাউকে চেনে না ত, তাই হয়ত ঠিক ধরতে পাচ্ছে না; তার চেয়ে নাম ধ'রে ডাকলে দূর থেকে শুনতে পেয়েও চ'লে আসতে পারে।

সে দিন থেকে ব্যাধ দিবা রাত্র আহার নিদ্রা ছেড়ে বনে বনে ডেকে বেড়াতে লাগল 'কৃষ্ণ! কোথা আছ ভাই! আমি যে কতদিন ধ'রে না খেয়ে না ঘুমিয়ে বনে বনে ডেকে বেড়াচ্ছি! দেখা দাও ভাই! আমি যে ভাই, তোমার বাবাকে কথা দিয়ে এসেছি যে যেমন ক'রে হোক তোমায় খুঁজে তাঁর কাছে নিয়ে আসব!' এই রূপে অনবরত কিছু দিন ডাকতে ডাকতে হঠাৎ একদিন দেখতে পেলে যে সেই রকম একটী রাখাল বালক দূরে গাছ তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে দেখতে শ্যাম বর্ণ, তার মাথায় পাখির পালক, আর হাতে একটী বাঁশীও রয়েছে। তখন সেই ব্যাধ তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'হ্যাঁ ভাই, তোমার নাম কি কৃষ্ণ?' সেই ছেলেটী বললে 'হ্যাঁ ভাই, আমাকেই সবাই কৃষ্ণ ব'লে ডাকে। তা, তুমি সারাদিন ধ'রে না খেয়ে না ঘুমিয়ে এত কাতর ভাবে আমায় ডাকছ কেন ভাই? তোমার কষ্ট ও আগ্রহ দেখে আমি আর থাকতে পারলুম না, আমার প্রাণে বড় লাগছিল, তাই ছুটে তোমায় দেখতে এলুম।' ব্যাধ বললে 'আহা! তোমার কি ভালবাসা ভাই! আমার কষ্ট দেখে তোমার দুঃখ হ'ল আর অমনি ছুটে এলে! তোমার কি

রূপ! কি মিষ্টি কথা! তোমায় যে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না ভাই! তোমায় বুকে ক'রে রাখলে যে বুক ঠাণ্ডা হয় ভাই! তা, যখন দেখা দিলে ত চল, তোমার বাবা যে তোমার জন্যে কত কাতর হয়েছে; তাঁর কাছে যাই চল।' কৃষ্ণ বললে 'তোমার এই একলক্ষ্য ও একাগ্রতা এবং আমার জন্যে এত কঠোরতা ও অসাধারণ ভালবাসা চিরদিন আমার প্রাণে গাঁথা থাকবে; এ ত ভোলবার জিনিষ নয় ভাই! তোমার ভালবাসায় আমি চিরদিনের জন্য তোমার কাছে বাঁধা রইলুম কিন্তু পিতাকে ব'ল তাঁর এখনও সময় হয় নি, সময় হ'লে তাঁকে দেখা দোব।' এই শুনে ব্যাধ বললে 'সে কি ভাই! তিনি যে তোমার জন্যে কত কাতর ভাবে আমায় বললেন, তা ছাড়া তিনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন এবং আমিও তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি যে আমার জীবন যায় যাক যে রকমে পারি আমি তোমায় খুঁজে তাঁর কাছে নিয়ে আসবই। এখন আবার কি ক'রে একলা ফিরে গিয়ে তাঁকে এ কথা বলব আর তিনিই বা আমার কথা বিশ্বাস করবেন কেন?' কৃষ্ণ বললে 'আচ্ছা, আমার এই বাঁশী তোমায় দিচ্ছি। তুমি এটা নিয়ে গিয়ে পিতাকে নিদর্শন দেখিয়ে ব'ল যে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, আর আমি পিতার কথা সব শুনেছি এবং বলিছি যে পিতার এখনও সময় হয় নি সময় হ'লে দেখা দিব।' ব্যাধ সেই বাঁশীটি নিয়ে কেঁদে বললে 'ভাই কৃষ্ণ। তোমার এত রূপ আর আমি কখনও কোথাও ত দেখিনি; তোমার রূপ দেখে আমার মন ম'জে গেছে তোমায় আর আমার ছাড়তে ইচ্ছে করছে না; যদি দয়া ক'রে দেখা দিলে ভাই, আর আমায় দূরে রেখো না। আমি তোমার পিতার কাছে প্রতিশ্রুত, তাই তোমায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে, নইলে আমি আর তোমায় ছেড়ে যেতুম না সর্ব্বদাই তোমার কাছে থাকতুম। কিন্তু দেখো ভাই, তুমি যেন আমায় ভুলে থেক না। আমি তোমার পিতাকে এই খবরটা দিয়েই এই খানে আবার ফিরে আসছি তখন আবার আমায় এই রকম সর্ব্বদা দেখা দিয়ে কাছে কাছে রেখো ভাই।'

এই ব'লে ব্যাধ বাঁশীটি নিয়ে ঋষির আশ্রমে ফিরে এসে তাঁকে বললে 'দেখুন গোড়ায় আমি কত খুঁজলুম, শেষে নাওয়া খাওয়ার সময়টাও নষ্ট না ক'রে খুঁজে বেড়াতে লাগলুম তাতেও যখন দেখা পেলুম না তখন ভাবলুম আমরা ত কেউ কাউকেও চিনি না কাজেই নাম ধ'রে ডাকলে হয়ত দেখা হতে পারে। তারপর থেকে সারা দিন রাত আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে বনে বনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'রে ডেকে বেড়াতে লাগলুম। একদিন দেখি সেই রকম একটী রাখাল বালক গাছ তলায় দাঁড়িয়ে আছে; তখন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম তোমার নাম কি কৃষ্ণ। সে বললে 'হ্যাঁ ভাই, আমাকেই লোকে কৃষ্ণ ব'লে ডাকে'। তা আমি বললুম যে চল, তোমার বাবা তোমার জন্যে বড় কাতর হয়েছেন, আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি যেমন ক'রে হোক তোমাকে নিয়ে আসবই কিন্তু সে বললে পিতাকে ব'লো এখনও তার সময় হয়নি, সময় হলে দেখা দোব। আমি যখন বল্লুম তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করবেন কেন তখন এই বাঁশীটি দিয়ে বললে তাকে এই নিদর্শন দেখিও তা হলেই তার বিশ্বাস হবে।'

এই কথা শুনে ঋষি বললে 'ব্যাধ! তুমি অতি মহান, তুমি অতি ভাগ্যবান; আমি এত দিন এত সাধনা ক'রেও যা না করতে পেরেছি তুমি একনিষ্ঠা ও একাগ্রতার জোরে তাই করেছ। আমি যখনই দেখলুম যে তোমার এত বড় একাগ্রতা, যে তুমি বিষধর পিপীলিকার কামড় অগ্রাহ্য ক'রেও তোমার শিকারের প্রতি একলক্ষ্য রয়েছ এবং তাকে শরে বিদ্ধ ক'রে তবে নিজে পড়েছ, তখনই বুঝলুম যে তোমার এই একাগ্রতা ও একলক্ষ্যের দ্বারা তুমি অসাধ্য সাধন করতে পার, তাই শিকার থেকে তোমার লক্ষ্য ঘুরিয়ে তাঁর দিকে দেবার জন্যেই তোমাকে কৃষ্ণ খুঁজতে পাঠিয়েছিলুম। তা দেখ, তোমার এই একাগ্রতা ও একলক্ষ্যের জোরেই আজ তুমি তাঁর দর্শন লাভ ক'রে নিজে ধন্য হলে এবং তোমার জন্যে আমিও আজ তাঁর

শ্রীহস্তের বাঁশী পেয়ে কৃতার্থ হলুম ও তাঁর আশ্বাস বাণী জানলুম যে আমার প্রতি তাঁর দয়া আছে, সময় হলে এসে দেখা দেবেন।

দ্বিজেন গাহিল—

কে এমন কঠিন রে আমার আদরিণী মায়ের পায়ে দিলে বন ফুল।
তার কি দয়া নাই রে মনে, সে কি কভু শোনেনি কানে
মন দিলে যার পায়ে বাজে কণ্টক সমতুল ॥
ছিল না কি ঘরে তার কমল দশ শতদল,
ছিল না কি সে পাষাণের এক বিন্দু অশ্রু জল।
এমন মায়ের উদয় ঘরে যার, রোমাঞ্চ কি হয় না তার
তবে কেন সে রাতুল পদে দুর্ব্বা দিলে সে বাতুল ॥
উচাটি লাগিলে যার রক্ত বহে শত ধারে
হৃদয় চিরে এক বিন্দু রক্ত কি সে দিতে নারে।
তাতে অনুকল্প রূপে আরক্ত চন্দন সঁপে
ভেবেছ কি ভবের জায়া হবে অনুকুল ॥
সামান্য দীপ জ্বালাইলে জ্বালামুখী হয় না বশ
শুভাশুভ কর্ম্মফল পোড়াইলে থাকত যশ।
তৈল দীপে শৈল সুতা মা আমার নয় বশীভূতা
জ্ঞানের ধূপ নির্মঞ্চনে কেটে যায় রে ভবের ভুল ॥
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ রস
তত্ত্ব মধু সত্ত্ব বিনা তাতেই বা রে কি পৌরষ।
প্রাণ আমার যে ক্ষুধায় মাতে, সে ক্ষুধা কি আছে মা তে
জঠরাগ্নি তারে কভু করে কি ব্যাকুল ॥
এই অষ্ট রসে মাখা রূপ রসে দেহ প্রাণ
তা না দিয়ে অন্নদারে কেন রে আমান্ন দান।
জাগ্রতাদি স্বপ্ন সহ কেন সে দিলে না দেহ
পরিণামে দৃশ্য যার শ্মশান ভূমি চিতা ধুল ॥

তৃতীয় ভাগ—ত্রিংশ অধ্যায়

কলিকাতা ; শুক্রবার ২৩শে আষাঢ় ১৩৪০ সাল ;
ইং ৭ই জুলাই ১৯৩৩।

আজ গুরু পূর্ণিমা। শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গঙ্গা স্নানের পর কালীঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহ্নিক সারিয়া লইলেন। তার পর ভক্তরা সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে মালা পরাইয়া দিল এবং পরে সকলে মিলিয়া গুরু স্তোত্র ও স্তব পাঠ করিয়া গুরু অর্চ্চনা শেষ করিলে শ্রীশ্রীঠাকুর উপদেশ দিতেছেন।

ঠাকুর। গুরু ত সেই সচ্চিদানন্দ। তোমরা তাঁকেই পূজা করলে। যখন যে আধারের ভেতর দিয়ে তাঁর শক্তি কার্য্য করে, তখন তাঁকেই গুরু ব'লে নেওয়া হয়। গুরুতে খুব নিষ্ঠা রাখবে এবং ভক্তি বিশ্বাস রাখবার চেষ্টা করবে। **গুরু ছাড়া কিছুই হবার যো নেই।** যার পূর্ণ বিশ্বাস এসেছে তারই ঠিক ভালবাসা বা প্রেম লেগেছে ; তখন তার মন সর্ব্বদাই গুরুতে প'ড়ে আছে। সাধারণ ভালবাসায় চাওয়া চাওয়ি আছে, যেমন 'আমি বড় হব,' 'আত্মোন্নতি করব' ইত্যাদি কামনা রয়েছে। অবশ্য এ ভাবেও ডাকা ঢের ভাল ; কিন্তু **প্রধান জিনিষ হচ্ছে বিশ্বাস।** বিশ্বাস আনবার জন্যেই সাধনা করতে হয়। যার প্রেম লেগে গেছে তার কথা আলাদা ; তার ত স্থির বিশ্বাস রয়েছেই।

সাধারণ ভালবাসায় তত বিশ্বাস থাকে না, যেমন মা ছেলেকে ভালবাসে বটে কিন্তু টাকার বাক্স তার হাতে ছেড়ে দেয় না। **যত ক্ষণ নিজের স্বার্থ রেখেছ, তত ক্ষণ সে ভালবাসা বা প্রেম আসেনি। ভেতরে ত্যাগ থাকলে ভালবাসা সকল সময় ঠিক থাকে এবং বিশ্বাস আসে।** তোমরা

যে ভাবে স্তব স্তুতি করলে সেই রকম বিশ্বাস সর্ব্বদা রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। **গুরুকে খুব বড় করবে তবে ত নিজে বড় হতে পারবে।** যদি গুরুকে ছোট কর তবে নিজে বড় হতে পারবে না এবং সংশয় ও অবিশ্বাস আসবে। **গুরুতে ঠিক বিশ্বাস থাকলে সমস্ত গ্রহ ক্ষীণ হয় এবং পরাস্ত হয়ে যায়। তাই গ্রহ আগে গুরুতে সংশয় আনাবার চেষ্টা করে, এবং সংশয় আনিয়ে দিয়ে পরে কার্য্য করতে থাকে; কিন্তু বিশ্বাস না নড়াতে পারলে কিছুই করতে পারে না।** ভোগে থাকলে সকল সময় ত এক অবস্থায় কাটে না, তাই, তখন কিছু বিশ্বাস এলেও তাকে নষ্ট ক'রে দেয়। যত ক্ষণ না সংসার বুদ্ধি নষ্ট ক'রে গুরুতে মন সমর্পণ করা যায়, তত ক্ষণ ঠিক বিশ্বাস আসে না।

আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের সব মঙ্গল হ'ক। তোমাদের ভালবাসা ভোলবার নয়; তোমরা যে সব ভালবেসে আমার কাছে এস, এ সর্ব্বদা আমার মনে আছে এবং যার যে ভাব, আমার মনে সব গাঁথা আছে। তবে যারা সব ছেড়ে আমার জন্য পাগল হয়ে ছুটে আসছে, তাদের সে ভাবটা ত আমাকে রক্ষা করতে হবে, কারণ তাদের যে আর অন্য কোন অবলম্বন নেই। তারা জোর ক'রে ভালবাসা টেনে নেয়। তা ভিন্ন, তোমাদের সকলকেই আমি সমান ভালবাসি, কেননা আমি ত কোন স্বার্থ নিয়ে ভালবাসি না। আমার ত নিজের কোনও অভাব নেই বা কোন জিনিষের প্রয়োজন নেই। যে টুকু দেখছ এও তোমাদের জন্যে। তোমরা সর্ব্বদা ভোগে রয়েছ, ভোগটাই ভালবাস, তাই তোমাদেরই জন্যে কিছু ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে যাতে তোমরা টেঁকে থাকতে পার।

আর আমাকে ত এ সব ব্যবস্থার জন্যে চিন্তা করতে হয় না, বা ছাড়বার জন্যে ভাবতে হয় না অথবা ছেড়ে যেতেও কোন

কষ্টই হবে না। তোমরা ত সব ত্যাগী নও, তোমরা ভোগী, তাই তোমাদের জন্যে কিছু রক্ষে করতে হয়। এই দেখনা, যারই বাড়ী খাই সে কি ত্যাগীর মত শুধু এক তরকারী, ভাত খাওয়ায়? সে পঞ্চাশ রকম ব্যবস্থা করে। তোমাদের জন্যেই এই খাওয়া, গান, বাজনা প্রভৃতি নানা রকমের ভোগের ব্যবস্থা করা আছে, কারণ যেন তেন প্রকারে তোমাদের মনটা এখানে এক বার ব'সে গেলেই কাজ হবে। পরমহংসদেব এমন কি সখী সেজে নেচে পর্য্যন্ত কোন কোন ভক্তদের আটকেছিলেন। মূল কথা তোমাদের মঙ্গল করা, তা যে রকম ক'রেই হোক।

আমার এই যে নীতি পালন করা, পূজা ও আহ্নিক করা, দেবস্থানে যাওয়া প্রভৃতি কিছুরই নিজের জন্যে কোন প্রয়োজন নেই, কেবল তোমাদের জন্যেই এ সব ব্যবস্থা করা। এ সব যা কিছু দেখছ সব তোমাদেরই জন্যে। **তোমাদেরই জন্যে আমার থাকা।** তোমরা সংসারে মায়ায় অন্ধ হ'য়ে রয়েছ, কাজেই সব ত বুঝতে পার না; তাই বার বার বলি তোমাদের পক্ষে সঙ্গই প্রধান; সঙ্গ ছাড়া আর তোমাদের গতি নেই। রোজ কিছু সময় অন্তঃত ঠিক নীতি পালন ক'রে সঙ্গ করবে, কোন রকম বাধা, বিঘ্ন, সুবিধা, অসুবিধা কিছুই মানবে না, যেমন ক'রে হোক সেই সময় সকল কাজ ফেলেও চ'লে আসবে তবে ত তোমাদের নীতি বলবৎ হবে। তখন দেখবে গুরুই তোমাদের রক্ষা করবেন, তিনি তোমাদের সকল ভার নেবেন। যেমন চা খোরের কাছে গেলে চা খেতে বলে, তেমনি আমার কাছে এলে তোমাদের ত্যাগ শিক্ষা করতে বলব, কারণ ভোগে কখনও শান্তি আসে না। **তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি তোমরা ত্যাগ শিক্ষা কর, তবে কিছু শান্তি পাবে। বেশী কিছু কর আর নাই কর, কিছু সময় এখানে আসবে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এখানে এসে বসলেই**

কাজ হবে। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের সব মঙ্গল হোক, তোমাদের সৎ বুদ্ধি আসুক এবং ক্রমশঃ তোমরা ত্যাগের পথে গতি করতে শেখ। তার পর শ্রীশ্রীঠাকুর "তোদের তরে আমার দেহ, তোদের তরে আমার জীবন" এই গানটী গাহিলেন।

তার পর দ্বিজেন গাহিল—

(১)

হরি কি দিয়ে পূজিব আমি তোমারে।
আমি যে দিকে নেহারি সকলি তোমারি, তবে কি আছে আমার
এ ভব সংসারে ॥
তুমি লতায় লাবণ্য, কুসুমে সুবাস, সকল সৌরভেতে তোমারই বিকাশ।
ধূপ দীপাদিতে তোমারই প্রকাশ, ফল, ফুল সব তোমারই ভাণ্ডারে ॥
তুমি চন্দনে সুগন্ধ শীতল, তুমিই পবিত্র জাহ্নবীর জল।
তুমিই তুলসী নব দুর্ব্বাদল, বিল্বদলে তুমি ত্রিগুণ আকারে ॥
শব্দ রূপে তুমি শঙ্খেতে জানাও, ঘণ্টার নিনাদে তুমি ভক্তিরে জাগাও।
কাঁশর আদি বাদ্যেতে সবারে মাতাও, পরিব্যাপ্ত তুমি ব্যোম চরাচরে ॥
আতপ তণ্ডুল, ক্ষীর, সর, ননী, সকলই তোমারই ওহে চিন্তামণি।
তবে কি দিয়ে পূজিব ও রাঙ্গা পা দুখানি, বল সর্ব্বময় ওহে বলহে
আমারে ॥

(২)

('ওমা) বুঝিতে না পারি তারা তোর স্বরূপ কেমন।
জ্যোতির্ম্ময়ী তারা তুমি তবে কেন মা কাল বরণ ॥
অগম্য সে মণিপুরে সৌদামিনী রূপ ধ'রে (মা),
স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ ক'রে মা করিছ বিশ্ব সৃজন।
ঢালিছ অমৃত ধারা জননী জীব কারণ ॥
বিতরি অমৃত ধার মা পালিতেছ এ সংসার,
অন্নপূর্ণা মা আমার আলো করি সিংহাসন।
চারিদিকে স্তব করে সঙ্গিনী যোগিনীগণ ॥
পুনঃ এ নগনা বেশে মহাকাল ল'য়ে পাশে,

শ্মশান করাল গ্রাসে শাসিতেছ ত্রিভুবন।
চারি দিকে শিবা কুল করিছে রব ভীষণ।।

(৩)

এস গো জননী দীন দয়াময়ী দয়া ক'রে এই দীনের কুটীরে।
তোমার পরশে আনন্দ হরষে অমৃতের ধারা বহিবে অন্তরে।।
বাসনা কামনা আর প্রিয় জনা আমায় দেয়নি করিতে তব উপাসনা।
মায়াতে ভুলায়ে করিয়ে ছলনা (এখন) অজ্ঞান আঁধারে রহিলাম দূরে।।
রোগে, শোকে, তাপে মা ঝরে দুটি আঁখি, তবু ভুলে মাগো তোরে
নাহি ডাকি।
অসার সংসারে সদা ম'জে থাকি,আর এ দারুণ বন্ধনে রেখো না আমারে।
যেন তব কৃপা বলে বুঝি মা এবার, যাহা কিছু দেখি সকলই তোমার।
ভাল মন্দ ফেলে আপনারে ভুলে (যেন) 'মা' 'মা' ব'লে সদা
ডাকি গো তোমারে।।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার গাহিলেন—

দীন তারিণী দুরিত হারিনী সত্ত্ব রজস্তম ত্রিগুণধারিনী।
সৃজন, পালন, নিধনকারিনী, সগুণা নির্গুণা সর্ব্ব স্বরূপিণী।।
ত্বং হি কালী, তারা, পরমা প্রকৃতি, ত্বং হি মীন, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি।
ত্বং হি স্থল, জল, অনিল, অনল, ত্বং হি ব্যোম, ব্যোমকেশ, প্রসবিণী।।
সাংখ্য পাতঞ্জল, মীমাংসক, ন্যায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়।
বৈশেষিক বেদান্ত ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত অদ্যাপি তথাপি জানিতে পারে নি।।
নিরুপাধি আদি অন্ত রহিত, করিবারে সাধক জনার হিত।
গণেশাদি পঞ্চ রূপে কাল বঞ্চ, ভবভয়হরা ত্রিকালবর্ত্তিণী।।
সাকার সাধকের তুমি মা সাকারা, নিরাকার উপাসকের নিরাকারা।
কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়, সেও ত তুমি তা নয় গো জননী।।
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরম ব্রহ্ম কয়।
তৎপরে তুরীয় অনির্ব্বচনীয়, সকলি মা তারা ত্রিলোক ব্যাপিনী।।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, ললিত, নগেন, জ্ঞান, কালু, কৃষ্ণ দত্ত, পুত্তু, জিতেন, কৃষ্ণ কিশোর, অপূর্ব্ব, তারাপদ,

শ্যাম, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, অজয়, প্রফুল্ল, ভোলা ও অভয় আছে। আহ্নিক সারা হইলে কথা হইতেছে—

কালু। কেউ বলেন যে তিনি ভগবানের আদেশ শুনতে পান, বেশ স্পষ্ট শুনতে পান।

ঠাকুর। সব সময় যে ভগবানের আদেশ হয় তা নয়; অপর শক্তি ও রকম আদেশ করে। আবার কখন কখন খুব গাঢ় চিন্তা করতে করতে নিজের চিন্তাই নিজেকে ঐ রকম বলে, এমন কি এত চেঁচিয়ে বলে, যাতে কানে শোনা যায়। এতে ভাল হতে পারে অথবা মন্দ হতে পারে আবার কোন সময় কিছুই না হতে পারে; যেমন শক্তি আদেশ করে সেই রকম কার্য্য হয়। কাজ দেখলেই ধরা যায়, ভাল শক্তি না মন্দ শক্তি তোমায় ধরেছে।

ভগবানের আদেশ হ'ল আলাদা জিনিষ, তাতে আত্মার খুব উন্নতি হয়। ভগবানের আদেশ সর্ব্বদাই মঙ্গলময় এবং কখনও বিফল হয় না। ভগবান তোমারও, আমারও, তাঁর আদেশ পালন করলে সকলেরই কল্যাণ হয়। মন যেমন স্তরে উঠবে সেই রকম শুনবে এবং মন উন্নত হলে শব্দটা মনের আদেশ, কি কোন লোকের (যেমন স্বর্গলোক ইত্যাদি) আদেশ অথবা ভগবানের আদেশ বেশ তফাৎ বুঝতে পারবে ও ধরতে পারবে।

কেষ্ট। আপনাকে দেখছি, এ ত বিশ্বাস হচ্ছে, কিন্তু ভগবান আছেন, এ কথা ঠিক বিশ্বাস হয় না কেন?

ঠাকুর। আমাকে চোখের সামনে দেখছ, কাজেই আমার রূপ সম্বন্ধে আর সন্দেহ আসবে কেন? কিন্তু প্রথমে ত আমাকে চিনতে না, এক জন চিনিয়ে দিলে যে এঁর নাম এই, ইনি অমুক ইত্যাদি; তুমি সেটা বিশ্বাস করলে কিন্তু তখনই যদি অপর এক জন বলত, না, না, উনি নন, সে আর এক জন আছেন, তাহলে তোমার মনে অমনি অবিশ্বাস আসত। যেই তুমি নিজে আর এক জনের কথায় বিশ্বাস ক'রে আমাকে ভাল রূপে জেনে নিলে, তখন আর তোমার

বিশ্বাস টলবে না। সেই রকম ভগবান সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, চোখেও দেখতে পাচ্ছ না যে স্থূল শরীর দেখার মত তবু খানিকটা বিশ্বাস আসবে।

কাজেই ভেতরে কিছু অনুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি ঠিক বিশ্বাস রাখতে পারবে না। যখন তোমার নিজের ভেতর অনুভূতি হবে যে তাঁর নাম ক'রে তোমার মন অনেকটা স্থির হয়ে এসেছে, তোমার বাসনার উগ্রতা অনেকটা ক'মে এসেছে ও তুমি মনে কিছু শান্তি পাচ্ছ, তখন অপরে যতই বলুক না কেন যে 'ভগবানকে ডেকে কিছু হয় না', এ কথার ওপর তোমার ভগবানে যে বিশ্বাস সেটা কিছুতেই নষ্ট হবে না। যেমন রসগোল্লা খাচ্ছ, মিষ্টি লাগছে তখন যদি আর কেউ বলে রসগোল্লা খেও না বড় তেত, সে কথায় কি তুমি বিশ্বাস কর ?

তোমরা সংসারে আসক্তি নিয়েই আছ ; যে জিনিষের জন্যে যার যত আসক্তি, সেই জিনিষের জন্যে তার তত চিন্তা। আসক্তি কিছু কমলেই বুঝতে পারবে কত চিন্তা ক'মে আসছে, কত মনে শান্তি পাচ্ছ, এবং তখন নিজেই ধরতে পারবে ভগবানের চিন্তা করায় তোমার কত লাভ হচ্ছে। তখন আর অপরে যে যাই বলুক সে কথার ওপর তোমার কিছু মাত্র অবিশ্বাস আসবে না। তবে হ্যাঁ, যত ক্ষণ না সংসার আসক্তি একেবারে যায়, তত ক্ষণ অবস্থা ঠিক পাকা হয় না।

অপূর্ব্ব। ধরুন পাঁচ বৎসর এক জন বিশ্বাস রেখে আসছে, কিন্তু এখন হয়ত বিপরীত শুনে অবিশ্বাস হ'ল। তা হ'লে এই পাঁচ বৎসর সে যে বিশ্বাস রক্ষা ক'রে আনন্দ পাচ্ছিল সেটা কি মিথ্যা ? না এখন যেটা হ'ল সেটা মনের দুর্ব্বলতা ?

ঠাকুর। সত্যিই কিছু আনন্দ পাচ্ছিল বই কি ? নইলে পাঁচ বৎসর আসবে কেন ? তবে মনের সে পরিমাণ শক্তি হয় নি, তাই বিপরীত শুনে নিজের ভাব ঠিক রাখতে পারলে না। মনের

দুর্ব্বলতা ত বটেই, তা না হ'লে অপরের কথায় চলবে কেন ? এটা মনে ভাবলে না যে যার কথায় এখন এঁর ওপর অবিশ্বাস করছি, তাকে দেখে ত এখানে আসিনি, তার সঙ্গে পূর্ব্বে জানা শোনাও ছিল না, হয়ত জীবনে তার সঙ্গে কখনও আলাপ হ'ত না, এঁর জন্যেই তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, অতএব ওর কথায় এঁর ওপর অবিশ্বাস আনি কেন ?

এই জন্যেই আছে, সব গুরুভাইদের সঙ্গে অবাধে ঘনিষ্ঠ ভাবে ব্যবহার রাখতে নেই। যে গুরুতে শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ইত্যাদি বাড়িয়ে দেয় সেই হচ্ছে ঠিক গুরুভাই ; আর কেবল সেই সব গুরুভাইদের সঙ্গেই প্রাণ খুলে মেশামেশি করবে ; কারণ তাতে তোমার গুরুভক্তি চট্ চট্ ক'রে বেড়ে পাকা হয়ে আসতে পারবে। তা ছাড়া, অপর সকলের সঙ্গে সাবধানে মিশবে অর্থাৎ তাদের সঙ্গে সব ব্যবহার রাখবে বটে, তবে সর্ব্বদা সাবধান থাকবে যেন তোমার নিজের ভাব ঘুরে না যায়। অবশ্য সকলকেই ভালবাসতে শিখবে কিন্তু কার কার সঙ্গে অবাধে বেশী ঘনিষ্ঠতা করবে সেটা গুরুকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা ক'রে নেওয়াই ভাল, তা হলে আর ভয়ের কারণ থাকবে না। তবে যদি তোমার এ ভাব থাকে যে গুরু ছাড়া আর কারুর সঙ্গে বেশী ব্যবহার করব না এবং গুরুকে জিজ্ঞাসা না ক'রে নিজের ভাব আর কারুর কথাতেই বদলাব না, সে খুব ভাল।

গুরুতে ঠিক ভালবাসা এসে পড়লে, দেখবে, গুরুভাইদের ওপরও সখ্যতা এবং প্রেম আপনিই এসে পড়বে ; বিশেষতঃ যাদের ঠিক ঠিক গুরুনিষ্ঠা আছে তাদের ক'জনের ভেতর যেন আপনা আপনি এমন একটা ঘনিষ্ঠতা ও আপনত্ব এসে পড়বে যে সংসারের এত প্রিয়, এত আপন যে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র তাদের সকলের চেয়েও সেই সব গুরুভাইদের সঙ্গে সম্বন্ধ আরও ঢের বেশী বড় ও জোরের ব'লে মনে হবে। যদিও কোন

রকমে গুরুর প্রতি বিন্দু মাত্র অবিশ্বাস এসে পড়ে তবুও গুরুর সঙ্গ ছাড়বে না বরং তখন ইচ্ছা না থাকলেও জোর ক'রে গুরু সঙ্গ করবে তা হ'লে দেখবে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

এটা বেশ মনে রাখবে **গুরু সঙ্গ ছাড়া গুরুতে অবিশ্বাস তাড়াবার আর কোন উপায় নেই।** তাই, অবিশ্বাস এসে পড়লে গুরুর সঙ্গ অভাবে সেই রকম নিষ্ঠাবান গুরুভাইদের সঙ্গ করলেও অনেক সময় অবিশ্বাস চ'লে যায়। গিরীশ ঘোষের মত ভক্ত লোকেরও এক বার পরমহংসদেবের ওপর অবিশ্বাস এসেছিল। তিনি বলেছিলেন 'সে জন্যে মনে বড়ই অশান্তি বোধ করছিলুম, শান্তি পাবার জন্যে বাড়ীতে ভাগবৎ পাঠ আদি বহু ধর্ম্ম আলোচনা শুনেও কিছুতেই কিছু হ'ল না, এমন সময় এক দিন রাখাল মহারাজ প্রভৃতি দু' একটী একনিষ্ঠ গুরুভাই আমার বাড়ী আসে, তাদের সঙ্গে কিছু ক্ষণ আলাপ করতেই অবিশ্বাস চ'লে গেল এবং পূর্ব্বের মত বিশ্বাস ফিরে এল।'

জ্ঞান। সাধুর ওপর ভক্তি আছে, যেখানে যে সাধুর কাছে যায় তাকে ভক্তি করে ; এতেও সাধু সঙ্গের ফল হবে ত ?

ঠাকুর। এটা ঠিক ভক্তি নয় সংস্কার, যে সাধুকে দেখলে প্রণাম করতে হয়। কেউ বা এই মনে ক'রে প্রণাম করে যে 'কে জানে বাবা, একটা নমস্কার ক'রে রাখি ত, না করলে হয়ত ক্ষতি হতে পারে' ; আবার কারুর বা এই ভাব থাকতে পারে যে প্রণাম করলে সংসারের কিছু মঙ্গল হতে পারে। এই রকম নানা ভাবে সাধুর কাছে যায় ; এটা ঠিক ভক্তি বা ভালবাসা নয়। ভালবাসা থাকলে আর অপর জায়গায় যাবে কেন ? তবে হ্যাঁ, এটা সৎ নীতির মধ্যে গণ্য ; এ সংস্কারও ভাল। এক বার ঠিক ভালবাসা লাগলে সেটা আর যায় না।

কাশীতে এক জন এসেছিল ; সে এই রকম অনেক সাধুর কাছে গেছে এবং অনেকের কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছে। শেষ কালে

তার এমন হয়েছে বললে, যে সে সকলকার উপদেশ পালন করবার আর সময়ই পাচ্ছে না। এ হচ্ছে সাধু যাচাই করা; যাচাই করা মানেই অবিশ্বাস। লোকে সাংসারিক স্বার্থ নিয়ে সাধুর কাছে আসে। হয়ত কেউ রোগ সারাবার জন্যে যায়, যদি একটা রোগ সেরে গেল ত বিশ্বাস এল। তখন সাধুর ক্ষমতা আছে ভেবে তার কাছে আনাগোনা করে।

কারুর হয়ত আবার কৃতজ্ঞতার ভাব আসে; মনে করে এঁর কাছে যখন উপকার পেয়েছি তখন এঁকে আর ছাড়ব না। এই করতে করতে কিছু ভালবাসা লাগতে পারে, কিন্তু যত ক্ষণ সংসার আছে তত ক্ষণ ত শুধু একটী কামনা নেই; বহু কামনা থাকে, সে গুলি সব পর পর আসবে, আর সুখ দুঃখও পর পর চলবে। কাজেই আর একটা যদি পূরণ না হয় তাহ'লে প্রায়ই দেখা যায়, যে টুকু ভালবাসা লেগেছিল সে টুকুও নষ্ট ক'রে দেয়। কিন্তু ঠিক ভালবাসা লাগলে এ সব স্বার্থ থাকে না; সে তখন স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ম'রে গেলে দুঃখ করে না, বাড়ী বিক্রী হয়ে গেলে বা বিষয় সম্পত্তি সব চ'লে গেলে ভাবে না, কোন কিছুতেই বিচলিত হয় না। তখনই ঠিক বোঝা যাবে যে প্রেম লেগেছে, বিশ্বাস এসেছে। তবে নব অনুরাগ হ'লে অর্থাৎ প্রথমে নতুন ভাব লাগলে তাকে বেড় দিতে হয় নইলে পাকা হবার আগেই হয়ত সে ভাব নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। এক বার পাকা হয়ে গেলে আর ভয় থাকে না। সংসারীদের স্বার্থ রক্ষা ক'রে ঠিক ভালবাসা রক্ষা করা বড় শক্ত।

কেষ্ট। ঠিক সাধু চিনব কি ক'রে?

ঠাকুর। সাধু চেনার প্রধান উপায় হচ্ছে যে দেখতে হয়, তার সঙ্গ ক'রে তোমার ভেতরের সৎ বৃত্তি কতটা বাড়ল। তা ছাড়া, তোমাদের সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে সাধু চিনবে কি ক'রে? পরমহংস দেবের কাছে একজন এসে বলেছিল 'মশায়, অমুক জায়গায় এক জন বড় সাধু দেখে এলুম।' তিনি সে কথা শুনে বলেছিলেন 'হ্যাঁ রে!

বড় সাধু বুঝলি কি ক'রে? তার দ্বারা তোর কি উপকার হ'ল বল দেখি?' প্রেম না এলে সাধুর কাছে অনেক ক্ষণ বসতে পারবে না; আবার ঠিক ঠিক প্রেম আনতে গেলে ও ভগবানের দিকে গতি করতে গেলে তাঁর জন্যে পাগল না হ'লে কিছু হবে না। তবে, 'যেমন ক'রে হোক 'নিয়ম ক'রে অন্তঃত কিছু সময়ের জন্য সাধু সঙ্গ করবই' এই নীতি রক্ষা ক'রে গেলেও অনেক কাজ হয়।

পুত্তু। চৌদ্দ বৎসর বেশ নিয়ম ক'রে সাধুর কাছে আসছে, সাধু সঙ্গ করছে, অথচ সাধুর নিন্দাও করছে, এমন শোনা যায়। এ ক্ষেত্রে ভালবাসা লাগে নি ত?

ঠাকুর। ভালবাসা কিছু লেগেছে বই কি, নইলে চোদ্দ বছর নিয়ম ক'রে আসবে কেন? তবে তার আমিত্বটা বড় বেশী। সে ভাবে যে সে খুব বেশী বোঝে, তাই তার ভেতর বড় বেশী বিচার আসে। সেই বিচারের ঠেলায় তার মনে তখন আসল ভাব দাঁড়াতে পারে না কাজেই যা তা বলে। আবার প্রকৃতিস্থ হ'লে বিচার ভাব কেটে গেলে সেই পূর্ব্ব শ্রদ্ধা, ভালবাসা ফিরে আসে।

বাগবাজার থেকে এক জন সাধু শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে আসিয়াছিল। ঠাকুর তাকে গান করিতে বলিলেন।

সে তাহার রচিত গান কয়খানি গাহিল—

(১)

তোমারি মন্দিরে আসি মা গো যখনই লুটায়ে পড়ি।
যত দুঃখ, যত জ্বালা তখনি সব পাশরি ॥
পলকে কুহক যেন আমার এই নরক অনলে হায়।
সহসা কি এক শান্তির শীতল মধু মলয়া বহিয়া যায়।
জুড়ায় তাপিত প্রাণ, জুড়ায় এ দেহ পান।
সকল ভুবন যেন আনন্দে উঠে গো ভরি ॥
নিরাশা আঁধারে ভরা হৃদয় গগনে হয়।
সহসা কি এক আশার সুখ সুধাংশুর উদয়।

সে চাঁদিমা ঢল ঢল, সে জ্যোছনা কি সুশীতল।
দরশে পরশে প্রাণ পুলকে উঠে গো শিহরি ॥
মরু ভূ সম এই শুধু ধূ ধূ বালুকাময়।
তাপিত হৃদয় যেন সহসা শীতল হয়।
যেন হয় নব উপবন বহে ধীর সমীরণ।
শত প্রেম প্রস্রবণ চলে গো তুলি লহরী ॥
খুলে যায় এ হিয়ার কপট কপাট খান।
কুসুম কোমল হয় কুলীশ কঠিন প্রাণ।
পাই নব আঁখি যুগ দেখি যেন এক নব যুগ।
যত নর নারী মুখে তোমারি মুখ নেহারি ॥
নব নব ভাবাবেশে যেন সে নখর পরশে কার।
বেজে উঠে নব সুরে আমার এ নূতন বীণার তার।
নব বংশী বট ছায় নট নটী জড়িত কায়।
গলিত প্রেম তড়িত হেম নবীন মিলন মাধুরী ॥

(২)

এমন কিছু আছে কিনা যে সদানন্দে থাকা যায়।
দুঃখ যেন আমায় দেখে দুঃখ দিতে ভুলে যায় ॥
যা পেলে আর এ ভুবনে পড়ে না মন প্রলোভনে।
যা পেলে আর মনের কোণে থাকে না সংশয় ভয় ॥
যা পেলে সে নিজ লাভে পূর্ণ আত্মা মহাভাবে।
পড়ে না আর অনুতাপে ধরে না পরের আশ্রয় ॥
যা পেলে সেই দুঃখ এলে, এস এস বন্ধু ব'লে।
ভাসি প্রেম অশ্রু জলে হরি ব'লে ধুলায় লুটায় ॥
(হরি বোল বলেরে ভাই, হরি বোল ব'লেরে)
যা পেলে এক কণা মাত্র ভুলে ভেদ শত্রু মিত্র।
সে কি এক অমৃতত্ব আস্বাদে উন্মাদ প্রায় ॥
তেমন কিছু পেতে হ'লে এ মনের বঞ্চনা ভুলে
চলরে চঞ্চল চ'লে শ্রীগুরুর চরণ ছায় ॥

(৩)

সাধনে ভজনে যে আনন্দ সে আনন্দ কি আর বিষয়ে রয়।
তোমার ভজনানন্দ সনে কি আর বিষয়ানন্দের তুলনা হয় ॥
তোমার সাধনে, তোমার ভজনে, স্মরণে, মননে, শ্রবণে, কীর্ত্তনে
যে আনন্দ এ তিন ভুবনে, দ্বিতীয় কোথাও নাহিক রয় ॥
তোমার ভজনানন্দ আবেশে, যে উন্মাদ নিমিষে নিমিষে।
মজেছে যে জন সে আনন্দ রসে, বিষয়ের কি দিয়ে ভুলাবে তায় ॥
তব অনুপম তনুর কান্তি ভাবিতে ভাবনা বেদনা ভ্রান্তি।
দূরে যায় যত দুঃখ অশান্তি চিন্তনে তব চরণ দ্বয় ॥
বিপদ সাগর অকুল অপার, বিধি নাহি পান যার বিধি প্রতিকার।
সে বিপদ রাশি হয় অবহেলে পার, বারেক দিলে ঐ নামের জয় ॥
বিকার, প্রলাপ, মৃত্যুর ব্যাধি, বৈদ্য না পায় যার ঔষধি বিধি।
সলিল সেচনে অনল যেমতি, তোমার স্মরণে হয় তখনই লয় ॥
তোমার চরণামৃত কণিকার সে কি লোকাতীত মহিমা অপার।
সেবনে সেচনে অবশ অসার মৃত দেহ যেন চেতনাময় ॥
রোগ, শোক আদি যদি মর্ম্মশূল, এক বিষয়ই সে সবার মূল।
তোমার ভজনে আনন্দ অতুল, নির্ম্মূল সব ভাবনা ভয় ॥
এ জগতে আছে কি কোন অসম্ভব, যাহা নাহি হয় তব সাধনে সম্ভব।
নহিলে কি শুধুই সদা শিব শব রূপ ধরি চরণে লুটায় ॥

তৃতীয় ভাগ—একত্রিংশ অধ্যায়

কলিকাতা; রবিবার, ২৫শে আষাঢ় ১৩৪০ সাল,

ইং, ৯ই জুলাই ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, প্রফুল্ল, নগেন, জ্ঞান, পুত্তু, জিতেন, অপূর্ব্ব, তারাপদ, শ্যাম, কৃষ্ণ কিশোর, দ্বিজেন, হর প্রসন্ন, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, মতি, কালী মোহন, দ্বিজেন সরকার, ভোলা ও অভয় আছে।

জিতেন। অনেক সময় সাধারণ মানুষ রূপ দর্শন করে, এটা কি ঠিক?

ঠাকুর। হ্যাঁ, দর্শন হতে পারে, কিন্তু শুধু দর্শন হয়ে লাভ কি? আত্মার উন্নতি, ভেতরের কামনা বাসনা নষ্ট, ত্যাগ, এই সব লক্ষণ আসা চাই, তবে বোঝা যাবে যে ঠিক দর্শন হ'ল।

ভোলা। সাধু পুরুষদের পায়ের ধুলা নেওয়ায় দোষ আছে কি?

ঠাকুর। দোষ আর কি? তবে স্পর্শ ক'রে প্রণাম করলে, তাদের ভেতরের ইলেক্‌ট্রিসিটি (electricity) সাধু পুরুষদের শরীরে প্রবেশ করে। তাঁরা সর্ব্বদা পবিত্র ভাবে রয়েছেন, আর সাধারণ মানুষ অনেক সময় মনে নানা রকম অপবিত্র ভাব নিয়ে, কত রকম অন্যায় বাসনা কামনা নিয়ে আসছে। সে অবস্থায় স্পর্শ করলে তাঁদের খানিকটা অশান্তি হয়। অনেক সময় অনেকে আবার শরীরের ব্যাধি সারাবার বাসনা ক'রে সাধুদের প্রণাম করে, তাতে তাদের শরীরের ব্যাধি সাধুদের শরীরে আসে। কিন্তু ব্যাধির চেয়ে অসৎ ভাব গুলো তাঁদের বেশী অশান্তি দেয়। সেই জন্যে যারা তাঁদের সেবায় থাকে তাদেরও খুব পবিত্র ভাবে থাকা দরকার, অর্থাৎ ভক্ত ছাড়া তাঁদের সেবায় থাকা উচিত নয়। ভক্ত মানেই যার বিশ্বাস আছে; বিশ্বাস ঠিক থাকলে অপর যে কোন দোষ থাক না কেন, সব চ'লে যায়। তাই ঠিক ভক্তি ভাবে স্পর্শ

ক'রে পায়ের ধুলো নিলে ক্ষতি হয় না। তা ছাড়া তোমাদের অসৎ ভাব গুলো তাঁদের খানিকটা অশান্তি দিতে পারে বটে, কিন্তু তাঁদের শক্তির কাছে ত দাঁড়াতে পারে না; কাজেই তাঁদের যারা বেশী ভালবাসে ও ভক্তি করে, তাদেরই ঘাড়ে ছড়িয়ে পড়ে। সেই জন্য যার তার, যা তা ভাব নিয়ে সাধুদের স্পর্শ করা উচিত নয়। তা ছাড়া, যদি কোন জায়গায় স্পর্শ করতে না দেওয়া একটা নীতি থাকে তা হলে সেটা মেনে চলা সকলেরই উচিত, সে নীতি ভাঙ্গলে অকল্যাণ হয়।

জিতেন। মন্ত্র না নিলে কি সাধনা হতে পারে?

ঠাকুর। **মন্ত্র না হ'লে সাধনা চলতে পারে কিন্তু তার পূর্ণতা আসতে পারে না।** সংসারের এত জিনিষের মধ্যে দিয়ে গতি করতে হয় যে **গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল নিজের চেষ্টায় গতি করা এক রকম অসম্ভব।** বিনা গুরুর সাহায্যে এ পর্য্যন্ত কেউ পারেনি, এমন কি অবতাররাও লোকশিক্ষার জন্য এক জন গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে দেখিয়ে গেছেন। সাধনা মানে কি? একলক্ষ্য হয়ে এক বস্তুতে লেগে থাকা। এই ভাবে গতি করার নাম সাধনা। যত সাধন পথে অগ্রসর হবে, তত ভেতরের বাসনা, কামনা নষ্ট হবে, স্বার্থ কমতে থাকবে, আর তত পরকে আপন করতে পারবে। যত ক্ষণ স্বার্থ থাকে, তত ক্ষণ পরের দিকে নজর থাকে না; স্বার্থ যত কমবে তত পরকে ঠিক দেখতে শিখবে।

কেষ্ট। সাধারণ মানুষের দেহের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য আছে ব'লে আমরা সহজে চিনতে পারি; তেমনি সাধুদের শরীরে এমন একটা কিছু থাকে না কেন যা দ্বারা আমরা সাধু ব'লে ধরতে পারি?

ঠাকুর। এই যে দেহের পার্থক্যের কথা বললে, এও ত বড় হয়ে তবে দেখতে পাচ্ছ। ছোট ছেলে কি পার্থক্য বুঝতে পারে?

খুব ছোট যখন তখন তাকে কোলে নিলে, সে কি কোন রকম বিচার ক'রে বা চেনা অচেনা দেখে কোলে যায়? কিন্তু সেই যখন বড় হয়, তার যখন কিছু জ্ঞান বাড়ে, তখন সেই আবার অপরিচিত লোকের কাছে যেতে চায় না। যেমন জ্ঞান বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে এই সম্বন্ধে বিচার বাড়ছে। তোমার জ্ঞান যে টুকু বাড়ছে সেই অনুযায়ী তুমি বিভিন্নতা দেখছ। এখন সাধারণ মানুষের ভেতর বিভিন্নতা দেখতে পাচ্ছ। জ্ঞান আরও বাড়াও, সাধুকে চেনবার মত জ্ঞান বাড়লে, তখন সাধুদের মধ্যে বিভিন্নতা দেখতে পাবে।

তা ছাড়া, দুটোর মধ্যে বিভিন্নতা দেখে চিনতে গেলে দুটোই যে কি রকম তা আগে জানা চাই। এখন সাধারণ মানুষ যে কি তা জানলে, কিন্তু সাধু যে কি তা ঠিক না জানলে, দু জনের মধ্যে পার্থক্য দেখে ঠিক করবে কি ক'রে? তা, সাধুকে চেনা কি সোজা কথা? তোমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে কি সাধুর বিচার কিম্বা মাপ করতে পার? আর, সাধুর অবস্থা মাপ করবার তোমার দরকারই বা কি? তুমি দেখবে যে তোমার নিজের মিষ্টি লাগছে কি না? নিজের উন্নতি হচ্ছে কি না? নিজের বাসনা, কামনা কমছে কি না? এবং নিজের ত্যাগ আসছে কি না? তা হ'লেই ত সাধুকে কিছু জানতে পারলে।

গিরিশ ঘোষ পরমহংসদেব সম্বন্ধে বলেছিলেন 'উনি ভগবান হ'ন বা নাই হ'ন তাতে আমার কি? ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্য থাকতে পারে তাতেই বা আমার কি? এঁর কাছে থেকে যখন আমার দুঃখের নিবৃত্তি হয়েছে, এবং আমি শান্তি পাচ্ছি, তখন ইনিই আমার ভগবান।' কত বড় বিশ্বাস দেখ! শুধু এই বিশ্বাসের জোরেই কাজ হয়ে গেল। তাই পরমহংসদেব বলতেন 'ওরে গিরীশের বিশ্বাস পাঁচ সিকা পাঁচ আনা।' ধর, তোমার চারটী পয়সা দরকার, যে তোমায় চারটী পয়সা দিলে সেই তোমার অভাব ঘোচালে, সেই তোমার কাছে দাতা। এখন অপরের তুলনায় তার কত টাকা আছে বা না আছে, সে কথায় তোমার প্রয়োজন কি? আর চেনা হলেই

যে বিশ্বাস আসবে তা নয়, বিশ্বাস একটা মনের অবস্থা। হাজার চেন, হাজার শোন, মনের সে অবস্থা না এলে বিশ্বাস দাঁড়াবে না।

কেষ্ট। গুরু যাই হোন, তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে অন্ধের মত সে বিশ্বাস রাখলেই হবে ত ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, সে রকম ঠিক অন্ধ বিশ্বাস আসে যদি যে কিছুতেই সে বিশ্বাস আর টলবে না তা হলে অবশ্য আলাদা কথা, কিন্তু সে রকম বিশ্বাস আসা বড় শক্ত। তাই গুরুর সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। সদ্‌গুরু জোর ক'রে করিয়ে নেন। দরকার মত তাঁরা 'বজ্রাদপি কঠোরানি' আবার দরকার মত 'মৃদুনি কুসুমাদপি' হন। বিশ্বামিত্র শেষ পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্রের প্রতি কি কঠোর ভাব ধারণ ক'রে মান অপমানের লেশ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়ে দিলেন। তখন কি আর 'আহা', করলে শিষ্যের মঙ্গল হ'ত ? তাই বলেছে গুরুর কার্য্য বড় সোজা নয় ; বহির্ত্যাগ অনেকে হয়ত করাতে পারে, কিন্তু ভেতরে ত্যাগ করান বড়ই কঠিন। বিনা সাধনায় ভেতর ত্যাগ হয় না ব'লে, গুরু সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থেকে এই সব সাধনা সহজে করিয়ে নেন।

সেই জন্যেই পুরাকালে সকলেরই গুরু গৃহে থেকে কিছু সাধন ভজন ক'রে, মনের শক্তি কিছু বাড়িয়ে তবে সংসারে ঢোকবার নিয়ম ছিল। তখন তারা নিম্নস্থ কর্ম্মচারীকে শাসন করতে গিয়ে মূলে তার যাতে ক্ষতি না হয় এ বিষয় লক্ষ্য রাখত, এবং কাহারও প্রতি অযথা অন্যায় ব্যবহার করত না। এমন কি রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজাদেরও গুরুর সঙ্গে থেকে কত কঠোর সাধনা করতে হয়েছে, তবে ত ঠিক সব দিক বজায় রেখে রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। তা'তে রাজারও অনেক মঙ্গল হ'ত। ভাব দেখি, ভেতরে কতটা আসক্তি শূন্যতা ছিল, যাতে ক'রে রামচন্দ্র এক কথায় কাল রাজা হবার জায়গায় সমান ভাবে আনন্দ রক্ষা ক'রে রাজত্ব ছেড়ে বনে গেলেন এবং রাজা হরিশ্চন্দ্র এক কথায় সমস্ত রাজত্বই দান ক'রে

ফেললে! তখন রাজাদের স্বার্থ খুব কম ছিল; তারা যে টুকু স্বার্থ দেখাত, সেটার বেশী ভাগ দোকানদারী। এ দোকানদারী টুকুও দরকার।

যত ক্ষণ রাজা হয়েছ, রাজসিক ধর্ম্মে রয়েছ, মান সম্ভ্রম চাচ্ছ, তত ক্ষণ কিছু রাজসিক ভাব রাখতেই হবে। আবার যখন সাত্ত্বিক ভাব আসবে মান, অপমানকে সমান ভাবে দেখে স্থির থাকতে পারবে, তখন অবশ্য আলাদা কথা। সেকালে ৫০ পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর বনে যেতে বলেছে কেন? কারণ বয়স হ'লে দেহ স্বতঃই অপটু হয়ে আসে, এবং সাধারণতঃ মনের শক্তি ক'মে যায় তখন মায়াটা আরও বেশী জড়িয়ে ধরে এবং দেহসুখ ও আরামের জন্য নিজেকে আরও বেশী ক'রে ছেলে পরিবার প্রভৃতি মায়ার জিনিষের কাছে অধীন ক'রে ফেলে। তাই এই বদ্ধ মায়ার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে নিজের কেবল খাওয়া পরার সংস্থান রেখে ছেলেকে সংসারের ভার বুঝিয়ে দিয়ে নিজেকে আলাদা রাখতে এবং সর্ব্বদা তাঁর ভাবে থাকতে বলেছে।

যোগবাশিষ্ঠে আছে, **গুরুবাক্য পালন ক'রে চলার নামই পুরুষকার।'** সাধন করতে করতে মন কোন্ কোন্ স্তরে উঠলে মনের কি কি অবস্থা হয়, যোগবাশিষ্ঠে সে সব গুলো খুব ভাল ক'রে দেখিয়ে গেছে, তাতে দেখিয়েছে যে মন যত ক্ষণ রিপুর অধীন, তত ক্ষণ স্ত্রী, পুরুষ ভেদ আছে, কিন্তু রিপু গণ মনের অধীন হয়ে গেলেই আর ভেদ থাকে না। তাই চুড়ালা শিখিধ্বজকে পরীক্ষা করবার জন্যে নিজে সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক সেজে আর একটী মানস যুবক সৃষ্টি ক'রে তাকে আলিঙ্গন ক'রে শুয়ে ছিল। এমন সময় শিখিধ্বজ ঘরে ঢুকে তাই দেখে যেমনি বেরিয়ে চ'লে যাচ্ছে, অমনি চুড়ালা যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে ওঠবার ভান ক'রে উঠে এসে তাকে বললে 'আমি তোমার কাছে অবিশ্বাসী হয়েছি, আমাকে ক্ষমা কর।' এই কথা শুনে শিখিধ্বজ বললে 'ও কি কথা বলছ? শূন্যে কি কখনও বৃক্ষ হয়? আমার মনে ত কোন অন্যায় ভাব আসেনি,

তবে পাছে তোমাদের আনন্দের ব্যাঘাত হয় তাই চ'লে যাচ্ছিলাম।' ক্রোধ হয় কখন? বাসনা তুষ্পূরণে ক্রোধ; কাজেই বাসনা জয় হয়ে গেলে আর ক্রোধ হবে কেন? কারণ মান, অপমান ক্রোধের সঙ্গে জড়িত, আমার মান নষ্ট হ'ল, আমায় অপমান করলে, এই অহঙ্কার বোধ থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন—

ঠাকুর। বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে। সঙ্গই প্রধান; গুরুতে ঠিক বিশ্বাস রেখে তাঁর সঙ্গ করলে কখনও পড়তে পারে না। গ্রহ যতই বিরোধী হোক না কেন, মূলে কোন ক্ষতি করতে পারে না। সকল অবস্থায় গুরুতে ঠিক বিশ্বাস রক্ষা করতে পারলে আপনিই সব ঘুরে ঠিক হয়ে যাবে। **শিষ্যের প্রধান গুণ কি? অবিচারে গুরুবাক্য পালন করা।** সেই জন্যে কাউকে গুরু করবার আগে বেশ ভাল ক'রে বুঝে দেখতে হয় যে তোমার ভাবের সঙ্গে তাঁর ভাব মিল খায় কিনা? বা তুমি অবিচারে নিজেকে ভুলে গিয়ে শুধু তাঁর ভাব নিয়ে চলতে পারবে কিনা? হুজুগে প'ড়ে হঠাৎ কিছু ক'রে ফেলতে নেই। আগে নিজের মনে ঠিক ঠিক ভাব লাগা চাই। তখন তাঁর সঙ্গ করতে করতে নিজের মনের উন্নতি হতে থাকবে ও ক্রমশঃ তাঁকে ভাল লাগবে। সেই অবস্থায় গুরু করলে ভালবাসা লাগতে পারে। তার পর বেড় দিয়ে রক্ষা করলে সেই ভালবাসা পাকা হ'য়ে বিশ্বাস আনিয়ে দেয় এবং ঠিক পথে গতি করায়।

সদ্‌গুরুও তাই ভাল ক'রে ভেতর না দেখে চট্ ক'রে দীক্ষা দিতে চান না। সাধারণ সংসারী স্বার্থ নিয়ে সাধু সঙ্গ করে; আর সংসারীয় বাসনাতে সুখ, দুঃখ থাকবেই। বাসনা প্রবল হয় ব'লে সংসারীদের সাধু সঙ্গে ভাব রাখতে দেয় না। যে আত্মোন্নতির জন্যে আসে, তার ভাব ঠিক থাকে, কারণ সে কিছুতেই ত সঙ্গ ছাড়বে না, দরকার হয় বরং অপর সব ছাড়বে। সে জেদ বজায়

রেখে জোর ক'রে সঙ্গ করে এবং অন্য সব ত্যাগ করে। আর আছে, প্রেম বা ভালবাসা লাগলে জোর ক'রে কিছু করতে হয় না, আপনি সব হয়ে যায়। ঠিক ভালবাসা লাগলে মন স্বতঃই জোর ক'রে ভালবাসার পাত্রকে ধরে, তখন অপর জিনিষ গুলো আপনিই মন থেকে স'রে যায়, কারণ মন এক সঙ্গে দু'টো জিনিষ ধরতে পারে না। 'এ ভালবাসা ঠিক থাকে, তা ভিন্ন তোমাদের ভাল মন্দ বিচারের ওপর ভালবাসার দাম কি? কোন সময় হয়ত বিচারে ভাল লাগল, আবার কোন সময় বা মন্দ ব'লে মনে হ'ল।

যখন সংসারে খুব টাকা কড়ি আনব, সকলকে সুখী করব এই ভাব নিয়ে চলতে চাও, কিন্তু দেখ যে দুঃখ ত ছাড়ছে না ঠিকই আসছে, কাউকে সুখী করতে পারছ না, একটা না একটা অশান্তি লেগে আছেই, নিজেও কোন অবস্থায় সুখী হতে পারছ না, তখন সাধুর ওপরও অনেক সময় অবিশ্বাস আসতে থাকে এবং যে টুকু ভালবাসা নিয়ে সঙ্গ করছিলে সেটাও অনেক সময় রক্ষা করতে পার না। আমার কথা হচ্ছে এ অবস্থাতেও সঙ্গ ছেড় না। সুখ, দুঃখের হাতে প'ড়ে মনে অবিশ্বাস এলেও জোর ক'রে নীতি পালন ক'রে গুরুর সঙ্গ ক'রে যাবে, তাতে মনে জোর সংশয় আসতে দেবে না এবং ক্রমশঃ আবার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে। গুরুসঙ্গের প্রভাবই হচ্ছে যে অবিশ্বাস এলেও মনকে ঘুরিয়ে আবার ঠিক ক'রে দেয়। সংসারের ভেতর থেকে কিছু সময় নিয়মিত গুরুর সঙ্গ করলে কোন অপকার হ'তে পারে না, কারণ যিনি চালাবেন তাঁর কাছে গেলে কি কখনও ক্ষতি হতে পারে? বরং মনের শক্তি বাড়বে, বাসনা ক'মে আসবে ও অনিত্য বস্তুতে অশ্রদ্ধা আসবে। গুরুসঙ্গ বা সাধু সঙ্গের মুনফা হচ্ছে—ভেতরে কিছু অনুভূতি আসবে, বাসনা কমবে ও ত্যাগ আসবে এবং ক্রমশঃ তার নিজের আমিত্ব সব চ'লে যাবে।

ভালবাসা অনুযায়ী ভেতরের ভাব ওঠে এবং ভাব অনুযায়ী

দৃষ্টি হয়। এখানে ঠাকুর 'বারান্দায় সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকের' গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ১ম ভাগ ২১ পৃষ্ঠা) একই কৃষ্ণকে যশোদা এক ভাবে দেখছে, আয়ান এক ভাবে দেখছে, আবার রাধিকা আর এক ভাবে দেখছে। জটিলা, কুটিলা, কংশ প্রভৃতি এক ভাবে দেখছে, আবার বসুদেব তাঁকে কোলে ক'রে যমুনা দেখে আকুল হয়ে কাঁদছে, কেমন ক'রে পার হবে। যার যেমন ভেতরের ভাব সে সেই রকম দেখছে। ভেতরের ভাব না বাড়লে ঠিক দেখতে পাওয়া যায় না। কিছু ভালবাসা না এলে, কিছু বিশ্বাস না এলে, বিপদে মোটেই দাঁড়াতে পারবে না। সম্পদে থাকতে বিশ্বাস বোঝা যায় না, বিপদের সময়েই ঠিক বোঝা যায় কি পরিমাণ বিশ্বাস আছে। 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার, আর বিচ্ছেদ হ'লে জানা যায় ভালবাসা বাসি।' ভগবানের দিকে যে গতি করছে তার আলাদা কথা, তার বিশ্বাস যায় না; কিন্তু সাধারণের ভাব ত তা নয়। তাদের বিশ্বাস থাকলেও সেটা কাঁচা, তাই তাদের জন্যে গুরুর সঙ্গ, সাধুর সঙ্গই প্রধান। প্রেম থাক, বা নাই থাক, অন্তঃত নীতি পালনের মত রোজ কিছু সময় সঙ্গ করতে হয়, কিছুতেই নীতি ভঙ্গ করতে নেই; তাতেও ঢের কাজ হবে। ভালবাসায় যত কাজ হয় তেমন আর কিছুতেই হয না। তাই পরমহংসদেব ভালবেসে সব আপন ক'রে নিতেন, এবং তারাও সেই আপনত্বে আপন হয়ে সব ছেড়ে ছুটে আসত।

দ্বিজেন গাহিল—

(১)

যত দিন গত হতেছে জননী, বাড়িছে দীনের দারুণ যন্ত্রণা।
জননী পাষাণী কভু নাহি শুনি, মা হয়ে সন্তানে করিছ ছলনা॥
ভুবন মাঝারে রাখি স্তরে স্তরে, মা সাজায়ে রেখেছ ছেলের খেলনা।
দিয়েছ আঁখিরে বহির্দৃষ্টি মম, আমি হেরে লোভে তায় করি আনাগোনা॥

মোহেরই আবেশে পড়িয়া কুসঙ্গে, হতেছে জগতে কুযশ ঘোষণা।
তোমারই তনয়ে (মা! মা!) কু সন্তান বলে, শুনেও কি সরম হয় না॥
মা, কু সন্তান ব'লে যদি ত্যজ মোরে, আমি ত তোমারে ছাড়িব না।
রটাব জগতে নূতন কীর্ত্তি তব, মা হয়ে সন্তানে হেরিতে চাহে না॥
দীনে প্রবঞ্চনা করো না করো না, দাও অন্তর্দৃষ্টি ওমা ত্রিনয়না।
ঘুচাও মোহ ঘোর খুলি আবরণ, ওরূপ হেরি সহস্রারে মনেরি বাসনা॥

(২)

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি।
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন 'মা' ব'লে ডাকে।
(মাঝে মাঝে সে যেন 'মা' ব'লে ডাকে)
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও না ক।
জ্ঞান নয়নকে প্রহরী রেখো সে যেন সাবধানে থাকে॥

তৃতীয় ভাগ—দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

কলিকাতা ; মঙ্গলবার, ২৭শে আষাঢ় ১৩৪০ সাল ;

ইং ১১ই জুলাই ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, ললিত, নগেন, পুত্তু, অপূর্ব্ব, তারাপদ, শ্যাম, দ্বিজেন, জিতেন, কৃষ্ণ কিশোর, হর প্রসন্ন, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, মতি, ধন কৃষ্ণ, কালী মোহন, সুধীর, প্রফুল্ল, ভোলা ও অভয় আছে।

কালী মোহন। বিজ্ঞান অবস্থা না এলে পূর্ণ আনন্দ পাওয়া যায় কি ?

ঠাকুর। না, পূর্ণ আনন্দ হ'তে পারে না, এ খণ্ড আনন্দ। সংসারের ভেতরও খণ্ড আনন্দ পাওয়া যায়, তবে মাত্রা কম বেশী। দুটো অবস্থায় মানুষ গতি করে। হয় দুঃখের নিবৃত্তির জন্যে আর না হয় ভালবেসে। ভালবাসা লেগে গেলে আলাদা কথা ; দুঃখের নিবৃত্তি করতে গেলে যে যে বস্তু দুঃখ দিচ্ছে, সে গুলিকে ত্যাগ করা ব্যতিরেকে দুঃখ যাবে না। নিম পাতা খেতে তেত লাগে কাজেই তেত না চাইলে নিম পাতা খাওয়া বন্ধ করতে হবে। দুঃখের কিছু নিবৃত্তি হলে কিছু আনন্দ পাবে। তখন নিজেই বুঝতে পারবে আগের চেয়ে সংসার থেকে তফাৎ থাকতে পারছ কি না ? কিছু ত্যাগ এসেছে কি না ?

কালী মোহন। আমরা যে শীঘ্র শীঘ্র চাই।

ঠাকুর। শীঘ্র শীঘ্র চাইলে কি হবে ? শীঘ্র শীঘ্র ভোগ করবারই বা শক্তি কই ? ভাল পুষ্টিকর খাদ্য ব'লে খুব খানিকটা খেয়ে নিলে, এ দিকে হজম করবার শক্তি নেই অসুখ ক'রে বসলে।

কালী মোহন। বাসনা সব ছাড়বই বা কেন ? গীতায় বলেছে যুক্তাহার করতে।

ঠাকুর। এটা ত আলাদা, শরীর রক্ষার জন্যে খাওয়া দরকার, কাজেই কেবল দেহ রাখবার জন্যে অর্থাৎ পিণ্ড রক্ষার জন্যে যে অন্ন সেটা বাসনার মধ্যে নয়। সংসার বাসনা ছাড়তে হবে।

কালী মোহন। সংসারের মধ্যে জনক ঋষির মত থাকা কি সম্ভব? তাঁর হয়ত পূর্ব্ব জন্মের সাধনা ছিল কিন্তু ও রকম কি সবাই হতে পারে?

ঠাকুর। সম্ভব নয় কেন? জনকও ত সাধারণ মানুষ ছিলেন, সাধনার দ্বারা ঐ অবস্থা পেয়েছিলেন। জনক একটা অবস্থার নাম। আর তোমারও যে পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি নেই তা জানছ কি ক'রে? আজ হয়নি ব'লে যে কাল হবে না, তা তোমায় কে বললে? লালা বাবু এক কথায় সব ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে, যেমন মূলধন ফেলবে ব্যবসায় তেমনি লাভ হবে। কেউ এই নিয়েই প'ড়ে আছে, তার শীঘ্র হয়ে যাবে।

কালী মোহন। তা হলে সে অবস্থা আসা কি শুধু নিজের চেষ্টায় হয়?

ঠাকুর। না, শুধু নিজের চেষ্টায় হয় না; নিজের চেষ্টা ও অপর শক্তি এই দুটোতে মিলে হয়।

কালী মোহন। আমরা ত তাই অপর শক্তির কাছে এসেছি।

ঠাকুর। অপর শক্তির যে টুকু করবার তিনি করিয়ে নিচ্ছেন, কিন্তু তার ওপর তোমার চেষ্টা কই? তুমি ত সমস্ত ক্ষণ অপর চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছ। তোমার যে রকম আধার সেই রকম কাজ হবে ত? ঘটী ছোট হ'লে বেশী জল দিলে রাখতে পারবে কেন? এত সোজা নয়। জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্ম ক্ষয় হওয়া চাই তবে ত হবে। তার ওপর তোমার পূর্ব্ব জন্মের ধর্ম্ম সঞ্চয়ের ওপর কাজ হবে। তোমার তহবিলে ৯০০৲ নয় শত টাকা থাকলে তার ওপর আর ১০০৲ এক শত টাকা দিলে পুরা হাজার টাকা হবে কিন্তু কারুর তহবিলে ১০০৲ এক শত টাকা থাকলে তাতে ৯০০৲ নয় শত টাকা দিতে হবে তবে হাজার টাকা পুরা হবে। এই দু জনের অবস্থা কি এক হতে পারে?

নগেন। মন সুখ, দুঃখ দেখছে, বুঝতে পারছে কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, অথচ অজ্ঞান বশতঃই হোক বা যে কারণেই হোক, সেই মন্দটাকে ভাল ব'লে ধ'রে নিচ্ছে কেন?

ঠাকুর। এ দোষ হচ্ছে বাসনার। মানুষ যখন যেটা চায়, তখন সেইটারই চেষ্টা করে, তখন ভাবে না বা বোঝে না এতে ক্ষতি হবে কি ভাল হবে। যে রকমে হোক বাসনা পোরাতে চায়।

কালী মোহন। আনন্দ না পেলে বাসনা পোরাতে চায় কি? তাতে আনন্দ আছে ত?

ঠাকুর। আনন্দ নেই কে বললে? আনন্দ আছে বই কি, তবে সেই আনন্দের বিনিময়ে বড় নিরানন্দ আসে। ক্ষণ স্থায়ী আনন্দের বদলে দীর্ঘ স্থায়ী নিরানন্দ ও দুঃখ আসে।

কালী মোহনের ভাইপো সুধীরের সঙ্গে কথা হচ্ছে।

সুধীর। বাসনা ত্যাগ ক'রে, ধর্ম্ম রক্ষা ক'রে কি ক'রে সংসার করা যায়? বিশেষতঃ যদি অনেক গুলি খাওয়াবার পোষ্য থাকে?

ঠাকুর। এখানে বাসনা ত্যাগ মানে নেহাত যে টুকু নইলে নয়, কেবল সেই টুকুর চেষ্টা করবে। অর্থাৎ ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্ন (শাক, অন্ন), লজ্জা নিবারণেব বস্ত্র ও মাথা গোঁজার জন্যে একটু আশ্রয়, এই হলেই হ'ল। নিজে এই ভাবে থাকবে, আর আত্মীয় স্বজন, যারা তোমার পোষ্য, তাদেরও ঠিক এই ভাবে রাখবে। কিসে বেশী আসবে এ চিন্তা রেখ না। তবে তোমার প্রারব্ধে এসে যায় ভোগ করবে, কিন্তু তার জন্যে কোন চিন্তা মাথায় রাখবে না।

সুধীর। এর জন্যেও ত কিছু অর্থ চাই, সেই অর্থ আনতে গেলেই অসদুপায় নিতে হয়, অধর্ম্ম করতে হয়।

ঠাকুর। ওটা ঠিক নয়। এর জন্যে যে সামান্য অর্থের দরকার তা সদুপায়েই আনা যায়; তা ছাড়া অভাবটা কি ন্যায় থেকে উৎপন্ন হয়েছে যে সেটা পূরণের জন্যে অন্যায়ের দ্বারা টাকা রোজগার করতে তুমিতো হবে? দর মায়ায় প'ড়ে তাদের দুঃখ দূর করতে চাচ্ছ; এই

বাসনার জন্যে অন্যায় করছ। প্রকৃত অভাবের জন্যে অধর্ম্ম ক'রে পয়সা আনতে হয় না।

সুধীর। ধরুন আমার এমন বিদ্যেও নেই বা এমন কোন ক্ষমতাও নেই যে ঐ টুকু অর্থ আনি।

ঠাকুর। তাও যদি না পার, তবে সবাই দুঃখ পাবে। যে যার প্রারব্ধে কষ্ট পাচ্ছে তুমি তার কি করবে ?

সুধীর। তা এ অবস্থায় বাড়ীর অকর্ম্মণ্য বিধবা প্রভৃতিদের ফেলে সংসার ছেড়ে চ'লে গেলে অন্যায় হয় না ?

ঠাকুর। সংসার ত্যাগ কি এত সোজা ? ত্যাগ করবার আগে মস্ত একটা জিনিষ চাই। যদি এদের মায়ায় প'ড়ে এদের জন্যে টাকা রোজগার করতে চাও তা হলে বাইরে যেতে হ'ল ত ? এবং কিছু ক্ষণের জন্যও অন্তঃত ছাড়লে ত ? তবে, এ অবস্থায় তুমি বললেও সংসার ছাড়তে পারবে না। কারণ তখনও তোমার বিশ্বাস যে অপরের কাছে গিয়ে তুমি চেষ্টা ক'রে টাকা আনছ। যখন এইটা ঠিক বুঝবে যে আমরা কেউ কিছুই করতে পারি না এবং মানুষ টাকা দিতে পারে না; কেবল এক মাত্র ভগবানই সব করতে পারেন, তখন তুমি ত্যাগের কথা ভাবতে পার, আর তখনই তুমি সংসার ত্যাগের অধিকারী হবে। সে অবস্থায় আর ওদের মায়ায় প'ড়ে ওদের জন্যে টাকা রোজগার ক'রে আনবার জন্যে সংসারে থাকতে পারবে না; জোর ক'রে তোমায় বের ক'রে নিয়ে যাবে। তাই বলেছে যত দিন সংসারে আছ নীতিবান হয়ে সৎ ভাবে সংসার ক'রে যাও।

সুধীর। তাঁর ওপর নির্ভর করলে হয়, এ কথা অনেকে বলে, এটা কি ঠিক ?

ঠাকুর। নির্ভর কাঁকে বলে, সেইটাই যে জানা নেই। কেবল ভাষা শুনে রেখেছ। নির্ভরতা একটা বড় অবস্থা, সে কি সহজে হয় ? দুর্গাও বলছ আবার নৌকাও ঠেলছ। একে নির্ভরতা বলে না, এটা হল তাঁর শক্তির পরীক্ষা করা। শুনেছ নির্ভর করলে তিনি ভার নেন,

তাই পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাচ্ছ, সত্যিই তিনি নেন কিনা। এটা নির্ভরতা হ'ল না ; পরীক্ষা মানেই অবিশ্বাস, নির্ভরতা নয়।

ডাঃ সাহেব। উচ্চ অবস্থা হ'লে নির্ভরতা আছে বা না আছে কোন চিন্তাই রাখবে না ?

ঠাকুর। যখন দেখছে নিজে কখনও কিছু করতে পারে নি, প্রারব্ধে যদি কখন কিছু আসে তা ভাল, তা ছাড়া তার নিজের কোন ক্ষমতা নাই ; তখন আর কোন চিন্তা রাখে না।

কালী মোহন। সংসারে যে যার প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করছে যখন, তখন চেষ্টা ক'রে আমরা তার কিছু করতে পারি কি ?

ঠাকুর। কিছুই করতে পার না, যার যা আছে তার ঠিক ভোগ হবেই।

সুধীর। রাস্তায় এক জন অন্ধ ভিখারী ভিক্ষা করছে। তাকে দেখে ভিক্ষে দেওয়া বা তার দুঃখ দূর করবার জন্য অনাথ আশ্রম প্রভৃতিতে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করা উচিত ? না, সে তার কর্ম্ম ফল ভোগ করছে করুক ব'লে চ'লে যাওয়া উচিত ?

ঠাকুর। সব জায়গায় যদি ঠিক ভাবতে পার যে, যে যার কর্ম্ম ফল ভোগ করছে, তা হ'লে এ স্থলেও সেটা ভেবে চ'লে যেতে পার। তোমার নিজের ছেলে পরিবারের বেলাও কিন্তু ঠিক ভাবতে হবে যে ওরা যে যার কর্ম্ম ফল ভোগ করছে। তা ভিন্ন ছেলে পরিবারের বেলা নানা রকম বুদ্ধি খাটাবে, কত চেষ্টা করবে, আর কেবল অপরের বেলাই ও কথা ব'লে স'রে যাবে, তা হবে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে সাধারণ যা করে তাই তোমার করা উচিত। তোমার কাছে পয়সা থাকে ত যত টুকু দিতে পার দান কর ; তাতে তার দুঃখ গেল কি না এ সব চিন্তা করবার দরকার নেই। পার ত আশ্রমে বা কোথাও ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে তার দুঃখ যাতে কমে সে চেষ্টা করবে বই কি ?

তার পর হয় ত তার এমনই প্রাক্তন যে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য

সেখানে না থেকে ইচ্ছা ক'রে পালিয়ে গিয়ে আবার দুঃখ পেতে লাগল। সে তার প্রারব্ধ ভোগ করবে, কিন্তু তুমি সাধারণ বুদ্ধিতে, যেমন সব জায়গায় কর, সেই রকম যত টুকু পারবে তার জন্যে চেষ্টা করতে ত্রুটি করবে না; তবে তার তাতে লাভ হ'ল কি না এ তোমার দেখবার দরকার নেই। এটা যা বলছি, এ শুধু সাধারণ লোকের জন্য। যারা তাঁর দিকে যাবে, তাদের এ সব প্রয়োজন নেই। সামনে যদি হঠাৎ কিছু প'ড়ে যায়, এবং কেউ সাহায্য করবার লোক কাছে না থাকে, তা হ'লে সে যত টুকু পারে তাকে সাহায্য ক'রে যেই অপর লোক আসবে অমনি তার হাতে তাকে দিয়ে চ'লে যাবে।

সুধীর। ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ ক'রে সে কথার যুক্তি বিচার খাটিয়ে গ্রহণ করতে দোষ আছে কি? ধরুন শাস্ত্রে বলেছে চণ্ডাল অস্পৃশ্য এ কথা মেনে তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত না তাদের সঙ্গে মিশে তাদের ভালবেসে তাদের ভাল করবার চেষ্টা করা উচিত?

ঠাকুর। প্রথমে দেখ, শাস্ত্র লিখেছেন ঋষিরা। তাঁরা সাধন ভজন ক'রে, জ্ঞান লাভ ক'রে শাস্ত্রে লিখে গেছেন। তোমার সে জ্ঞান নেই; তোমরা যেটাকে 'জ্ঞান' বল সেটা হচ্ছে 'অজ্ঞান', কাজেই অজ্ঞান হয়ে কি জ্ঞানের বিচার করতে পার? তোমাদের পক্ষে, যদি মঙ্গল চাও, ঋষি বাক্য ধ্রুব সত্য ব'লে মেনে নিতে হবে। এক, যথার্থ জ্ঞান লাভ ক'রে, বিচার কর, মন্দ নয়, কিন্তু ঘোর অজ্ঞানতায় ডুবে থেকে, স্ত্রী পুত্রের মায়াতে হাবুডুবু খেয়ে, ঋষি বাক্যের ওপর কি বিচার করবে? তা ছাড়া মানুষ ত সব এক, মানুষ ত চণ্ডাল নয়, তার প্রকৃতিটা চণ্ডাল। সেই প্রকৃতিটাকে ভয় কর, তাই তার জন্যে বেড় দাও। তুমি কুকুর বেরাল পোষ, তাই ব'লে কি একটা বাঘ পুষবে? অথচ বাঘকে ঘৃণা কর না, তা যদি করতে তা হ'লে পয়সা দিয়ে চিড়িয়াখানার বাঘ দেখতে যেতে না। বাঘকে ভালবেসে পুষতে গেলেই, সে তার প্রকৃতির দোষে তোমাকে মেরে ফেলবে। বাঘের এই

মানুষ খাওয়া প্রকৃতি বদলাবার তোমার শক্তি থাকে যদি, তা হ'লে তার সঙ্গে মিশতে দোষ নেই, কিন্তু সে শক্তি ত তোমার নেই। যদি কারুর সে শক্তি থাকে, তার পক্ষে আলাদা কথা, তাই ব'লে সকলের পক্ষে ত আর বাঘকে কুকুর বেরালের মত নিয়ে ব্যবহার করা চলবে না।

তোমার যদি বিষ খেয়ে হজম করবার শক্তি থাকে, তাহলে তোমার পক্ষে বিষ আর সন্দেশ সমান; কিন্তু বিষ খেয়ে যদি ম'রে যাবার ভয় থাকে, তা হ'লে বিষকে অতি সাবধানে রাখতে হবে এবং তা থেকে তফাতে থাকতে হবে। মানুষ ত ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট পদার্থ; এই মানুষই ভেতরের বৃত্তি অনুযায়ী পশু হচ্ছে, মানুষ হচ্ছে, দেবতা হচ্ছে, আবার ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। কাজেই ভেতরের বৃত্তি নিয়েই কথা। শাস্ত্রে বেড় দিয়েছে কেন? চণ্ডালের প্রকৃতি তমগুণে ভরা, কাম, ক্রোধ, লোভের অধীন; তোমার ভেতরেও কাম, ক্রোধ, লোভ রিপু আছে, তবে তোমার বৃত্তি কিছু ভাল ব'লে মনের শক্তির দ্বারা তাদের ওপর কিছু কর্তৃত্ব করতে পার, এবং পশুবৎ ব্যবহার কর না। এই মনের শক্তি তোমাদের বাড়াবার জন্যেই এত বেড় দেওয়া। এখন যদি তুমি ওদের সঙ্গে অবাধে মিশতে যাও, তা হ'লে তোমার চাপা রিপু গুলো বেড় পেলে না বরং আরও সুবিধা পেয়ে তাদের মত যথেচ্চার ব্যবহার করতে লাগল; ফলে তাদেরও ভাল করতে পারলে না, নিজেরও সৎ বৃত্তি ও সংযম যে টুকু ছিল নষ্ট ক'রে ফেললে।

এই দেখনা, এমনও শোনা গেছে উচ্চ শিক্ষিত ও ভদ্র বংশের সন্তান বেশ্যাদের উন্নতি করবার জন্যে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশে তাদের ভাল না ক'রে নিজেই নষ্ট হয়ে গেল। কোনও চণ্ডাল যদি সৎ বৃত্তি সম্পন্ন হয়, তা হ'লে তার সঙ্গে মিশতে দোষ নেই, কিন্তু সে ভাল ব'লে, তার আত্মীয় স্বজন যে সব ভাল হবে তার কোন মানে নেই। তা হ'লেই সে যখন সেই সব আত্মীয় স্বজন ত্যাগ ক'রে তোমার সঙ্গে মিশছে না তখন তার সঙ্গে অবাধ মেশা মানেই তার সেই সব মন্দ প্রকৃতি আত্মীয় স্বজন

দের সঙ্গে অবাধে মেশা। তাই সাধুরা যে সময় সংসার ছেড়ে বাইরে থাকেন তখন সকলের সঙ্গেই অবাধে মেশেন কিন্তু যেই সংসারের ভেতর থেকে সংসারীদের সঙ্গে কার্য্য করেন, তখন আর সংসার নীতি, সমাজ নীতি প্রভৃতি কিছুতেই ভাঙ্গতে চেষ্টা করেন না, সব ঠিক বজায় রেখে যান। অবশ্য, তিনি যদি সংসারে থেকে নীতি ভাঙ্গেন তাতে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না বটে, কারণ তাঁর শক্তি আছে, কিন্তু তাঁর দেখাদেখি আর সকলে সেই ভাবে নীতি ভেঙ্গে মিশতে আরম্ভ করবে।

এক বার নীতি বা সংস্কার ভাঙ্গলে আর সামলাতে পারবে না। তা, দেখছই ত এই নীতি ও সংস্কার কিছু ভাঙ্গবার জন্যে তোমাদের সমাজের আজ এই অবস্থা! তোমরা বলবে উচ্চ বর্ণের লোকেরা পতিত ও নীচগামী হয়েছে। বেশ কথা, তা যদি বুঝে থাক, এবং তোমাদের যদি শক্তি থাকে তাদের অন্যায় গুলি যাতে নষ্ট হয় তার চেষ্টা কর। তা না ক'রে নীচ বর্ণের লোকদের তাদের সকলের সঙ্গে অবাধে মিশতে দিয়ে কার উন্নতি করবে? একটা পরিষ্কার জল ঘোলা হয়েছে, তখন তোমাদের কি করা উচিত? সেই জলের চারিদিকে ভাল ক'রে বেড় দিয়ে, যাতে অপর ঘোলা জল আর না মিশতে পারে, এই ভাবে সেই ঘোলা জল পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা করা উচিত। তা না ক'রে, যদি আর একটা নর্দ্দমার সঙ্গে তার যোগ ক'রে দাও তা হ'লে যা হবে, আজ তোমাদের সেই অবস্থা হয়েছে। এখন যে হাওয়া চলেছে, এটা হিংসার ওপর প্রতিষ্ঠিত, এটা প্রেম নয়। হিংসা যে কার্য্যের ভিত্তি সে কার্য্যের কখনও সুফল ফলতে পারে না, তা যিনি যাই বলুন না কেন।

গীতাতে তাই ভগবান বলেছেন 'চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ'। এখানে মানুষকে ভাগ করেন নি, মানুষের গুণ ও কর্ম্ম অনুযায়ী ভাগ করেছেন। ' ত্যাগ, পরের দুঃখে কাতর হওয়া, সহিষ্ণুতা উপেক্ষা, ভালবাসা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; ব্রাহ্মণ সাধন ভজনকেই প্রধান ক'রে সর্ব্বদা তাই নিয়ে থাকে; তারা সত্ত্বগুণী। ক্ষত্রিয় রাজ্য শাসন করবে, অর্থ রোজগার করবে, ধর্ম্ম রক্ষার সহায়তা করবে,

আবার নিজেরাও কিছু সাধন ভজন করবে। এদের সত্ত্ব রজ মিশ্রিত। বৈশ্য কেবল অর্থই প্রধান করেছে, যে রকম ক'রে হোক অর্থ সম্পদ হওয়া চাইই, ধর্ম্মের দিকে এত লক্ষ্য নেই; তাই এদের রজ ও তম মিশ্রিত। এ যুগের রাজারা প্রায়ই এই শ্রেণী ভুক্ত। তোমরা যখন তাদেরই বড় করেছ এবং তাদের অনুকরণ করছ, তখন তোমরা তাদের চেয়েও নিম্ন শ্রেণী অর্থাৎ তম গুণাচ্ছন্ন হয়ে আছ। আর শূদ্র তম গুণাশ্রিত। তম মানে অজ্ঞানতা। তবে এরই মধ্যে থেকে নবশাক প্রভৃতি সৎ সঙ্গে কিছু সৎ বৃত্তি সম্পন্ন হয়েছে ব'লে তাদের একটু বড় করেছ। শূদ্র যদি বৃত্তি বদলে ভাল হতে পারে, তবে সেও ব্রাহ্মণের মত সম্মান পায়, যেমন বিদুর পেয়েছিল। গুহক চণ্ডাল হলেও ভগবান তাকে কোল দিলেন; সবই বৃত্তির ওপর। তাই বলি, আগে নিজে সাধন ভজন ক'রে রিপু গুলো অধীন কর, বাসনা জয় কর, তবে ত মনের শক্তি বাড়বে। তখন তুমি বিচার করবার উপযুক্ত হবে; তা ভিন্ন শাস্ত্রের বিচার করতে গেলেই ভুল হয়ে যাবে।

সুধীর। তম গুণী ব্রাহ্মণ হয়ে আমি যদি সত্ত্ব গুণী চণ্ডালের সঙ্গে না মিশি, সেটা কি অহঙ্কার হ'ল না?

ঠাকুর। তুমি যদি তম গুণী ব্রাহ্মণ হও, তা হলে তোমার ভেতরটা অজ্ঞানে ভরা। সে অবস্থায় তুমি কি ক'রে সত্ত্ব গুণী চণ্ডাল চিনবে? সত্ত্ব গুণ যে কি, তার কি কি লক্ষণ এ সব তোমার কিছুই জানা নেই, অথচ তুমি টপ ক'রে এক জন চণ্ডালকে দেখে সে সত্ত্ব গুণী কি না বুঝে নিলে? তা ছাড়া, শুধু সাময়িক একটা বাহ্যিক লক্ষণ বা তার ভাষা শুনে তার ভেতরের অবস্থা বোঝা যায় না। তুমি যা বললে সেটা কি রকম জান; যেমন একটী জন্মান্ধ ব্যক্তি একটী সুন্দরী যুবতীর রূপ দেখে মুগ্ধ হওয়া। এটা যেমন অসম্ভব তোমার কথাটাও তাই।

আর বাস্তবিক যদি তুমি তোমার নিজের উন্নতি করবার জন্যে সত্ত্ব গুণী চণ্ডালের সঙ্গ করতে চাও, ত অত দূর না গিয়ে তোমার হাতের

কাছে সত্ত্ব গুণী ব্রাহ্মণের সঙ্গ ক'রে নিজেকে ভাল কর না ? চণ্ডালের কাছে যাও কেন ? এর কারণ হচ্ছে, হয় তার প্রকৃতিটা তোমার ভাল লাগে ব'লে সেইটা নিতে চাও আর নয় তুমি নিজেকে ভাল ব'লে বিবেচনা ক'রে তাকে তুলতে যাও। তার প্রকৃতিটা যখন ভাল ব'লে মনে কর না তখন তাকে তোলবার জন্যেই যাচ্ছ, তা দেখ, তোমার তোলবার মত শক্তি আছে কি না ? আগে নিজে বড় হও, নিজের অভাব এবং দুঃখ একেবারে দূর কর, খুব শক্তি সম্পন্ন হও, তবে ত তাকে তুলতে পারবে, নইলে দু জনেই ডুবে যাবে, যেমন ভাল সাঁতার না জেনে ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে গেলে হয়।

সুধীর। যদি বলি যে ভগবানকে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে বড় ধর্ম্ম আর নেই, তা হলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সব বলা হ'ল ত ? আর কিছুই বাকী রইল না ?

ঠাকুর। ঠিক আত্মসমর্পণ ত খুব বড় ধর্ম্ম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সে ত বললেই হবে না। আগে, আত্মসমর্পণ বললে কি বোঝায় সেটা বোঝ। আত্মসমর্পণ করতে গেলে কি কি লক্ষণ থাকা দরকার, কি ভাবে চলতে হবে, আর কি কি লক্ষণ দেখলে ঠিক আত্মসমর্পণ বুঝবে, এ গুলি আগে ভাল ক'রে জান, তবে আত্মসমর্পণের কথা বলা সাজবে ; নইলে সেটা শুধু বই পড়া বা শোনা কথা মাত্র। **বাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ ক'রে মন স্থির করতে না পারলে ঠিক ঠিক আত্মসমর্পণ হয় না বা করা যায় না।**

প্রফুল্ল। বাসনা ত্যাগ করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু এ দেহ থাকতে হয় ত সব বাসনা ত্যাগ হয়ে উঠল না। যে টুকু ত্যাগ হ'ল, এ দেহ চ'লে গেলে পর জন্মে সেই টুকু ত্যাগ সঞ্চিত থাকবে ত ? আবার তার পর থেকে ত্যাগ আরম্ভ হয়ে ত্যাগ আরও বাড়বে ত ?

ঠাকুর। হঁা, যে টুকু ত্যাগ হয়ে গেল সেটা জমা রইল। পর-জন্মে তার পর থেকে কাজ হবে, কারণ 'বাসনা ত্যাগ করব' এই বাসনা নিয়েই এ দেহ ছাড়ছ কি না।

প্রফুল্ল। হরিদাসের মত অন্তরঙ্গ ভক্তকে কি চৈতন্য বলেছিলেন এক শত জন্ম পরে তাঁকে পাবে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, সে গুরু আজ্ঞা পালন করেনি ব'লে। চৈতন্যদেবের আদেশ ছিল ভিক্ষা ক'রে আনবে বটে কিন্তু কোন স্ত্রীলোকের, এমন কি তাঁর অন্তরঙ্গ স্ত্রীলোকভক্ত মাধবীলতার কাছ থেকেও ভিক্ষা করবে না। এক দিন কোথাও ভিক্ষা না পেয়ে প্রভুর সেবা হবে না ব'লে হরিদাস বাধ্য হয়ে মাধবীলতার কাছ থেকে ভিক্ষা ক'রে এনেছিল। সেই জন্যে তার ওপর এই সাজা দেওয়া হয়েছিল। যে ঠিক ঠিক ভক্ত তাকে গুরুর সঙ্গ করতে না দেওয়াই সব চেয়ে বড় শাস্তি। ভক্ত ত সঙ্গ ছাড়া আর কিছুই চায় না। যত ক্ষণ রিপু গণ সম্পূর্ণ অধীন না হয়, তত ক্ষণ সাধকের কিছুতেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। সন্ন্যাসীদের তাই স্ত্রীলোকের ছবি পর্য্যন্ত দেখা নিষিদ্ধ।

সাধুই হোক, আর সন্ন্যাসীই হোক তারা গুণের ভেতর; তারা সত্ত্ব গুণের মধ্যে থাকতে চেষ্টা করছে, আর রজ তম ছাড়তে চেষ্টা করছে। গুণের মধ্যে থাকলেই স্ত্রী পুরুষ বোধ থাকে; গুণাতীত হলে তখন আর স্ত্রী, পুরুষ ব'লে বোধ থাকে না এবং তখন, যে তাকে ভালবেসে আসবে তা সে মেয়ে হোক, পুরুষ হোক, সকলকেই সে ভালবাসতে পারে। গুণাতীত অবস্থা কি? বাসনা সম্পূর্ণ অধীন হলেই গুণাতীত অবস্থা হবে; কিন্তু কাজ করতে এলেই গুণের মধ্যে আসতেই হবে। তখন সত্ত্ব, রজ, তম তিন গুণেরই ভেতর থেকে কাজ করতে পারে। তবে এদের অর্থাৎ জীবন্মুক্তদের তম গুণের ভেতর এসে কাজ করা আর সাধারণ তম-গুণীর তম গুণের কার্য্য করা ঢের তফাৎ। তম গুণী তমের কাজ ছাড়া করতে পারবে না কারণ সে তাতেই বদ্ধ; আর যারা গুণাতীত তারা প্রয়োজন হলে তবে তম গুণের কাজ করে কিন্তু সেটা কখনও নিজের স্বার্থের জন্যে নয়, বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ শুধু পরের মঙ্গলের

জন্যে করে। সে তাতে বদ্ধ নয় এবং কাজ শেষ হলেই আবার মনকে তুলে নেয়। যেমন, বাড়ীর কর্ত্তা ওপর থেকে দরকার মত নীচে নেমে আসে, আবার কাজ সেরে ইচ্ছামত ওপরে চ'লে যায়; কিন্তু যে এক তলায় থাকে অর্থাৎ বাড়ীর দরোয়ান, সে কেবল এক তলার কাজেই থাকে ইচ্ছা করলেই ওপরে উঠতে পারে না। দুঃখের সময়ই কে কোন অবস্থায় আছে তার আসল পরীক্ষা হয় এবং তখন কে কোন গুণে আছে সহজে ধরা যায়।

শিবপুর হইতে চুণী আসিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে গান করিতে বলিলেন। চুণী তাহার রচিত গান দু খানি গাহিল—

(১)

আমার মন যেও না ভুলে।
গুরুপদ কোকনদ সব তীর্থের মূলে।
গয়া গঙ্গা কাশী কাঞ্চি পাবি ঐ চরণের তলে॥
গুরুই মাতা, গুরুই পিতা, গুরুই বন্ধু, জ্ঞান দাতা।
গুরু এক মাত্র ত্রাণ কর্ত্তা, এ ভব সাগরের কুলে॥
গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর।
গুরুই পরম ব্রহ্ম সব শাস্ত্রেতে বলে।
গুরু অরূপে সরূপ রূপ এই ধরাতলে॥
মিছে তার জপ তপ বৃথা সাধন ভজন।
গুরু ইষ্টে ভেদ যে করে তার জনম গেল বিফলে॥
যা চাবি তাই পাবি রে ভাই মিছে কোথায় যাবি।
চতুর্ব্বর্গ ফল রয়েছে গুরুর চরণ তলে।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পাবি ঐ চরণের তলে॥
এমন সাধের রতনে মন রতি হ'ল না তোর।
তুই মণি ফেলে কাঁচে মজিলি, তোর জ্ঞান হবে কোন কালে॥

(২)

আমার চিনায়ে দাও না তুমি ঘুচায়ে মনের ধাঁধা।
কে তুমি ছোট পাছে পাছে যেন ডুরি দিয়ে বাঁধা॥

মা কিম্বা পিতা তুমি মোর, সুকোমল অতি তব প্রেম ডোর।
ছিঁড়িতে জানে না টানিলে ছাড়ে না, ছাড়াতে হই আরও বাঁধা ॥
কত রূপ তব বিমোহন, হেরিলে পুরে যায় প্রাণ মন।
যেরূপে যখন হও হে প্রকাশ, বিভোর হই যে সদা ॥
কভু বনমালী মুরলী অধরে, প্রেমলীলা পুনঃ দেখাবার তরে।
দেখাতেছ লীলা অন্তরে বাহিরে, সাথে ল'য়ে প্রেমের রাধা ॥
কভু শ্রীচৈতন্য প্রেমের পুতলি, ডাকিতেছ মোরে দুই বাহু তুলি।
মন প্রাণ খুলি আয় হরি বলি, ওরে আনন্দে রহিবে সদা ॥
কভু শিব তুমি চির মঙ্গলময়, উদ্ধারিছ জীবে ত্রিতাপ জ্বালায়।
দেখাতেছ জীবে ভবে বেদ মিথ্যা নয়, তাই শিষ্য প্রেমে হলে বাঁধা ॥
কভু বা তুমি হয়ে মহাকালী, ঘুচাইছ জীবের মনের কালি।
কহিছ সবারে আয় 'মা' 'মা' ব'লে, ওরে আমি যে তোদেরই বাঁধা ॥
কভু শিশু মুখে 'মা' 'মা' বুলি, নাচিছ, গাইছ দিয়ে করতালি।
মা বিনা যেন অসার সকলই, মাতৃ প্রেমে সদা বাঁধা ॥
তোমার এ অনাদি অনন্ত রূপ, তুমি বিনা কে কহিবে স্বরূপ।
তাই ত বলি বুঝায়ে দাও না, ঘুচায়ে মনের ধাঁধা ॥

তৃতীয় ভাগ—ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

কলিকাতা ; বৃহস্পতিবার, ২৯শে আষাঢ় ১৩৪০ সাল ;
ইং ১৩ই জুলাই ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, ললিত, নগেন, পুত্তু, অপূর্ব্ব, শ্যাম, তারা পদ, কৃষ্ণ দত্ত, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, কৃষ্ণ কিশোর, পঞ্চানন, কালী মোহন, মতি, সুধাময়, সুরেন পাল, প্রফুল্ল, কালু, জিতেন, হর প্রসন্ন, দ্বিজেন সরকার, অনুকুল, সুধীর, ভোলা ও অভয় আছে।

পুত্তু। নিজে কঠোর সাধন ভজন করলে আর গুরু সঙ্গ করার দরকার হয় কি ?

ঠাকুর। সাধন ভজন করছ ঘর থেকে বেরুবার জন্যে ; তা তুমি নিজে যদি কেবল দেওয়ালের দিকেই গতি করতে থাক ত খালি দেওয়ালেই ধাক্কা খাবে, দরজা খুঁজে পাবে না। গুরুর সঙ্গ করলে গুরু ঘরের দরজা কোন দিকে সেটা দেখিয়ে দেন তখন সেই দিক ধ'রে চললে চট্ ক'রে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। গুরু সঙ্গ বা সাধু সঙ্গ ছাড়া কিছু হবার যো নেই ; আবার সাধারণ সাধু সঙ্গ বা সাধারণ গুরু সঙ্গ অপেক্ষা সৎ গুরু সঙ্গে ঢের বেশী কাজ হয়। সাধারণ সাধু নিজের সাধন ভজন নিয়ে থাকে এবং নিজের ভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী চলে। সেই ভাব বা প্রকৃতির সঙ্গে যদি কাহারও মিশ খায় তবে সেই সাধু সেই প্রকৃতির লোকদের গতি করবার সাহায্য করতে পারে, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি ধরবার বা চালাবার ক্ষমতা থাকে না। তারা জানে সাপের কাছে গেলে সাপ কামড়াবে তাই তারা সাপের কাছ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু যাঁরা সৎ গুরু তাঁরা লোক শিক্ষার জন্য আসেন, তাঁরা সাপ দেখে ভয় পান না,

কারণ তাঁরা জানেন সাপ তাঁদের কামড়াতে পারবে না; আর যদিও বা কামড়ে ফেলে, তার বিষ তাঁদের কিছুই করতে পারবে না।

তাঁরা সব রস নিয়ে থাকেন, সব রস আস্বাদন করেন, অথচ প্রত্যেক রসটিই তাঁদের অধীন, যখন ইচ্ছা হয় তার থেকে তফাৎ হয়ে যান। তাঁদের বাহ্যিক কিছুই ত্যাগ করবার প্রয়োজন হয় না, কারণ তাঁরা কিছুতেই বদ্ধ নন; বেশ ভোগের মধ্যে রয়েছেন, কিন্তু যেই ইচ্ছা হবে, অমনি সব ফেলে চ'লে যাবেন, তখন আর কোন জিনিষ তাঁদের বাঁধতে পারবে না। কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে মিশে তাদের জন্যে কত কাঁদছেন, যেন কত মায়ায় জড়িত হয়ে ভালবাসছেন কিন্তু যেই মথুরায় যাবার প্রয়োজন বিবেচনা করলেন অমনি সব ফেলে চ'লে যাচ্ছেন, আর কারুর কান্না শুনছেন না। কত গোপী রথের চাকার তলায় প'ড়ে দুঃখ পাচ্ছে কিন্তু সে দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না।

রামচন্দ্র রাজা হতে যাচ্ছেন, যেই শুনলেন বনে যেতে হবে, অমনি সমান আনন্দ রক্ষা করেই বনে চ'লে গেলেন। সীতা হরণে কাঁদছেন, আবার প্রয়োজন মত সেই সীতাকেই বনে পাঠাচ্ছেন। তাঁরা সব ভাবে থেকে লোককে শিক্ষা দিচ্ছেন যে কেমন ক'রে ভোগকে অধীন ক'রে নিয়ে সংসারে ভোগ করা যায়। এ রকম ভোগে কোন দুঃখ আসে না। হাঁসি কান্না এঁদের অধীন, কিন্তু সাধারণ জীব হাঁসি কান্না, ও মায়ার অধীন এবং এতেই বদ্ধ হয়ে প'ড়ে থাকে ও ইচ্ছা করলেও ছেড়ে যেতে পারে না। সৎ গুরু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে যার যা ভাব তার সঙ্গে সেই ভাবে মিশে গতি করান, তোমরা সংসারে দু একটা প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে মাথা খারাপ ক'রে ফেল, আর তাঁরা হাজার হাজার প্রকৃতি নিয়ে খেলছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধ'রে তাদের আপন ক'রে নিয়ে তাদের মঙ্গল করছেন।

আবার, যারা তাঁদের ভালবেসে মান, অভিমান, ঘৃণা, লজ্জা, এমন কি দেহটাকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ ক'রে তাঁদের কাছে ছুটে আসছে, তাদের সেই ভালবাসা গ্রহণ করা কি সোজা কথা? সে ভালবাসা যে না জেনেছে,

সে কি কখনও তার ধারণা করতে পারে? সৎ গুরু ছাড়া এমন ভাব, এ রকম এক লক্ষ্য ভালবাসা গ্রহণ করবার ক্ষমতা কি আর কারুর আছে? সৎ গুরুতে যার ভালবাসা পড়েছে, সৎ গুরুতে যার ঠিক বিশ্বাস আছে, তার আর সাধন ভজন করবার কিছু দরকার হয় না। তিনি তার সব ভার গ্রহণ করেন। তাঁতে বিশ্বাস মানেই, তাঁর সঙ্গে যোগ, কাজেই আপনিই কার্য্য হয়। খানিকটা নর্দ্দমার জল যদি গঙ্গায় ফেলে দেওয়া যায়, সেটা আর তখন নর্দ্দমার জল থাকে না, গঙ্গা জল হয়ে যায়। কিন্তু এই বিশ্বাস আসা বড় শক্ত। **বিশ্বাসের মত সোজা পথ আর নেই।** তাই বলেছে সঙ্গই প্রধান, সঙ্গ করতে করতে ভালবাসা পড়ে ও বিশ্বাস আসতে থাকে।

কৃষ্ণকিশোর। চট্ ক'রে রাগ হওয়াটা বন্ধ হয় কি ক'রে?

ঠাকুর। উপদেশ গুলি সব তখন মনে ধারণা করতে হয়, ধৈর্য্য রাখতে হয় ও উপেক্ষা করতে হয়। যে সঙ্গ দ্বারা নিজের অপকার হবে বুঝবে, সে সঙ্গে মেলা মিশতে নেই, নেহাত যে টুকু না মিশলে নয়, তা ছাড়া তফাত থাকতে হয়। বিশেষতঃ, তোমরা যখন রোজ খানিক ক্ষণ সঙ্গ করছ, তোমাদের ধৈর্য্য থাকা আরও দরকার, নইলে তোমাদের লোকে টিটকিরি দিয়ে বলবে 'এত সঙ্গ ক'রে ত এই হল!'

এই যে রোজ কালীঘাট যাচ্ছি, দেব স্থানে যাচ্ছি, এ শুধু তোমাদের কর্ম্ম ক্ষয় করবার ও তোমাদের নীতি বল শেখাবার জন্যে। কালীঘাটে যে দুটো চারটে লোক গোলমাল করে, তাদের ঠিক করতে কি আর বিলম্ব হয়, কিন্তু আমি যদি একটু রাগ করি, তোমরা তা হ'লে ত মেরে ধ'রে খুন ক'রে বসবে। তোমাদের ধৈর্য্য ও উপেক্ষা শেখাবার জন্যে অত ক'রে সাবধান করি। মিষ্ট কথায় সর্ব্বদা নিজের কাজ বজায় ক'রে যাবে, নিজের যে টুকু প্রয়োজন, ভাল ভাবে এবং মিষ্ট কথায় সে টুকু ঠিক আদায় ক'রে নেবে, একটুও ছাড়বে না; সবটা গুছিয়ে নিয়ে চুপ ক'রে আপনার কাজ ক'রে যাবে; অপরে যে যাই বলুক, এমন

কি যদি গালাগালও দেয় সব উপেক্ষা করবে। তা হ'লে তারা আপনার মনে ব'কে ব'কে নিজেরাই জব্দ হয়ে চ'লে যাবে।

তা ছাড়া যখন আমার সঙ্গে থাকবে, তখন আরও ধৈর্য্য ও উপেক্ষা দরকার কারণ তখন তোমাদের ত কিছু বলবে না, আমাকেই দোষ দেবে। বলবে, 'এই সাধুর এই সব শিষ্য! যেন গুণ্ডার দল!' সাধুদের প্রধান জিনিষ হচ্ছে স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য ও উপেক্ষা। সাধুকে আগে লোক গালাগাল দেবে, পাঁচ কথা বলবে, এ সব তাদের উপেক্ষা ক'রে সহ্য করতে হবে, নইলেই গোলমালের সৃষ্টি। অন্তঃত দেব স্থানে ও সাধু স্থানে যদি হিংসা, ক্রোধ, নষ্ট করতে পার, তাহ'লেও কিছু সময়ের জন্যে ক্রোধকে অধীন করতে পারলে ত? এই রকম অভ্যাস করতে করতে ক্রমান্বয়ে রিপু অধীন হয়ে আসবে। যত ধৈর্য্য রক্ষা করতে পারবে তত ভেতরে আনন্দ থাকবে। রাগ ক'রে কখনও আক্রোশ পোষণ করবে না; যত ভেতরে পুষে রাখবে, তত অশান্তি ভোগ করবে।

মতি। অভিমান হলে কি ক্রোধ হয়? অভিমান এলে তফাত থাকতে ইচ্ছে করে কেন?

ঠাকুর। ভালবাসা থেকে অভিমান হয়। অভিমান থেকে দুঃখ আসে; তাই অভিমানে ক্রোধ এলেও জ্ঞান হারা ক্রোধ হয় না। আবার বেশী ক্রোধ হলে তখন অভিমান থাকে না। ভালবাসা থেকে অভিমান আসে ব'লে, অভিমান এলে তার থেকে তফাত থাকতে ইচ্ছে হয় ও তখন বিচ্ছেদ ভাল লাগে। আবার বিচ্ছেদ হ'লেই অভিমান চট্ ক'রে চ'লে যায়। যার যত ভালবাসার জোর তার তত শীঘ্র অভিমান নষ্ট হয়।

নগেন। সাংখ্যেতে কিসে দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় বলেছে, কিন্তু বাসনা ত্যাগ করলেই যে দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, সেটা বলেনি। যোগবাশিষ্ঠেও সুবাসনা, কুবাসনা দুটো দিয়েছে।

ঠাকুর। যে বাসনা ত্যাগ করতে পারে, তার কাছে 'সু', 'কু' নেই। যে বাসনা ত্যাগ করতে পারে না, তার পক্ষে সুবাসনা দিয়ে কুবাসনা ত্যাগ করতে হয়। শাস্ত্র পড়াও দু রকম আছে, এক হচ্ছে বই এর কথা গুলো মুখস্থ ক'রে রাখা, আর হচ্ছে বই এর উপদেশ মত চলা। যারা শাস্ত্রের উপদেশ অনুযায়ী চলে, তারাই বাসনা ত্যাগের অধিকারী হয়। পরমহংসদেব বলতেন, 'বিবেক বৈরাগ্য শূন্য পণ্ডিতকে খড় কুটোর মতন দেখবে।' যেমন শকুনি খুব বড় পাখী, খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু নজর থাকে নীচের ভাগাড়ে, তেমনি শাস্ত্র মুখস্থ ক'রে পণ্ডিত হলে কি হবে? মন রয়েছে কামিনী কাঞ্চনে প'ড়ে। শাস্ত্র প'ড়ে যদি অহঙ্কার না গেল ত শাস্ত্র পড়ার দরকার কি? আর শাস্ত্র না প'ড়ে যদি অহঙ্কার যায়, তা হ'লেও ঠিক শাস্ত্রী হ'ল। প্রথমে, দেখ তুমি পণ্ডিত হয়েছ, শাস্ত্র পড়েছ, তাতে কার কি লাভ হ'ল যে তুমি সকলের মাথায় পা দিয়ে চলবে? যাতে আত্মোন্নতি হয় সেই জন্যই তুমি শাস্ত্র পড়তে যাচ্চ ত? তুমি কিছু জ্ঞান বাড়াতে চাচ্ছ ব'লে যারা শাস্ত্র পড়েনি তাদের মাথায় উঠবে?

অহঙ্কার থাকতে কিছু হবে না; অহঙ্কার যেন একটা ঢিপি, এর ওপর যতই জল ঢাল না কেন, জল দাঁড়াবে না। পূর্ণ সত্বের ভাব না এলে জ্ঞান উপলব্ধি হতে পারে না। দেখ, কিছু উন্নতি করতে গেলে, আগে প্রাণে একটা ধাক্কা লাগা চাই, অনুতাপ আসা চাই যে এত দিন ধ'রে জীবনে কি করলুম? এই সংসারে যাদের সুখী করবার জন্যে এত খাটলুম, কই তাদের ত সুখী করতে পারিনি, যে যার প্রারব্ধ ঠিক ভোগ ক'রে গেছে, তার কিছুই করতে পারিনি, নিজেকেও সুখী করতে পারিনি, শুধু ত পশু পক্ষীর মত ছেলে পরিবারকে খাইয়েছি, পরিয়েছি আর তাদের গোলামগিরি করেছি। মনুষ্য জন্ম পেয়ে কি কয়লুম, নিজের আত্মোন্নতিরই বা কি করেছি? প্রাণে এই রকম একটা দুঃখ ও অশান্তি আসা চাই,

জীবনের ওপর একটা ধিক্কার আসা চাই, চোখ দিয়ে জল বেরুন চাই, তবে কিছু হবে।

ছেলে ছোকরাদের হয়ত ভোগ বাসনা এখনও পোরেনি, এখনও সংসারে ভোগের সব দিক তারা দেখেনি, তাদের হয়ত না হতে পারে। কিন্তু যাদের বয়স হয়েছে, যারা ভোগের সব দিক দেখে বুঝেছে, যে সংসারে ভোগে কোন সুখ নেই, যতই খাট কারুর কিছু বিশেষ উপকার করবার ক্ষমতা নেই, তাদের অন্তঃত এ রকম অনুতাপ ও দুঃখ আসা উচিত। তাদের অন্তঃত এ টুকু ভাব আসা উচিত যে 'সংসারে বাঁধা পড়েছি, কি করব, থাকতে হবে, কিন্তু মনে অশান্তি ভোগ করছি, বাঁধন ছেঁড়বার বিশেষ চেষ্টা করছি, একটু ফাঁক পেলেই বেরিয়ে পড়ব।' যেমন, খাবারের লোভে ইঁদুর খাঁচার ভেতর ঢুকে আর বেরুতে পারে না, ছট্‌ফট্ করে, লাফায়, কেবল দরজার দিকে যায় এবং এই রকম করতে করতে যে কোন রকমে এক বার দরজাটা একটু ফাঁক পেলেই দৌড়ে পালায়; তখন আর ভেতরে যত ভাল খাবারই দাও, সে দিকে লক্ষ্য করে না। সংসারে এই ভাবে থাকতে পারলে বোঝা যাবে, যে সে এক দিন বাইরে যেতে পারবে। সদ্‌গুরুর সঙ্গে এই সব ভাব আনিয়ে দেয়, তাই সঙ্গই সব চেয়ে প্রধান বলেছে।

জিতেন। পরমহংসদেব বলতেন বিকারী রোগীর ঘরে আচার, তেঁতুল রাখতে নেই, তা হ'লে এই সংসারের ভেতর থাকলে কি এ রোগ সারবে?

ঠাকুর। যখন সংসার থেকে বাইরে যাবার দিকে নজর পড়ে, তখন সংসারে থাকলেও মন ত আর সংসার চাচ্ছে না, কাজেই তাতে তত ক্ষতি হয় না। যেমন বিকারী রোগীর আচার, তেঁতুল খাবার ইচ্ছে না থাকলে সে ঘরে আর ওসব রাখতে দোষ নেই। তাই বলেছে সংসারে থেকে মন তৈরী কর। সংসারই মন তৈরী করবার পক্ষে সুবিধার জায়গা।

জ্ঞান। তাই আমি সংসারে, আর কাউকে কিছু বলিনি, যার যা খুসী করুকগে, আমি আলাদা থাকি।

ঠাকুর। যদি মনের ঠিক জোর থাকে যে ছেলেটা যা ইচ্ছে তাই ক'রে যদি নষ্টও হয়ে যায় তবুও তোমার মনে দুঃখ স্পর্শ করবে না, তা হলে ভাল। আর নইলে সাধারণ ভাবে যখন রয়েছ, সাধারণের মত ব্যবহার করতে হবে, তাকে শাসন করতে হবে। তবে যদি বোঝ যে সে কিছুতেই তোমার কথা শুনবে না তা হ'লে অবশ্য কিছু না ব'লে চুপ ক'রে থাকাই ভাল। যদি দেখ তোমাকে কর্ত্তা ব'লে মানবে না তা হ'লে কর্ত্তা না সাজাই ভাল।

জিতেন। কেবল সদ্‌গুরুর সঙ্গ করলেই কি দর্শন হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়? আর সাধন ভজন দরকার হয় না?

ঠাকুর। দর্শন ত এক রকম হয় না। স্তর অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দর্শন হয়। আর দর্শন হলেই যে চরম হয়ে গেল, তা নয়। ঠিক ভাবে সদ্‌গুরুর সঙ্গ করলেই মনে ত্যাগের ভাব উঠবে এবং ত্যাগও সঙ্গে সঙ্গে আসতে থাকবে; কারণ ঠিক মন দিয়ে যার সঙ্গ করা যায় ক্রমশঃ তার ভাব আপনি আসে। **ঠিক ঠিক মন দিয়ে সদ্‌গুরুর সঙ্গ করলেই ব্রহ্মজ্ঞান ফুটে উঠবে।** সদ্‌গুরুতে যার ঠিক ঠিক নিষ্ঠা আছে, অর্থাৎ ঠিক ঠিক ভক্তি শ্রদ্ধা আছে ও যার মন গুরুতে ঠিক প'ড়ে আছে, তার আপনি সব কাজ হয়ে যায়। যার যে পরিমাণ নিষ্ঠা আছে তার সেই পরিমাণ কাজ হবে। **সঙ্গ কখনও বৃথা যায় না।** যে ভাবে যত টুকু সঙ্গ করবে তত টুকু লাভ পাবে। **সদ্‌গুরুতে ঠিক বিশ্বাস থাকলে তার হবেই।**

আর সাধন ভজন কি জান? সে তোমার ভাবের ওপর নির্ভর করে। যদি তোমার মনে এই ভাব ওঠে যে তোমার জন্যে লড়বার লোক নেই, তাহ'লে তোমাকে নিজেই লড়তে হবে,

অর্থাৎ সাধন ভজন করতে হবে। আর যদি বোঝ তোমার ভার নেবার লোক রয়েছে, সদ্‌গুরুই তোমার জন্যে লড়বেন, তা হ'লে সাধন ভজনের প্রয়োজন হয় না। **ঠিক ঠিক সদ্‌গুরুতে বিশ্বাস থাকলে তার আর আলাদা সাধন ভজন প্রয়োজন হয় না।** কিন্তু এ রকম বিশ্বাস আসা অতি বিরল, তাই সদ্‌গুরুর সঙ্গ করলেও আলাদা সাধন ভজন করা দরকার। তা ছাড়া, সঙ্গ ব্যতিরেকে সাধন ভজনও ত করতে পারবে না। ঠিক ভাবে সঙ্গ কিছু করলেই আপনি মনের পরিবর্ত্তন বুঝতে পারবে। আর যদি সেই সঙ্গ ঠিক ভাবে বরাবর রক্ষা করে যেতে পার, তবে ত কাজ হয়েই গেল।

পরমহংসদেব বলতেন, **'যে সদ্‌গুরু পেয়েছে, সে ত তাকিয়া পেয়ে গেছে; সে তখন কেবল আরাম করবে।'** অর্থাৎ কথা হচ্ছে **গুরুতে যার জোর বিশ্বাস এসেছে তার আর কোন ভাবনা নেই, সে ত নিশ্চিন্ত।** যার ত্যাগের ভাব এসেছে, যে আত্মোন্নতি ও আত্মজ্ঞান লাভ করবার জন্যে গুরুর সঙ্গ করছে তার বিশ্বাস অনেকটা পাকা। সংসারী ভাব থাকলেই বিশ্বাস পাতলা থাকে: তখন সেটা আর বিশ্বাস নয়, সংস্কার। একটু দুঃখ কষ্ট পেলেই সংস্কারটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সংসারী ভাব থাকলেই জানবে তারা প্রায়ই সংসারীয় বাসনা নিয়েই আসে। সদ্‌গুরু দুটো একটা বাসনা হয়ত পূরণ ক'রে দিলেন, কিন্তু লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা কত পোরাবেন, কাজেই চট্ ক'রে অবিশ্বাস আসবার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। সংসারের নিয়মই হচ্ছে সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, তাপ, অভাবের হাতে পড়তেই হবে; সকলেই পড়েছে, আর তোমার বেলাতে একটা আলাদা আইন হবে নাত। সদ্‌গুরুর সঙ্গ করছ ব'লে যে এ আইন উল্টে যাবে তা নয়, তবে ভোগের মাত্রা অনেক ক'মে যেতে পারে কিন্তু একেবারে নিস্তার পাবে না। কিছু ভোগ করতেই হবে।

যে গ্রহটা হয়ত সাধারণ ভাবে দশ বৎসর কাজ করত, সঙ্গ করার জন্যে সে ভোগটা হয়ত দু' বছরেই শেষ হয়ে গেল। সংসারী ভাব থাকলে সেটা বুঝতে পার না, কারণ তুমি যে মোটেই ভুগতে চাচ্ছ না, কাজেই দশ বৎসরের জায়গায় যে দু' বছরে ভোগটা শেষ হয়ে গেল সেটা আর তখন নজরে পড়ে না।

গুরুতে যত বিশ্বাস আসবে, তত সংসার পাতলা হয়ে যাবে। গুরুতে বিশ্বাস মানেই ত্যাগ। গুরু বলছ কাকে?

'গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেব মহেশ্বর।
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥',
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥'

তা দেখ, গুরুকে প্রথমেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও পরম ব্রহ্ম বললে; আবার বলছ গুরু দিব্য জ্ঞান দিয়ে অজ্ঞান নষ্ট করলে। তা হলেই তুমি অজ্ঞান অন্ধকার নষ্ট ক'রে জ্ঞান দ্বারা ভেতরের দিব্য চক্ষু খুলিয়ে নেবার জন্যে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ ও আত্মোন্নতির জন্যেই যখন তাঁর কাছে আসছ, তখন সংসারী ভাবটা যে একেবারে নষ্ট ক'রে আসছ এটা বুঝতে হবে। ঠিক এই ভাবে এলেই বিশ্বাস আপনি পাকা হয়ে যায় এবং আপনিই কাজ হতে থাকে।

জিতেন। এ বিশ্বাস ত সোজা নয়; বিবেকানন্দ প্রভৃতি পরমহংসদেবের বড় বড় অন্তরঙ্গদেরও তাঁর জীবদ্দশায় এ রকম পাকা বিশ্বাস আসে নি।

ঠাকুর। দেখ, ব্যক্তিগত ভাবে আমি কিছু বলতে চাই না; তবে পরমহংসদেব নিজে এদের চালিয়েছেন, কাজেই লোক শিক্ষার জন্যে কাকে কি ভাবে, কি প্রয়োজনে, কি রকমে তিনি চালিয়ে নিয়ে গেছেন, সেটা তিনিই ভাল জানেন। তোমার স্থূল দৃষ্টিতে এদের কোথায়

কি একটু ব্যতিক্রম হয়েছে সে বিচার করবার তোমার প্রয়োজন কি? আর যদি তাই ধর, যে তিনি এদের পুরো নম্বর না দিয়ে দশ নম্বর কম দিয়েছেন, তাহলেই বা সেই দশ নম্বর কমের দিকেই তোমার নজর পড়ছে কেন? আর তিনি যে বাকী নব্বই নম্বর তাদের দিয়েছেন সেটার দিকেই বা দেখছ না কেন? এদের যাই থাক, এত লোক যে এদের কথা শুনছে, এদের মেনে চলছে, নানা দেশ বিদেশের লোক এদের কাছে ছুটে আসছে, এ কি সহজ কথা? ভেতরে বড় একটা কিছু না থাকলে কি এ কখনও সম্ভব হয়? সংসারে ত তোমাদের এত ভালবাসা এত আপনত্ব, তবু কে কাকে মেনে চলে?

কেষ্ট। ভালবাসা আছে, অথচ বিচারও রয়েছে; বিচারে ঠিক ভালবাসা আসতে দিচ্ছে না ত?

ঠাকুর। বিচার থাকলে ত সে ঠিক ভালবাসা হ'ল না। **ভালবাসা মানেই ত্যাগ, তখন আর বিচার টেঁকতে পারে না।** তবে, প্রথম অবস্থায় বিচার থাকে, একেবারে ত পূর্ণ ভালবাসা পড়ে না। যার একেবারে এসে যায়, তার কথা আলাদা, তার নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি আছে সাধারণের কিন্তু তা হয় না। তাদের এই বৈধি ভক্তি থাকে। সঙ্গ করতে করতে যত ভালবাসা বাড়তে থাকে, তত বিচার ক'মে আসে। এখানে ভালবাসা বাড়িয়ে বিচার তাড়ালে; আর না হয় বিচার কমাও তা হ'লে ভালবাসা বাড়বে। হয় আলো নিয়ে এস, অন্ধকার চ'লে যাবে আর নয় অন্ধকার তাড়াও আপনি আলো আসবে। যে উপায়ে পার কর।

পুত্তু। যে টুকু বিশ্বাস আছে, আর যদি নাও বাড়ে, তবে অন্তঃত সে টুকু বিশ্বাস রক্ষা করবার উপায় কি?

ঠাকুর। পাতলা বিশ্বাস সহজে ভেঙ্গে যেতে পারে, তাই এত ক'রে বেড় দিতে বলেছে। সঙ্গই হচ্ছে প্রধান বেড়; নিয়মিত সাধু সঙ্গ করলেই ভাঙ্গবার বড় ভয় থাকবে না, বরং ক্রমশঃ বেড়ে যাবে।

সংসারে স্বামী স্ত্রীর, পিতা পুত্রের, ভাই ভায়ের, যে ভালবাসাই বল সব ভোগ নিয়ে, স্বার্থ নিয়ে। এ ভালবাসা সহজে ভেঙ্গে যাওয়া সম্ভব; কিন্তু গুরু শিষ্যের যে ভালবাসা এটা ত্যাগের ওপর, এ বড় চট ক'রে ভাঙ্গে না, ক্রমশঃ পূর্ণ হওয়াই সম্ভব।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। সাধু সঙ্গ ছাড়া ত্যাগ আসবে না। ত্যাগীর সঙ্গ করলে তবে ঠিক ত্যাগ আসবে; তখন অন্তর্ত্যাগ আসবে। বহির্ত্যাগ ত আর ঠিক ত্যাগ নয়। যারা গরীব তাদের ত কতক গুলো বহির্ত্যাগ আপনি হয়ে থাকে। অবশ্য বহির্ত্যাগ খানিকটা সুবিধা ক'রে দেয়, কিন্তু অন্তর্ত্যাগ ব্যতিরেকে কিছুতেই শান্তি আসতে পারে না। সৎ সঙ্গের দ্বারা মনের শক্তি বাড়ে, তখন প্রকৃতির ধাক্কা সহ্য করবার ক্ষমতা হয় ও কিছু শান্তি আসে। মানুষ এক ভালবেসে বা প্রেমে তাঁর দিকে গতি করে, নয় ভাল মন্দ বিচার ক'রে মন্দটা ত্যাগ করে, আর নয় সংসার দুঃখে জর্জ্জরিত হয়ে নিরুপায় হয়ে তাঁকে ডাকে। সংসার মানেই দুঃখ। এখানে লোক অনবরত রোগ, শোক, তাপ ও অভাবের যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছে আর হবেও। তা সাধু সঙ্গই কর, আর যাই কর, এ গুলো সংসারের ধর্ম্ম, এ আসবেই। তবে সঙ্গ করলে এ গুলো সহ্য করবার শক্তি আসে এবং তখন এরা আর তত দুঃখ দিতে পারে না। ঠিক ভাবে সংসার করতে গেলেও শক্তি দরকার; দুর্ব্বল এবং ভীতু মানুষ সংসার করতে পারে না।

যত ক্ষণ সংসারীয় ভাব থাকবে তত ক্ষণ দুঃখ অনিবার্য্য। বিনা ত্যাগে শান্তি আসবে না। **বাসনা নিবৃত্তির নাম শান্তি,** আর বাসনা পূরণের নাম সুখ। সঙ্গে বাসনা নিবৃত্তি হবে ও ত্যাগ আসবে। তাই **কোন অবস্থায়, গুরুর সঙ্গ ছাড়তে নেই; গুরুর কথা বা তাঁর ভাব ভাল না লাগলেও, এমন কি তাঁর ওপর কোন কারণে**

অবিশ্বাস এলেও তখন জোর ক'রে তার সঙ্গ করবে কখনও সঙ্গ ছাড়বে না, তাতে দেখবে ক্রমশঃ এ সব ভাব চ'লে যাবে ও ভবিষ্যতে ভাল হবে। এইখানে ঠাকুর গুরুর উপদেশ না শুনে যে দেশে মুড়ি মিছরি, ঘি তেল, সব এক দর সেই দেশে থাকার পরিণাম শূলে প্রাণ দণ্ড এবং শূলের পূর্ব্বেই গুরুর আবির্ভাব ও বাঁচানর গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ২য় ভাগ ৯১ পৃষ্ঠা)। গুরুতে যার ঠিক বিশ্বাস আছে, সে ত খোঁটা ধ'রে আছে, তার আর কোন ভয় নেই; সে ঠিক গতি করবেই। সেই কারণে বলেছে, অন্ততঃ কিছু সময় নিয়ম ক'রে রোজ গুরুর সঙ্গ করবে; তাতে ভালবাসা লেগে গেলে যত কাজ হবে, আর কিছুতে তত কাজ হবে না। তাই পরমহংসদেব ভালবেসে আপন ক'রে সকলকে ডাকতেন এবং তারাও সেই আপনত্বে ছুটে আসত।

দ্বিজেন গাহিল—

আমার মন ভুলালে যে, কোথায় আছে সে।
(ওগো) সে দেখে আমি দেখি না, চেয়ে থাকি আশে পাশে॥
পেলাম পেলাম দেখলাম তারে (ওগো) এই সে ব'লে ধরি তারে।
(ওগো) সে নয় সে হলে পরে, আর কি মন ফিরে আসে॥
বল দেখি রে বিহঙ্গ কুল, তোরা কার প্রেমে হয়ে আকুল।
থেকে থেকে ডেকে ডেকে, উড়ে যাস কার উদ্দেশে॥
বল দেখি তরু লতা, আমার জগজ্জীবন আছেন কোথা।
তোরা পেয়ে বুঝি কস্ না কথা, তাই তোদের কুসুম হাসে॥
বল দেখিরে হিমাচল, তুই কিসে এত সুশীতল।
তোর ঝরিতেছে অশ্রুজল কার অনুরাগে মিশে॥
পেয়ে বুঝি রত্নবর, সিন্ধু নাম ধরেছিস রত্নাকর
তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে নৃত্য করিস উল্লাসে॥
লুকিয়ে থেকে প্রেম করে, আমি এমন প্রেমিক দেখি নাই রে।
দেখলে পরে শুধাই তারে কেন সে মোরে ভালবাসে॥

মা ও দিদি

তৃতীয় ভাগ—চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

কলিকাতা, রবিবার ৩২শে আষাঢ় ১৩৪০ সাল ;

ইং ১৬ই জুলাই ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, ললিত, কালু, পুত্তু, অপূর্ব্ব, শ্যাম, কৃষ্ণ কিশোর, হর প্রসন্ন, দ্বিজেন, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, মতি ডাক্তার, দ্বিজেন সরকার, আশু, প্রফুল্ল, তারা পদ, জিতেন, কৃষ্ণ দত্ত, দাশরথি, ভোলা, ও অভয় আছে।

জিতেন। শুধু বিশ্বাস দ্বারা কি প্রত্যক্ষ হয় ?

ঠাকুর। বিশ্বাস ঠিক রাখতে পারলে কাজ হয়ে যায়। **বিশ্বাস জিনিষটা স্বতঃই অন্ধ।** বিশ্বাস দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। **সৎগুরুতে ঠিক বিশ্বাস থাকলে ক্রমান্বয়ে জ্ঞান আসে।** জ্ঞানের পর বিশ্বাস খুব পাকা হয়। পূর্ণ বিশ্বাস এলে প্রত্যক্ষীভূত হয়। যদি ঠিক বিশ্বাস থাকে যে তিনি সর্ব্বময় তাহ'লে তিনি এখানেও আছেন, যেমন প্রহ্লাদ স্ফটিক স্তম্ভে হরিকে দেখিয়েছিল। এই বিশ্বাসের নাম ভক্তি-যোগ। তা ছাড়া শুনে মেনে যা চল বা ভক্তি কর সে ত সংস্কার। এই সংস্কারটা পাকা হ'য়ে গেলে আর ভাঙ্গতে চায় না। তবে কারুর কারুর শোনা মাত্র বিশ্বাস পাকা হ'য়ে যায়। তখন যার কাছে শুনেছে তার ওপর আর বিচার রাখে না।

জিতেন। বিশ্বাস কি আপনি আসে, না চেষ্টা ক'রে আনতে হয় ?

ঠাকুর। বিশ্বাস স্বতঃই আসে, তবে অবিশ্বাস তাড়াবার জন্য সঙ্গই হচ্ছে প্রধান। তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু শুনে আমার ওপর একটু বিশ্বাস ক'রে এখানে এলে। বাহিরে গিয়ে আবার আমার বিরুদ্ধে কিছু শুনলে। যদি সেটা বিশ্বাস কর তা হ'লে আমার ওপর অবিশ্বাস

এল, আর তার কথায় যদি কান না দাও ত তোমার বিশ্বাস টুকু থেকে গেল। সেই জন্যেই বলেছে 'চৌদিকে দাও শক্ত বেড়া ফিরছে কত ছাগল ভেড়া'। বেশীর ভাগই সংস্কার, বিশ্বাস খুব কম। কেউ ভাল বললে ত তুমি ভাবলে ভাল, আবার মন্দ বললে ত তুমিও বুঝে গেলে মন্দ। কিন্তু ভালবাসা বাড়লে বিশ্বাস আপনি বেড়ে যায়।

জিতেন। বিশ্বাস আছে ভালবাসা নেই বা ভালবাসা আছে বিশ্বাস নেই এমন হয় কি ?

ঠাকুর। বিশ্বাস আছে ভালবাসা নেই, এ ত সাধারণ। শুনলে অমুক মাষ্টারের কাছে পড়লে ভাল লেখা পড়া শিখবে। শুনে বিশ্বাস হ'ল, তা ব'লে সেই মাষ্টারের ওপর ত তোমার ভালবাসা নেই। আবার ভালবাসা আছে অথচ বিশ্বাস নেই, এও আছে। যেমন মা ছেলেকে ভালবাসে, না দেখলে থাকতে পারে না, কিন্তু টাকার বাক্সটাও লুকিয়ে বন্ধ ক'রে রাখে, পাছে ছেলে নিয়ে পালায় কারণ ছেলের ওপর বিশ্বাস নেই। এখানে জোর ভালবাসা নেই ব'লে বিশ্বাস দাঁড়াতে পারে না। জোর ভালবাসা মানেই ত্যাগ। তখন আর টাকা থাকা বা যাওয়ার ওপর লক্ষ্য থাকে না। যাকে ভালবাসে, তার ভাল মন্দ ভাবে না বা নিজের লাভ লোকসানের ওপর নজর রাখে না, কেবল তাকেই চায়। 'ভাল মন্দ নাহি জানি, পাপ পুণ্য শুধু তোমার চরণ খানি।' **ঠিক বিশ্বাস বড় শক্ত।** আমার কথা শুনে আমার কাছে এলে। এসে আর এক জনের সঙ্গে চেনা হ'ল। পূর্ব্বে তাকে চিনতে না বা জানতে না। আমার জন্যেই তার সঙ্গে পরিচয় হ'ল, অথচ সে যেই বললে 'ওহে! আমি দেখে এলুম উনি রাতকাণা, আর ওঁর এই এই দোষ আছে,' অমনি সেটা বিশ্বাস করলে। এক বার নিজে দেখলে না যে সত্যি আমি রাতকাণা কি না, বা সত্যিই আমার সে সব দোষ আছে কি না ? না দেখেই তার কথা বিশ্বাস করলে, এবং তার সঙ্গে চেনা হবার আগে

যে বিশ্বাস নিয়ে আমার কাছে এসেছিলে সেটা ছেড়ে দিয়ে তার কথাটাই বড় ক'রে ধরলে।

বিভূতি। গুরু শিষ্য সম্বন্ধ হ'লেও কি এ রকম হয়?

ঠাকুর। শিষ্যত্ব মানে কি? সর্ব্বস্ব গুরুতে অর্পণ করলে তবে ঠিক ঠিক শিষ্য হয়। তা ভিন্ন, সাধারণ গুরু শিষ্য বলতে যা বোঝায় সেটা ত সংস্কার, যে গুরুকে শ্রদ্ধা করতে হয়, ভক্তি করতে হয় ইত্যাদি। নইলে অপরের কথা শুনে গুরুর ওপর অবিশ্বাস আন কেন? গুরুর চেয়েও তাকে বড় কর কেন? তখন ত এই সোজা কথাটা ভাবলে না যে গুরু হতেই ত তার সঙ্গে চেনা। অনেক সময় আবার নিজে সত্যি সত্যি গুরুর সঙ্গে আনন্দ পাওয়া সত্ত্বেও শুধু তার কথা শুনে তাঁকে ছোট ক'রে ফেল ও মন্দ বল এবং তাঁর ওপর অবিশ্বাস আন। তা হলেই বোঝ গুরুর ওপর কতটা আস্থা রাখ। আবার অনেকে হয় ত সাংসারিক সুখের জন্য বা কোন স্বার্থ নিয়ে তাঁর কাছে আসে, এবং যেই সেটা পূরণ হ'ল না অমনি তাঁর ওপর অবিশ্বাস এল।

অপূর্ব্ব। সাধুকে খুব ভালবেসে আসছে না বটে, কিন্তু সাধুর একটা ভাব ভাল লাগে ব'লে আসছে হয় ত।

ঠাকুর। এটা ত নিজের ভাব বজায় রেখে আসা হ'ল। এতে জিনিষটা কি দাঁড়াল জান? সাধু তোমার ভাবে চলুক তবে তোমার ভাল লাগবে, সাধুর নিজের ভাব তোমার ভাল লাগবে না। একে ভালবাসা বলে না।

জিতেন। যে ঠিক বিশ্বাস ক'রে আসে সেও কিছু প্রত্যাশা করে ত?

ঠাকুর। হ্যাঁ, 'আমি সৎ হব, আত্মোন্নতি করব' এই সব আশা রাখে; কিন্তু খুব ভালবাসা লাগলে সৎ হব, কি অসৎ হব এ সব বোঝে না। গুরুকে ভালবাসে, তাঁর কাছে আনন্দ পায়, তাই শুধু তাঁর কাছেই থাকতে চায়। কেবল তাঁকে পেলেই আনন্দ, আর

কিছু চায় না। অথবা তাঁর কাছ থেকে যে সব ভাব পায় তাতে আনন্দ।

কেষ্ট। ভাল করি, বা মন্দ করি, মন ত আগে ব'লে দেবে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ ?

ঠাকুর। মন ঠিক ব'লে দেবে কখন ? মন যখন শুদ্ধ হবে। নইলে সব সময় কি মন ঠিক ব'লে দেয় ? বাঁধা দুটো একটা জিনিষ হয় ত থাকতে পারে। ধর যেমন জ্ঞান, বিষ খেলে মানুষ মরে, তখন বিষ খাবার আগে জানছ যে বিষ খেলে ম'রে যাবে। আবার অনেক সময় অন্যায় কাজ জেনেও সেটা কর ; যেমন টাকার লোভে লোকে ত কত খুন জখমও ক'রে ফেলে। সে ত জানে যে খুন জখম করা মন্দ জিনিষ, তবু সামলাতে পারে কি ? মন হচ্ছে দর্পণ, মনে ছবি পড়ে। এ সব কাজ করবার আগে মনে একটা ছবি প'ড়ে জানিয়ে দেয়, কিন্তু সেটা ভাল কি মন্দ এ বিচার করে বুদ্ধি, অথচ সেই ভাল মন্দের ফল ভোগ হয় মনে।

কেষ্ট। মন যদি ঠিক ব'লে না দেয়, উল্টোটা ত ব'লে দেবে না ?

ঠাকুর। খুব ব'লে দেয়। যত ক্ষণ মানুষের অহং জ্ঞান প্রবল থাকে, তত ক্ষণ মানুষ ভাবে যে সে যেটা করছে সেইটাই ঠিক। তখন সে এই অহং জ্ঞানের ঠেলায় মন্দটাকেই ভাল ব'লে ধ'রে নেয় এবং তার সপক্ষে প্রমান যুক্তিও ঠিক ক'রে রাখে।

কিছু ক্ষণ পরে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঠাকুর। আচ্ছা কেষ্ট, বল দেখি তুমি আমাকে ভালবাস কি না ? ঠিক তোমার মনের ভাব বল। যেটা তোমার ঠিক বিশ্বাস সেইটে বল। লৌকিকতা বা ভদ্রতা ক'রো না। সরল ভাবে তোমার যা ঠিক বিশ্বাস তাই বল।

কেষ্ট। হ্যাঁ ঠাকুর, আপনাকে ভালবাসি।

ঠাকুর। আমার ওপর বিশ্বাস আছে কি ?

কেষ্ট। হ্যাঁ ঠাকুর, বিশ্বাস আছে বই কি।

ঠাকুর। আমি যদি একটী স্ত্রীলোক নিয়ে ব'সে থাকি, তা হ'লেও কি আমার ওপর সেই বিশ্বাস রাখতে পারবে?

কেষ্ট। হ্যাঁ, এখন সে বিশ্বাস এসেছে।

ঠাকুর। তুমি যে সব কথা বললে সে গুলো যদি ঠিক হয় তা হ'লে বলতে হবে তোমার কিছু বিশ্বাস আছে। যার ওপর বিশ্বাস থাকে তার সব অবস্থাই ভাল লাগে এবং ভাল ব'লে বোধ হয়। তখন স্ত্রীলোকই বা কি আর পুরুষই বা কি? যদি স্ত্রীলোক ব'লে আপত্তি কর,: তা হ'লে বুঝতে হবে, তোমার মনে এই ভাব আছে যে স্ত্রীলোকের দ্বারা কিছু অন্যায় হতে পারে, নইলে দোষ ব'লে ভাববে কেন? তুমি কি তোমার মেয়েকে কাছে নিয়ে ব'স না, তাতে কি কোন অন্যায় মনে কর? যাকে ভাল বল তার প্রত্যেক জিনিষটাই ভাল ব'লে বোধ হবে, আর যাকে মন্দ ভেবেছ তার প্রত্যেক জিনিষটাই মন্দ দেখবে।

পুত্তু। স্ত্রীলোকের বেলায় না হয় বিশ্বাস রইল কিন্তু যদি বলেন যে 'বিষয়টা লিখে দাও' তখন ত আর বিশ্বাস থাকবে না।

ঠাকুর। এটা আলাদা। বিষয়ের ওপর আসক্তি আছে ব'লে ছাড়তে পারে না। আমাকে ভালবাসে, আমার ওপর এ বিশ্বাস আছে যে আমি তার বাড়ী গেলে কিছু কেড়ে নোব না, তাই আমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে কোন আপত্তি করে না, কিন্তু তার বিষয়ের ওপর আসক্তি যায় নি ব'লে বিষয় ছাড়তে পারে না। এ অবশ্য সাধারণ বিশ্বাস। **পূর্ণ বিশ্বাস এলে ত সবই ছাড়তে পারে, তখন আর নিজের ব'লে কিছুই থাকে না।**

পুত্তু। অবতারেরা কত সাধন ভজন ক'রে অবস্থা লাভ করেন, কিন্তু তাঁদের স্ত্রীরা যদি সাধন ভজন না করে তা হ'লে তারা ত আর তাঁদের মত উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না?

ঠাকুর। স্বামীর ওপর যদি স্ত্রীর ঠিক ভালবাসা থাকে তা হলে

স্ত্রীর আর আলাদা সাধন ভজনের প্রয়োজন হয় না। তা ভিন্ন জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্ম যত ক্ষণ না সব ক্ষয় হয় তত ক্ষণ ত কিছু হবার যো নেই। তবে সঙ্গে অনেক কর্ম্ম ক্ষয় হতে পারে।

জিতেন। সাংসারিক কামনা পূরণের জন্য মার চরণের ফুল সঙ্গে রেখে ও গুরুর চরণ ধ্যান ক'রে কোন কার্য্যে গেলে কি কিছু ফল হয়, না যা হবার ঠিক তাই হয়?

ঠাকুর। সংসারে যেটা বাসনা হয় সেটা প্রাপ্তির জন্য মনটা বেশী লাগে, তখন দৈব শক্তিতে কাজ হয় শোনা আছে ব'লে এই সব করে। ভাবে, এতে ত আর খারাপ হবে না, যদি কিছু সহায়তা করে মন্দ কি? তার পর যে জন্যেই হোক দুটো একটা সফল হ'য়ে গেলেই মনে এই সংস্কারটা আরও জোর ক'রে ধরে। তবে যার এই ফুলের ওপর বা গুরুর চরণের ওপর ঠিক বিশ্বাস আছে তার কথা আলাদা। কি জান, গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে শনি মঙ্গল বারে বা অমাবস্যা প্রভৃতি কতক গুলি তিথিতে তোমার মনের শক্তির বেশী প্রকাশ হয়; সেই জন্যে ঐ সময় মায়ের পায়ের ফুল নিলে সাধারণ অপর দিনের চেয়ে তোমার মনের শক্তির জোরে একটু বেশী কাজ হয়। নইলে মায়ের পায়ে ত শক্তি সকল সময়েই রয়েছে তবে তুমি ঐ সকল দিনে মনের জোর শক্তি দিয়ে ভক্তি ক'রে মায়ের পায়ে ফুল চড়াও ব'লে সেই ফুলে বেশী শক্তি থাকে।

জিতেন। অনেক সময় অপরে হয় ত কত বাসনা কামনা নিয়ে মায়ের পায়ে ফুল চড়িয়েছে। সেই ফুল নিয়ে যদি সঙ্গে রাখা হয় তাতেও কি ঠিক কাজ হয়? আর যে কারণেই ফুল নিই না কেন তাতে মনের পবিত্রতা আনে কি?

ঠাকুর। বাসনা কামনা নিয়ে মায়ের পায়ে ফুল চড়ালেও মার শক্তিতে সে সব কামনা নষ্ট হ'য়ে যায়। সেই ফুল নিলে মায়ের শক্তিই তাতে রইল। তা ছাড়া, তুমি ত মায়ের পায়ের ফুল নিচ্ছ, অন্য কিছু নিচ্ছ না ত, কাজেই সেই ফুলে মায়ের পায়ের শক্তি

ঠিকই থাকে। আর, পবিত্রতা কি জান! যেমন ভাব নিয়ে কাজ করবে সেই রকম হবে। তুমি যদি মনের পবিত্রতা আনবার জন্যে ফুল গ্রহণ ক'রে থাক ত তাই হবে।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। সঙ্গই প্রধান; তাই বার বার বলেছে সঙ্গ কর। **গুরুতে যার ঠিক পূর্ণ বিশ্বাস এসেছে তার আর ভগবান পাবার বিলম্ব নেই, তার ভগবান লাভ হবেই।** সাধারণ সংসারীর এ বিশ্বাস সহজে আসে না। তবে সংস্কার বশতঃ যে বিশ্বাস আসে তাকে গুরু সঙ্গ দ্বারা বেড় দিয়ে বাড়ান যায়। সঙ্গে ঠিক বিশ্বাস আনিয়ে দেবে। তাই এদের সকল সময় সঙ্গ করতে নেই, কারণ সদগুরুকে নানা ভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার ক'রে যার যার ভাবে মিশে গতি করাতে হয়; অথচ তোমার আবার নিজের ভাব ছাড়া অপর ভাব ভাল লাগবে না। অপর ভাব দেখলে হয় ত তোমার মনে সংশয় উঠে যে টুকু ভাব লেগেছিল তাও নষ্ট হয়ে যাবে। সেই জন্য যত ক্ষণ না অবস্থা লাভ হয়, তত ক্ষণ গুরুর আদেশ মত নিয়মিত সঙ্গ করতে হয়। পরে তাঁর সকল ভাবই যখন তোমার ভাল লাগবে বা তোমার এমন ভাব হবে যে তুমি কিছু জান না, বোঝ না, তিনি যা করেন তাই ভাল তখন সব সময় তাঁর সঙ্গ করবার উপযুক্ত হবে। আবার স্থান জায়গা বিশেষে এক এক রকম জিনিষ এক এক রূপ ধারণ করে। তোমরা সাধারণ সংসারী এ সব ভাব ধরতে পার না। সংশয়ী হৃদয় বড় খারাপ জিনিষ। সংশয়ী মনে সকল জিনিষই মন্দ দেখবে, তাই বলেছে **গুরুতে বিশ্বাস না থাকলে কাজ হবে না। গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে সেই অনুযায়ী চলার নামই গুরু-সেবা ও পুরুষকার।** তা ছাড়া যা কর সেটার নাম স্বেচ্ছাচার। যার গুরুতে ঠিক বিশ্বাস আছে সে ত সর্ব্বদা অমর

লোকের সঙ্গে বাস করে ; দেবশক্তি সর্ব্বদা তাকে রক্ষা করে আর গুরুশক্তি সর্ব্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কবীর বলেছেন 'আমি গুরুতে বিশ্বাস রেখেছি, প্রাণ মন সমর্পণ করেছি, তাই সর্ব্বদা অমর লোকের সঙ্গে বাস করছি।'

যে সব ত্যাগ করতে পেরেছে সেই কেবল সাধন ভজনের অধিকারী হয় ; তার পর সাধন ভজন ক'রে অবস্থা লাভ করতে পারে। কিন্তু যার গুরুতে ঠিক বিশ্বাস এসেছে তার আর সাধন ভজন কিছুরই দরকার হয় না, আপনি সব কাজ হয়ে যায়। তবে এ বিশ্বাস আসা বড় শক্ত। শুকদেবেরই যখন সন্দেহ এসেছিল তখন সাধারণ সংসারী জীবের ত কথাই নেই। এই খানে ঠাকুর জনক রাজা ও শুকদেবের গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ১ম ভাগ, ৭৪ পৃষ্ঠা)। জ্ঞান লাভ না হ'লে সব জিনিষ ঠিক ধরতে পারে না। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে সাধারণ ভাবই ধরতে পারবে, তাই ব'লে কি অসাধারণ ভাব ধরতে বা বুঝতে পার ? সেই জন্য তোমাদের গুরুবাক্য অবিচারে পালন করা উচিত।

পলের ধারণা ছিল যে সে সব চেয়ে বড় ভক্ত। তাই যীশাস যখন বললেন যে 'অমুক গ্রামে অমুক লোক আমার সব চেয়ে বড় ভক্ত', পল সে কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলে না। কিছু দিন পরে যীশাস পলকে বললেন 'পল তোমার উরু থেকে আমায় এক পোয়া মাংস দিতে পার ?' পল বললে 'আপনি ও কি আদেশ করছেন ? বলেন ত ভাল মাংস অপর জায়গা থেকে এনে দিই, উরু থেকে কেমন ক'রে দোব ?' যীশাস আবার জিজ্ঞাসা করলেন 'তুমি তোমার উরু থেকে দিতে পার কি না ?' পল বললে 'আজ্ঞে না ; আপনি অন্য কিছু আদেশ করুন।' যীশাস তখন বললেন 'আচ্ছা আমার সেই ভক্তটীর কাছে গিয়ে বলগে আমার জন্যে তার উরু থেকে এক পোয়া মাংস দিতে।' পল সেই ভক্তটীর কাছে গিয়ে বলতেই সে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে উরু থেকে মাংস কেটে দিয়ে পলকে,

বললে 'আমার উরু বড় সরু, বোধ হয় এক পোয়া মাংস হবে না। তা, আর অপর জায়গা থেকে দিলে হবে না?' পল ত দেখেই অবাক।

এর পর ঠাকুর নারদ ও চাষার বিশ্বাস যে নাম করলেই মুক্তি এই গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ১ম ভাগ, ৩৮ পৃষ্ঠা)। বিশ্বাসের জোর দেখ। তার স্থির বিশ্বাস ছিল যে সে যখনই নাম করবে তখনই মুক্ত হয়ে চ'লে যাবে। তা দেখ, ঠিক বিশ্বাসে কি না হয়? সংসারীদের পক্ষে এই ভক্তি বিশ্বাস দ্বারা গতি করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই, কারণ তারা সংসারের দুঃখে জর্জ্জরিত, দেহসুখে ভরা, তাদের পুরুষকার কত টুকু দাঁড়াতে পারে যে তারা সাধনা করবে? এক ধাক্কায় কোথায় চ'লে যাবে। আর প্রেমে বা ভালবেসে গতি করা আলাদা; প্রেমে সব আপন হয়ে যায়। তাই পরমহংসদেব সকলকে ভালবেসে আপন ক'রে ডাকতেন, আর তারাও সেই আপনত্বে ছুটে না এসে থাকতে পারত না।

দ্বিজেন গাহিল।

(১)

নেভেনি এখনও হোমের আগুন আসিছে ধূপের গন্ধ।
খোল খোল ওগো মন্দির দ্বার, কেন এখনি করিলে বন্ধ॥
পাষাণ দেবতা পুজিব বলিয়া বহু দূর হতে এসেছি চলিয়া।
দিও না দিও না চরণে ঠেলিয়া, কপাল আমার মন্দ॥
অবলার মনে কামনা অপার, ভয় নাই প্রভু চাহিব না আর।
শুধাইব শুধু কি দোষ আমার, ঘুচে যাবে বৃথা দ্বন্দ্ব॥

(২)

আমি সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া তোমার দুয়ারে এসেছি।
সকলের প্রেমে বঞ্চিত হ'য়ে তোমারে ভাল বেসেছি॥
কত যে আঘাত লেগেছে গায়, কত যে কাঁটা ফুটেছে পায়।
এসে অবেলায় অপরাধী প্রায় দুয়ারে দাঁড়ায়ে রয়েছি॥

তুমি যে আমার আমি যে তোমার, সকলের চেয়ে বেশী আপনার
সকলের প্রেমে বিমুখ হইয়ে তোমারে ভাল বেসেছি ॥
লহ লহ মোর জীবনের ভার, হৃদয় দেবতা হে প্রিয় আমার।
অশ্রু স্নিগ্ধ মৌন বেদনা অর্ঘ্য বহিয়া এনেছি ॥

(৩)

বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা।
সে দুঃখ নয় (কেবলই) দয়া তব জেনেছি মা দুঃখ হরা ॥
সন্তানের মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে।
তাই বহিতেছি সুখে শিরে দুঃখেরই পশরা ॥
আমি তোমার পোষা পাখী, যা শিখাও মা তাই শিখি।
শিখায়েছ মা তারা (কালী) বুলি, তাই ডাকি মা তারা তারা ॥
তুমি মা দীন তারিণী শরণাগত জন পালিনী।
অধম সন্তানে গো মা করিস্ নে তোর চরণ ছাড়া ॥

———o———

তৃতীয় ভাগ—পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

কলিকাতা, বুধবার, ৩রা শ্রাবণ ১৩৪০ সাল.;

ইং ১৯শে জুলাই ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, ললিত, প্রফুল্ল, পুত্তু, অপূর্ব্ব, শ্যাম, তারা পদ, কৃষ্ণ কিশোর, জিতেন, কেষ্ট, ললিত ভট্টাচার্য্য, হর প্রসন্ন, গোষ্ঠ, মতি ডাক্তার, জ্ঞান, কালী, হরি মোহন, ভোলা ও অভয় আছে।

জিতেন। ধ্যানে কেউ কেউ হৃদয়ে বা মস্তকে মূর্ত্তি চিন্তা করে, কেউ কেউ বা নাসিকার অগ্রভাগে বা ভ্রূ মধ্যে দৃষ্টি স্থির করে, আবার কেউ কেউ ধ্যানে একটা বিন্দু চিন্তা করে। কোনটা ভাল?

ঠাকুর। হৃদয়ে বা মস্তকে মূর্ত্তি ভেবে চিন্তা করতে হয়। কিন্তু নাসিকার অগ্রভাগে বা ভ্রূ মধ্যে মূর্ত্তি না ভেবেও মনকে শূন্য রাখা যায়। ধ্যান সবই ভাল, তবে তোমরা সংসারী, তোমাদের পক্ষে একটা মূর্ত্তি নিয়ে ধ্যান করাই ভাল। বিন্দু চিন্তা ক'রে ধ্যান করবার সময়েও একটা রূপ ধরলে ত? ধ্যেয় বস্তুর চিন্তাকেই ধ্যান বলে। এই চিন্তা স্থির হয়ে গেলে তবে ধারণা হয়। আর এক আছে অবলম্বন শূন্য দৃষ্টি; তখন পুতুলের মত ফ্যাল ফেলে দৃষ্টি হয়, মনে হয় সকলের দিকে চেয়ে রয়েছে কিন্তু বাস্তবিক কাউকেই দেখছে না। মন স্থির না হলে এ রকম দৃষ্টি রাখা যায় না। মূর্ত্তির ধ্যান করবার সময় মন চঞ্চল থাকে এবং ধ্যান জ'মে গেলে মন স্থির হয়। আবার মূর্ত্তির চিন্তা ক'মে গেলে যত ধ্যান পাতলা হয়ে যায় তত মন চঞ্চল হয়। তাই শুধু চিন্তা ক'রে ধ্যান করার চেয়ে গুরু বা দেব দেবীর ছবি বা মূর্ত্তির দিকে চেয়ে ধ্যান করা ভাল, কারণ এতে মনটা সহজে লয়প্রাপ্ত যায়।

জিতেন। কোন মূৰ্ত্তি পুরো না এলে কি হবে? তখন কি সেই মূৰ্ত্তির চরণ বা নাসিকার অগ্রভাগের মত একটা বিন্দু ভাবতে হয়?

ঠাকুর। মূৰ্ত্তি একটা আসবেই; তবে যে মুৰ্ত্তি ধ্যান করতে চাইছ সেটা হয় ত না আসতে পারে। তখন যে মূৰ্ত্তি সহজে আসছে সেইটেই ধ্যান করতে পার। মূৰ্ত্তি একেবারে না এলে ত হাত, পা প্রভৃতি কোন অঙ্গই আসবে না। মানুষ চিন্তা করবার সময় ত আগে মুখ তার পর চোখ, তার পর হাত এই ভাবে ত চিন্তা করা হয় না। সমস্ত মূৰ্ত্তিটাই সামনে আসে, এবং সাধারণ ভাবে পুরো মূৰ্ত্তিটা মনে চিন্তা করা যায় কিন্তু পূর্ণ ভাবে মূৰ্ত্তির সব অংশ এক সঙ্গে চিন্তা করা চলে না। তাই যার যে অংশ ভাল লাগে সে সেইটা জোর ক'রে ধরে ও চিন্তা করে।

কৃষ্ণ কিশোর। ভক্ত বিপদে পড়লে সদগুরু জানতে পারেন ত? তা হলে ভক্তদের আর সদগুরুকে জানাবার প্রয়োজন নেই ত?

ঠাকুর। হ্যাঁ, সদগুরু ইচ্ছা করলে জানতে পারেন। **ভক্তের মনে কষ্ট হলে তাঁর প্রাণে লাগে।** তাঁরা সাধারণ ভাবে রক্ষা ক'রে যান। তাঁরা হয় ত দেখলেন কোন গ্রহ খারাপ রয়েছে, তিনি সেইটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করেন; কাজেই গ্রহ বৈগুন্যতার ফলে কি কি ঘটতে পারে এ সব ভেবে সব দিক রক্ষা করার আর দরকার হয় না। সদগুরুর দিক দিয়ে দেখলে, তাঁকে তোমাদের বিপদের কথা জানাবার দরকার নেই, তবে তোমাদের দিক দিয়ে বলা ভাল কারণ তাতে তাঁকে তোমরা সরল ভাবে নিজেদের দোষ গুণ সব বলতে পারলে। এই রকম অভ্যাস করতে করতে ক্রমশঃ মনটা সরল হয়ে আসবে, ঘৃণা, লজ্জা, ভয় কিছু অধীন হবে, তখন আর বড় কুকৰ্ম্ম করতে পারবে না।

ললিত ভট্টাচার্য্য। স্বপ্নে একটা বিপদ দেখলে সেটা কি সত্যি হয়? অনেক সময় মৃত আত্মীয়দের সঙ্গে রয়েছি, এ রকম স্বপ্ন দেখা যায়।

ঠাকুর। স্বপ্ন অনেক সময় মিলতে পারে বটে তবে, সব সময় যে মিলবে তা নয়। আর মরা আত্মীয়দের সঙ্গে থাকা এমন কিছু নয়, এক দিন ত সবাই মরবে।

কৃষ্ণ কিশোর। সদ্‌গুরুতে বিশ্বাস থাকলে আর ভাবনা থাকে না। ঠিক বিশ্বাস আছে কিনা জানে না, তবে তাঁকে ভালবাসে ব'লে রোজ তাঁর কাছে আসে। ধরুন, তার কোন কাজ কর্ম্ম নেই; তার পিতার ও শ্বশুরের সঙ্গে সদ্ভাব নেই ব'লে তার স্ত্রীকে তার বাড়ী পাঠায় না, বলে 'এখানে এসে থাক, চাকরি ক'রে দোব;' আবার পিতা বলে 'ও স্ত্রী ত্যাগ ক'রে ফের বিয়ে কর।' সংসারে এ রকম গণ্ডগোল ও অশান্তি থাকলে কারুর কোন কথা না শুনে চুপ ক'রে গুরুর ওপর নির্ভর ক'রে থাকা উচিত ত?

ঠাকুর। প্রথমে দেখ, তোমার কাজ কর্ম্ম নেই, অথচ অর্থের আকাঙ্খা যখন রয়েছে তখন যেই হোক চাকরি ক'রে দিলে ছাড়া উচিত নয়, কারণ তুমি ত জান না সদ্‌গুরু হয় ত তারই মধ্যে দিয়ে কাজ ক'রে তোমার চাকরি জুটিয়ে দিলেন। আর দেখ, এ সব সাংসারিক কথা তুমি নিজে বুঝে যা ভাল হয় করবে। শ্বশুর ত ছোট বেলায় তোমার কোন ভার নেয় নি, এখন মেয়ের বিয়ে দিয়েছে ব'লেই ত সম্বন্ধ। কাজেই তার কথা শুনে তোমার পিতা মাতার ওপর কর্ত্তব্য একেবারে ত্যাগ করাটা উচিত নয়।

আজ কালকার দিনে রোজগার করবার আগে কাহারও বিবাহ করা উচিত নয় কারণ নিজের একটা পেট কোন রকমে হয় ত চালাতে পারা যায় কিন্তু স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণের উপযুক্ত অর্থ রোজগার করতে না পারলে বিশেষ কষ্টে পড়তে হয়। এ ক্ষেত্রে রোজগার না থাকা সত্ত্বেও, বাপ, মা যদি জোর ক'রে বিয়ে দিতে চায় ত তোমার উচিত হবে 'আগে তাদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়া যে তারা তোমার এই বিয়ের ও ভবিষ্যতে স্ত্রী পুত্রাদির সকলের যাবজ্জীবনের ভার নেবে এবং সে জন্য আলাদা ব্যবস্থা ক'রে দেবে, তোমার

নিজের ওপর কোন ভার থাকবে না। তা ছাড়া, বিবাহ হবার পর শাস্ত্র সঙ্গত স্ত্রী ত্যাগের বিশেষ কোন কারণ না থাকলে অর্থাৎ স্ত্রীর বিশেষ কোন দোষ না থাকলে স্ত্রী থাকতে আর বিবাহ করা উচিত নয়।

আবার এটাও তোমার পিতা মাতাকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে তোমার বাপের সঙ্গে তোমার শ্বশুরের ঝগড়ার জন্যে তোমার স্ত্রী দুঃখ ভোগ করে কেন? সে বেচারীর কি অপরাধ? এই রকম ভাবে নিজে বুঝে ও সবাইকে বুঝিয়ে নিয়ে যতটা সম্ভব সব দিক বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করবে। সাধারণতঃ দেখ, যে ভাবেই হোক কেউ উপকার করলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা রাখা দরকার ও তাকে যতটা সম্ভব মেনে চলা উচিত, নইলে নীচতা হয়। তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে তুমি যখন এত দিন উপকার পেয়েছ, তখন তাকে নেবে না বললে তার হয় ত খাওয়া পরার দিক থেকে কোন ক্ষতি না হতে পারে কিন্তু তুমি যে তার উপকারের প্রতিদান করলে না তাতে তোমার মন ত নীচু হ'য়ে গেল আর তারও প্রাণে দুঃখ লাগল, কারণ সংসারীদের পক্ষে প্রতিদান না পেলে মন ঠিক রাখা বড় শক্ত।

ভোলা। প্রায়শ্চিত্ত করার মানে কি? বলে অসুখে ভুগছ, দুঃখ পাচ্ছ, প্রায়শ্চিত্ত কর ভাল হবে।

ঠাকুর। প্রায়শ্চিত্ত মানে জরিমানা দেওয়া।

জ্ঞান। আমার ত মনে হয় ভগবানকে পাবার জন্যে সবাইকে যে সব ত্যাগ ক'রে গেরুয়া প'রে বেরুতে হবে তা নয়; সংসারে যেমন আছি সেই রকম থেকে তাঁকে ডাকতে ডাকতে তাঁকে পাওয়া যায়।

ঠাকুর। আচ্ছা, বল দেখি, এই কথায় তোমার ঠিক বিশ্বাস আছে কি? শুধু ভাষা বললে হবে না, সত্যি সত্যি মনে ঠিক এই বিশ্বাস আছে কি? দু' দিক করলে হবে না; হয় সব পুরো

ভোগ ক'রে যাও, তাতেও তাঁকে পাবে আর নয় সব পুরো ত্যাগ কর তবে তাঁকে পাবে। 'সব ভোগ করলে তাঁকে পাওয়া যায়' এই বিশ্বাস যদি ঠিক থাকে ত সব ভোগ কর একটাও বাদ দিও না। ভোগ মানে শুধু সুখ ভোগ নয়; সুখ, দুঃখ, শান্তি, অশান্তি, ভাল, মন্দ প্রভৃতি যা যা আসবে সব গুলি সমান আনন্দের সঙ্গে ভোগ কর, একটীও বাদ দিতে পাবে না।

যে ভাবে সংসার করছ এতে কি কি পাওয়া যায় তা ত এত দিন জানলে। যতই খাট না কেন, যতই চেষ্টা কর না কেন, সুখ, দুঃখ, রোগ শোক, তাপ, অভাব আসবেই, এর হাত থেকে কারুর নিস্তার নেই। এ ভাবে যে ভগবান পাওয়া যাবে না, তা বোধ হয় বুঝেছ। ভগবানের প্রয়োজন হ'লে তখন আপনি সব ত্যাগ করিয়ে দেবে। যেমন অর্থের প্রয়োজন আছে ব'লে স্ত্রী, পুত্র সব ছেড়ে একলা বিদেশে গিয়ে, কত কষ্ট স্বীকার ক'রেও এক অজানা অচেনা সাহেবের খোসামোদ কর।

জ্ঞান। গীতায় ত বলেছে 'কর্ম্ম করতে করতেও তাঁকে পাওয়া যায়।'

ঠাকুর। কর্ম্ম ত করতেই হবে। অবস্থা না এলে কর্ম্ম শূন্য হয়ে থাকতে পারবে কেন? কর্ম্ম তিন প্রকার—কুকর্ম্ম যাতে আত্মার অবনতি হয়; অকর্ম্ম অর্থাৎ সংসারের কর্ম্ম, যাতে কোন মুনফা নেই; আর সুকর্ম্ম, যাতে আত্মার উন্নতি হয়। তাই কুকর্ম্ম করতে বারণ করেছে; আর অকর্ম্ম নেহাৎ সংসারের প্রয়োজন মত যত টুকু না করলে নয় কেবল তত টুকু করবে, কিন্তু তাতে মন রাখবে না এবং বাকী সব সময় সুকর্ম্ম করবে ও সর্ব্বদা তাঁতে মন রাখবার চেষ্টা করবে। এই করতে করতে সুকর্ম্ম যত বেড়ে যাবে তত আর তার দ্বারা কুকর্ম্ম করা সম্ভব হবে না ও অকর্ম্মও ঢের ক'মে আসবে এবং তত সে তাঁর দিকে গতি করতে থাকবে। আর এক, ভালবেসে প্রেমে গতি করা। এতে কোন বিচার দরকার হয় না, কিন্তু এ ভালবাসা ত তোমরা ধারণা করতে পারবে না। যখন তুমি ঠিক

ভালবাসতে শিখবে তখনই ভালবাসা যে কি জিনিষ বুঝবে, আর তখন দেখবে তোমাকেও ভালবাসবার লোক আছে। এ অবস্থা না এলে ভালবাসা ধরবার ক্ষমতা থাকবে না, শুধু মুখেই বাতুলের মত 'ভালবাসা' 'ভালবাসা' করবে। চণ্ডীদাস বলেছেন—

পিরীতি পিরীতি সব জন কহে পিরীতি সহজ কথা।
বৃক্ষের ফল নহেক পিরীতি, নাহি মিলে যথা তথা॥

তারাপদ। চণ্ডীদাস যে বলেছেন—

দিবস রজনী ছিল না যখন তখন গণেছি মাস।
মাটীর জনম ছিল না যখন তখন করেছি চাষ॥

এর মানে কি ?

ঠাকুর। দিবস রজনী থাকে না কখন ? প্রকৃতির বাইরে; অর্থাৎ যখন এই প্রকৃতির মধ্যে আসিনি তখন মাস কি না সংখ্যা গণেছি, অর্থাৎ সংখ্যা রেখে তাঁর নাম করেছি। কিন্তু এই প্রকৃতির মধ্যে এসেই তাঁর নাম করা ভুলে গেছি। মাটীর জনম ছিল না যখন অর্থাৎ যখন এই মাটীতে ভূমিষ্ঠ হইনি তখন চাষ করেছি, ভেতরে কর্ষণ করেছি। রামপ্রসাদ বলেছেন 'এমন মানব জনম রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা, মন রে কৃষি কাজ জান না।' যেই মাটীতে পড়লুম অমনি সব ভুলে গেলুম।

গর্ভে অষ্টম মাসে পূর্ণ অবয়ব হয়; তখন সেখানে চৈতন্য হয় ও জ্ঞান হয় যে আবার সেই সংসারের মধ্যে, সেই রোগ, শোক, দুঃখের মধ্যে যাচ্ছি। তখন সে হাত জোড় ক'রে ভগবানের কাছে কাঁদে ও প্রার্থনা করে যেন তিনি তাকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন ও সে যেন সর্ব্বদা তাঁতে মন রক্ষা করতে পারে। কিন্তু যেই ভূমিষ্ঠ হয় অমনি সুষুম্না নাড়ীতে শ্লেষ্মা হয়ে জ্ঞান লোপ করে, আর মায়াতে সব ভুলিয়ে দেয়। এই মায়ার মধ্যে প'ড়ে যত দুঃখ কষ্ট পায় তত আবার তাঁর দিকে যাবার চেষ্টা করে। সংসারে দুঃখ কষ্ট না থাকলে কেউ কি আর্ত্ত হ'ত, না তাঁর দিকে যাবার চেষ্টা করত ?

সংসারে দু তিনটি লোককে ভালবাসা, অর্থাৎ **সীমাবদ্ধ ভালবাসার নাম মায়া** আর **সকলকে ভাল বাসার নাম প্রেম।** সীমাবদ্ধ ভালবাসাতে সীমার মধ্যে থাকে ব'লে বদ্ধ ; আর সকলকে ভালবাসলে সবটাই যে তার আপনার হল, তার আর সীমা থাকে না, কাজেই সে আর তখন বদ্ধ নয়। **ভালবাসা মানেই ত্যাগ।** মানুষ প্রকৃতিতে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন কেবল এদেরই ভালবাসে ; দেব প্রকৃতিতে মানুষ মাত্রকেই ভালবাসে ; আর ব্রহ্ম প্রকৃতিতে মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সৃষ্টির যেখানে যা আছে সকলকেই ভালবাসে।

পুত্তু। অবতাররাও ত তাঁর সংসারের সকলকেই সাধারণের মত ভালবাসেন।

ঠাকুর। অবতাররা যখন জগত শুদ্ধ সকলকেই ভালবাসেন, তখন তাঁদের স্ত্রী, পুত্রাদি আত্মীয়রা কি অপরাধ করেছে? স্ত্রী না হয়ে পর হলে ত ভালবাসা পেত, আর বিয়ে ক'রেই কি যত অপরাধ করেছে যে আর ভালবাসা পাবে না! অবতাররা জগতের সকলকেই সমান ভাবে ভালবাসেন, কারণ তাঁদের ত আর কোন স্বার্থ বা কোন আকাঙ্খা নেই যে সেই আশায় কাহাকেও বেশী ভালবাসবেন। যারা তাঁদের কাছে আসে তারাই কিছু বুঝতে পারে যে তাঁরা তাদের কত ভালবাসেন, তবে যারা সকল ছেড়ে সকল ভুলে এক লক্ষ্য হয়ে ছুটে আসে তারা জোর ক'রে বেশী ভালবাসা টেনে নেয়। ভীষ্ম যেমন জোর ক'রে ভগবানের প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে দিয়েছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন "অর্জ্জুন, তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বল যে আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না ; কারণ তুমি ভক্ত, তোমার প্রতিজ্ঞা বরং থাকবে কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করলে ভক্ত জোর ক'রে আমার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে দিতে পারে।'

পুত্তু। গিরিশ ঘোষ প্রভৃতির ত এত জোর বিশ্বাস ছিল, তবু তারা সংসারও বজায় রেখেছিলেন ত?

ঠাকুর। সংসার বজায় রাখতে ত কোন দোষ নেই, সংসারে একেবারে বদ্ধ না হ'লেই হল। তোমার যদি সে ক্ষমতা ও মনের শক্তি থাকে ত তুমি সবই বজায় রেখে ভোগ করতে পার, কিন্তু তখন আর কোনটীকে বাদ দিতে পারবে না।

কালী। স্ত্রী, পুত্রের সঙ্গে ব্যবহার রাখতে গেলে মনকে এ ভাবে ত্যাগের পথে নিয়ে যাওয়া চলে না।

ঠাকুর। তুমি ত সংসার ছাড়ছ না। মায়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে মনকে শক্ত করার জন্য চেষ্টা করছ। যখন সকল মানুষের সঙ্গে ব্যবহার রেখেছ, তখন স্ত্রী পুত্রাদির সঙ্গেও ব্যবহার রাখতে হবে ত।

কালী। স্ত্রী, পুত্রের সঙ্গে সর্ব্বদা ব্যবহার রাখতে হচ্ছে; তাদের ভাবের সঙ্গে মিশতে পারলে তবে শান্তি নচেৎ ঘোর অশান্তি। কাজেই তাদের ভাব নীচগামী হ'লে বাধ্য হয়ে নিজের মনকে না নামিয়ে আনলে শান্তি আসবে না। এ ক্ষেত্রে গুরুর বিশেষ কৃপা ছাড়া হওয়া খুব শক্ত।

ঠাকুর। এ ত বেশ কথা। তবে গুরুর ওপর ঠিক নির্ভর ক'রে থাক, তিনি ত সব সময় সকলকেই কৃপা করছেন। কিন্তু তোমরা যে অন্ধ, তোমরা দেখতেও পাও না, বুঝতেও পার না। সে অবস্থা না এলে ত বুঝতে পারবে না, কাজেই অহং জ্ঞানের বিচারে ঠিক এর ওপর বিশ্বাস রেখে দাঁড়াতে পার না। দেখ, সংসারে স্বামী ও স্ত্রীর ভাব আলাদা হলে অশান্তি হয়, তখন হয় স্ত্রীকে স্বামীর ভাবে আসতে হবে, নয় স্বামীকে স্ত্রীর ভাবে যেতে হবে তবে শান্তি হবে। যদি স্বামী ধর্ম্ম পথে যায় তা হলে স্ত্রীকেও বুঝিয়ে সেই দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। তবে যত ক্ষণ স্ত্রীর ভোগ বাসনা প্রবল থাকে তত ক্ষণ সে হয় ত এ দিকে আসতে চাইবে না। তবু তাকে বোঝাতে হবে যে দেখ, সংসারে রাজা থেকে নীচ পর্য্যন্ত কেহই এ পর্য্যন্ত সুখী হতে পারে নি; এতে

কোন রকমেই সুখ আসবে না, তাঁর দিকে না গেলে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এই ভাবে প্রতি কার্য্যে, প্রতি কথায় বুঝিয়ে বুঝিয়ে আস্তে আস্তে ফেরাতে হবে। সদ্গুরুর সঙ্গে এই গুলো শীঘ্র শীঘ্র সহজে হয়ে যায়। তোমরা সংসারী, তোমরা ত অন্য সাধন ভজন করতে পারবে না, তোমাদের পক্ষে সঙ্গই প্রধান। গুরুসঙ্গ ও গুরুতে বিশ্বাস, এই তোমাদের পক্ষে একমাত্র সহজ উপায়। অবিচারে গুরুবাক্য পালন করবে ও গুরুতে স্থির বিশ্বাস রাখবে। কারণ গুরুতে ঠিক ঠিক বিশ্বাস না থাকলে, আমিত্ব টুকু কমবে না এবং আমিত্ব না গেলে গুরুকে ঠিক একলক্ষ্য হয়ে ধ'রে থাকতে ও অবিচারে গুরুবাক্য পালন করতে পারবে না; মনে স্বতঃই বিচার উঠবে।

গুরু শিষ্যের ভাব ঠিক কেমন জান? যেমন শিশুর মতন। ছোট ছেলে যেমন মা ছাড়া আর অন্য কিছুই জানে না। শিষ্য বাহিরে যত বড় হোক, যত বুদ্ধিমানই হোক, গুরুর কাছে ঠিক শিশুটীর মতন থাকবে; তিনি ছাড়া আর কিছু জানে না বা বোঝে না। সেখানে কোন বিচার করতে নেই, কারণ বাহিরে তুমি যত বড়ই বুদ্ধিমান সাজ না, তাঁর কাছে তুমি অজ্ঞানী; আর অজ্ঞানীর বিচার অজ্ঞানতা পূর্ণ, জ্ঞানের দিক দিয়েও যাবে না। যত ক্ষণ নিজে না জ্ঞানী হচ্ছ তত ক্ষণ গুরুর ভাব ধরতে বা বুঝতে পারবে না; তাই তোমাদের বলি গুরুর কথার বা তাঁর ভাবের বিচার করতে যেও না। কারণ তাঁকে ত তোমার বিচার বুদ্ধির ভেতর ধরতে পারবে না, মাঝখান থেকে তোমার অজ্ঞান মনে সংশয় এসে যেটুকু ভাব আসছিল সেটুকু ভেঙ্গে দিয়ে তোমার মস্ত অমঙ্গল করবে।

সর্ব্বদা গুরুতে মন রাখবার চেষ্টা করবে। যেমন বাহিরের কাজে গেলেও মনটা সংসারের ওপর প'ড়ে থাকে, তেমনি যেখানেই থাক বা যে কাজই কর না কেন, সর্ব্বদা গুরুতে মনটা ফেলে রেখে দেবে, তা হ'লেও সর্ব্বদা গুরুসঙ্গ হতে লাগল। এ রকম অভ্যাস

করতে পারলে সাধন ভজন না করলেও গুরুশক্তি তোমার সব আপনিই করিয়ে দেবে। তন্ময়ত্ব অবশ্য আলাদা অবস্থা, তখন আর কোন দিকে লক্ষ্য থাকে না, এমন কি দেহ, যে এত প্রিয় সেটা পর্য্যন্ত ভুল হ'য়ে যায়। তখন সে ত এক হয়ে গেছে। আমি জোর ক'রে বলতে পারি এবং যে ভাবে বল লিখে দিতে পারি—**গুরুবাক্যে যার বিশ্বাস আছে এবং যে অবিচারে গুরুবাক্য পালন করে তার হবেই। এমন কি ঠিক ভাবে মানতে না পারলেও মানবার জন্যে মনে জোর আকাঙ্খা থাকলেও ভাল হতেই হবে।** মনে আকাঙ্খা আসা চাই, জোর প্রয়োজন বোধ হওয়া চাই, তবে ফল লাভ হবে। এমন কি গুরু সেবার জন্যে প্রাণে জোর আকাঙ্খা রয়েছে অথচ ব্যাধিতে শরীর অপটু হওয়ায় হয় ত পেরে উঠছে না। এ অবস্থায় জোর আকাঙ্খা থাকায় তার গুরু সেবার ফল হয়।

কালী। বিবেকানন্দ প্রভৃতি পরমহংসদেবের প্রধান প্রধান ভক্তরাও ত জানত না যে তারা কত দূর এগিয়েছে! এ কেন?

ঠাকুর। পূর্ণ তৈরী হবার আগে সদগুরু জানতে দেন না, কারণ জানলেই 'আমি এত দূর এগিয়েছি' মনে ক'রে একটু অহং জ্ঞান আসতে পারে ও ভাবটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পরমহংসদেব ত বিবেকানন্দকে বলেছিলেন 'তুই কে জান্‌লে তুই কি আর থাকবি রে।' কেন না যারা উচ্চ অবস্থা থেকে আসে তারা যখন সেটা বুঝতে পারে তখন প্রায়ই তাদের দেহ থাকে না। অর্থাৎ পূর্ব্ব অবস্থা সব মনে পড়লে এই সংসারের দুঃখ কষ্টের মধ্যে কি আর কেউ থাকতে চায়? তা ছাড়া, যাকে যে ভাবে, যে কাজের জন্যে কর্ম্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে তার পূর্ণতা এলে, তবে তাঁকে সে কাজে লাগান হয়; যেমন ভিজে কাঠ সব শুকিয়ে এলে তখন একটু অগ্নি সংযোগ করলেই চট্ ক'রে সব জ্বলে যায় ও জোর আগুন হয়।

কেষ্ট। ভগবানকেও ত ভক্তের জন্যে চঞ্চল হতে হয় ?

ঠাকুর। চঞ্চল হন ব'লেই ত ভগবান ; তাই ত ভগবানকে ডাক। চঞ্চলতার জন্যেই ত সৃষ্টি। স্থির হ'য়ে গেলে আর সৃষ্টি কই ? ভক্ত ভগবান সম্বন্ধ কি রকম জান ? ভক্ত আগে, ভক্তকেই তিনি বড় ক'রে গেছেন। রুক্মিণী ভালবাসার জিনিষ স্বামী হিসাবে কৃষ্ণকে ভালবেসেছে তাই এ ভালবাসার মধ্যে তত বড়ত্ব নেই কিন্তু শ্রীমতী ভালবাসার জিনিষ সব ছেড়ে এসে কৃষ্ণকে ভালবেসেছে ব'লে রাধিকার সেই ভালবাসাকে এত বড় করেছেন ও রাধিকাকে এত উচ্চ স্থান দিয়েছেন।

দ্বিজেন গাহিল

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে (বলে) আয় ছুটে আয় আমার পাশে ॥

বলে আয় রে ছুটে আয় রে ত্বরা, হেথা নাইক মৃত্যু নাইক জরা,
হেথা বাতাস গীতি গন্ধে ভরা চির স্নিগ্ধ মধু মাসে।
হেথা চির শ্যামল বসুন্ধরা, চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে ॥
কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে, কেন ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে,
হেথা সুধা সিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে আয়রে চ'লে, আয় চ'লে আয় আমার পাশে ॥
কেন কারাগৃহে থাকিস বন্ধ, ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ,
ভবে সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালবাসে।
ওরে ঘরের ছেলে পরের মত কোথা থাকবি পরের বাসে ॥

তৃতীয় ভাগ—ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

কলিকাতা বৃহস্পতিবার ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৪০ সাল ;
ইং ২০শে জুলাই ১৯৩৩ সাল

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, ললিত, কালু, পুর্ত্তু, অপূর্ব্ব, কেষ্ট, শ্যাম, তারা পদ, দ্বিজেন, কৃষ্ণ কিশোর, জিতেন, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, দ্বিজেন সরকার, সুধাময়, পঞ্চানন, মতি ডাক্তার, হরি মোহন, প্রফুল্ল, সুরেন, বটুক, কালী মোহন, ভোলা ও অভয় আছে। ঠাকুর বৈকালে গজাননের বিশেষ অনুরোধে তার বাড়ীতে ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলেন। তা ভিন্ন তিনি বড় সন্ধ্যার সময় আসন ছেড়ে আর কোথাও যান না।

ঠাকুর। সাধারণ সংসারী পিতা মাতা পুত্রকে আপন করে এবং পুত্রও পিতা মাতাকে আপন করে বটে, কিন্তু এই আপনে বাপ মারও কিছু স্বার্থ আছে, আর পুত্রেরও কিছু আমিত্ব আছে। তাই, যশোদা কৃষ্ণকে আপন ক'রে যেমন কৃষ্ণের অধীন হয়েছিল এবং কৃষ্ণও যশোদাকে আপন ক'রে যেমন তার অধীন হয়েছিল সে রকম ভাবে এরা কেউ কাহারও অধীন হতে পারে না। যশোদা কৃষ্ণের মুখ খানি ছাড়া এ জগতে আর কিছু জানত না, বুঝত না, এবং কৃষ্ণ আমার ছেলে এ ছাড়া তার ওপর আর কোনও স্বার্থ রাখত না। সংসারীরা প্রত্যেক ছেলে-কেই ভালবাসে, প্রত্যেকটিকেই মানুষ করে, আবার সংসারের অপর সব দিকও বজায় রাখে, কিন্তু যশোদা কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু জানত না। কৃষ্ণকে সে সব সমর্পণ ক'রে ভালবেসেছিল ; সংসারের অপর কোন জিনিষের ওপর বা অন্য কাহারও ওপর তার ভালবাসা ছিলই না। এইখানে কথক ব্যাখ্যার সময় বলছে যে কায়মনোবাক্যে এই রকম জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে এক চিন্তা রাখতে পারলে ভগবান লাভ

নিকট হয়। কিন্তু কায়মনোবাক্যে এক চিন্তা রাখতে পারলে ত স্বপ্নে আপনিই সেই চিন্তা আসবে তার জন্যে আলাদা চেষ্টা করতে হয় না; আর এ অবস্থায় সর্ব্বদাই সেই চিন্তায় থাকে ব'লে সুষুপ্তি হতে পারে না কারণ সুষুপ্তি চিন্তা রহিত অবস্থা, তখন কোন চিন্তা থাকে না।

কৃষ্ণ যতই বিশ্বরূপ দেখান বা যতই বোঝান যে তিনি স্বয়ং ভগবান, যশোদা সে সব কিছুই বুঝতে চাইত না; কৃষ্ণ যে তার ছেলে এই সন্তান ভাবই বরাবর রক্ষা ক'রে গিয়েছিল। যশোদার বাৎসল্য ভাবে তবু কৃষ্ণকে বাঁধতে যাওয়া, ভয় দেখান প্রভৃতি কিছু ছিল কিন্তু মধুর ভাবে এ রকম মোটেই থাকে না। আবার কৃষ্ণ যখন রেগে দাঁত কামড়ে হাঁড়ি ভেঙ্গে কাঁদছেন তখন ব্যাখ্যা করলে যে এটা কৃষ্ণের যথার্থই রাগ, শুধু দেখাবার জন্যে অভিনয় করে নি, কারণ সেখানে ত আর কেউ ছিল না। এ কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ রাগ হলে এই এই হয়, এ স্বতঃ প্রকৃতি, এর আবার প্রমাণের দরকার কি?

অপূর্ব্ব। নির্গুণের সঙ্গে ক্রোধ হলে সেটা নির্গুণ ক্রোধ, এর মানে কি?

ঠাকুর। এটা ভাষা। এর দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছে যে এ রাগ তার ভেতর স্পর্শই করে নি।

পুত্তু। আপনি ত বলেন যার সঙ্গ কর তার ভাব আসে; তা এখানে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, যশোদা এবং গোপীরা তাঁর সঙ্গ করছে ব'লে বড় হয়েছে। তা হলে তাদের নিজেদের বড়ত্ব কিছু নেই ত?

ঠাকুর। দেখ, ভগবান ভেবে ত তারা কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যবহার করে নি। ভগবান ব'লে জানলে বা ভাবলে আর সে ভাব থাকবে না, অমনি এই সরল ভাব চ'লে গিয়ে সঙ্কোচ আসবে। তা ছাড়া, ভগবান বললেই তাকে বড় করা হ'ল কেননা ভগবান মানেই ঐশ্বর্য্য বান, আর ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি আছে ব'লে তার কাছ থেকে কিছু লাভের আশা, কিছু চাওয়া থাকবে। কিন্তু যশোদা ও গোপীদের

এ ভাব ছিল না। তাদের ভালবাসায় সংসারীদের মত স্বার্থ বোধ বা বড় ছোট বোধ ছিল না। এই স্বার্থ শূন্য অহেতুকী ভালবাসাই হচ্ছে প্রেম। তবে হ্যাঁ, এটাও ঠিক, যাকে ভালবাসবে তার ভাব তোমার ভেতর আপনিই আসবে এবং সে ক্রমশঃ.তার ভাবাপন্ন হবে। ত্যাগীকে ভালবাসলে ত্যাগ আপনিই আসবে কারণ ভালবাসার স্বভাবই হচ্ছে স্বার্থ নষ্ট ক'রে দেয়।

কৃষ্ণকে ভালবেসে তাদের এই ভাব এসেছে বটে, কিন্তু আসল জিনিষটা দেখাচ্ছে যে ঠিক ভালবাসায় কি রকম সব ত্যাগ হয়ে যায়, এমন কি নিজেকে পর্য্যন্তও বিলিয়ে দেয়। এই ভালবাসাই ভগবান লাভের উপায়। এই ভাবটাই এখানে বড় করেছে আর তোমরা সেইটেই নেবে; কতক গুলো ভাষার মাধুর্য্য বা ভাবের পারিপাট্যের দিকে নজর দেবার প্রয়োজন নেই। এই সব শুনে বা প'ড়ে তোমার মনে যদি উদ্দীপনা হয় যে 'তাই ত আমি এত দিন কি করলুম! আমিও এখন থেকে এই রকম নিঃস্বার্থ ভালবাসতে শিখব, কিছু সৎ হব', তা হলে তোমার ভাগবত শোনা বা পড়ার কিছু কাজ হ'ল, তা ভিন্ন সাধারণ গল্পের বই পড়ার মত হয়।

মূল কথা হচ্ছে ত্যাগ শিক্ষা কর। তাই, ভক্ত নিজের ভালবাসার জিনিষ সব ছেড়ে এসে ভালবাসে ব'লে তাকে এত বড় করেছে। মন্দোদরি যখন রাবণকে বললে 'তুমি এখনও বুঝছ না রাম কে? রাম স্বয়ং ভগবান; যাও, সীতাকে নিয়ে গিয়ে রামের কাছে ফিরিয়ে দাও, তাহলে দেখবে তিনি সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমায় ক্ষমা করবেন, নইলে দেখছ ত এ যুদ্ধে আর নিস্তার নেই।' স্ত্রীর উপদেশ শুনে রাবণের ক্রোধ হয়েছে, সে বলছে 'কি? মন্দোদরি! তুমি আমাকেই চিনতে পার নি, সামান্য স্বামীর ছাঁচে গড়েছ, আর তুমি রামকে চিনবে? আমি জানি না রাম কে? জান, মন্দোদরি! রাম আমার জন্যে এসেছেন। রামের প্রীতির জন্যে সীতাকে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হয় না, কারণ সীতার বড়ত্ব কোথায়? আমি যে সীতাকে

নিয়ে এসে এত যত্ন করছি তবুও তিনি ত তাঁর সেই প্রিয় স্বামী রামের চিন্তা ছাড়া, আমি যে ভক্ত, এই ভেবে একবারও আমার চিন্তা করেন নি। তিনি স্ত্রী হিসাবে তাঁর প্রিয় জিনিষই ধ'রে আছেন, এতে আর তাঁর বাহাদুরি কি? কিন্তু আমি ভক্ত, আমি যখন রামের কাছে যাব, তখন আমার যে এত প্রিয় স্ত্রী, পুত্র, পৌত্রাদি সব ছেড়ে তাঁর কাছে যাব এবং কারুর চিন্তাও রাখব না; তাই আমাকে দেখলেই তাঁর সীতা ভুল হয়ে যাবে, কারণ তিনি যে ভক্ত বৎসল, স্ত্রী বৎসল নন। তবে, আমিও এখন যাব না, কেন না বাসনা কামনা নিয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি তাই দিয়ে ফিরিয়ে দেবেন। বাসনা কামনা কারা? এই পুত্র, পৌত্রাদি। সেই জন্য আগে এদের একে একে তাঁর কাছে পাঠাচ্ছি; আর তাঁর হাতে মরলে এদেরও সংগতি হবে। এরা সব নষ্ট হয়ে গেলে তখন আমি যাব আর ফিরব না। তা ছাড়া দেখ, আমি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সকল দেবতাদের আমার রাজত্বে বেঁধে রেখেছি, শুধু লক্ষ্মীকে আনতে পারিনি। সীতা লক্ষ্মী, তাই মা ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবার জন্যেই নিজে ধরা দিয়েছেন নইলে আমার সাধ্য কি আমি তাঁকে এনে বন্দিনী ক'রে রাখি।'

জিতেন। যারা সাধন করে তারা কিছু অনুভূতি পায় ত? নইলে কি ক'রে গতি করে?

ঠাকুর। সাধনা করতে করতেই কি অনুভূতি হয়? আর সাধনা কি এত সোজা জিনিষ? সব ছেড়ে এক লক্ষ্য হয়ে সেই বস্তুর জন্য কঠোর ক'রে লেগে থাকার নাম সাধনা। এই সাধন পথে গতি করতে করতে যেমন যেমন অবস্থা লাভ হবে তেমন তেমন অনুভূতি হতে পারে; তা ভিন্ন, সাধনা আরম্ভ করলেই যে সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি হবে তা নয়। তোমরা যে এই সৎ স্থানে আসছ, সৎ সঙ্গ করছ এগুলো ত সাধনা নয়, এ হ'ল সৎ সংস্কার। তবে এতেও সব সময় ঠিক লেগে থাকতে থাকতে অবস্থা লাভ ও অনুভূতি হতে পারে।

যারা সর্ব্বদা গুরুতে ঠিক বিশ্বাস রেখেছে তাদের আপনা আপনি অবস্থা লাভ হয়।

সর্ব্বদা গুরুতে বিশ্বাস মানে যে কাজ কর্ম্ম সব ছেড়ে কেবল তাঁর চিন্তায় থাক তা নয় ; কারণ অবস্থা না এলে ত সব ছেড়ে সর্ব্বদা তাঁতে মন রাখতে পারবে না। সংসারে নেহাত দরকারী কাজ গুলো, যে গুলো না করলে নয়, করতে হবে, অর্থ রোজগারের জন্য সাধারণ চেষ্টাও করতে হবে, তবে তার জন্য দিন রাত ছুটোছুটি করবার দরকার নেই কেননা প্রারব্ধে যেটুকু অর্থ আছে তাহা সহজেই আসবে। আর বাকী সব সময় বাজে চিন্তায়, বাজে বই পড়ায় বা বাজে গল্পে নষ্ট না ক'রে সৎ সঙ্গে ও তাঁর চিন্তায় থাকবে। মোট কথা বাকী সব সময় টুকু ছাড়াও এই রকম বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ করতে করতে যেই একটু ফুরসুত পাবে সেটুকুও তাঁর চিন্তায় থাকবে।

ডাঃ সাহেব। যোগ মার্গে অষ্টসিদ্ধাই প্রভৃতি যোগ বিভূতি আসে, ভক্তি পথেও কি ওরকম হয় ?

ঠাকুর। ভক্তিপথে সিদ্ধাই বা বিভূতি আসে না, কারণ ভক্ত ত তা চায় না এবং ভক্তের প্রয়োজনও হয় না। যোগপন্থী বিভূতি খোঁজে এবং তাতে তার আনন্দ, কিন্তু ভক্ত এ সব কিছু বোঝে না বা এতে তার কোন আনন্দ হয় না। সে সর্ব্বদা তাঁর চিন্তায় থাকতে ভালবাসে এবং তাতেই তার আনন্দ। তার অবস্থা লাভ হ'য়ে বিভূতি এলেও সে সেগুলি ব্যবহার করে না, তবে অবস্থার পূর্ণতা এলে অর্থাৎ তাঁকে প্রাপ্ত হ'লে ভক্ত বা যোগী একই রকম আনন্দ উপভোগ করে। ভক্তি, বিশ্বাসের জোরে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য তোটকাচার্য্য মূর্খ হলেও তার হঠাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ফুটে উঠেছিল। যার সঙ্গ করবে, যাকে ভালবাসবে তার ভাব আপনি আসবে। তাই ত্যাগী গুরুর সঙ্গ করলে আপনি ত্যাগ শিক্ষা হবে। ভক্ত তার সব প্রিয় জিনিষ ছেড়ে ছুটে এসে ভালবাসে এ কি কম কথা ? এ কি কম বিভূতি ? চৈতন্যদেব ভালবাসা দ্বারা সমস্ত দেশ শুদ্ধ

লোককে মাতিয়ে তুলেছিলেন—এর চেয়ে আর বড় বিভূতি কি হতে পারে? শিষ্য যত সব ছেড়ে তাঁর দিকে আসতে থাকে, ত্যাগী গুরুর তত আনন্দ হয়।

পুত্তু। নিজে যত চেষ্টাই করুক গুরুর কৃপা ছাড়া ত হবে না?

ঠাকুর। গুরুকৃপা ত সব সময় আছে, কিন্তু সে কৃপা নেবার ক্ষমতা না থাকলে নেবে কি ক'রে? পাথরে পেরেক ঠুকলে কি পেরেক বসে, মাটী হ'লে চট্ ক'রে বসে। তেমনি গুরুর সঙ্গ করতে করতে পাথর গ'লে মাটী হয়ে এলে কৃপা নেবার ইচ্ছা হবে ও কৃপা নিতে পারবে; তা ছাড়া, সে ত কৃপা চাইবে না আর দিলেও নেবে না।

জিতেন। পরমহংসদেব বলতেন 'সদ্‌গুরু পেয়েছিস ত তাকিয়া পেয়েছিস,' তা হলে আবার চিন্তা কেন?

ঠাকুর। এ হচ্ছে বিশ্বাসীর পক্ষে অর্থাৎ যার বিশ্বাস আছে যে, সদ্‌গুরু পেয়েছি যখন, তখন আর কিছুরই প্রয়োজন নেই, তার পক্ষে। এই ভাবে পূর্ণ নির্ভর করতে পারলে তবে ত নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকতে পারবে, তবে ত সব ভাবনা চিন্তা ছেড়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে আরাম করতে পারবে, তা ভিন্ন, নিশ্চিন্ত হতেই দেবে না, আপনি চিন্তা এসে পড়বে।

কৃষ্ণ কিশোর। যে নীতি গুলো পালন করতে বলেছেন, সেগুলো পালন করা সম্ভব না হলে কি কোন দোষ হয়? তা ছাড়া এও ত আছে গুরুর কাছে থাকলে নীতি পালন না করলেও চলে।

ঠাকুর। বিশেষ কোন কারণ ছাড়া নীতি ভাঙ্গবে কেন? নীতি ভাঙ্গা মানেই গুরুর কথা শুনলে না, তাতে খুব কম কাজ হবে। সামান্য অসুবিধা হলে বা খেয়াল বশতঃ নীতি ভাঙ্গতে নেই। আর, 'গুরুর কাছে থাকলে নীতি পালন করবার দরকার নেই', এ কথা ত কখনও হয় নি। সংসারের বেলা কত বড় বড় নীতি যে রকমে হোক পালন করছ, আর ধর্ম্মের দিকে গতি করবার জন্যে দুটো একটা নীতি রাখতে পারবে না? সংসার বজায় রেখে ধর্ম্ম

করতে গেলে, যা প্রায় সবাই করে, ধর্ম্মটাকে ছোট ক'রে ফেলে ব'লে এ সব কথা ওঠে। কিন্তু যারা সংসার ভেঙ্গে এ পথে আসতে চায়, তারা আবার গুরুর এই আদেশ গুলো না মেনে চলতেই পারবে না।

জিতেন। পরের বাড়ী খাওয়া মানেই ত কর্ম্ম গ্রহণ করা?

ঠাকুর। সেটা উদ্দেশ্যের ওপর; শ্রাদ্ধ বাড়ী খাওয়ানর উদ্দেশ্যই হচ্ছে মৃত আত্মার মঙ্গল কামনা; সেই জন্য তার কর্ম্ম নিতে হয়। কিন্তু ভালবাসা বা প্রীতির ওপর খাওয়ান ত কর্ম্ম দেবার উদ্দেশ্যে নয়, তাই তাতে দোষ হয় না; তবে তোমার সংস্কার অনুযায়ী খাদ্য দ্রব্য যদি না দেয় অর্থাৎ তুমি যে সব জিনিষ না খাও সে সব দিলে খাবে না।

ভোলা। কোন পূজার সময় ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণে বা শ্রাদ্ধ বাড়ী ছাড়া বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক খাওয়ানতে খেলে কি কোন দোষ হয়?

ঠাকুর। পূজার সময় ত দেব উদ্দেশ্য রয়েছে কাজেই তাতে তত দোষ হয় না, আর যদি প্রসাদ হয় তবে ত কথাই নেই। তা ছাড়া, সামাজিক নিমন্ত্রণে বিশেষ দোষ না থাকলেও সকলের ছোঁয়া জিনিষ না খাওয়াই ভাল। বিশেষতঃ যারা একটা সৎ নীতি ধ'রে ঠিক মত পালন ক'রে তাঁর দিকে গতি করতে চাচ্ছ তাদের পক্ষে ত অন্য জায়গায় বা অপরের ছোঁয়া যত না খাওয়া যায় ততই ভাল।

ভোলা। উচ্ছিষ্ট খাওয়া কি দোষের? প্রসাদ কি উচ্ছিষ্ট হয়?

ঠাকুর। প্রসাদ উচ্ছিষ্ট হয় না বটে, তবে মনে সে রকম ঠিক ভাব ও বিশ্বাস থাকা চাই। গুরুর উচ্ছিষ্ট খেতেই হবে তবে সেটাকে উচ্ছিষ্ট না বলাই ভাল। সেটা প্রসাদ। তা ছাড়া সাধারণ-ভাবে পিতা মাতা ছাড়া আর কাহারও উচ্ছিষ্ট খেতে নেই, কারণ সকলের কর্ম্ম ত সমান নয়, একে নিজেরটা নিয়েই ত ব্যস্ত আবার পরের নিয়ে জড়াতে যাও কেন? পিতা মাতা কর্ত্তৃক জগত দেখেছ, তাঁদের

দ্বারাই এত বড় হয়েছ, গর্ভে মায়ের খাদ্য থেকেই পুষ্ট হয়েছ, তাই তাদের উচ্ছিষ্ট খেতে দোষ হয় না। তাও, যদি তুমি সৎ পথে, ধর্ম্ম পথে থেকে তাঁর দিকে গতি করতে চাও তখন অনাচারী পিতা মাতারও উচ্ছিষ্ট খেতে বারণ করা আছে। অনেকে ছেলে মেয়ের উচ্ছিষ্ট ইচ্ছা ক'রে খায়, সেটা উচিত নয়, কারণ তাদের উচ্ছিষ্ট খাওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না, শুধু মায়ার ঠেলায় ওরকম করে। এমন কি গুরুভাইদেরও সকলের উচ্ছিষ্ট খেতে নেই। কেননা তাদের সকলকার কর্ম্ম ত সমান নয় বা সবাইকার কর্ম্ম ক্ষয় হয়ে সবাই যে এক রকম স্তরে উঠেছে তাও নয়।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন—

ঠাকুর। সঙ্গই প্রধান; বিশেষতঃ সংসারীদের পক্ষে সঙ্গ ছাড়া আর উপায় নেই। মানুষ মাত্রেরই কতক গুলো সংস্কার কতক গুলো প্রকৃতি আছে। সঙ্গ করতে করতে কুসংস্কার গুলো বদলে যায়। কারুর কারুর পূর্ব্ব সংস্কার অনুযায়ী সে অর্থে তত বদ্ধ থাকে না। ত্যাগীর সঙ্গ করলে অর্থে বদ্ধতার সংস্কার অনেক ক'মে আসবে এবং ক্রমশঃ এমন অবস্থা হবে যে অর্থ আসে ভাল কিন্তু না এলে বা চ'লে গেলেও তত দুঃখ বোধ হবে না। সৎ সঙ্গে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, এ বোধ আনিয়ে দেবে। ত্যাগ দু' রকমে হয়; এক, জোর ক'রে মনকে বুঝিয়ে; আর এক, ভালবেসে, তখন আপনি সব ছেড়ে যায়। সংসারে কামিনী কাঞ্চনের মায়ার এত জোর আকর্ষণ এবং পর পর এমন ভোগের জিনিষ সব এনে দেয় যে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে, সেগুলি ত ছাড়তে পারেই না বরং কিসে সেই সব ভোগের জিনিষ পর পর আরও বেড়ে যায় সর্ব্বদা সেই চিন্তা করে। কত চেষ্টা ক'রে, কত বুঝিয়ে, এ গুলি যে অনিত্য এ বোধ আনতে আনতে তবে কিছু কিছু ত্যাগ হতে থাকে। সঙ্গে এই বোধ সহজে আনিয়ে দেয় কিন্তু যাদের সৎ এ কিছু ভালবাসা প'ড়ে গেছে তাদের আপনি ত্যাগ হয়ে যায়, বুঝিয়ে ত্যাগ করাতে হয় না।

মুক্ত পুরুষদের পক্ষে ভোগ, ত্যাগ দুই সমান। তাঁরা ভোগে থাকলেও ইচ্ছা করলেই সব ছেড়ে যেতে পারেন। তাই সৎ সঙ্গকে এত বড় করেছে। অনেকে আবার মুখে বলে গুরুত সব করাচ্ছেন, তিনিই করিয়ে দেবেন। বেশ কথা, তিনিই যখন সব করাচ্ছেন তখন আর চিন্তা কর কেন? যে সব বিষয়েই এই ভাব রাখতে পারে যে 'তিনিই যখন করাচ্ছেন, তিনিই করাবেন' তার পক্ষেই কেবল এ কথা বলা শোভা পায়, নয়ত পাঁচটার বেলায় নিজের আমিত্ব রাখবে আর অপর পাঁচটার বেলায় দায়ে প'ড়ে তাঁর দোহাই দেবে এটা ঠিক নয়। যেটা জ্ঞান বল, সেটা ত সাধারণ, জ্ঞান নয় অজ্ঞান। **গুরুতে ঠিক বিশ্বাস রাখ, অবিচারে গুরু-বাক্য পালন কর, তখন ঠিক জ্ঞান আসবে। এরই নাম গুরুসেবা।** ত্যাগী গুরু গা, হাত, পা টিপিয়ে সেবা চান না, তিনি দেখেন যে শিষ্য কতটা সৎ হচ্ছে, তার বাসনা কামনা কত কমছে, এবং তার কতটা ত্যাগ এসেছে। সংসারের সব জিনিষই অনিত্য, কাজেই এদের সেবা করা মানে অনিত্যের সেবা করা; তা না ক'রে এমন জিনিষের সেবা কর যাতে এই দেহ চ'লে যাবার পরও সেবা চলে। তাই বলি নিত্য বস্তুকে সেবা কর। **গুরু নিত্য, তাঁকে সেবা কর।** যশ, মান, দেহসুখ প্রভৃতিতে যখন শান্তি আসে না তখন তাদের সেবা ক'রে লাভ কি? আর যশ মান ত সংসারীদের কাছে; তাদের কথার ভাল বা মন্দের দাম কি? যে দেহ, মন, প্রাণ দিয়ে গুরুর আদেশ পালন করে সেই বড়। তাই বলেছে কৃপণের কাছে নীতিবল শিখবে, আর চোরের কাছে একলক্ষ্যতা শিখবে। কৃপণ যেমন টাকাকে সব চেয়ে বড় করে ও টাকার জন্যে সব ছাড়তে পারে; এবং চোর যেমন রাত্রে অন্ধকারে প'ড়ে মরবে বা পুলিশের হাতে ধরা প'ড়ে মার খাবে ও সাজা পাবে এ সব ভ্রূক্ষেপ না ক'রে চুরি করার জন্য ব্যস্ত হয়, তেমনি অপর সব তুচ্ছ ক'রে কেবল গুরুর

উপদেশ মত একলক্ষ্য হয়ে তাঁর দিকে গতি করতে শেখ। তবে রিপু আদি যারা বিঘ্নকারী তাদের দূরে সরিয়ে দিতে পারবে ও যথার্থ তাঁকে পাবার মত সাধনা করতে পারবে। এইখানে শিবের আদেশ মত নন্দীর এক গরীব ব্রাহ্মণকে এক মাসের মধ্যে এক লক্ষ টাকা পাইয়ে দেবার গল্প বলিলেন।

এক কৃপণের অনেক টাকা ছিল তথাপি কিসে আরও অর্থ বাড়বে দিবারাত্র সে এই চেষ্টাতেই থাকত। সকাল হ'তেই এর কাছ থেকে সুদ আদায়, ওর কাছ থেকে টাকা আদায়, এর ধান বেচে খাজনা আদায় প্রভৃতি ক'রে বা এর নামে নালিশ ক'রে, ওকে উৎপীড়ন ক'রে যে কোন উপায়ে হোক তার নিজের স্বার্থ ঠিক বজায় করতেই ব্যস্ত থাকত। এক বার ভুলেও সৎ চিন্তা বা সৎ কথার ধার দিয়েও যেত না। এক দিন সকালে এই রকম টাকা আদায় করতে বেরিয়েছে; ঘুরে ঘুরে অনেক বেলা হয়েছে, দুপুর রোদে মাঠের মধ্যে দিয়ে ফিরতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে এমন সময় একটী শিবমন্দির দেখে তার পাশে গাছ তলায় একটু বিশ্রাম করতে বসেছে। খানিক পরেই শুনতে পেলে শিব নন্দীকে ডেকে বলছে 'নন্দী, দেখ, অমুক গ্রামের অমুক ব্রাহ্মণকে এক মাসের মধ্যে এক লক্ষ্য টাকা দেবে।' নন্দী বললে 'আজ্ঞে আচ্ছা!' কৃপণটী দেখলে এ ত তারই গ্রামে তার বাড়ীর কাছের এক গরীব ব্রাহ্মণের কথা হ'ল। সে ত তাকে খুব চেনে, দু' বেলাই ত তার বাড়ীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করে। ব্রাহ্মণ রোজ ভিক্ষে ক'রে কোন রকমে দিন কাটায়, আর তাকে এক লাখ টাকা পাইয়ে দিলেন! এই ভাবতে ভাবতে বাড়ী এসে স্নান আহার ক'রে বিশ্রাম করতে গেছে, কিন্তু মনে খালি ঐ চিন্তা। গরীব ব্রাহ্মণ এক লাখ টাকা নিয়েই বা কি করবে, শুধু শুধু তাকেই বা এত টাকা দেওয়া কেন? তার আর বিশ্রাম ভাল লাগল না, তখনই উঠে পড়ল এবং একটু রোদ পড়তেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে ভাবলে 'এক বার দেখি, সেই ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়ে তাকে ফুসলে

এই টাকাটা কোন রকমে তার হাত থেকে বের ক'রে নেবার চেষ্টা করি'।

সেই গ্রামের সে মস্ত ধনী, বড় জমীদার, অহঙ্কারে তার মাটীতে পা পড়ে না। নিজের চেয়ে কম অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ী সে কখনই মাড়ায় না। প্রত্যহ এই ব্রাহ্মণের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছে, কখনও ফিরেও দেখে নি কিন্তু টাকার এমনি প্রভাব যে আজ যেমনি তার টাকা পাবার কথা শুনেছে অমনি সব মান, অভিমান, অহঙ্কার নষ্ট ক'রে সেই গরীব ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বাড়ীর দরজায় এসে হাজির। বাড়ী ত ভাঙ্গা কুঁড়ে, তু'খানি খড়ের ঘর ও সামনে একটী দাওয়া, তাও সব শত ছিদ্র, খ'সে পড়ছে। ব্রাহ্মণ ভিক্ষে ক'রে যৎসামান্য যা পায় তাতে কোন রকমে স্বামী স্ত্রীর খোরাকটা চ'লে যায়, চালা মেরামতের খরচ আর জোটে না। দরজায় দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণের নাম ধ'রে ডাকতেই সে ছুটে বেরিয়ে এসে জমিদারকে দেখেই ত অবাক! তখনই 'আসুন, আসুন, আপনি দয়া ক'রে আজ আমার কুঁড়েতে এসেছেন, আজ আমার কি সৌভাগ্য' এই ব'লে দাওয়ায় এক খানি আসন পেতে খুব যত্ন সহকারে তাকে বসালে। তু'বেলা সামনে দিয়ে চ'লে যায় কখনও খোঁজ নেওয়া ত দূরের কথা এক বার ফিরেও চায় না, আর আজ একেবারে বাড়ী এসে হাজির দেখে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তু'জনেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তাই, ব্রাহ্মণ জমীদারের কাছে দাওয়ায় বসতেই ব্রাহ্মণী তাদের কথা বার্ত্তা শোনবার জন্যে দাওয়ার পাশের ঘরের ভেতর দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েছেলেদের এই রকম আড়ি পাতা অর্থাৎ দরজার পাশে লুকিয়ে কথা শোনা অভ্যাসটা খুব বেশী।

জমিদার বললে দেখ তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। তুমি ত রোজ ভিক্ষে কর, তা কাল থেকে এক মাস ভিক্ষে ক'রে বা যে উপায়েই হোক এক মাসের মধ্যে যা পাবে সব আমাকে দেবে আর আমি তার বদলে এখনই তোমায় নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি। —এই

নাও টাকা এনেছি ব'লে টাকার থলেটা এগিয়ে দিলে। ব্রাহ্মণ ত একেবারে অবাক! ব্যাপার কি, কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছে না। সাধারণতঃ এ সব ধরণের ব্রাহ্মণদের স্ত্রীরা একটু চালাক চতুর হয়। ব্রাহ্মণীর একটু বুদ্ধি ছিল, এই সব কথা শুনে তার মনে সন্দেহ হ'ল যে জমীদার ত কখনও এ দিকে মাড়ায় না আর আজ হঠাৎ এসেই একেবারে এক মাসের ভিক্ষের বদলে যখন নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাইছে তখন এর ভেতর নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে: ব্রাহ্মণ ত বোকা হঠাৎ এক কথাতেই রাজী হ'য়ে না বসে। এই ভেবে ভেতর থেকে ব্রাহ্মণী একটা নাম ধ'রে চিৎকার ক'রে ডাকতেই ব্রাহ্মণ তার স্ত্রীর ডাক বুঝতে পেরে, বাড়ীতে যখন এ নামে কেউ নেই তখন সম্ভবতঃ তাকেই ডাকছে, এই ভেবে ভেতরে গেল। ব্রাহ্মণী তাকে বুঝিয়ে দিলে দেখ, এর ভেতর নিশ্চয়ই কোন একটা বড় ব্যাপার আছে, তুমি যেন চট্ ক'রে রাজী হ'য়ো না, খুব সম্ভব আরও বেশী পাওয়া যাবে। জমীদার যতই বেশী দিতে চাক তুমি কিছুতেই রাজী হয়ো না, আমি দরজায় ধাক্কা মারলে বুঝবে যে এই বার রাজী হতে বলছি, তখন রাজী হবে।

ব্রাহ্মণ বাইরে আসতেই জমীদার বললে 'এই নাও টাকা তুলে নাও, কাল থেকে সকালে আগে আমার বাড়ী যাবে তার পর ভিক্ষায় বেরুবে।' ব্রাহ্মণ বললে 'না মশাই, আমরা গরীব মানুষ ভিক্ষায় যা পাই তাই ভাল; পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে কি করব বলুন।' জমিদার বললে 'আচ্ছা বাপু, তুমি ভিক্ষা ক'রে আর কতই পাবে, এক মাসে আর কত টাকাই পাবে তার চেয়ে পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে যাচ্ছ এ ভাল হ'ল না?' ব্রাহ্মণ তখনও বললে 'আজ্ঞে না, পাঁচ হাজার টাকা আমাদের দরকার নেই।' জমিদার বললে 'আচ্ছা নাও, দশ হাজার টাকা নাও।' ব্রাহ্মণ তাতেও রাজী না হওয়ায় জমিদার ক্রমশঃ পনের হাজার, কুড়ি হাজার পর্য্যন্ত উঠল। এত টাকা শুনে ব্রাহ্মণের লোভ হ'ল যে ভিক্ষে ক'রে ত খেতেও কুলোয়

না, তা কুড়ি হাজার টাকা এক সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছি মন্দ কি? কিন্তু কি করে ব্রাহ্মণী দরজায় ত ধাক্কা মারছে না, অগত্যা তাকে ফের না বলতে হ'ল। এই করতে করতে জমিদার ক্রমশঃ পঁচিশ হাজার, ত্রিশ হাজার, শেষে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত উঠল। এ দিকে জমিদার যত ওঠে, ব্রাহ্মণ দরজায় ধাক্কা না শুনতে পেয়ে ব্রাহ্মণীর ওপর ততই চটছে পাছে একেবারে সবটাই হাত ছাড়া হয়। কিন্তু কি করে ব্রাহ্মণীর হুকুমও ত অমান্য করতে পাচ্ছে না। জমিদার পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হওয়ায় ব্রাহ্মণী দরজায় ধাক্কা মারলে। ব্রাহ্মণের তখন খুব আনন্দ হয়েছে; সে বললে 'আচ্ছা, আপনি যখন এত ক'রে বলছেন বেশ তাই হবে।' জমিদার ভাবলে যাই হোক তবু ত পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ থাকবে।

তার পর থেকে রোজ সকালে ব্রাহ্মণ জমিদার বাড়ী যায় এবং জমিদার লক্ষ টাকার লোভে সরকার লোকজনের ওপর এত টাকার বিশ্বাস রাখতে না পারায় নিজেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষায় থাকত। এই ভাবে এক মাস কেটে গেল কিন্তু ভিক্ষায় বিশেষ কিছুই ত পাওয়া গেল না। মাস ছাড়িয়ে আরও তিন চার দিন হ'য়ে গেল ব্রাহ্মণ আগের মতই ভিক্ষায় সামান্য পাচ্ছে। তখন জমিদারের ভয়ানক চিন্তা হ'ল, তাই ত শেষে কি পঞ্চাশ হাজার টাকাই লোকসান হবে! এই ভেবে সেই শিবের ওপর তার ভয়ানক রাগ হ'ল, এবং তার ধারণা হল দেবতারাও তা হলে যা তা মিথ্যা ব'লেও ঠকায়। এই রাগের মাথায় সে পর দিনই সেই শিবমন্দিরে গিয়ে মন্দিরের দরজা বন্ধ দেখে আরও চ'টে গিয়ে জোরে দরজায় এক লাথি মারলে। পুরান দরজা, লাথি মারতেই যেখানে পা দিয়ে মেরেছে সেই জায়গাটা ভেঙ্গে পা ঢুকে আটকে গেল আর কিছুতেই বের করতে পারে না। মন্দির বনের পথে, মাঠের ওপর, সে দিকে বড় লোক চলাচল করে না, এবং শিব পূজা করতেও কেউ বড় আসে না কাজেই বাধ্য হয়ে জমিদারকে সেই ভাবে পা আটকে প'ড়ে থাকতে হ'ল। নাওয়া

নেই, খাওয়া নেই, এই ভাবে দু' দিন প'ড়ে রয়েছে এমন সময় শিব আবার নন্দীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন 'নন্দী! সেই ব্রাহ্মণকে এক লক্ষ টাকা দিতে বলেছিলুম দিয়েছ ত?' নন্দী বললে 'আজ্ঞে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছি আর বাকী পঞ্চাশ হাজারের জন্যে এই আসামী আটকে রেখেছি।' এই কথা শুনে জমিদার ভাবলে 'ও ঠাকুর! তুমি আমার ঘাড় দিয়েই লাখ টাকা তাকে দোয়ালে, তোমার নিজের দোবার ক্ষমতা নেই!' তখন আর কি করে, ব্রাহ্মণকে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে স্বীকার পেয়ে নিজেকে বন্ধন থেকে উদ্ধার ক'রে বাড়ী ফিরে এল।

তা দেখ, টাকাকে ভালবেসে এই জমিদার নিজের যশ, মান, অহঙ্কার, যাদের সে এত দিন বড় ক'রে ছিল তাও সব জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক মাস রোজ দুপুর পর্য্যন্ত রোদে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষেতে বেড়াতে কিছুই কষ্ট বোধ করলে না বা কোন রকম কুণ্ঠিত হ'ল না। এই ভালবাসা যদি ঘুরিয়ে গুরুর প্রতি দেওয়া যায় তা হলে তাঁর ভগবান লাভ সহজ হয়ে আসে। **সংসারের ভালবাসা চিরস্থায়ী নয় তাই সৎকে ভালবাসলে এই ভালবাসা নিত্য জিনিষের ওপর পড়ায় আপনি অনিত্য সব ছেড়ে আসে।**

দ্বিজেন গাহিল—

(১)

বোঝ না মন বুঝাইলে, তুমি পরমার্থ না চিন্তিলে।
দিনান্তে মনের প্রান্তে তুমি কালী ব'লে না ডাকিলে॥
জঠরস্থ ছিলে যোগী, জন্ম মাত্র কর্ম্ম ভোগী
ইন্দ্রিয় বশে ইন্দ্রত্ব, কোথা রবে সে ইন্দ্রত্ব।
পড়ে রবে সে ইন্দ্রত্ব দশেন্দ্রিয় অবশ হ'লে॥

(২)

দিন গেল মা হেলায় ফেলায় এবার মোরে ডাক।
সন্ধ্যা হল, এই আঁধারে আমার কাছে থাক॥
মায়া মোহের নিবিড় রাতে থেক আমার সাথে সাথে।
হারিয়ে পাছে যাই বিপথে চোখে চোখে রাখ॥
তোমার অনেক ছেলে মেয়ে, আমার মা কে আর আছে।
ক্লান্ত হিয়া জুড়াই বল, মা ছাড়া আর কার কাছে
তোমায় ভুলে ছিলাম ব'লে তুমি না কি মা যাবে চ'লে।
অবোধ ব'লে এবার আমায় দূরে ঠেলো না গো॥

(৩)

না চাহিতে তুমি সকলি দিয়েছ, তবে চাহিব কিবা আর।
মিছে চাওয়া চাওয়ি জানত সকলি, যা কিছু অভাব আমার॥
সংসারের এই বিষয় ঘূর্ণিপাকে, বুকে ক'রে তুমি রেখেছ আমাকে।
রেখেছ সদা প্রেমের পুলকে, অনন্ত প্রেমে তোমার॥
না ডাকিতে তুমি আস মোর কাছে, যেথা সেথা যাই আছ পাছে পাছে।
আলোক আঁধারে বিপদে সম্পদে সহায় তুমি আমার॥

তৃতীয় ভাগ—সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

কলিকাতা, রবিবার, ৭ই শ্রাবণ ১৩৪০ সাল;

ইং ২৩শে জুলাই ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাক্তার সাহেব, প্রফুল্ল, পুত্তু, অপূর্ব্ব, তারা পদ, শ্যাম, জিতেন, কৃষ্ণ কিশোর, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, সুধাময়, পঞ্চানন, মতি ডাক্তার, হরি মোহন, ভোলা, অভয় প্রভৃতি আছে।

জিতেন। জীবন্মুক্তেরা যখন সংসারে থেকে কাজ করেন, তখন প্রয়োজন মত অন্যায়ও ত করতে হতে পারে? যেমন অর্থ সঞ্চয়, বিষয় রক্ষার জন্য মারপিট, রাজত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ, মানুষ খুন ইত্যাদি?

ঠাকুর। দরকার মত ত করতেই হবে। সে গুলোতে বদ্ধতা অর্থাৎ ফলাফল; লাভ লোকসানের চিন্তা না থাকলেই হ'ল। বদ্ধতা থাকলেই দুঃখ আসবে। জীবন্মুক্তদের নিজের কোনও চিন্তা নেই; কেবল লোক শিক্ষার জন্যে এবং সাধারণের মঙ্গলের জন্যে তাঁরা মনকে প্রয়োজন মত নীচে নামিয়ে এনে কাজ করেন। যার ওপর যেমন ভার পড়ে তাকে সেই রকম চিন্তা রাখতে হয়, কিন্তু সেটা বদ্ধতা বা আসক্তি-জনিত চিন্তা নয়। যেমন ধর, সৎগুরুকেও শিষ্যের মঙ্গলের জন্য চিন্তা রাখতে হয়। অর্থ সঞ্চয় কর আর যাই কর নিজের সুখের জন্য বা নিজের স্বার্থের জন্য না হলেই হ'ল।

রাজত্ব করতে গিয়ে যুদ্ধ করতে দোষ নেই, যদি তাতে বদ্ধ না হও বা হার 'জিতের ওপর মন না রাখ; অর্থাৎ কর্ত্তব্য হিসাবে কার্য্য ক'রে যাও মাথায় কোন চিন্তা রেখ না। যুদ্ধে হেরে গিয়ে রাজত্ব চ'লে গেলেও মনে কোন দুঃখ বোধ করবে না বা

কোন রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি আনবে না। আর খুন করা যে বললে, স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদির ওপর যে কার্য্য হয় তাকেই খুন করা বলে, কিন্তু দণ্ডনীয় ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য বা বহু লোকের কল্যাণের জন্য যে কার্য্য করা হয় সেটা রাজসিক ধর্ম্ম। এটা না করলে আবার রাজার ও রাজত্বের অকল্যাণ হয় এবং ঠিক মত রাজধর্ম্ম পালন হয় না। যেমন হত্যাকারীকে ফাঁসি দেওয়া। রামচন্দ্র যেমন শম্বুক ও বালী বধ করেছিলেন।

ডাঃ সাহেব। নিজের জন্যই হ'ক বা পরের জন্যই হ'ক—এই ধরুন, যেমন মঠ চালাবার জন্যে, সঞ্চয় করলেই চিন্তা আসবে ত ?

ঠাকুর। হ্যাঁ সে ত বটেই। মন থাকলেই ত চিন্তা রয়েছে। তবে নিজের জন্যে চিন্তা করলেই বদ্ধ আর শুধু পরের জন্য চিন্তা করলে তাতে বদ্ধতা আসে না। ইচ্ছা করলেই অনায়াসে সব ছেড়ে দিতে পারে। অবশ্য তোমার যদি এ বোধ থাকে যে আমি করছি, আমি দাতা, আমি না করলে কেমন ক'রে হবে, সব নষ্ট হয়ে যাবে ইত্যাদি, তা হ'লেই অহঙ্কার এল এবং বদ্ধতা হ'ল। এতে দুঃখ আসবে। যেমন কোন এক রাজা আমার কাছে এসে দুঃখ করেছিল যে তার অর্থ ক'মে যাওয়ায় এখন আর প্রার্থীকে ইচ্ছা মত দান করতে পারছে না। সে খুব সৎ ব্যক্তি ও দাতা ছিল। তার কাছ থেকে বড় কেউ অমনি ফিরত না অর্থের টানাটানি হওয়ায় পূর্ব্বের মত সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না এবং অনেককে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে ব'লে ভয়ানক দুঃখ পাচ্ছে। এরই নাম বদ্ধতা। কারণ এখানে 'আমি দাতা' এই অহঙ্কারের দরুন দিতে না পারায় দুঃখ পাচ্ছে। তবে এ জিনিষটাও সাধারণের চেয়ে ঢের উচ্চ অবস্থার, কেন না নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য নয়, পরকে দিতে পারছে না ব'লে কষ্ট পাচ্ছে।

পুত্তু। এখন পরমহংসদেবকে ত অনেকে অবতার বলছেন। ধরুন কেউ যদি এ সময়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাঁকে ব'সে থাকতে দেখে তা হলে কি তার মনের অবস্থা একেবারে সেই রকম উচ্চ স্তরে উঠে পারে ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, ঠিক সেই ভাবে জাগ্রত অবস্থায় জ্যান্ত মূর্ত্তি দেখলে মন সেই স্তরে উঠে যাবে বটে, কিন্তু মনের আবার সে সহ্য করবার ক্ষমতা থাকা চাই। শুদ্ধ শরীর, শুদ্ধ মন না হ'লে এ রকম পূর্ণ দর্শন হয় না; তা না হলে পূর্ণ দর্শন ত দূরের কথা একটা শক্তি ঠিক মত সামলাবার ক্ষমতা থাকে না। এ চোখে ত দেখে না; জ্ঞানের উদয় না হলে, আসল চোখ না ফুটলে ত দেখতে পাবে না। তোমার সে দৃষ্টি নেই ব'লেই দেখতে পাচ্ছ না। আবার দর্শনের রকম আছে। সাধনা ক'রে ঠিক ঠিক তাঁর দর্শন পেয়েও সুরথ রাজা রাজত্ব চেয়ে নিলে আর বৈশ্য মোক্ষ চাইলে। যেমন একটা পরিষ্কার জলে ধোয়া ফল আর কাদা মাখান ফল—দুই একই ফল, অথচ আগুনে দিলে পরিষ্কার ফলটা চট্ ক'রে পুড়ে যাবে কিন্তু মাটি মাখান ফলটার মাটি যত ক্ষণ না পুড়ে যাচ্ছে তত ক্ষণ ফলটা পুড়বে না ঠিক থাকবে। তেমনি তোমার প্রয়োজন মত ও তোমার ভাবের ওপর দর্শন হবে। তা ছাড়া, চিত্ত খানিকটা শুদ্ধ হ'লে কতক গুলো রূপের দর্শনাদি হয় কিন্তু তা ব'লে এই দর্শন হলেই যে সব হয়ে গেল তা নয়।

কৃষ্ণ কিশোর। এইখানে যে সব রোজ আসছি তা আমরা কি চাচ্ছি? সবাই কি ভগবানকে চাচ্ছি? এমন ত অনেকে আছে ভগবানকে ডাকে না বা ভগবান বিশ্বাস করে না।

ঠাকুর। আমি ত জ্যোতিষী নই যে আমাকে পরীক্ষা করছ? তুমি কি চাচ্ছ তুমি জান না? মনের ভেতর ভোগ বাসনা, সংসার বাসনা প্রভৃতি সব পোরা আছে, সেই গুলোই নিশ্চয় চাচ্ছ। যখন এসেছিলে তখনও বাসনা কামনা ঠিক পোরা ছিল, তবে তখন সংসারে একটা ধাক্কা পেয়ে ক্ষণিকের জন্য উদাসীনতা এসেছিল এবং মনে মনে হয়েছিল হয়ত 'দূর ছাই! আর এর মধ্যে থাকব না।' কিছু দিন পরে যেই সে ধাক্কার ঘা একটু ক'মে এল, অমনি বাসনা কামনা গুলি আবার চাড়া দিয়ে উঠল, কাজেই ঠিক যে ভাব নিয়ে এসেছিলে সেই ভাব র'ইল না, বদলে গেল।

সাধারণ সংসারী বাসনা কামনা নিয়ে কিছু লাভের আশায় সাধু সঙ্গ করে। তারা ত ভগবান চায় না ; তবে সে আশা নিয়েও সৎ সঙ্গ করলে কিছু সংস্কার লেগে যায় এবং তাতে কিছু মঙ্গল হয়। যে সংসার সুখের আশায় সৎ সঙ্গ করে না, বাস্তবিকই ভগবান লাভ যার উদ্দেশ্য তার ভাবই আলাদা। সংসারের সকল জিনিষই তার বিষবৎ বোধ হয়। সে মন প্রাণ দিয়ে সঙ্গ করে ও যত ক্ষণ এখানে থাকে অন্য কোন চিন্তা মনে রাখে না এবং এই সঙ্গ ছেড়ে যেতে তার ভয়ানক দুঃখ হয়।

তোমরা যে সাধারণ নীতিবল ঠিক রেখেছ, জল নেই ঝড় নেই, রোজ নিয়ম ক'রে ঠিক আসছ, বাজে জায়গায় গিয়ে বাজে গল্পে সময় কাটাচ্ছ না, থিয়েটার বায়স্কোপে গিয়ে সময় নষ্ট না ক'রে যে রোজ এখানে আসছ, এও খুব ভাল। মনের কিছু শক্তি না হলে এ সব করতে পারতে না। এটা খুব ভাল সংস্কার, কিন্তু তাই ব'লে যে রাতারাতি শুকদেব হ'য়ে যাবে তা ভেব না। এই নীতি ঠিক বজায় রেখে চলতে পার ত ভবিষ্যতে ভাল হ'তে পারে। তা ছাড়া, তোমরা যে 'সঙ্গ করছি' 'সঙ্গ করছি' বল তা ঠিক সঙ্গ কত টুকু করছ? দেহটাই সঙ্গ করছে মন ত বেশীর ভাগ সময় অন্য চিন্তায় রয়েছে। মনের ওপর তোমার কোনও ক্ষমতা হয়নি, তত্রাচ এই রকম দেহ সঙ্গ করতে করতে মন এক দিন ফিরে যেতে পারে। সঙ্গে মনকে ঘুরিয়ে দেয়, তবে শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধ'রে বেঁচে থাকা চাই।

যত ক্ষণ সংসার বাসনা নিয়ে আসছ, যত ক্ষণ লাভের আশা রেখেছ, তত ক্ষণ মুনফা চাচ্ছ ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি খাটাচ্ছ। এ অবস্থায় যে কত দিন ঠিক ধ'রে লেগে থাকতে পারবে তা বলা বড় শক্ত ; যে কোন সময়েই ভেঙ্গে যেতে পারে। তাই তোমাদের বার বার বলি যে সঙ্গই প্রধান এবং এই নীতিটাও অন্তঃত জোর ক'রে ধ'রে থেক; কিছুতেই ছেড় না। যার একটু আনন্দ লেগে গেছে সে ত বাঁধা প'ড়ে গেছে ; সে সহজেই নীতি রক্ষা করতে পারে। লাভের আশা নিয়ে সব

সময় নীতি রক্ষা ক'রে আসতে আসতে এটা সংস্কারে দাঁড়িয়ে যায়, সংস্কার থেকে ক্রমশঃ অভ্যাসে পরিণত হয়, আর অভ্যাস করতে করতে প্রকৃতি গত হয়ে পড়ে। প্রকৃতি গত হয়ে গেলেই আনন্দ বোধ আসে এবং তখন জিনিষটা পাকা হয়ে যায়।

ভগবানকে যে একেবারে চায় না এমন লোক নেই বললেই হয়। বাইরে হয় ত দেখাচ্ছে ভগবান মানে না বা তোমাদের মত গঙ্গা নাওয়া, ফোঁটা কাটা, দেবস্থানে যাওয়া এ সব সংস্কার মানে না, কিন্তু বিপদে পড়লেই মনে মনে ভগবানকে ডাকছে। চাপ পড়লে প্রায় সকলকেই বাপ বলতে হয়; যুদ্ধের সময় দেখ ত দিন রাত ধ'রে গির্জ্জেতে উপাসনা চলছে। ও সব পরের কথা না হয় ছেড়েই দাও, নিজেরাই নিজেরটা দেখ না। তোমরাই যে কালীঘাটে মার কাছে যাও, তা কি মাকে চাও? চাও ত সংসারের সুখ, অর্থ, সম্পদ, যশ, মান প্রভৃতি; তাঁকে ঠিক চাইতে গেলে আগে নিজে তৈরী হও। সংসারে থেকে মন তৈরী কর, কিছু কঠোর অভ্যাস কর, কিছু ত্যাগ শিক্ষা কর, তবে ত তাঁর দিকে যাবার ঠিক ইচ্ছা হবে।

সাধারণতঃ সংসারে কঠোরতাকে তিন স্তরে ভাগ করা যায়—সহজ কঠিন, কঠিন ও অতি কঠিন। সহজ কঠিন হচ্ছে—অতি সাধারণ, যেমন একটু দূরে হাঁটতে কষ্ট না হওয়া, একটু গরমে বা শীতে অস্থির না হয়ে পড়া, একটু বৃষ্টিতে ভিজতে ভয় না হওয়া এবং ভিজলেও সহ্য করতে পারা, আহার নিদ্রার একটু এদিক ওদিক হলে মন খারাপ না হওয়া এবং ভেতরে কষ্ট বোধ না করা প্রভৃতি। আগে এই সব গুলো সহ্য এবং উপেক্ষা করতে অভ্যাস করতে হয়, এতে এমন কিছু কষ্ট নেই বা এতে মনকেও বেশী চঞ্চল করতে হয় না। প্রথমে অন্তঃত এই সহজ সাধ্য জিনিষ গুলো অভ্যাস করা চাই। তারপর কঠিন অর্থাৎ রসনা ও কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে কিছু [illegible] করা যেমন খাওয়া দাওয়ার কিছু সংযম অভ্যাস করা,

অর্থাৎ যেখানে সেখানে যা জুটে যায় খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা, সামান্য রোদ, তাপ, শীত, বর্ষা প্রভৃতি সহ্য করা, এবং সামান্য ব্যাধির যন্ত্রণায় অধীর না হ'য়ে পড়া; মোট কথা, দেহসুখ, আরাম প্রভৃতি যত দূর সম্ভব কমিয়ে আনা, কাহারও কথায় বা গালাগালে রাগ হ'লেও ধৈর্য্য রক্ষা ক'রে সহ্য করা ও বাহিরে কিছু মাত্র প্রকাশ না করা, কাহাকেও অপ্রিয় কথা না বলা বা কাহারও প্রাণে আঘাত না দেওয়া, এমন কি প্রয়োজন হলে অমানীকে মান দেওয়া প্রভৃতি এই সকল বিষয়ে সংযম ও নীতি রক্ষা করা চাই।

শেষে অতি কঠিন অর্থাৎ শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, স্তুতি, নিন্দা, শত্রু, মিত্র প্রভৃতি সব তাতেই সমতা জ্ঞান রক্ষা ক'রে অবাধে সব সহ্য ক'রে চলা চাই। তখন তিতিক্ষা গ্রহণ করতে হবে ও দেহ, মন এমন তৈরী করতে হবে যে সকল অবস্থায় যত রকম দুঃখ কষ্ট আসুক না কেন কিছুতেই বিচলিত হবে না, অবাধে হাসি মুখে সব সহ্য ক'রে যাবে, সর্ব্বদাই কুছ পরোয়া নেই এই ভাব ভেতরে রক্ষা করতে হবে। তবেই তুমি সাধন পথে যাবার অধিকারী হবে, তা ভিন্ন ও পথে এক পাও এগোতে পারবে না। এই সব অতি কঠিন বিষয় গুলি ঠিক মত অভ্যাস করতে পারলে তবে সংসার ছেড়ে বাহিরে বেরুবার কথা ভাবতে পারবে নচেৎ বাড়ী ছেড়ে এসে এক মিনিটও দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু যার ভালবাসা পড়েছে ও যার প্রেম লেগেছে তার আর কোন ভাবনা নেই সব আপনি হ'য়ে যায়; কারণ মনটা তখন সে এক জনকে দিয়ে ফেলেছে আর অপর কিছু মনে ধরতে পারছে না।

সুখ দুঃখ ভোগ করে মন; সেই মন অপর বস্তুতে প'ড়ে থাকায় তার সুখ, দুঃখ বোধ হয় না বা সে অন্য কোন জিনিষের প্রয়োজন বোধ করে না ও ব্যাধির যন্ত্রণায় আনন্দ রক্ষা করতে পারে। ব্যাধি জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্ম জনিত, কাজেই ওটা ত ভোগ হবেই তবে ব্যাধির যন্ত্রণায় বা প্রকৃতির অন্ত কোন ধাক্কায় সে বিচলিত হয় না। তা দেখ, এখানেও সব ত্যাগ হ'য়ে গেল বটে কিন্তু বুঝিয়ে বা চেষ্টা ক'রে

ত্যাগ করতে হয় নি। মন একটা জিনিষের ওপর জোর ক'রে লেগে থাকায় অপর বস্তু সব আপনা আপনিই ত্যাগ হ'য়ে গেল। ভাল বাসার প্রধান দুঃখ হচ্ছে বিচ্ছেদ; সাধকেরও এ দুঃখ আছে কারণ সাধক মিলনের আশায় সাধনা করছে কাজেই মিলনের বিলম্ব হ'লেই দুঃখ পায়। তবে জোর প্রেম লাগলে অর্থাৎ প্রেমে তন্ময় হয়ে গেলে আর বিচ্ছেদ বড় আসে না, তখন দূরে থাকলেও কাছে দেখতে পায়। যে ভাবেই গতি কর ত্যাগ ভিন্ন কিছু হবার যো নেই।

জিতেন। তা হলে বৃদ্ধেরা যখন সব ভোগ ক'রে, সব দেখে আসে তারাই ঠিক আসে?

ঠাকুর। দেহে বৃদ্ধ হ'লে কি হবে, সঙ্গে সঙ্গে মনেরও কর্ষণ ক'রে বৃদ্ধ অবস্থায় এসে থাকে ত আলাদা কথা, নইলে সাধারণের অনেক সময় বৃদ্ধ অবস্থায় বেশী আসক্তি থাকে। যারা সব বাসনা ত্যাগ ক'রে সংসার ছেড়ে আসে তারাই ঠিক বৃদ্ধ। বৃদ্ধ অবস্থায় ঠিক ঠিক আর্ত্ত হ'য়ে এলে আর ফিরে যেতে চায় না বটে, কিন্তু সংসারে একটু সুখ পেলেই বা পাবার একটু আশা দেখলেই তখনই সেই দিকে আবার ছুটবে।

ডাঃ সাহেব। সংসারে যখন আসক্তি রয়েছে, ছাড়তে পারছে না, তখন সেই আসক্তিই আবার কষ্ট দেয় কেন? আসক্তি যত ক্ষণ রয়েছে তত ক্ষণ ত ভাল লাগা উচিত, কিন্তু সব বিষবৎ বোধ হয় কেন?

ঠাকুর। আসক্তি রয়েছে ব'লেই ত বাঁধা রয়েছে, আর ঠিক বিষবৎ ব'লে বোধ আসে না। এক বার ঠিক বিষবৎ বোধ হলে কি আর সংসারে থাকতে পারে? আসল কথা সংসার করব না এ ভাবটাও ঠিক আসছে না তবে আসক্তিরও জোর নেই। কেউ বা চোখ বুজে সংসার করে; সংসারের সব জিনিষেই সুখ পাচ্ছে মনে করে এবং এই বোধ নিয়ে বদ্ধের মত সংসারে ডুবে প'ড়ে থাকে: আবার কেউ বা চোখ চেয়ে সংসার করে; তারা বুঝতে পারে যে সংসারে দুঃখ পাচ্ছে, অশান্তি ভোগ করছে অথচ ছাড়তেও পারছে না—এই হল

প্রবর্ত্তক অবস্থা। দুঃখ কষ্টের ঠেলায় সংসার ছেড়ে যাবার ইচ্ছা রয়েছে অথচ বেশী না হলেও, মনের অন্তরীক্ষে যে একটু সামান্য মায়ার টান রয়েছে ব'লে ছাড়তে পারছে না সেটা সে হয়ত ঠিক বুঝতে পারে না। এই অবস্থায় দুই নৌকায় পা থাকার দরুন বেশী অশান্তি ভোগ করে। কিন্তু যখন সংসার ছাড়বার জোর ইচ্ছা হবে তখন সে আর কিছুতেই সংসার করতে পারবে না এবং কেহ কিছুতেই তাকে আর সংসারে আটকে রাখতে পারবে না, সে সব ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়বেই।

বিভূতি। যে ভগবান লাভের জন্য সৎ গুরুর কাছে আসে তাকে কি নিজের পুরুষকার লাগাতে হয়, না সৎ গুরু সব ক'রে দেন, তার নিজের কিছু করতে হয় না?

ঠাকুর। দুইই দরকার; দু'য়ে মিলিয়ে কাজ হবে। তুমি যদি নিজের পুরুষকার ব'লে কিছু না রাখতে বা সম্পূর্ণ গুরুর ওপর বিশ্বাস রাখতে ও গুরুর ওপর নির্ভর করতে পারতে তা হলে আলাদা কথা। সে যদি পার ত ভাল, কিন্তু যত ক্ষণ আমিত্ব রয়েছে তত ক্ষণ পুরুষকার না লাগিয়ে থাকতে পার কই? তাই আছে, যখন পুরুষকার লাগাবেই তখন বিপরীত দিকে না লাগিয়ে এক দিকেই লাগাও। হয় দাঁড় টেন না, নৌকাকে স্রোতের টানে ছেড়ে দাও মাঝি ঠিক নিয়ে যাবে, আর যদি ভরসা না হয়, দাঁড় না টেনে থাকতে না পার ত, টানের দিকে দাঁড় টান; বিরুদ্ধ দিকে টানলে অনেক কষ্ট হবে ও দেরী হবে। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যদি গাড়ীতে উঠে বসতে পার তবে চট্ ক'রে পৌঁছে যাবে; কিন্তু যদি সব ছেড়ে গাড়ীতে উঠে বসবার ভরসা মোটেই না হয় তা হলে যদি শক্তি থাকে ত পা চালিয়ে যাও, তবে বিপরীত দিকে না গিয়ে ঠিক পথে পা চালাও। আর যদি খানিকটা নির্ভর করতে পার ত, কিছু ক্ষণ গাড়ীতে উঠে বস আবার খানিক ক্ষণ পাও চালাও। যে টুকু ভরসা ক'রে গাড়ী চড়তে পারবে সে টুকু পথ চট্ ক'রে চ'লে যাবে, আর যে টুকু পথ নিজে চলবে সে টুকু যেতে দেরী ত হবেই, অথচ গাড়ীকেও তোমার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে

ধীরে যেতে হবে। এই ভাবে গতি করতে করতে যখন গাড়ীর ওপর পূর্ণ নির্ভরতা ও বিশ্বাস এসে যাবে তখন পা চালান ছেড়ে গাড়ীতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে উঠে বসবে আর সাঁ ক'রে পৌঁছে যাবে।

মতি ডাক্তার। সংসার করছে, কাজ করছে, কারণ রজ গুণ রয়েছে। তখন দেবস্থানে বা সাধুস্থানে যাওয়া ত সত্ত্বের রজ হবে?

ঠাকুর। সত্ত্ব হচ্ছে জ্ঞান প্রকাশক, শুদ্ধ সত্ত্ব এলে পূর্ণ শান্তি আসবে। যদি বাসনা কামনা ত্যাগ করবার জন্যে, রিপুদের অধীন করবার জন্যে, সংসার ছাড়বার জন্যে দেবস্থানে বা সাধুস্থানে যাও, তা হলে সত্ত্বের রজ হবে। তা ভিন্ন, যত ক্ষণ সংসার বস্তুর মধ্যে থেকে বাসনা পূরণের জন্য দেবস্থানে যাচ্ছ, তত ক্ষণ সত্ত্ব বলা চলে না, তবে রজ তমের মধ্যে থেকে একটু সৎ সংস্কার সৎ ভাব লেগেছে এই টুকু বলা যেতে পারে মাত্র। ভেতরে বাসনা পোরা থাকলেই হয়ত এক সময় অর্থের জন্যই একটা অন্যায় ক'রে ফেলবে। তা ছাড়া কোন রকম সংসার বাসনা নিয়ে গতি করলে কত দিন যে দেবস্থানে বা সাধুস্থানে যাবার সংস্কার বজায় রাখতে পারবে তা বলা ভারি শক্ত; যে কোন সময় লাভের আশায় একটু ধাক্কা লাগলেই হয়ত যে টুকু বিশ্বাস আসছিল সে টুকুও নষ্ট হয়ে গিয়ে অবিশ্বাস আসবে ও তোমাকে আর দাঁড়াতে দেবে না।

তাই যত ক্ষণ না তোমার খুব জোর সংস্কার লাগছে, যত ক্ষণ না তুমি সব তুচ্ছ ক'রে গতি করতে পারছ এবং যত ক্ষণ না তোমার এমন অবস্থা হচ্ছে যে অর্থ প্রভৃতি সংসারীয় কোন জিনিষেরই আর তোমার প্রয়োজন বোধ নেই, অথবা যত ক্ষণ না তুমি প্রেমে ছুটে আসছ তত ক্ষণ তুমি ঠিক ভাবে যে কত দিন টেঁকে থাকতে পারবে তা বলা যায় না। সাধারণ সংসারীয় ভাবেই দেখছ ত সংসারে একটু টান থাকায় এত দুঃখ কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও, স্ত্রী পুত্রাদির ব্যবহারে জ্বালাতন পোড়াতন হ'লেও তাদের ছাড়তে পার না, এমন কি ছাড়ব বললেও তারা সেটা বিশ্বাস করে না কারণ তারা ঠিক জানে যে

'আমরা, স্ত্রী পুত্রাদি যতই খারাপ ব্যবহার করি না কেন, স্বামী স্ত্রী ছেড়ে বা পিতা পুত্রাদি ছেড়ে কিছুতেই যেতে পারবে না।' সেই রকম দেবস্থানে বা সাধুস্থানে যাওয়ার বিষয়ে অন্তঃত নীতি পালন হিসাবেও এমনি টান দেখাতে না পারলে শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য রক্ষা ক'রে দাঁড়াতে পারবে কি না বলা বড় কঠিন।

ত্যাগের পরিমাণ দেখলেই বোঝা যাবে যে কার কত দূর ভালবাসা পড়েছে। কারুর হয় ত এমন ভালবাসা পড়েছে যে, সে এক ঘণ্টা বা বড় জোর ২ ঘণ্টা সঙ্গ করতে পারে, তার পর পালায়, কেউ বা আবার চার পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সঙ্গ ক'রে আর টেঁকতে পারে না পালায় কিন্তু যার ঠিক প্রেম লেগেছে সে ছেড়ে যেতে চায় না ও পারে না। তাকে যাও বল্লেও সে ব'সে থাকে, এমন কি তাড়িয়ে দিলেও যেতে চাইবে না।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন—

ঠাকুর। সঙ্গই প্রধান, যেমন সঙ্গ করবে সেই রকম ভাব আসবে। সত্ত্বগুণীর সঙ্গ করলে সত্ত্ব গুণ বাড়বে ; সত্ত্ব গুণ হচ্ছে জ্ঞান প্রকাশক। সত্ত্বে ভগবানের দিকে গতি করায়, সৎ ভাব আনিয়ে দেয়, হিংসা, দ্বেষ, মান, অপমান ও নিজের লাভালাভ নষ্ট ক'রে দেয়। এমন কি সংসারীয় বাসনা কামনা নিয়েও সত্ত্ব গুণীর সঙ্গ করলে সেই সঙ্গ তার বাসনা কামনা কমিয়ে দিয়ে তাকে সৎ দিকে নিয়ে যায়। সংসারীয় সুখ, যশ, মান, অর্থ ইত্যাদি যার জন্যে লোকে বহু কষ্ট স্বীকার ক'রে চলে, অর্থাৎ যে সব প্রবল আকাঙ্খায় মানুষ সংসারে বদ্ধ হয়ে থাকে, সঙ্গ সে সব তুচ্ছ করিয়ে দেয়। ভগবান যাকে যশ, মান দেবেন সে ত তা পাবেই সে গুলো তার পেছন পেছন ছুটবে এবং না চাইলেও সে পাবে। • •

পাতঞ্জলে এই ভাবের কথা বলেছে, যে বস্তুর জন্য যে লালায়িত, সে বস্তু তার কাছ থেকে দূরে স'রে যায়, আর যে বস্তু যে উপেক্ষা করে সে বস্তু তার পেছনে পেছনে ছোটে।' এখানে বস্তু মানে

সংসারীয় কামনা। সঙ্গ করতে করতে মনের দুর্ব্বলতা নষ্ট হয়, মনের শক্তি বাড়ে ও সরলতা আসে, তখন তার ঠিক জ্ঞানের উদয় হতে থাকে ও বোধ আসে যে এই সংসার দুঃখময়। সে অবস্থায় সংসার করলেও ঠিক চোখ তাকিয়ে সে সংসার করতে পারে। একেবারে বদ্ধ জীবের ন্যায় অন্ধের মতন সংসার করে না। তখন সে খুব কড়া হয়ে সংসার করে এবং কাহার সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সব বোধ তার আসতে থাকে। এই সংসার ছেড়ে ঠিক ভগবান পাবার জন্যে অতি অল্প লোক সাধু সঙ্গ করে বা সৎ স্থানে যায়; সবাই প্রায় সংসার সুখের জন্যই আসে।

দেখ, সংসারে এত দুঃখ কষ্ট পেয়েও এই সংসার ধ'রে থাকার নীতিটা ত ঠিক বজায় রেখেছ, আর কোন রকম কষ্ট না ক'রে, কোন ত্যাগ স্বীকার না ক'রে সাধারণ ভাবে কিছু সময় নিয়ম ক'রে সাধুসঙ্গ করা এই নীতিটা রক্ষা করতে পার না? এটা কি এতই শক্ত? অথচ চাও যে তিনি তোমাদের সব দুঃখ কষ্ট নিবৃত্তি ক'রে দেবেন! পুরাকালে গুরু গৃহে শিক্ষা করবার সময় ভিক্ষা করা, কাট সংগ্রহ ক'রে আনা, রান্না করা, বাসন মাজা প্রভৃতি এত কঠোরতা ক'রে গুরুসেবা করত এবং তারপর নিজে শাস্ত্র অধ্যয়ন করত। আর এখানে ত বিন্দুমাত্র কঠোরের জিনিষ নেই, সমস্ত সুখ সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে, এমন কি এত সুখের জিনিষ রয়েছে যে সে সব দেখে অপর সংসারীদের পর্য্যন্ত হিংসা হয়; তত্রাচ যদি তোমরা শুধু নিয়ম ক'রে কিছু সময় এখানে আসা এই নীতি টুকু পর্য্যন্ত রাখতে না পার, তা হ'লে এক বার বুঝে দেখ তোমাদের মন কত দুর্ব্বল ও তোমরা কোথায় প'ড়ে আছ!

অন্ততঃ এই টুকু মনে রোক নেবে যে অল্প প্রয়োজনে বা অপরকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে নীতি কিছুতেই ভাঙ্গবে না। মোট কথা অপ্রয়োজনে নীতি ত ভাঙ্গবেই না, বিশেষ ক্ষতি হয় ত বা একান্ত এড়াতে না পার ত, না হয় প্রয়োজন বা অতি প্রয়োজন হলে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম করতে পার। অপ্রয়োজন অর্থে, সাধারণ

বাজে কাজ বা বাজে গল্প করা, তাস, পাশা খেলা, থিয়েটার বা বায়স্কোপ দেখা, ঘুমিয়ে সময় কাটান ইত্যাদি। এ সব গুলো ত সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছার অধীন, কাজেই এর কোনটার জন্যে নীতি ভঙ্গ করা একেবারেই উচিত নয়। প্রয়োজন অর্থে সংসারীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ যা দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হতে পারে—যেমন নিজের বা বাড়ীর কারুর ব্যাধি, বা হঠাৎ কোন আত্মীয় বা অতিথি এসে পড়া। তাও এখানে দেখ, সামান্য ব্যাধিতে ডাক্তারের ব্যবস্থা ও রোগীর পরিচর্য্যা ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে আসা যেতে পারে। আবার বাড়ীতে উপযুক্ত লোক থাকলে তার ওপর আত্মীয় বা অতিথির দেখা শুনার ভার দিয়ে চ'লে আসা যেতে পারে। কাজেই এ সব ক্ষেত্রে নীতি ভাঙ্গা উচিত নয়। অতি প্রয়োজন হচ্ছে—হয় ত বাড়ীতে কেউ কঠিন পীড়ায় প্রায় মৃত্যুমুখে প'ড়ে রয়েছে বা এমন কোন বিশেষ জরুরী কাজ পড়ল যার জন্যে তোমার নিজের উপস্থিত থাকা ছাড়া অন্য কোন গতি নেই।

তাও সংসারে মায়ার ভেতর রয়েছ ব'লে এ গুলো উপেক্ষা করতে পার না, কিন্তু যে আত্মীয়, স্বজন, লোক লজ্জা কিছুকেই ভয় করে না, যশ, মান প্রভৃতিকে গ্রাহ্য করে না, সে এ সব গুলি অনায়াসে উপেক্ষা ক'রে সকল সময়ই নীতি রক্ষা করতে পারে। তখনই বোঝা যাবে যে ভগবানের দিকে তার ঠিক মন আসছে এবং সে যথার্থ ত্যাগের পথে আসছে, কারণ ত্যাগীর এমন কোন কাজ থাকতে পারে না যা দ্বারা তার কোন নীতি ভঙ্গ হতে পারে। তবে সাধারণ সৎ নীতি ঠিক নিয়ম ক'রে মেনে চললে জন্ম জন্মান্তরের অনেক কর্ম্ম ক্ষয় হয় ও ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়। তা ভিন্ন, জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্ম যে মুহূর্ত্ত মধ্যেই উবে যাবে ও তুমি রাতারাতি বুদ্ধ কি চৈতন্য হয়ে পড়বে এটা ত সম্ভব নয়। ধৈর্য্য রেখে গতি করতে করতে মনের শক্তি বাড়লে ক্রমশঃ সহজ কঠিন, তারপর কঠিন এবং সব শেষে অতি কঠিন কঠোরতা পর্য্যন্ত অনায়াসে সহ্য করতে পারবে এবং তখনই সাধন পথের অধিকারী হবে।

আবার সঙ্গে ভালবাসা বাড়তে বাড়তে প্রেম এসে পড়লে, আপনি তাঁর দিকে গতি করতে থাকে, তখন আর জোর ক'রে বলতে বা বোঝাতে হয় না। তোমরা সংসারী তোমাদের সঙ্গ ছাড়া গতি নেই; সঙ্গই তোমাদের এক মাত্র উপায়। আসল কথা প্রয়োজন বোধ করা; যার যে জিনিষের জন্য যত প্রয়োজন বোধ সে সেই জিনিষের জন্য তত কঠোরতা অনায়াসে সহ্য করতে পারে। তার সাক্ষ্যি দেখ না, কই অফিসের বেলা ত সহজে নীতি ভঙ্গ কর না। সেখানে টাকার প্রয়োজন আছে ব'লে সহজ কঠোরতার জন্যে ত অফিস কামাই করই না; আবার চাকরীর বেশী প্রয়োজন বোধ কর ত কঠোরতা পর্য্যন্তও সহ্য ক'রে অফিস ঠিক চালাও। সেই রকম সৎ সঙ্গের নীতি পালনের জন্যে অন্তঃত সে টুকু কঠোরতাও সহ্য করা দরকার।

আবার কাহারও বা এত অভিমান ও আমিত্ব আছে যে এখানে এসে অপর প্রকৃতির ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে এখানে আসা বন্ধ ক'রে দিলে অথচ সেই হয়ত সংসারের যে কত প্রকৃতির কত রকম ধাক্কা অম্লান বদনে সহ্য ক'রে প'ড়ে রয়েছে তার ইতি নেই। তা ছাড়া, এটা ভাবা উচিত যে এখানে যখন আমার কাছে আসছ, তখন কোন প্রকৃতির তোমার ক্ষতি করবার সাধ্য নেই। তোমারও আমাকে ভালবেসে তাদের ব্যবহার সহ্য করা উচিত, তা না হলে মনের শক্তিও কখন বাড়বে না এবং কখনও উপেক্ষা করতে শিখবে না। আমি ত বলি এইটাই খুব সুযোগের বিষয় এবং মন তৈরী করবার সহজ উপায়, কারণ বিষদন্ত হীন সর্পের সঙ্গে ব্যবহার করলে এবং তার দংশনকে উপেক্ষা করতে শিখলে তোমার সাপের ভয় অনেক ক'মে যাবে। তখন তুমি সংসারীয় লোকের কথায় আর ভ্রূক্ষেপ করবে না, সহজে উপেক্ষা করতে শিখবে এবং তোমার অভিমান নষ্ট হবে ও তুমি শান্তি পাবে। মোট কথা যে সঙ্গ করা নীতি ঠিক রেখেছে সে জয় লাভ করবেই।

বুদ্ধ ব'লে গেছেন 'যত ক্ষণ যথা যোগ্যকে সম্মান করবে, যত ক্ষণ গুরু জনকে ভক্তি করবে, যত ক্ষণ সাধুকে উপেক্ষা করবে না ও ঋষি বাক্য গুরুবাক্য পালন করবে তত ক্ষণ জয় লাভ করবে।' সংসারে ত বহু সময় বহু বাজে কাজে কাটাও, তা থেকে অন্তঃত কিছু সময় বের ক'রে মন দিয়ে নিয়মিত সাধু সঙ্গ কর, তার কথা শোন, এবং যে যতই বলুক না কেন সে সময় অন্য কোন দিকে মন দিও না, তবেই মনকে বাগিয়ে আনতে পারবে, নচেত মনকে কোন সময়ের জন্যে কোন অবস্থাতে বিশ্বাস করতে পারবে না। বিশেষতঃ যত ক্ষণ সংসারের বাসনার মধ্যে রয়েছ, তত ক্ষণ মনকে গুরুর চরণে ফেলে রাখবার চেষ্টা করবে। খোঁটা ধ'রে চল, নইলে কখন যে অলক্ষিতে তোমার মন তোমাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে, তা তুমি আগে বুঝতেই পারবে না। ত্যাগ না এলে মনকে কোন অবস্থায় বিশ্বাস করবে না।

অনেক সময় ধারণা হয় যে আমার মন ত তৈরী হয়ে গেছে, গুরুতে আমার বিশ্বাস আছে, আমার আবার ভয় কি?' কিন্তু এই বিশ্বাসটা যে কত দূর স্থায়ী তার পরীক্ষা হচ্ছে দুঃখে, কষ্টে ও প্রলোভনের হাতে প'ড়ে কত ক্ষণ ঠিক বিশ্বাস রেখে দাঁড়াতে পার। এই খানে ঠাকুর সৎ গুরু ও রাজ পুত্রের বিশ্বাসের গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ১ম ভাগ ১৮৮ পৃষ্ঠা) এখানে গুরুর বারণ করা সত্ত্বেও রাজপুত্রের মনে স্থির ধারণা যে তার মন তৈরী হয়ে গেছে, তার গুরুতে বিশ্বাস আছে তার আর কি হবে? তাই বন্ধুর সঙ্গে বাগানের আনন্দ উপভোগ করতে চ'লে গেল। যার সঙ্গে তোমার যত বন্ধুত্ব, সে তত তার ভাবে তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে। এই হচ্ছে ভালবাসার লক্ষণ। তা দেখ, গুরুতে এখনও কিছু বিশ্বাস আছে ব'লে প্রথম দরজায় মদ্য পান করলে না ও দ্বিতীয় দরজায় গোমাংস খেলে না। তৃতীয় দরজায় ব্রাহ্মণ হত্যার বেলা তখনও গুরুর ওপর কিছু বিশ্বাস ঠিক আছে ব'লে জ্ঞান চক্ষু ঠিক রয়েছে

কাজেই গ্রহ গণ ও রিপু গণ কিছু করতে পারে নি। সে তখন বলছে "কি! আমি ব্রাহ্মণ হত্যা করব? যে ব্রাহ্মণ বর্ণ গুরু যে ব্রাহ্মণ নিজের স্বার্থ নষ্ট ক'রে ত্যাগ নীতির ওপর সমাজ গঠন করেছেন, সভ্যতা স্থাপন করেছেন সেই ব্রাহ্মণকে হত্যা করব?"

হিন্দুদের সভ্যতা হচ্ছে বাসনা ত্যাগ করা এবং রিপু অধীন করা, কারণ বাসনা ত্যাগে লোভ নষ্ট হয় তখন আর তার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ করা সম্ভব হয় না। তাই এই সব গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে সমাজের নেতা করেছিল, যাতে কারুর ওপর কোন রকম অন্যায় না হয়ে ঠিক ন্যায়ের ওপর সমাজ শাসন চলে। অপর জাতির সভ্যতা হচ্ছে বাসনা পূরণ কর, লোভ বৃদ্ধি কর, আর খুব ভোগ কর। আজ কাল এই নীতির ওপর আমাদের সমাজ চলতে চাচ্ছে ব'লে এত দুঃখ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

তার পর চতুর্থ দরজায় গিয়ে বারঙ্গনার নৃত্য গীতে মুগ্ধ হয়ে ভুলে যাওয়ায় যেই মন নেবে গেছে অমনি জ্ঞান লোপ হয়েছে ও অজ্ঞান ছেয়ে ফেলেছে এবং আগেকার সব যুক্তি ভুল হ'য়ে গেছে তখন অজ্ঞানের চোখে অজ্ঞানতাকেই ন্যায় ব'লে মনে হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী প্রমানও সব আসছে। তখন সেই রাজপুত্রই আবার প্রথম দরজায় গিয়ে মদ্য পান করতে আর কুণ্ঠিত হ'ল না। মদ খেতেই যে টুকু জ্ঞান ছিল তাও গেল। সেই জন্যে শাস্ত্রে মদ ছুঁতে পর্য্যন্ত নিষেধ করেছে। এত কড়া বেড় দেওয়া আছে, কারণ এর এত বড় জোর আকর্ষণ যে তার টানে প'ড়ে নিজেকে সামলাতে পারবে না।

সেই জন্যে বলেছে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপু গণ যত ক্ষণ না অধীন হয়, তত ক্ষণ মনকে কোন অবস্থায় বিশ্বাস ক'রো না, সর্ব্বদা গুরুর চরণে ফেলে রাখতে চেষ্টা করবে এবং যত টুকু প্রয়োজন, যত টুকু না করলে নয় কেবল সেই টুকু সময় সংসারে দিয়ে বাকী সব সময় সঙ্গ করবে। এই সংসারের প্রয়োজন আবার জ্ঞানের ওপর;

জ্ঞানীর প্রয়োজনের মাপ আছে কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় প্রয়োজনের মাপও নেই, তার ইতিও নেই। তোমরা সাধারণ সংসারী জীব, তাই গুরুর আদেশ মত তোমাদের চলা দরকার। তিনিই তোমার অবস্থা অনুযায়ী কত টুকু তোমার সংসারে প্রয়োজন এবং কি ভাবে কি কি নীতি পালন ক'রে চলতে হবে সব তোমাকে ব'লে দেবেন।

গুরুতে যার ঠিক বিশ্বাস আছে তার আর কোনও চিন্তা নেই। গুরু সঙ্গ করতে করতে ভগবৎ আনন্দ কিছু উপলব্ধি হ'লে বুঝবে যে সংসারে যেটাকে আনন্দ ব'লে তার পেছনে ছুটোছুটি কর সেটা কিছুই নয়। যতই বুদ্ধি খাটিয়ে সুখের অনুসন্ধান করছ ততই দুঃখের হাতে গিয়ে পড়ছ। বাসনার নিবৃত্তি হলেই সুখ, তখন ঠিক আনন্দ পাবে। সৎ গুরু ভালবেসে আপন ক'রে নিয়ে কাজ করেন, তখন অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম্ম যা কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারনি তাও হ'য়ে যায়। কিন্তু যত ক্ষণ গুরুকে না ভালবেসে, তাঁর গুণের ওপর এবং নিজের স্বার্থের ওপর কিছু আশা রেখে তাঁকে ভালবাস, তত ক্ষণ নিজের লাভ না হ'লে তোমার বিচারে তাঁর গুণের ওপর দোষারোপ ক'রে ফেল ও তাঁর ওপর যে বিশ্বাস ছিল সেটা নষ্ট করে অবিশ্বাস এনে ফেল। তাই কোন রকম বিচার না রেখে সর্ব্বদা গুরুর সঙ্গ করবে, তা হলে মনের ময়লা আপনি সব কেটে যাবে ও বিশ্বাস স্থির থাকবে। তাই পরমহংসদেব সকলকে আপন ক'রে নিয়ে নিজের কাছে ডাকতেন, আর তারাও তাঁর আপনত্বে তাঁর কাছে না গিয়ে থাকতে পারত না।

দ্বিজেন গাহিল

(১)

জান না রে মন পরম কারণ শ্যামা কভু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়॥

কভু বাঁধে চূড়া কভু পরে ধড়া ময়ুর পুচ্ছ শোভিছে তায়।
কখন পার্ব্বতী কখন শ্রীমতী কখন রামের জানকী হয়॥
যে রূপে যে জন করয়ে ভজন সেই রূপে তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে কমল মাঝে কমল হয় উদয়॥

(২)

মজল আমার মন ভ্রমরা শ্যামা (কালী) পদ নীল কমলে।
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হ'ল কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কাল ভ্রমর কাল কালোয় কাল মিশে গেল।
পঞ্চ তত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলাকান্তের মনে মা আশা পূর্ণ এত দিনে।
সুখ দুঃখ সমান হ'ল আনন্দ সাগর উথলে॥

তৃতীয় ভাগ—অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

কলিকাতা, মঙ্গলবার ৯ই শ্রাবণ ১৩৪০ সাল ;
ইং ২৫শে জুলাই ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাঃ সাহেব, প্রফুল্ল, অপূর্ব্ব, জিতেন, জ্ঞান, কালু, পুতু, কেষ্ট, হরিদাস, সুধাময়, পঞ্চানন, তারাপদ, কৃষ্ণ কিশোর, অজয়, মতি (ডাক্তার), ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, দ্বিজেন সরকার, ভোলা ও অভয় আছে।

জিতেন। সংসারে যাদের সঙ্গে ব্যবহার রাখতে হয় তাদের সঙ্গে যদি মিল না থাকে বা তাদের যদি ভাল না লাগে, তা হলে তাদের সঙ্গে ব্যবহার না রাখাই ভাল ত ?

ঠাকুর। আগে দেখ ব্যবহার বলতে কি বোঝায়। তুমি যার সঙ্গে ব্যবহার রাখছ তার দোষ গুলি তোমায় ধৈর্য্য রেখে সহ্য করতে হবে। দোষ গুণ তার প্রকৃতি অনুযায়ী ; তাকে ভাল কথা ব'লে উপদেশ দিয়ে তার প্রকৃতি বদলান পর্য্যন্ত ধৈর্য্য রেখে তার দোষ গুলি সব সহ্য ক'রে যেতে হবে, নইলে পদে পদে অশান্তি। আবার তারও পক্ষে তেমনি তোমার সঙ্গে ব্যবহার রাখতে গেলে ধৈর্য্য রক্ষা ক'রে তোমার দোষ গুণ সব সহ্য করতে হবে। এই হলে তবে দু'জনের মধ্যে ব্যবহার থাকবে, আর এই ভাবে ঠিক ব্যবহার রাখতে গিয়েও যদি দেখ যে দু'জনে মিল হচ্ছেনা, ও পরস্পর পরস্পরকে ভাল লাগছে না, তা হলে পদে পদে অশান্তি ভোগ করার চেয়ে দু'জনের ভেতর ব্যবহার যত দূর সম্ভব কম রাখাই ভাল।

প্রফুল্ল। যদি এক জন ধৈর্য্য রক্ষা ক'রে চলতে চেষ্টা করে, কিন্তু অপরটী যদি সে রকম না হয় ?

ঠাকুর। তুমি ধৈর্য্য রক্ষা করলে তোমার অশান্তি ভোগ খুব কম হল বটে, কিন্তু তার ত অশান্তি ঠিক রইল। কাজেই সেখানে তার সঙ্গে বেশী ব্যবহার না রাখাই খুব ভাল।

পুত্তু। সংসারে ব্যবসার খাতিরে উপস্থিত কোন দরকার না থাকলেও ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য অনেক সময় অনেক ভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে বাধ্য হয়ে ব্যবহার রাখতে হয় ও তাদের ভাবে চলতে হয়। মনে জোর ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় নীতিও ঠিক রাখতে পারা যায় না।

ঠাকুর। যে দিকে যাবে, যে বস্তু লাভ করতে হবে, সে দিকে মন বেশী দিতেই হবে। যদি অর্থকে বড় ক'রে থাক ত যে যে উপায়ে বেশী অর্থ আসে, সেই পথে সেই ভাবে কিছু চলতেই হবে। আর যদি ধর্ম্মকে বড় কর ও যদি তোমার মনের সে রকম শক্তি থাকে যে, টাকা আসুক বা না আসুক নিজের ভাব ঠিক বজায় রাখতেই হবে তখন ও সবের দিকে তোমার নজর থাকবে না ও তুমি কিছুই গ্রাহ্য করবে না। ব্যবসা চালাতে গেলে মৌখিক অন্তঃত তাদের জানাতে হবে যে তুমি তাদের ভাবে চলছ এবং তোমাকে সেই ব্যবসার নীতি পদ্ধতি ঠিক বজায় রেখে চলতে হবে। তবে মূলে ধর্ম্ম ভাব যতটা পারবে রক্ষা করবার চেষ্টা করবে এবং যতটা পার কিছু সময় নিয়ম ক'রে ভগবানকে দেবে। **তাঁতে ঠিক মন রেখে যে দিকেই চল মঙ্গল হবে।** অবশ্য প্রারব্ধে না থাকলেও যে মস্ত লাভ হবে তা নয়, তবে যেটুকু প্রারব্ধ অনুযায়ী প্রাপ্য সে টুকুরও সুবিধা হবে।

কেষ্ট। সংসারে আমরা প্রাণটাকেই বড় করি। কারণ প্রাণটাই ভগবান। এই প্রাণ না থাকলে ত সব জড়।

ঠাকুর। তাই কি ঠিক কর? মানুষ ম'রে গেলে কি প্রাণটার জন্যে কাঁদ, না রূপের জন্যে অর্থাৎ স্থূল দেহটার জন্যে কাঁদ? আর শ্রাদ্ধ করবার সময় মনে মনে তার প্রাণ চিন্তা কর, না রূপ চিন্তা ক'রে কার্য্য কর? সংসারে মায়াটা প্রাণের ওপর সম্পূর্ণ পড়ে না, কারণ প্রাণ ত

দেখতে পাও না। মায়াটা দেহের ওপরই পড়ে এবং সেই রূপটা ঠিক রাখতে গেলে প্রাণের দরকার হয় ব'লেই প্রাণকে এত রাখতে চাও। কারণ তুমি জান যে প্রাণ চ'লে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে এই দেহেরও ধ্বংস হয়ে যাবে। সেইজন্য রূপটাকে চাও ব'লে যাতে প্রাণ থাকে তার কামনা কর। প্রাণ থেকে চৈতন্য কিন্তু তুমি চৈতন্যময় রূপেই মুগ্ধ। প্রাণ না থাকলেও যদি এই চৈতন্যময় রূপ ঠিক রাখা যেত তাহলে আর তুমি প্রাণের জন্যে এত ব্যস্ত হতে না। অনেক সময় প্রাণ থাকা সত্ত্বেও হয়ত রোগে অচৈতন্য বা উন্মাদ অবস্থায় চৈতন্যের বিকৃতি হলে তখন আর তোমার সে রূপটাও তত ভাল লাগে না।

কালু। সকল প্রাণীই ত ভগবান, তাহলে সংসারে সকলের সেবা করা মানেই ত ভগবানকে সেবা করা ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তা হতে পারে, কিন্তু তোমার সে বোধ কই ? সকলেই যে ভগবান এটা কি তোমার একটুও বোধ আছে ? শুনে বা বই প'ড়ে মুখে বলছ বটে যে জীব মাত্রেই ভগবান, কিন্তু এর কোন উপলব্ধি ত নেইই অথচ ভগবান বলতে যে কি বোঝায় বা ভগবানের কি কি লক্ষণ, তাও মোটে জান না যে বিচার ক'রে মিলিয়ে নিয়ে ধারণা করবে। আর তোমার সে বোধ ঠিক থাকে ত বাহিরে যাবার প্রয়োজন কি ? তুমি নিজেকে ধর, তুমিও ত ভগবান। তুমি যখন খাও তখন কি মনে করতে পার ভগবানকেই খাওয়াচ্ছ ? ভগবানের উদ্দেশে দেব দেবীর ভোগ দিয়ে যতটা তৃপ্তি পাও, নিজেকে খাইয়ে কি ঠিক সেই রকম তৃপ্তি পাও ? সাধারণ ত দূরের কথা, সদ্‌গুরু, যিনি সেই সচ্চিদানন্দের অংশ, যিনি তোমাদের চেয়ে কত শক্তিমান, যাঁর কিছু কিছু অসাধারণ শক্তির পরিচয় ত তোমরা নিত্য চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ এবং কেহ কেহ হয়ত ভেতরেও কিছু কিছু উপলব্ধি করছ, তত্রাচ তাঁকেই কি তোমরা ভগবান ব'লে ঠিক ভাবতে পার, না তাঁর ওপর ঠিক সেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পার ? কাজেই তোমার যখন সে বোধ ঠিক নেই তখন মনের তৃপ্তির জন্যে দেব দেবীর মূর্ত্তিকে ধরতে হবে।

জিতেন। যেই কেউ দীক্ষা নিলে অমনি কি তার কর্ম্ম সব গুরুর ওপর এসে যায় ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, শিষ্য হ'লেই যোগ হ'ল এবং কর্ম্ম আসতে আরম্ভ করে। তা ছাড়া স্পর্শ করলে কর্ম্ম আসে, ও চক্ষুর দৃষ্টিতে কর্ম্ম আসে।

জিতেন। কর্ম্ম জিনিষটা ঠিক কি ? কি ভাবে এত জমছে ?

ঠাকুর। তুমি যে নিত্য কর্ম্ম ক'রে যাচ্ছ তার ফল হবে না ? যার যেমন কাজ, সেই অনুযায়ী তার কতক গুলি ধর্ম্ম আছে, এটা হল ব্যবহারিক ধর্ম্ম। যেমন রাজত্ব করতে গেলে যুদ্ধ করা রাজধর্ম্ম, সেখানে মানুষ মারা দোষের হয় না ; কিন্তু তুমি যদি স্বার্থের জন্যে বা রাগের মাথায় কাহাকেও মেরে ফেল সেটা গুরুতর অপরাধ হবে। তাও পুরাকালে পরস্পরের বল পরীক্ষা বা অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্যে ছাড়া শুধু হিংসা পরবশ হয়ে স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে যুদ্ধ কম হত। এ রকম অন্যায় যুদ্ধ করলে বা বাস্তবিক অন্যায় অত্যাচার করলে রাজাকেও তার ফল ভোগ করতে হয়। কিন্তু রাজত্ব করা ত আর শুকদেবের মত সাত্ত্বিক ধর্ম্ম পালন করা নয়, এ রাজসিক ধর্ম্ম, রাজসিক ভাবে কিছু কামনা, স্বার্থ ইত্যাদি থাকবেই অতএব কিছু অন্যায় অত্যাচার হবেই। সকলে ত রামচন্দ্রের মত রাজা হয়ে রাজত্ব করতে পারবে না।

রামচন্দ্র অবতার রূপে এসে শিক্ষা দিয়ে গেলেন যে কি ভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে রাজত্ব করতে ও প্রজা প্রতিপালন করতে হয় যাতে অপর রাজারা সেই আদর্শ মনে রেখে রাজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে পারে। তা ছাড়া দেখতে হবে যে তোমার মতে যেটা অন্যায় বলছ সেটা রাজনীতি হিসাবে যথার্থ অন্যায় কি না। এই দেখ, রামচন্দ্রকেই বালী বধ, শম্বুক বধ, সীতার বনবাস প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ লোক কত দোষ দিয়ে থাকে কিন্তু দণ্ড নীতি, ভেদ নীতি প্রভৃতি তোমার আমার কাছে অন্যায় বোধ হলেও রাজনীতির অন্তর্গত। কাজেই এর জন্যে তোমরা দুঃখ পাচ্ছ ব'লে যে রাজা দোষ করছে বলতে হবে তা ত নয়। তবে রাজা

যদি যথার্থ অন্যায় করে তাহলে তাকে বেশী সাজা ভোগ করতে হবে। কারণ যার ওপর অত্যাচার করলে, সে স্বতঃই তার অধীন ও তার তুলনায় শক্তিহীন ; সে ত রাজার সঙ্গে পারবে না বরং রাজারই দেখা উচিত যাতে দুর্ব্বল প্রজাদের ওপর কোন রকম অন্যায় অত্যাচার না হয়। অত্যাচারী রাজা এই দুই অপরাধে অপরাধী হয় এবং এই দু'টীর জন্যেই তাকে সাজা ভোগ করতে হবে।

মোট কথা অন্যায় ক'রে কাহারও মনে ব্যথা দিলে বেশী কর্ম্ম সঞ্চয় হয়। তাই বুদ্ধের কথায় আছে যারা দুর্ব্বল, নিরীহ ও গরীব তারা তোমার অত্যাচারের কিছুই করতে পারে না বটে কিন্তু তাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস তোমাকে নুনের হাঁড়ির মত ধীরে ধীরে জরিয়ে দেবে। আবার চোর বা দোষী ব্যক্তি রাজদণ্ড পেয়ে প্রাণে খুব আঘাত পেলেও সেটা তার পক্ষে যথার্থ ব্যথা হ'ল না কারণ সে ত নিজেই অন্যায়কারী। সংসারে ও কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময় মিথ্যা কথা বলতে হয়, তবে যদি তার দ্বারা অপরের কোন ক্ষতি না হয়, সেটা তত দোষের হয় না, কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য বা অপরের যথার্থ ক্ষতি হলে কর্ম্ম আসবেই। কাম, ক্রোধ, লোভের ওপরই সব কর্ম্ম আসে কারণ এদের দ্বারাই যত কুকর্ম্ম হয়। রিপুরা অধীন হলে আর বড় কর্ম্ম সঞ্চয় হয় না।

প্রফুল্ল। অনেক সময় ক্রোধের বশে অপরের মনে ব্যথা দিলে সে দুঃখ পাচ্ছে দেখে মনে যদি আনন্দ হয় তা হলে কি আরও বেশী কর্ম্ম আসবে ?

ঠাকুর। ক্রোধটা ত আর তোমার স্বাভাবিক অবস্থা নয় এবং সব সময় থাকে না। ক্ষণিকের জন্য এই রকম ভাব আসতে পারে কিন্তু ক্রোধ ক'মে গেলে তারই হয়ত আবার অনুতাপ আসবে যে সে কেন ওরকম করেছিল। তা ছাড়া ক্রোধের বশে কাহাকেও দুঃখ দিয়ে আনন্দ পাওয়াটা খুব কম হয়, কারণ দুঃখ দিয়ে আনন্দ পেতে গেলেই পূর্ব্ব থেকে চিন্তা ক'রে মনে ঠিক করা চাই যে একে এই ভাবে দুঃখ দিতে হবে। তখন সেটা আর ক্ষণিক উত্তেজনার

ফলে হঠাৎ ক্রোধের বশে না হয়ে হিংসা বা স্বার্থ জনিত হয়ে দাঁড়ায়। এ রকম মনের খুব নীচতা থাকলে হিংসা বা স্বার্থের বশে স্থির প্রকৃতিতে অপরকে দুঃখ দিয়ে আনন্দ করলে বেশী কর্ম্ম আসবেই। কারণ ক্রোধ অপেক্ষা হিংসাটা আরও বেশী খারাপ। ক্রোধে ক্ষণিক উত্তেজনায় ও অজ্ঞানতায় অন্যায় ক'রে ফেলে, আর হিংসায় স্থির ভাবে বিনা উত্তেজনায় 'অপরের অনিষ্ট করব' ব'লে মনে ঠিক ক'রে অপকার করে ও অপকার ক'রে আনন্দ পায়। এরা তম গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি।

কৃষ্ণ কিশোর। বিবাহ হলে স্ত্রীর কর্ম্ম স্বামীর ওপর আসে আর তার থেকে গুরুর ওপর আসে ত? তা হলে স্ত্রীর ত আপনা আপনি কর্ম্ম ক্ষয় হয়ে যায়?

ঠাকুর। তা কিছু হয় বই কি। স্ত্রীর কিছু কর্ম্ম স্বামীর ওপর আসে কিন্তু স্বামীর ত আবার বেশী নেবার শক্তি নেই। শুধু স্ত্রী কেন, যাদের যাদের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, যারা দুঃখ পেলে তোমার দুঃখ আসে তাদের কর্ম্মও কিছু কিছু আসে।

ভোলা। সাধু হলেই কি অপরের কর্ম্ম ঘাড়ে নিতে পারে?

ঠাকুর। তা কি পারে? সে শক্তি থাকা চাই। তা ছাড়া, যে সাধনা দ্বারা মনকে জয় করবার চেষ্টা করছে সেও ত সাধু। তা ব'লে সে কি কর্ম্ম নিতে পারবে? গীতায় আছে অতি দুরাচারীও যদি ঠিক ভাবে তাঁকে ডাকে সেও সাধু হয়ে যায়।

অতি দুরাচার যেই, সেও মোরে ধরি।
'সর্ব্ব দেব ময় আমি' হেন জ্ঞান করি॥
যদ্যপি ভজন করে অভেদ ভাবিয়া।
সেও সাধু সুনিশ্চয় সুদৃঢ় বলিয়া॥

সংসারের মায়া, বাসনা প্রভৃতি মানুষের ভেতর ভেদ জ্ঞান আনায়, তাই এদের অধীন করলেই আর ভেদ জ্ঞান থাকে না, তখন সে ছাড়া আর কিছুই নেই এই অভেদ জ্ঞান আসে। দুটো

বোধ থাকলেই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হবে, এবং এক হলেই চিত্ত স্থির হয়। যে ভক্ত সর্ব্ব বাসুদেব ময় অর্থাৎ সবই তিনি এই ভাব নিয়ে এবং অভেদ জ্ঞানে আমার ভজনা করে সেও সাধু। তার কিন্তু তখনও সবই তিনি এই জ্ঞান বা ঠিক অভেদ জ্ঞান আসেনি, এই ভাব ধ'রে গতি করছে মাত্র। সিদ্ধিলাভ করলে তখন এই সব ভাব ঠিক ঠিক আসবে।

ভক্ত এই অবস্থায় নিজেকে এক আর বাকী সব ভগবান ব'লে ধ'রে এক মনে ভজন করে, কিন্তু জ্ঞানী আর দুই বোধ রাখতে চায় না। তার কাছে সবই তিনি এবং তিনিই আমি এই অভেদ ভাব; এবং সে প্রথম থেকে এই ধারণা ক'রে নিয়ে গতি করে। যে ভাবেই হোক সিদ্ধিলাভ ক'রে নির্ব্বিকল্প সমাধি বা মহাভাব থেকে নেমে এসে তাঁর আদেশ পেয়ে লোক শিক্ষার ভার পেলে তবে শিষ্যের এবং অপরের কর্ম্ম নিতে পারে। সাধক কিম্বা শুধু সিদ্ধ সাধু অপরের কর্ম্ম নিতে পারে না এবং নিতে চায়ও না। তাই সিদ্ধ সাধু তার নিজের ভাবের মত দুটী একটীকে বেছে নিয়ে গতি করাতে পারে, কিন্তু সব প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার রেখে তাদের কর্ম্ম ঘাড়ে নিয়ে গতি করাতে পারবে না।

জিতেন। দেব স্থানে গিয়ে জপ, ধ্যান করা নিয়ম। এই করলে তাতে কি ভাবে কর্ম্ম ক্ষয় হয়?

ঠাকুর। জপ, ধ্যান কর কেন? একটা কিছু স্বার্থ আছেই। হয় সংসার সুখ চাইছ, নয় দুঃখের নিবৃত্তি চাইছ—একটা কামনা আছেই। দুঃখের নিবৃত্তি চাইলে কুকর্ম্ম ক্ষয় হতে থাকে, কিন্তু যদি শুধু আত্মোন্নতি বা শুদ্ধা ভক্তি কামনা কর তবে সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম দুইই ক্ষয় হবে। আবার কর্ম্ম ক্ষয় মানে যে ভোগ হবে না, তা নয়। শীঘ্র শীঘ্র ভোগ করিয়ে বা ভোগের পরিমান কমিয়ে কর্ম্ম ক্ষয় করা হয়। অনেক সময় হয়ত শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্ম ক্ষয় করাতে গিয়ে বেশী জোর দুঃখ ভোগ হয়ে যায়। কিন্তু তাই ব'লে যে অনবরত দুঃখই ভোগ হবে

তাও নয়। সংসারে সুখ দুঃখ মিশিয়ে ভোগ হয়। কলিতে তিন ভাগ দুঃখ এক ভাগ সুখ, তাই দুঃখ ভোগটা বেশী হয় এবং সেই জন্য তার মাঝে কখন যে একটু সুখ ভোগ হয়ে গেল তা ধরতে বা বুঝতে পারা যায় না। যেমন মুখে বেশী কুইনাইনের রস লেগে থাকলে অল্প সন্দেশের মিষ্টতা বোঝাই যায় না; সন্দেশ ঠিকই খাওয়া হল কিন্তু বেশী তেতর জন্য মুখে মিষ্ট বোধ হল না।

তারা পদ। পাপ থেকে মুক্ত হলে সে অবস্থার বোধ হয় কি ?

ঠাকুর। হ্যাঁ আনন্দ আসবে, শান্তি পাবে। ভেতর যত পরিষ্কার হবে তত অল্প পাপ পুণ্যও অনুভূতি হবে।

গোপেন। যারা যোগ আদি অভ্যাস ক'রে চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করে তাদেরও কি কর্ম্ম ক্ষয় হয় ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। চিত্ত বৃত্তি নিরোধ হওয়া মানেই বাসনা কামনা সব গেছে। বাসনা কামনা সমস্ত ত্যাগ না করতে পারলে চিত্ত বৃত্তি নিরোধ হবেই না। বিয়োগ থাকতে কি যোগ হয় ? সুখ দুঃখ বাসনা জনিত। বাসনা থাকলে সুখ দুঃখ ভোগ করতেই হবে। তবে কর্ম্ম ক্ষয় হলে বাসনা ক'মে আসে। সৎ কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় হয় এবং সৎ কর্ম্ম করতে করতে একটা সৎ সংস্কার দাঁড়িয়ে যায়। তখন আর তার দ্বারা বেশী অন্যায় কাজ হয় না।

জিতেন। এ রকম সৎ সংস্কার লাগবার পরও কি আবার অন্যায় ক'রে বা অবিশ্বাস এসে নেমে যায় ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, কর্ম্মের এমনি স্বভাব দিয়েছে যে অন্যায় জানছে, বলছে, তবু আবার ক'রেও ফেলেছে হয়ত। অবিশ্বাস এসে নেবে যাওয়া মানে একটু ঘোরা। সোজা গতি ক'রে গেলে শীঘ্র কার্য্য হয়, কিন্তু অবিশ্বাসের দরুন কিছু ঘুরতে হয় ব'লে দেরী হয়ে যায়, তবে তাকে ঘুরে ফিরে আবার আসতে হবে। যেমন স্কুলে পড়তে পড়তে মাঝে কিছু দিন পড়া ছেড়ে দিয়ে আবার পরে পড়া আরম্ভ করলে পাশ করতে পারে বটে কিন্তু পড়া ছেড়ে দেবার জন্য পেছিয়ে পড়ে ও দেরীতে

পাশ করে। দুই ভাবে অবিশ্বাস আসতে পারে—গুরুর প্রতি বা নিজের প্রতি; ভাবে, কই এত দিন গুরুসঙ্গ করলুম কিছুই ত হল না দেখছি, সুতরাং গুরুর দ্বারা কিছু হবে না, এই ভেবে গুরুর ওপর অবিশ্বাস আনে। অথবা ভাবে, কই নিজে এত দিন ধ'রে ত কত চেষ্টা করলুম কিছুই ত হল না সুতরাং এ সব বাজে, এই ভেবে অবিশ্বাস আনে ও ছেড়ে দেয়।

অবিশ্বাস আসে কেন? হয়ত প্রথমেই লাভের আশায় আসে ও মনে করে যে অল্পতেই একটা মস্ত কিছু তার মনের মত হয়ে যাবে, কাজেই সেটা না হলেই অবিশ্বাস আসে। অথচ মানুষ একটু ভেবে দেখে না যে সংসারে কত অকর্ম্ম রয়েছে, তার মুনফা ত কিছুই পাচ্ছে না, বরং দুঃখের ইতি নেই, কিন্তু কই তার বেলা ত সংসারের ওপর অবিশ্বাস এনে সংসার ছাড়ছে না। যদি সংসারে দুঃখ না থাকত, তা হলে কি কেউ ভগবানকে কখন ডাকত? দুঃখ পায় ব'লেই যে রকমে হোক তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে এদিকে আসে। এটা যে একটা সৎ কাজ, বা সৎ অনুষ্ঠান ও সৎ সংস্কার তা অনেকেই হয়ত বোঝে এবং এর দ্বারা গুরুর ত কিছু লাভ বা লোকসান নেই এও হয়ত বোঝে তত্রাচ বাসনার এদিক ওদিক হলেই গুরুর প্রতি সংশয় এনে ফেলে। তখন এটা ভাবে না যে মন্দ কাজের যখন মন্দ ফল আছে, সৎ কাজেরও তেমনি ভাল ফল হবেই; আর এই সৎ কাজটা ধ'রে থাকলে ত কোন লোকসান নেই, কাজেই এটা ধ'রে থাকতে ক্ষতি কি? আর ছাড়ই বা কেন? ছেড়েই বা যাবে কোথায়? কর্ম্ম ত্যাগ ত এখনও হয়ে যায় নি; সুতরাং উপস্থিত সৎ কর্ম্মে মনটা লেগে থাকলে আর কিছু না হলেও অন্ততঃ সেই সময়টায় ত কোন অসৎ কাজ হ'ল না। এও কি কম লাভ? কারণ সৎ কর্ম্মের ও সৎ সঙ্গের ভাল ফল আছেই।

আবার দেখ মোটের ওপর এই সংসারে সুখ ব'লে একটা জিনিষ ঠিক আছে কি না? সেখানে ঠিক তৃপ্তি পাও কি না? কেউ হয়ত টাকা চায়, কেউ বা যশ, মান চায়, ভাবে এতেই বুঝি সুখ।

ধর, একজন খুব টাকা চাইলে এবং হয়ত অনেক টাকাও পেলে, তাতে তার মনে উপস্থিত কিছু সুখ হ'ল বটে কিন্তু দেখতে হবে তার সেই সুখ স্থায়ী কি? সে কি সেই টাকাতেই সন্তুষ্ট, আর কখনও টাকা চায় না? তার কি আর কোন অভাব রইল না? তার পর আরও দেখতে হবে যে তার অন্য দিকে অপর কোন দুঃখ আছে কিনা? অর্থাৎ মোটের ওপর সে সুখী কি না? বা তৃপ্তিতে আছে কি না? তুমি হয়ত বাইরে থেকে তার টাকা পাওয়াটা দেখে তাকে খুব সুখী বিবেচনা ক'রে নিলে। তেমনি যার আবার যশ মান প্রভৃতি খুব আছে সেও মোটের ওপর সুখী কিনা বা তৃপ্তিতে আছে কিনা বেশ ক'রে ভেতরে তলিয়ে দেখতে হবে; তখন বুঝতে পারবে যে রাজা রাজড়ারাও, যাদের যথেষ্ট অর্থ, যশ, মান আছে যখন মোটেই সুখী নয় ও কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছে না বরং দুশ্চিন্তা ও দুঃখের ঠেলায় অস্থির, তখন সাধারণ আর কিসে সুখী হবে বা তৃপ্তি পাবে?

তাই বলি সমস্ত ক্ষণ সংসারে ডুবে না থেকে কিছু সময় সৎ অনুষ্ঠান, সৎ সঙ্গ করলে ক্ষতি কি? সৎ গুরুর সঙ্গ ক'রে হঠাৎ একটা কেষ্ট বিষ্ণু না হয়ে থাকতে পার কিন্তু এটুকুও ত নিজেরাই ধরতে পার যে এখন আর পূর্ব্বের মত অন্যায় কাজ করতে তত প্রবৃত্তি হয় না এবং যদিও বিশেষ কারণে সামলাতে না পেরে ক'রেও ফেল, ত পূর্ব্বের মত অবাধে খুব বেশী অন্যায়টা করবে না ও এমন কি হয়ত এই ছোট অন্যায়ের জন্যে বেশ অনুতাপ হচ্ছে। এটাও ত কিছু লাভ বটে; অন্ততঃ লোকসান যে নয় সেটা ত ঠিক? যারা সংসার ছাড়েনি, সব দিক বজায় রেখেছে কেবল বাজে কাজ বা বাজে গল্পে যে সময়টা নষ্ট করত তার কিছুটা হয় ত সৎ সঙ্গ করছে তাতে তারা কি ক'রে আর এর চেয়ে বেশী লাভ চায়? যেমন মূলধন ফেলবে সেই রকম লাভ হবে এই হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। কিছুই মূলধন ফেললে না, কিছুই লোকসান করলে না, অথচ মাঝখান থেকে

যদি সৎ সংস্কার লেগে গেল, সৎ ভাব এল তা কি মন্দ? সৎ সঙ্গ না করলে এ টুকুও ত হত না। সাধারণ মানুষের ধারণা যে বাসনা কামনা পূরণ হলেই মানুষ হ'ল কিন্তু তাকে ঠিক মানুষ তৈরী হওয়া বলে না। মনের শক্তি বাড়াও, যাতে সংসারের দুঃখে অর্থাৎ রোগ শোক, অভাবে ঠিক দাঁড়াতে পার তবে ত মানুষ ব'লে নিজেকে পরিচয় দিতে পারবে।

জিতেন। কিছু দিন ঠিক ভাবে ধ'রে থেকে বিশেষ লাভ বুঝতে পারে না ব'লে ত অনেক সময় বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দেয়?

ঠাকুর। তার মানেই হচ্ছে এটা ঠিক ধরে নি। সংসারে এত দুঃখ পেয়েও সেটা ত ছাড়তে দেখা যায় না, কারণ সেটা ভাল ক'রে ধ'রে নিয়েছে কিনা। প্রথমে দেখ, কিছু হল না মনে ক'রে দূর ছাই ব'লে ছেড়ে দেওয়া ত বীরের লক্ষণ নয়। পালোয়ান লড়তে গিয়ে হারলে কি লড়াই ছেড়ে দেয়! না আরও কসরত ক'রে খেয়ে দেয়ে ফিরে বারের জন্যে তৈরী হয়? সেই রকম রাজসিক বৃত্তি নাও, কিছু হ'ল না ব'লে ছেড়ে দেবে কেন? আরও জোর ক'রে চেষ্টা কর। তা ছাড়া, কি বড় সুখের আশ্বাসে এটা ছাড়তে চাচ্ছ? সেই ত রোগ, শোক, তাপ, অভাব, স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতিতে ভরা দুঃখময় সংসারেই ডুবতে যাচ্ছ। আর আমি প্রত্যেককেই দেখিয়ে দোব যে যারা যারা একটু সৎ নীতি ধ'রে আছে তাদের সকলেরই কিছু না কিছু লাভ হয়েছেই; তবে যেমন মন দেবে সেই অনুযায়ী কাজ হবে। তা যে ভাবেই কর, নিয়ম ক'রে রোজ কিছু সময় সৎ সঙ্গ করলে কিছু লাভ হবেই।

জিতেন। যার কিছুতেই বিশ্বাস নেই, তার কোন কৌশল দ্বারা বিশ্বাস আনাবার উপায় আছে কি? এই যেমন যোগ ক্রিয়া দ্বারা চিত্ত স্থির করা যায়, সেই রকম কোন ক্রিয়ার দ্বারা কি বিশ্বাস আনা যায়?
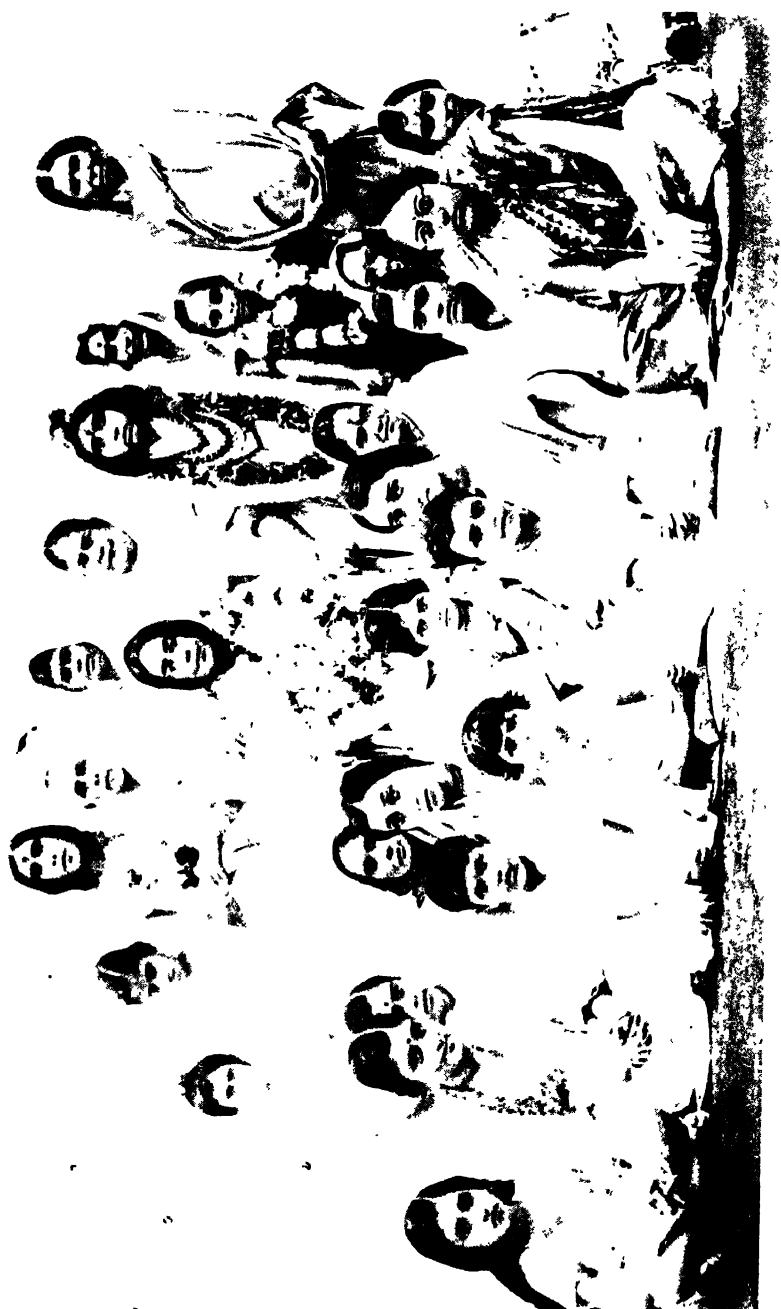
ঠাকুর। বিশ্বাস কিছুতেই নেই এ রকম লোক কেউ আছে কি? একটা না একটাতে কিছু বিশ্বাস আছেই। গুরুতে বিশ্বাস না থাকতে পারে, ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকতে পারে, কিন্তু (২+২=৪) দুয়ে দুয়ে যে চার হয় এটায় বিশ্বাস আছে ত? প্রথমেই চট্ ক'রে গুরুতে বা ধর্ম্মে বিশ্বাস সকলের ভাগ্যে আসে না, তবে পূর্ব্ব সুকৃতি বশে কারুর হয়ত এসে যায়। নচেৎ সাধু সঙ্গ ও সৎ নীতি পালন করতে করতে বিশ্বাস আসে। পথ ত তিনটে আছে, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ। সংসারীদের পক্ষে সঙ্গই হচ্ছে সহজ এবং এক মাত্র উপায়; সঙ্গে কিছু শ্রদ্ধা আসে, ক্রমে সৎ নীতি ও সৎ কর্ম্মের একটা সংস্কার লেগে যায়। তার পর সংস্কার কাজ করতে করতে কিছু ভালবাসা লাগে, এবং সেই ভালবাসা যত বাড়তে থাকে তত বিশ্বাস আসে। শ্রদ্ধাটা কিছু থাকা চাই; শ্রদ্ধা না থাকলে তুমি ত আসবেই না। শুনেছ যে সৎ সঙ্গে মঙ্গল হয়, এই কথায় শ্রদ্ধা থাকায় তবে ত তুমি সৎ সঙ্গ করতে লাগলে। এ টুকু তোমাকে করতে হবে, তার পর লেগে থাকতে থাকতে বাকীটা হবে। পূর্ব্বেই শ্রদ্ধার দরকার, শ্রদ্ধা না থাকলে কিসের জোরে লেগে থাকবে? তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'শ্রদ্ধা না থাকিলে পার্থ সকলি বিফল।' আবার আর এক জায়গায় বলেছেন 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম।'

কালু। বিশ্বাস কিছুই নেই, তবে ভাল লাগে ব'লে সৎ স্থানে আসে, আর এলেও হয়ত অনেক সময় মন্দ ভাব নিয়ে আসে।

ঠাকুর। ভাল লাগা মানেই কিছু বিশ্বাস। তা ছাড়া সৎ স্থান বলছ, মানেই ত সৎ ব'লে বিশ্বাস আছে। ভাল লাগে ব'লে ছুটোছুটি কর, নইলে ত আসতেই না। আর এর চেয়ে বড় ভাল লাগা না পেলে এটা ছেড়ে অন্য জায়গায় যাবেও না। যখনই ভাল লাগছে তখন প্রত্যক্ষ একটা কিছু দেখে ভাল লাগছে ত, খারাপে ভাল লাগা ও ভালতে ভাল লাগা, অন্ততঃ এই টুকু তফাৎ ক'রে নিয়েছ ত? এই টাই বিশ্বাস। আর মন্দ ভাব যেটা বললে সেটা জায়গা বিশেষে।

দেবস্থানে বা সাধুস্থানে ত খারাপ জিনিষ পাবে না যে সেইটা ভেবে সৎ স্থানে আসবে। মদ খেতে যদি ভাল লাগে ত মদের দোকানে ঢুকবে, অন্য জায়গায় যাবে কেন? যখনই কালী মন্দিরে ঢুকেছ, তখনই বুঝতে হবে যে তুমি মাকে দর্শন ক'রে তাঁর চরণামৃত খেতে এসেছ; এখানে যদি তোমার ভাল না লাগত তা হলে তুমি টেঁকতে না, চ'লে যেতে। তার প্রমাণ দেখ, সংসার ভাল লাগে ব'লে এত দুঃখ পেয়েও ছাড় না।

প্রথমেই ত ঠিক বিশ্বাস আসে না; গোড়ায় সাধারণ বিশ্বাস অর্থাৎ শ্রদ্ধার সঙ্গে একটু বিশ্বাস নিয়ে এসেছ। এই ভাবেই বেশীর ভাগ লোক আসে। ক'টা লোক ঠিক বিশ্বাস নিয়ে আসছে? বিশ্বাস আছে কি না এ ত ভাষায় বুঝব না, এর লক্ষণ আছে। যখন খুব দুঃখ পেয়েও ছাড়নি, ঠিক দাঁড়িয়ে রয়েছ কিম্বা বড় বিপদেও স্থির হয়ে আছ, টলছ না তখনই ঠিক বিশ্বাস এসেছে। শুধু শ্রদ্ধা নিয়ে গতি করতে করতে অনেক সময় সংশয় এসে পড়ে; সেটা কিন্তু ঠিক অবিশ্বাস নয়। তখন যে টুকু বিশ্বাস ছিল সে টুকুও টলেছে, অথচ একেবারে ছাড়নি, হয় ত অল্প অবিশ্বাসও এসেছে এবং ভেতরে যুক্তি বিচার দ্বারা বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব চালাচ্ছ। যদি এই বিচার করতে করতে ঠিক ক'রে ফেল যে বিশ্বাসটাই ঠিক জিনিষ, অবিশ্বাস কিছুই নয়, তখন সংশয় কেটে গিয়ে আগের চেয়ে বরং একটু জোর বিশ্বাস আসে। কিন্তু যেই বিচারে স্থির করলে যে বিশ্বাসটা ঠিক নয়, ভুল, তখন পুরো অবিশ্বাস এল। অবিশ্বাস বলতে একই বোঝায়, এর আর রকম নেই তবে কিছু কম বেশী। অবিশ্বাস আসা মানেই বিশ্বাস একেবারে হারান। অবিশ্বাসের কাজ হচ্ছে গুরুর কাছ থেকে তফাৎ ক'রে দেয়। এ রকম পূর্ণ অবিশ্বাস এলে নেমে যায় বটে, কিন্তু আবার যখন কোন কারণে পরে বুঝতে পারে যে তার বিচার ভুল হয়েছিল, সে মিছি মিছি অবিশ্বাস করেছিল, তখন সে নিজের দোষ বুঝতে পারে ও তার মনে অনুতাপ আসে। এ

অবস্থায় সে আবার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে এবং গুরুর কৃপায় তার বিশ্বাস ফিরেও আসে।

কালু। শাস্ত্রে গুরুকে ত কত বড় করেছে ; গুরু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এত বড় বিশ্বাস নেই, তবে তিনি অজ্ঞান নষ্ট ক'রে জ্ঞান দিতে পারেন এই বিশ্বাস টুকু আছে হয় ত।

ঠাকুর। হ্যাঁ, প্রায় সবই তাই। গুরুব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেব মহেশ্বর এ বোধ ঠিক থাকলে কি আর অবিশ্বাস আসতে পারে? তখন সে যে সব প্রত্যক্ষ দেখছে, আর অবিশ্বাস করবে কেন? কিন্তু তা ত সাধারণে পারে না। তবে শাস্ত্রে ব'লে গেছে, তাই সংস্কার বশতঃ ঐ ভাষা গুলো শুধু আওড়ায় মাত্র। আবার এরই মধ্যে কারুর কারুর হয় ত বা কিছু ভক্তি আছে ; সে সত্যি সত্যিই ভক্তি সহকারে প্রণাম করে, আবার কেউ বা শুধু সংস্কার বশতঃ প্রণাম করে। যেমন ব্রাহ্মণ দেখলেই প্রণাম করতে হয় এই সংস্কারের বশে দেখা হলেই বলছে 'ঠাকুর মশাই, প্রণাম', এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণ তার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে দিচ্ছে না ব'লে কড়া কথাও শুনিয়ে তাগিদ দিচ্ছে। অথচ ফের দেখা হ'লে আবার সেই কেতা দুরস্ত বলছে 'ঠাকুর মশাই, প্রণাম' এবং তারপরেই মনের আসল ভাব ব'লে ফেলছে' দেখুন ঠাকুর মশাই, টাকাটা কিন্তু না দিলে বাধ্য হয়ে আপনার নামে নালিশ ক'রে আপনার ভিটে বাড়ীটা ক্রোক করতে হবে।'

শাস্ত্রে ত এ কথাও বলেছে গুরু ইষ্ট এক, তা সে বিশ্বাস কি সহজে আসে? সাধারণ গুরু ও ইষ্টকে আলাদা ভাবে এবং গুরু দ্বারা ইষ্ট লাভ হতে পারে এই বিশ্বাসে গুরুকে দালাল খাড়া ক'রে গতি করে। এও ভাল, এই করতে করতে পূর্ণ বিশ্বাস এলে গুরু আর ইষ্ট আলাদা থাকে না এক হয়ে যায়। কিন্তু সে ক'জন বুঝতে পারে? কৃষ্ণ সাধারণ রাখাল বালকের মত ব্যবহার করলেন, তা যশোদা, নন্দ কেউ কি ধরতে পারলে? বসুদেব কৃষ্ণকে কোলে ক'রে যমুনা দেখে আকুল হ'য়ে কাঁদছে। অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাবার

পরও অর্জ্জুনের বিশ্বাস এল না। শুধু দেখলে কি হবে? সহ্য করতে পারলেও একটা ঘোরের ঝোঁকে দেখলে বই ত নয়। তার পর যখন প্রকৃতিস্থ হবে তখন মনে হবে যে হয় ত স্বপ্ন দেখেছে; যত ক্ষণ না সে অবস্থা হয় তত ক্ষণ চোখে দেখলেও সে ভাব উপলব্ধি করতে পারা যায় না। আর গুরুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে খুব বড় করা, কারণ বড় করলে তবে তাঁর কাছে কিছু পেতে পারবে। এই লাভের আশায় যখনই আসবে তাঁকে বড় করতেই হবে, নইলে আর বড় ছোটর প্রয়োজন কি? তাঁকে যদি ঠিক ভালবাস তাহলে তাঁর ওপর ত কোন স্বার্থ রাখবে না; তিনি যাই হোন তাঁকেই শুধু ভালবাসবে, তিনি বড় কি ছোট বা তাঁর ঐশ্বর্য্য আছে কি না এ সব কিছুই দেখবে না বা ভাববে না। তাই প্রেমে পঞ্চ ভাব দিয়ে, যার যে ভাব ভাল লাগে, গতি করে; বাপ, মা, ছেলে, প্রভু, দাস যে ভাবেই তাঁকে ডাক স্বার্থ না থাকলেই হ'ল। তাই আছে 'যে রূপে যে জন করয়ে ভজন সেই রূপে তার মানসে রয়।' ছোট ছেলে মাকে ভালবাসে, মাকেই চায়; মার কোন গুণ আছে কি না সে সব দেখে কি? তা ছাড়া, গুরুই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বলার অর্থ তোমার এই তিনের কারুর ওপর অবিশ্বাস এলেই আর গুরুর ওপর বিশ্বাস রইল না। আবার এই তিনের ওপর বিশ্বাস এলেই আর গুরুর ওপর অবিশ্বাস আসতে পারবে না; অর্থাৎ ভাবটা হচ্ছে গুরুই সব।

জিতেন। গুরুকে কেউ বা ভগবান ভেবে আসে, কেউ বা অবতার ভেবে আসে; কাজেই তাদের সে ভাব না পেলে দাঁড়াতে পারে না।

ঠাকুর। আগে দেখ, যে ভাব গুলোর জন্যে আসছ বলছ, তার কোনটা বোঝ কি না? ভগবানই বা কি, আর অবতারই বা কি তা কি তুমি জান? কখনও কি ভগবান দেখেছ? কি কি গুণ, বা লক্ষণ থাকলে ভগবান বা অবতার হয়, তা কি জান? যদি কিছুই না জান বা বোঝ তা হলে মাপবে কি ক'রে? তা ত নয়; তোমরা যার যার প্রাণের ভাব ও আবেগ অনুযায়ী গুরুকে ভগবান বা অবতার বলছ এবং যার

প্রাণে যে ভাবটা গিয়ে লাগে সে সেই ভাবে তাঁকে তোমার মনোমত গ'ড়ে নিচ্ছ। গুরুর ওপর প্রেম বা ভক্তি এলে যারাই তাঁর কাছে আসে ও সেই ভাবে গতি করে তাদেরই মঙ্গল হয়।

কেষ্ট। তা হলে ভগবানকে মাপবার উপায় নেই ত?

ঠাকুর। কি ক'রে পারবে? একটী ঘটি নিয়ে কি অনন্ত সমুদ্রের জল মাপতে পার? যার যে পরিমাণ জ্ঞান আছে সে সেই টুকু মাপতে পারে। তবে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণ আনন্দ ও শান্তি বাড়বে। তুমি যে অবস্থায় আছ সেই অনুযায়ী বোধ আসবে, যেমন অবস্থা বদলাবে সেই সঙ্গে বোধও বদলাতে থাকবে। সৎ সঙ্গ করতে করতে তোমার ভক্তি বিশ্বাস যেমন যেমন বাড়বে সেই পরিমাণ উপলব্ধি হবে, তার বেশী তোমার আধারে ধরবে কেন? তাই আছে 'যে অবধি যার অভিসন্ধি হয় সে অবধি সে পরম ব্রহ্ম কয় তৎপরে তূরীয় অনির্ব্বচনীয়।'

জিতেন। পঞ্চ ভাবের সাধনার কোন ভাবটী নিয়ে চলতে হবে? সেটা কি আপনি আসে না চেষ্টা ক'রে আনতে হয়?

ঠাকুর। যার যে ভাবটা ভাল লাগে সে সেই ভাবে সাধনা করে। এই ভাল লাগাটা আপনিই আসে। মধুর ভাবে দেহ, মন, প্রাণ সমস্ত অর্পণ ক'রে ফেলে। তখন আর স্ত্রী পুরুষ বোধ বা অন্য কোন স্বার্থ বোধ থাকে না! পুরুষ, স্ত্রী বোধ থাকলেই কামনা রইল। স্বার্থ শূন্য হলে পুরুষ স্ত্রী ব'লে ভেদ বোধই থাকবে না, তখন লজ্জা বা সঙ্কোচ আসবে না। এই অবস্থা এলে তবে মধুর ভাব ঠিক হবে। সখ্য ভাবে কিছু কৃতজ্ঞতা থাকে। কৃষ্ণ ও গোপিকাদের এই মধুর ভাব ছিল; তাদের পুরুষ, স্ত্রী বোধ ছিল না; অর্থাৎ গোপিকাদের কৃষ্ণের ওপর কোন স্বার্থ ছিল না। এটা তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে কারণ একটা স্ত্রী নিয়েই তোমরা হাবুডুবু খাচ্ছ, আর দুটো বিয়ে করলে ত ঘোর অশান্তি। গোপিকাদের মধ্যে কামনা বা কোনরূপ স্বার্থ থাকলে কি কৃষ্ণ অত গুলি গোপিনীদের ঐ ভাবে রাখতে পারতেন? শক্তি অসাধারণ ভাবে না থাকলে তিনি কি এত ভালবাসা সহ্য বা গ্রহণ

করতে পারতেন? প্রত্যেক গোপিকাই ভাবত যে 'কৃষ্ণ আমাকে যেমন ভালবাসেন তেমন আর কাউকেও ভাল বাসেন না'। এ ভালবাসা কি তোমরা ধারণার ভেতর আনতে পার? এ ত বাদসাহের বেগমদের মত জোর ক'রে বন্দী রেখে অশান্তি ভোগ করা নয়। গোপিকারা স্বেচ্ছায় যাওয়া আসা করছে, নিজেরা না খেয়ে কৃষ্ণকে খাইয়ে ভালবেসে ছুটছে, তাঁকে না দেখতে পেলে কেঁদে ভাসাচ্ছে এবং তাড়িয়ে দিলেও যাচ্ছে না। নিঃস্বার্থ ভাব না থাকলে কি এ রকম ব্যবহার করতে পারত, না পরস্পরের মধ্যে হিংসা পোষণ না ক'রে অত ভালবাসা এবং সদ্ভাব রক্ষা করতে পারত? আসল কথা কি জান? কাম, ক্রোধ, লোভ রিপু গণকে দমন ক'রে যা খুসি তাই ক'রে বেড়াতে পার, কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যত ক্ষণ না রিপুদের অধীন করতে পারছ, তত ক্ষণ খুব বেড় দিয়ে সাবধানে চলতে হবে। কামনা মানে কোন বস্তুতে জোর আকাঙ্ক্ষা; এই কামনা দুষ্পুরণে ক্রোধ এবং প্রবল কামনা হ'লেই লোভ, তবে সাধারণতঃ রসনার বস্তুতে কামনাকে লোভ বলে। সৎ সঙ্গ বা গুরুর সঙ্গ ব্যতিরেকে রিপু দমন করা বড় শক্ত জিনিষ, তাই এত ক'রে সংসারীদের সঙ্গ করতে বলেছে কারণ এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে গতি করা বড়ই কঠিন।

দ্বিজেন ও সকলে একত্রে গাহিল—

ধরম করম শিখাতে ভূলোকে এসেছ গোলোক ছাড়িয়া।
জীব দুঃখ হেরি রহিতে না পারি এসেছ করুণা করিয়া॥
অপরূপ রূপ ঝলকে, মোহিছ নয়ন পলকে।
মধুর বচনে গীত আলাপনে অমিয় পড়িছে ঝরিয়া॥
শান্তি ঢালিছ মরমে, ভ্রান্তি নাশিছ করমে।
আদরে শাসনে গঠিছ মনেরে নিজ মনোমত করিয়া॥
ভকত জনের সঙ্গে বিহরিছ লীলা রঙ্গে।
জয় জয় গুরু প্রেম রসতরু নমি হে চরণে পড়িয়া॥

গুরুকৃপা হি কেবলম্‌।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের উপদেশাবলীর সূচিপত্র

——ঃ০ঃ——

সংসার ঠিক বিষবৎ বোধ হয় না। একবার ঠিক বিষবৎ হ'লে আর কি সংসারে থাকতে পারে। ৩৭৯

সংসারে কামিনী কাঞ্চনের মায়ার এত জোর আকর্ষণ এবং পরপর এমন ভোগের জিনিষ সব এনে দেয় যে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে সে গুলি ত ছাড়তে পারেই না বরং কিসে সেই সব ভোগের জিনিষ পরপর আরও বেড়ে যায় সর্ব্বদা সেই চিন্তা করে। সঙ্গে এ গুলি যে অনিত্য এ বোধ সহজে আনিয়ে দেয় তবে কিছু কিছু ত্যাগ হতে থাকে, কিন্তু সৎ এ কিছু ভালবাসা প'ড়ে গেলে আপনি ত্যাগ হয়ে যায়। ৩৬৫

সংসারে কেউ বা চোখ বুজে সংসার করে এবং সংসারের সব জিনিষেই সুখ পাচ্ছে মনে ক'রে বদ্ধের মত সংসারে ডুবে থাকে আবার কেউ বা চোখ চেয়ে সংসার করে অর্থাৎ সংসারে দুঃখ পাচ্ছে অশান্তি ভোগ করছে অথচ ছাড়তেও পারছেনা। এই হল প্রবর্ত্তক অবস্থা। ... ৩৭৯

সংসারে টাকা কড়ি আনব, সকলকে সুখী করব এইভাব নিয়ে যখন চলতে চাও অথচ দেখচ দুঃখ ত ছাড়ছে না ঠিকই আসছে তখন সাধুর ওপরও অনেক সময় অবিশ্বাস আসতে থাকে ; আমার কথা হচ্ছে এ অবস্থাতেও সঙ্গ ছেড় না। অবিশ্বাস এলেও জোর ক'রে নীতি পালন হিসাবে গুরু সঙ্গ করলে জোর সংশয় আসতে দেবেনা এবং ক্রমশঃ বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে। ৩০৯

সংসারে ত্যাগ কি এত সোজা? ত্যাগ করার আগে মস্ত একটা জিনিষ চাই। যতক্ষণ তোমার বিশ্বাস যে তুমি চেষ্টা ক'রে করছ তখন বললেও সংসার ছাড়তে পারবে না। যখন ঠিক বুঝবে যে আমরা কেউ কিছুই করতে পারি না কেবল একমাত্র ভগবানই সব করতে পারেন তখনই তুমি ত্যাগের কথা ভাবতে পার আর তখনই তুমি

শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখনিঃসৃত ঃ—

১। **অমৃতবাণী,** ১ম ভাগ—শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সারগর্ভ উপদেশ বাণী; মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র ।৵০।

২। **অমৃতবাণী,** ২য় ভাগ—সংসার, সমাজ ও ধর্ম্ম-বিষয়ে সরল উপদেশ বাণী। মূল্য—২৲ দুই টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র ।৵০, দুই ভাগ একত্রে লইলে ডাক মাশুল ইঃ ১।০।

৩। **অমৃতবাণী,** ৩য় ভাগ—সংসার, সমাজনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে চমৎকার উপদেশ। মূল্য—২৲ দুই টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র ।৵০, তিন ভাগ একত্রে লইলে ডাক মাশুল ১।৵০।

৪। **বড়ু চণ্ডীদাস** (ধর্ম্মমূলক নাটক)—নাটকাকারে নিষ্কাম প্রেম তত্ত্ব ও সামাজিক ঘটনা সম্বন্ধে উপদেশ। মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র ।৵০।

৫। **ভক্ত প্রসাদ** (ধর্ম্মমূলক নাটক)—নাটকাকারে রামপ্রসাদের পূর্ব্বাপর সাধন তত্ত্ব ও স্তরে স্তরে অবস্থা লাভ বর্ণনা। মূল্য—১৲ এক টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র ।৵০।

৬। **শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কয়েকটী উপদেশ**—অমৃতবাণী হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ বাণী কিছু কিছু উদ্ধৃত। মূল্য ।০ চার আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র ৵০।

৭। **গোবিন্দনাম** (সংকীর্ত্তন)—কীর্ত্তনচ্ছলে সাংসারিক ও ধর্ম্মমূলক উপদেশ। মূল্য ৶০ দুই আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র ৵০।

৮। **কয়েকটী স্তব**—প্রত্যহ মঠে পাঠ করা হয়। মূল্য ৶০ দুই আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র ৵০।